আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থাদি পড়ে ঈমান আক্বীদা মজবুত করুন

১। জা'আল হক — মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী
২। শানে হাবীবুর রহমান — "
৩। সালতানাতে মুস্তফা — "
৪। আউলিয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত — "
৫। ইলমুল কুরআন — "
৬। ...র জবাব — "
৭। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) — "
৮। ইসলামী জিন্দেগী — "
৯। কানযুল ঈমান (তরজুমা কুরআন) আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১০। ...র সঠিক বিশ্লেষণ — "
১১। ...র হক — "
১২। বাহারে শরীয়ত — মুফ্‌তী আমজাদ আলী
১৩। কানুনে শরীয়ত — মুফ্‌তী শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৪। কারবালা প্রান্তরে — আল্লামা শফি উকাড়ভী
১৫। জলজলা — আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৬। আমাদের প্রিয় নবী — আল্লামা আবেদ নিযামী
১৭। ইসলামের বাস্তব কাহিনী — আল্লামা আবুন-নূর-বশীর
১৮। যিয়ারতে আজমীর — অধ্যাপক লুৎফুর রহমান
১৯। ইসলাম ও গান বাজনা — মাওলানা নুরুল হক
২০। হাম্‌দে খোদা ও নাতে রসূল — মাওঃ মুহাম্মদ আলী

মুহাম্মদী কুতুব খানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

জা'আল হক
২
মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

জা'আল হক

মুফ্‌তী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায় ঃ মিসেস হাসিনা রহমান
নিশান প্রকাশনী
শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রথম সংস্করণ	ঃ	৩০শে সেপ্টেম্বর	'৮৮ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	১লা নভেম্বর	'৯০ ইং
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	১লা ডিসেম্বর	'৯২ ইং
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	১লা জানুয়ারী	২০০০ ইং
পুণঃ মুদ্রণ	ঃ	২রা ফেব্রুয়ারী	'৯৬ইং
পুণঃ মুদ্রণ	ঃ	৪ঠা সেপ্টেম্বর	'৯৮ ইং
পুণঃ মুদ্রণ	ঃ	১লা মার্চ	২০০২ইং
পুণ ঃ মুদ্রণ	ঃ	১৫ই ফেব্রুয়ারী	২০০৬ইং
			২০১০ ইং

হাদিয়া ঃ ২০০.০০

শব্দ বিন্যাস ঃ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান
এনাসম্ কমিপউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com

অনুবাদকের কথা

খোদার লাখো শুকরিয়া, হাকীমুল উম্মত মুফ্তী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব 'জা'আল হক' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয়াংশের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হলো। আশা করি প্রথমাংশের মত এটাও সুধী পাঠক সমাজের কাছে সমাদৃত হবে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন কতেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করে থাকে, যার সম্পর্কে ওদের কোন সম্যক জ্ঞান নেই; কেবল শোনা কথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। উদাহরণ স্বরূপ, কতেক লোক বিদ্আত' বিদ্আত' বলে গলাবাজি করে। কিন্তু বিদ্আত কাকে বলে, বিদ্আত কত প্রকার, কোন্ ধরনের বিদআত দূষণীয় আর কোন্ ধরনের বিদ্আত পুণ্যময়, এ সব কিছুই জানে না। অনুরূপ মীলাদ, কিয়াম, উরশ, ফাতিহা, মাযার তৈরী, কবর যিয়ারত, উচ্চস্বরে যিক্র, কবরে আযান, নযর-নিয়ায ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে অনেক কিছু বলে। কিন্তু কোনটা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 'জা'আল হক' কিতাবটা একবার পাঠ করলে অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হবে এবং উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবে। আমি পূর্ণ আস্থা সহকারে বলতে পারি, যার হাতে এ কিতাবটি থাকবে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণকারীর মুকাবিলা করতে পারবেন এবং ওদের খপ্পর থেকে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। এ কিতাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক আকীদা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং সাথে সাথে বাতিলপন্থীদের উত্থাপিত আপত্তি সমূহের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত এ কিতাবে প্রদত্ত দলীলাদি কেউ খণ্ডাতে পারেনি। আশা করি পারবেও না।

এ অমূল্য গ্রন্থখানা ভাষান্তরিত করে বাংলা ভাষাভাষীদের খিদমতে পেশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ভাষার ব্যাপারে আমার তেমন দক্ষতা নেই তবে দক্ষজনের সাহায্য নিতে ভুল করিনি। বিশিষ্ট

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব নূর মোহাম্মদ রফিক সাহেব সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। আমার একান্ত অনুরোধে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জনাব হাফেজ মাওলানা মঈনুল ইসলাম সাহেব নানা ব্যস্ততার মধ্যেও গ্রন্থখানা যথাযথ সম্পাদনা করেছেন। এর জন্য আমি উভয়ের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থখানা আরও অনেক আগে প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কাগজের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে অনেক দেরি হয়ে গেল। ইন্‌শা আল্লাহ, পরবর্তী খণ্ড প্রকাশ করতে বেশি দেরি হবে না। এর মধ্যে আরো কয়েকটা মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ চলছে এবং একটার পর একটা প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে আমি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক দুআ কামনা করি।

ইতি
অনুবাদক

www.AmarIslam.com

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় চাচা মরহুম ফজল করীম সাহেবের আর্থিক আনুকুল্যে গ্রন্থখানা পুনঃ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে বিধায় গ্রন্থখানা তাঁরই নামে উৎসর্গ করলাম। পাঠক মহল গ্রন্থখানা পাঠে উপকৃত হলে মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বাধিত করবেন।

বিদ্আতের সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ ও বিধানাবলীর বিবরণ

এ আলোচনাকে দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বিদ্আতের সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ ও বিধানাবলীর বিবরণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের বিবরণ ও এর উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বিদ্আতের সংজ্ঞা, এর প্রকারভেদ ও বিধানাবলী

বিদ্আতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- নতুন জিনিস। যেমন- কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান- قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ (বলে দিন, আমি নতুন রসুল নই।) আল্লাহ ইরশাদ করেন- بَدِيعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ (আসমান ও যমীনসমূহের সৃষ্টিকর্তা।) আর এক জায়গায় ইরশাদ করা হয়েছে- وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ (সন্ন্যাসবাদ তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল, আমি তাদেরকে এর হুকুম দিইনি।)

উপরোক্ত আয়াত সমূহে 'বিদ্আত' শব্দকে শাব্দিক অর্থে-অর্থাৎ সৃষ্টি করা, নতুন কিছু তৈরী করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতে- الاعتصام بالكتاب والسنة শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

قَالَ النُّوَوِيُّ الْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْئٍ عَمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ

অর্থাৎ বিদ্আত সে কাজকে বলা হয়, যা বিগত কোন কিছুর অনুকরণ ছাড়া করা হয়। বিদ্আত তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) নতুন কাজ, যা হুযূর পাক (দঃ) এর পরে সূচিত হয়েছে; (২) সুন্নাতের বিপরীত কাজ, যা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে এবং (৩) সে সব বদ্আকীদা, যা পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অর্থে ব্যবহৃত বিদ্আত দু'প্রকার- বিদ্আতে হাস্না ও বিদ্আতে সাইয়া। দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত বিদ্আত মাত্রই সাইয়া (মন্দ)। যে সব বুযুর্গানে কিরাম প্রত্যেক বিদ্আতকে সাইয়া (মন্দ) বলেছেন, তাঁরা তা দ্বিতীয় অর্থের বেলায় বলেছেন এবং হাদীছের মধ্যে যে আছে- প্রত্যেক বিদ্আত গুমরাহী, তা দিয়ে তৃতীয় অর্থের বিদ্আত বোঝানো হয়েছে। সুতরাং, হাদীছসমূহ ও উলামায়ে কিরামের উক্তি সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীয়তের পরিভাষায় বিদ্‌আত বলতে সে সব আকীদা ও আমলকে বলা হয়, যা হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জাহেরী জিন্দেগীকালে ছিল না; পরে প্রচলন হয়েছে। এ সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় বিদ্‌আতে শারেয়ী দু'রকম-বিদ্‌আতে ইতিকাদী ও বিদ্‌আতে আমলী। বিদ্‌আতে ইতিকাদ সে সব মন্দ আকীদাকে বলা হয়, যা হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরে ইসলাম ধর্মে সূচিত হয়েছে। ঈসায়ী, ইহুদী, মজুসী এবং মুশরিকদের আকীদাসমূহ বিদ্‌আতে ইতিকাদী নয়। কেননা এরা হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র জিন্দেগীতে বিদ্যমান ছিল। অধিকন্তু, সেসব আকীদাকে ঈসায়ী ও অন্যান্যগণ ইসলামী আকাইদ বলে না। জবরীয়া, কদরীয়া, মরজিয়া, ছকড়ালবী, লা-মাযহাবী ও দেওবন্দীদের আকীদা হচ্ছে বিদ্‌আতে ইতিকাদী। কেননা এসব ফির্‌কা পরে আবির্ভূত হয়েছে এবং এরা তাদের আকীদাকে ইসলামী আকীদা মনে করে থাকে। যেমন- দেওবন্দীরা বলে, আল্লাহ মিথ্যে বলার ক্ষমতা রাখেন, হুযূর আলাইহিস সালাম গায়ব জানেন না, নামাযে হুযুরের স্মরণ গরু-গাধার স্মরণ থেকে খারাপ। এসব নাপাক আকীদা ১২০০ হিজরীর আবিষ্কার। আমি এ কিতাবের শুরুতে ফাত্ওয়ায়ে শামীর উদ্ধৃতি দিয়ে এর প্রমাণ দিয়েছি।

এখন বিদ্‌আতে হাস্‌নার প্রমাণ নিনঃ আল্লাহ তা'আলা ফরমান-

وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ الاابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ.

(আমি তাঁদের আত্মায়, যাঁরা তাঁর অনুসরণ করেছেন, আরাম ও রহমত দান করেছি। সন্ন্যাসবাদ তারাই প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর হুকুম দিইনি। আল্লাহর রেযামন্দীর উদ্দেশ্যে এর সূচনা করেছিল।) পুনরায় ইরশাদ করেন فَاتَيْنَا الَّذِينَ امَنُوا مِنْهُم اَجْرَهُم. (তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, আমি ওদেরকে পুরস্কার দিয়েছি।)

এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে ঈসায়ীগণ বিদ্‌আতে হাস্‌না অর্থাৎ সংসার ত্যাগী হওয়াটা আবিষ্কার করলো, আল্লাহ তা'আলা এর প্রশংসা করলেন এবং এর জন্য পুরস্কারও দিলেন। তবে হ্যাঁ, যারা একে চালু রাখতে পারেনি, তাদের নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. (এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি।) লক্ষ্য করুন, এখানে বিদ্‌আতের জন্য নিন্দা করা হয়নি বরং এটা চালু না রাখায় নিন্দা করা হয়েছে। তাই প্রমাণিত হলো যে, বিদ্‌আতে হাস্‌না ভাল ও ছওয়াবের কাজ। কিন্তু যথাযথ পালন না করা পাপ। خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَدْوَمُهَا-

www.AmarIslam.com

(সবচেয়ে ভাল কাজ হচ্ছে ওটার উপর অটল থাকা।) সুতরাং, মুসলমানগণ যেন যথাযথভাবে মীলাদ মাহফিল ইত্যাদি উদ্‌যাপন করেন। মিশকাত শরীফের الاعتصام। অধ্যায়ের প্রথম হাদীছে আছে-

مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

(যে ব্যক্তি আমার এ ধর্মে ওই ধরনের আকীদার প্রচলন করে, যা ধর্মের বিপরীত, [illegible] অভিশপ্ত।) আমি উপরোক্ত হাদীছে শব্দের অর্থ আকীদা এ জন্য করেছি যে ধর্ম হচ্ছে আকীদার অপর নাম। গৌণ আমল সমূহের ক্ষেত্রে, যেমন- বেনামাযী গুণাহ্‌গার বটে, কিন্তু বেদীন বা কাফির নয়, অথচ মন্দ আকীদা পোষণকারী হয়তো গুমরাহ, না হয় কাফির। এ প্রসংগে 'মিরকাত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

والمعنى أن من احدث فى الاسلام رايا فهو مردود عليه اقول فى وصف هذا الامر اشارة الى ان أمر الاسلام كمل.

(যে কেউ ইসলামে এ ধরনের আকীদার প্রচলন করে, যা ধর্মের পরিপন্থী, সে মরদুদ। আমি বলতে চাই যে هٰذا الامر দ্বারা ওদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে ইসলামের ব্যাপারটা পরিপূর্ণ হয়েছে।)

প্রমাণিত হলো বিদ্‌আত আকীদাকে বলা হয়েছে। মিশ্‌কাত الايمان بالقدر অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে- হযরত ইব্‌নে উমর (রাঃ)কে কেউ বললেন যে অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন-

بَلَغَنِى اَنَّهُ قَدْ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ اَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلَامَ.

(আমি জানতে পারলাম যে সে বিদ্‌আতী হয়ে গেছে। তা যদি হয়, তাকে আমার সালাম বলবেন না।) জিজ্ঞাসা করা হলো বিদ্‌আতী কিভাবে হতে পারে? ফরমালেন,

يَقُولُ يَكُوْنُ فِى اُمَّتِى خَسْفٌ وَمَسْخٌ اَوْقَذْفٌ فِى اَهْلِ الْقَدْرِ.

(হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমাতেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে কদরীয়া সম্প্রদায়ের বেলায় ভূমি ধ্বসে যাবে, চেহারা বিকৃত হবে, অথবা পাথর বর্ষিত হবে।)

প্রতিভাত হলো যে, কদরীয়া ফির্‌কাকে অর্থাৎ যারা তকদীরকে অস্বীকার করতো তাদেরকে বিদ্‌আতী বলা হয়েছে। দুর্‌রুল মুখতারের কিতাবুল সালাতে الامت। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

www.AmarIslam.com

وَمُبْتَدِعٍ اَىْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ وَهِىَ اِعْتِقَادُ خِلَافِ الْمَعْرُوْفِ عَنِ الرَّسُوْلِ.
(বিদ্আতী ইমামের পিছনে নামায পড়া মাকরূহ। বিদ্আত হচ্ছে সেই আকীদার বিপরীত আকীদা পোষণ করা, যা হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।)

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে বোঝা গেল, বিদ্আত নতুন ও মন্দ আকীদাকে বলা হয়। হাদীছসমূহে বিদ্আত ও বিদ্আতী সম্পর্কে যে কঠিন হুমকি দেয়া হয়েছে, এর দ্বারা আকীদাগত বিদ্আতকে বোঝানো হয়েছে। হাদীছ শরীফে আছে- যে বিদ্আতীর (আকীদাগত) সম্মান করলো, সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করলো। ফাত্ওয়ায়ে রশীদিয়া প্রথম খণ্ড কিতাবুল বিদ্আতের ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- "যে বিদ্আতের ব্যাপারে কঠিন হুমকি দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে আকীদাগত বিদ্আত যেমন- রাফেজী ও খারেজীদের বিদ্আত।"

আমলী বিদ্আত সেসব কার্যাবলীকে বলা হয়, যা' হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগের পরে, দুনিয়াবী বা ধর্মীয় হোক সাহাবায়ে কিরামের যুগে বা এর পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। "মিরকাত" গ্রন্থে الاعتصام অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَفِى الشَّرْعِ اِحْدَاثُ مَالَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

বিদ্আত হচ্ছে শরীয়তে ওই ধরনের কাজের সূচনা করা, যা হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যুগে ছিল না। 'আশ্আতুল লুম্আতে সেই একই অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

بدانکه هرچیز پیدا شده بعداز پیغمبر علیه السلام بدعت است.
(যে কাজ হুযূর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের পরে সূচিত হয়েছে, তা বিদ্আত)

উপরোক্ত ইবারতদ্বয়ে দীনের কাজের শর্তও নেই আর সাহাবায়ে কিরামের যুগের কথাও উল্লেখ নেই, যে কোন কাজ দুনিয়াবী হোক বা ধর্মীয়, যা হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরে যে কোন সময়ে সাহাবায়ে কিরামের যুগে বা এর পরে চালু হয়েছে, তা বিদ্আত হিসেবে গণ্য। তবে, প্রচলিত ভাষায় সাহাবায়ে কিরামের আবিষ্কারকে সুন্নাতে সাহাবা বলা হয়, বিদ্আত বলা হয় না। এটা প্রচলন মাত্র, না হয়, হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) তারাবীর নামাযে নিয়মিত জামআতের প্রবর্তন করে

বলেছেন যা نِعْمَةُ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এতো খুবই উত্তম বিদ্আত)।

আমলী বিদ্আত দু'প্রকার-বিদ্আতে হাস্না ও বিদ্আতে সাইয়া। বিদ্আতে হাস্না এই ধরনের নয়া কাজকে বলা হয়, যা কোন সুন্নাতের বিপরীত নয়। যেমন- মীলাদ মাহফিল, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ, নিত্য নতুন উন্নতমানের খানাপিনা, ছাপাখানায় কুরআন শরীফ ও ধর্মীয় কিতাব ছাপানো ইত্যাদি এবং বিদ্আতে সাইয়া ওইসব কাজকে বলা হয়, যা কোন সুন্নাতের বিপরীত বা কোন সুন্নাতকে বিলুপ্তকারী হিসেবে প্রতিভাত হয়। যেমন- জুমআ ও উভয় ঈদে আরবী বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় খুৎবা পাঠ করা বা মাইকের সাহায্যে নামায পড়া বা পড়ানো। কেননা এর ফলে আরবী ভাষায় খুৎবা পাঠ করা এবং তকবীর দেয়া অর্থাৎ তক্বীরের সাহায্যে আওয়াজ পৌছানো যে সুন্নাত, তা দূর হয়ে যায়। বিদ্আতে হাস্না জায়েয বরং কোন কোন সময় মুস্তাহাব ও ওয়াজিবে পরিগণিত হয়। আর বিদ্আতে সাইয়া হচ্ছে মাক্রূহ তানযিহী বা মাকরূহ তাহরীমী অথবা হারাম। এ প্রকারভেদকে আমি সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবো।

বিদ্আতে হাস্না ও বিদ্আতে সাইয়ার প্রমাণ শুনুন- আশ্আতুল লুমআত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড الاعتصام অধ্যায়ে وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ হাদীছটি প্রসংগে উল্লেখিত আছে-

وانچه موافق اصول وقواعد سنت اوست وقياس كرده شده است آں رابدعت حسنه گويند وآنچه مخالف آں باشد باعث ضلالت گويند.

যে বিদ্আত ধর্মের মূলনীতি, নিয়ম কানুন ও সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর সাথে কিয়াস করা হয়েছে, একে বিদ্আতে হাস্না বলা হয়। আর যা এর বিপরীত, সেটাকে বিদ্আতে গুমরাহী বলা হয়।

মিশ্কাত শরীফের العلم অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.
(যে কেউ ইসলামের মধ্যে ভাল রীতি প্রচলন করেন, তিনি এর জন্য ছওয়াব

পাবেন; যাঁরা এর উপর আমল করবেন, এর জন্যও ছওয়াব পাবেন, তবে তাঁদের ছওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না; এবং যারা ইসলামে মন্দরীতি প্রচলন করে, এর জন্য তাদের পাপ হবে এবং যারা এর উপর আমল করবে, তার জন্যও পাপের ভাগী হবে, তবে ওদের পাপের বেলায় কোন কমতি হবে না।) সুতরাং, বোঝা গেল যে ইসলামে কোন ভাল কাজের প্রচলন কারাটা হচ্ছে ছওয়াবের কাজ আর মন্দ কাজের সূচনা করাটা হচ্ছে পাপের ভাগী হওয়া।

ফাতওয়ায়ে শামীর ভূমিকায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ফযীলত বর্ণনা প্রসংগে উল্লেখিত আছে-

قَالَ الْعُلَمَاءُ هذه احاديث مِنْ قَواعد الاسلام وَهوَ انَّ كُل من ابْتدع شَيئًا من الشَّر كان عليه مثل وزر مَن اقْتدَى به فِى ذالك وَكُلّ مَن ابْتدع شَيئًا من الْخَير كَان لَه مثل اجر كُل مَنْ يَعْمَلَ الِى يَوْم الْقيمة.

উলামায়ে কিরাম বলেন- এসব হাদীছসমূহ ইসলামের কানুন হিসেবে প্রযোজ্য- যে কেউ ইসলামে কোন মন্দ কাজের সূচনা করলে সে এর উপর সমস্ত আমলকারীদের গুণাহের ভাগী হবে; আর যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের প্রচলন করেন, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত আমলকারীদের ছওয়াবের ভাগী হবেন।)

এর থেকেও প্রমাণিত হলো ভাল বিদ্‌আতে ছওয়াব আছে ও মন্দ বিদ্‌আতে গুণাহ হয়।

যেটা সুন্নাতের বিপরীত, সেটা হচ্ছে মন্দ বিদ্‌আত। এর প্রমাণও প্রত্যক্ষ করুনঃ মিশকাত শরীফের الاعتصام অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

مَنْ احْدَثَ فِى اَمْرِنا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

(যে ব্যক্তি আমার ধর্মে নতুন এমন কোন কিছু প্রচলন করলো, যা ধর্মের মধ্যে নেই, তাহলে সে মরদুদ হিসেবে গণ্য।) 'ধর্মের মধ্যে নেই' এর ভাবার্থ হলো ধর্মের বিপরীত। যেমন- আশ্‌আতুল লুমআতে-এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত আছে-

ومراد چیزے است که مخالف ومغیر آں باشد.

এর দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে, যা ধর্মের বিপরীত বা ধর্ম পরিবর্তনকারী।

মিশকাত শরীফের সেই একই অধ্যায় الاعتصام এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে

উল্লেখিত আছে-

مَاأحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً الاَّ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكٌ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ احْدَاثِ بِدْعَةٍ.

(যে কোন কওম যে পরিমাণ বিদ্‌আতের সূচনা করে, সে পরিমাণ সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং, সুন্নাতকে গ্রহণ করা বিদ্‌আতের প্রচলন করা থেকে উত্তম।

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে 'আশ্‌আতুল লুমআতে' উল্লেখিত আছে-

وچوں احداث بدعت رافع سنت است ہمیں قیاس اقامت سنت قاطع بدعت خواہد بود.

(যেহেতু বিদ্‌আতের সূচনা করাটা হচ্ছে সুন্নাত বিলুপ্তির সহায়ক, সেহেতু সুন্নাতের উপর অটল থাকাটা হবে বিদ্‌আত প্রতিরোধের সহায়ক।

এ হাদীছ ও এর ব্যাখ্যা থেকে এটা বোঝা গেল যে বিদ্‌আতে সাইয়া অর্থাৎ মন্দ বিদ্‌আত হচ্ছে, যার দ্বারা সুন্নাতের বিলুপ্তি ঘটে। ইতিপূর্বে এর উদাহরণসমূহ দেয়া হয়েছে। বিদ্‌আতে হাস্‌না ও বিদ্‌আতে সাইয়ার পার্থক্য ভালভাবে স্মরণ রাখা দরকার। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রায়শই ধোঁকা দেয়া হয়।

বিদ্‌আতের প্রকারভেদ

ইতিপূর্বে জানা গেছে যে, বিদ্‌আত দু'রকম- বিদ্‌আতে হাস্‌না ও বিদ্‌আতে সাইয়া। এখন স্মরণ রাখতে হবে যে, বিদ্‌আতে হাস্‌না তিন প্রকার- জায়েয, মুস্তাহাব ও ওয়াজিব এবং বিদ্‌আতে সাইয়া দু'রকম- মাকরূহ ও হারাম। এ প্রকারভেদের প্রমাণ দেখুন: মিরকাত গ্রন্থ الاعتصام بالكتاب والسنة অধ্যায়ে আছে-

اَلْبِدْعَةُ امَّا وَاجِبَةٌ كَتَعَلُّمِ النَّحْوِ وَتَدْوِيْنِ اُصُوْلِ الْفِقْهِ وَامَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبْرِيَّةِ وَامَّا مَنْدُوْبَةٌ كَاحْدَاثِ الرَّوَابِطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَكَالتَّرَاوِيْحِ اَىْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ وَامَّامَكْرُوْهَةٌ كَزَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ وَامَّامُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيْبَ الصُّبْحِ وَالتَّوَسُّعِ

بِلَذِيْذِ الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِبِ.

বিদ্আত হয়তো ওয়াজিব, যেমন- আরবি ব্যাকরণ শিখা এবং ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহকে একত্রিত করা, অথবা হারাম, যেমন- জবরীয়া সম্প্রদায় বা মুস্তাহাব, যেমন মুসাফিরখানা ও মাদ্রাসাসমূহ তৈরী করা এবং প্রত্যেক ভাল কাজ, যা আগের যুগে ছিল না, যেমন- জামাআত সহকারে তারাবীর নামায পড়া অথবা মাকরূহ, যেমন মসজিদসমূহে গৌরব বোধক কারুকার্য করা, অথবা জায়েয, যেমন- ফজরের নামাযের পর মুসাফাহা করা ও ভাল ভাল খানাপিনার ব্যাপারে উদারতা দেখানো।

ফাত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ডের কিতাবুস সালাতের الامامة অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

اَىْ صَاحِبِ بِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَالْاَفَقَدْ تَكُوْنُ وَاجِبَةً كَنَصْبِ الْاَدِلَّةِ وَتَعَلُّمِ النَّحْوِ وَمَنْدُوْبَةً كَاَحْدَاثِ نَحْوِ رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلِّ اِحْسَانٍ لَمْ يَكُنْ فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ مَكْرُوْهَةً كَزَخْرَفَةِ الْمَسْجِدِ وَمُبَاحَةً كَالتَّوَسُّعِ بِلَذِيْذِ الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالثِّيَابِ كَمَا فِى شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ.

অর্থাৎ হারাম বিদ্আতীর পিছনে নামায পড়া মাকরূহ। অন্যথায় কোন কোন বিদ্আত ওয়াজিবে পরিণত হয়, যেমন- প্রমাণাদি উপস্থাপন, ইলমে নাহু (আরবি ব্যাকরণ) শিখা, কোন কোন সময় মুস্তাহাব, যথা- মুসাফিরখানা মাদ্রাসা এবং সে সব ভাল কাজ, যা আগের যুগে ছিল না, প্রচলন করা, আবার কোন সময় মাকরূহ, যেমন- মসজিদসমূহে গৌরববোধক কারুকার্য করা এবং কোন সময় মুবাহ, যেমন ভাল খানা-পিনা ও পোশাক পরিচ্ছেদের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা। 'জামেসগীর' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়ও অনুরূপ উল্লেখিত আছে।

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে পাঁচ প্রকার বিদ্আতের পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং, বোঝা গেল যে প্রত্যেক বিদ্আত হারাম নয় বরং কতেক বিদ্আত অত্যাবশ্যকও হয়ে থাকে, যেমন- ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ,, কুরআন করীমকে একত্রিত করা বা কুরআনে এরাব (যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) দেয়া, আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন ছাপানো এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠ্যসূচি ইত্যাদি প্রণয়ন।

www.AmarIslam.com

বিদ্আতের প্রকারসমূহের পরিচয় ও লক্ষণসমূহ

বিদ্আতে হাসনা ও সাইয়ার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে (যে বিদ্আত ইসলামের বিপরীত বা কোন সুন্নাত বিলুপ্তকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তা বিদ্আতে সাইয়া আর যে বিদ্আত এ রকম হবে না, তা বিদ্আতে হাস্না) এখন ওই পাঁচ প্রকারের বিদ্আতের লক্ষণসমূহ জেনে নিন।

বৈধ বিদ্আত- (بدعت جائز) ওইসব নতুন কাজ, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং কোন সদুদ্দেশ্য বিহীন করা হবে। যেমন- নানা রকম খান্নাপিনা করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কোন কিছু করা। এর প্রমাণ মিরকাত ও শামীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছে। এসব কাজের জন্য পাপ-পুণ্য কিছু নেই।

মুস্তাহাব বিদ্আত- (بدعت مستحب) ওইসব নতুন কাজ, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং সাধারণ মুসলমানগণ সেগুলোকে পুণ্যের কাজ মনে করে থাকেন বা কেউ তা সদুদ্দেশ্যে করেন। যেমন- মাহফিলে মীলাদ শরীফ এবং বুযুর্গানে কিরামের ফাতিহা, যাকে সাধারণ মুসলমানগণ পুণ্যের কাজ মনে করেন। এসব কাজ যাঁরা করবেন, তাঁরা ছওয়াব পাবেন আর যাঁরা করবেন না, তাঁরা পাপী হবেন না। এর দলীলসমূহ দেখুন-

'মিরকাত' গ্রন্থে الاعتصام অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَرُوِىَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَفِىْ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ وَلَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

হযরত ইব্নে মাস্উস (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে-যে কাজকে মুসলমানগণ ভাল মনে করে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকটেও ভাল হিসেবে গণ্য এবং হাদীছে মরফুতে (যে হাদীছে বর্ণনার দিক দিয়ে কোন দুর্বলতা নেই) আছে যে উম্মতে মুহাম্মদী গুমরাহীতে কখনও ঐক্যমত হবে না।

মিশকাত শরীফের শুরুতে আছে-

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِاِمْرَءٍ مَانَوٰى

(আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভর করে এবং মানুষের বেলায় তাই হবে, যা নিয়ত করে।)

দুররুল মুখতার ১ম খণ্ডের مستحبات وضو শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَمُسْتَحَبُّهُ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِلَذِيْذِ الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِبِ.

বিদ্আত হয়তো ওয়াজিব, যেমন- আরবি ব্যাকরণ শিখা এবং ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতিসমূহকে একত্রিত করা, অথবা হারাম, যেমন- জবরীয়া সম্প্রদায় বা মুস্তাহাব, যেমন মুসাফিরখানা ও মাদ্রাসাসমূহ তৈরী করা এবং প্রত্যেক ভাল কাজ, যা আগের যুগে ছিল না, যেমন- জামাআত সহকারে তারাবীর নামায পড়া অথবা মাকরূহ, যেমন মসজিদসমূহে গৌরব বোধক কারুকার্য করা, অথবা জায়েয, যেমন- ফজরের নামাযের পর মুসাফাহা করা ও ভাল ভাল খানাপিনার ব্যাপারে উদারতা দেখানো।

ফাত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ডের কিতাবুস সালাতের الامامة অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

اى صاحب بدعة محرمة والافقد تكون واجبة كنصب الادلة وتعلم النحو ومندوبة كاحداث نحو رباط ومدرسة وكل احسان لم يكن فى الصدر الاول مكروهة كزخرفة المسجد ومباحة كالتوسع بلذيذ الماكل والمشارب والثياب كما فى شرح الجامع الصغير.

অর্থাৎ হারাম বিদ্আতীর পিছনে নামায পড়া মাকরূহ। অন্যথায় কোন কোন বিদ্আত ওয়াজিবে পরিণত হয়, যেমন- প্রমাণাদি উপস্থাপন, ইলমে নাহু (আরবি ব্যাকরণ) শিখা, কোন কোন সময় মুস্তাহাব, যথা- মুসাফিরখানা মাদ্রাসা এবং সে সব ভাল কাজ, যা আগের যুগে ছিল না, প্রচলন করা, আবার কোন সময় মাকরূহ, যেমন- মসজিদসমূহে গৌরববোধক কারুকার্য করা এবং কোন সময় মুবাহ, যেমন ভাল খানা-পিনা ও পোশাক পরিচ্ছেদের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করা। 'জামেসগীর' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়ও অনুরূপ উল্লেখিত আছে।

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে পাঁচ প্রকার বিদ্আতের পরিচয় পাওয়া গেল। সুতরাং, বোঝা গেল যে প্রত্যেক বিদ্আত হারাম নয় বরং কতেক বিদ্আত অত্যাবশ্যকও হয়ে থাকে, যেমন- ফিক্হ্, উসূলে ফিক্হ্,, কুরআন করীমকে একত্রিত করা বা কুরআনে এরাব (যের, যবর, পেশ ইত্যাদি) দেয়া, আধুনিক পদ্ধতিতে কুরআন ছাপানো এবং মাদ্রাসায় শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠ্যসূচি ইত্যাদি প্রণয়ন।

বিদ্আতের প্রকারসমূহের পরিচয় ও লক্ষণসমূহ

বিদ্আতে হাসনা ও সাইয়ার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে (যে বিদ্আত ইসলামের বিপরীত বা কোন সুন্নাত বিলুপ্তকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়, তা বিদ্আতে সাইয়া আর যে বিদ্আত এ রকম হবে না, তা বিদ্আতে হাসনা) এখন ওই পাঁচ প্রকারের বিদ্আতের লক্ষণসমূহ জেনে নিন।

বৈধ বিদ্আত- (بدعت جائز) ওইসব নতুন কাজ, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং কোন সদুদ্দেশ্য বিহীন করা হবে। যেমন- নানা রকম খান্নাপিনা করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কোন কিছু করা। এর প্রমাণ মিরকাত ও শামীর উদ্ধৃতি দিয়ে ইতোপূর্বে দেখানো হয়েছে। এসব কাজের জন্য পাপ-পুণ্য কিছু নেই।

মুস্তাহাব বিদ্আত- (بدعت مستحبه) ওইসব নতুন কাজ, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং সাধারণ মুসলমানগণ সেগুলোকে পুণ্যের কাজ মনে করে থাকেন বা কেউ তা সদুদ্দেশ্যে করেন। যেমন- মাহফিলে মীলাদ শরীফ এবং বুযুর্গানে কিরামের ফাতিহা, যাকে সাধারণ মুসলমানগণ পুণ্যের কাজ মনে করেন। এসব কাজ যাঁরা করবেন, তাঁরা ছওয়াব পাবেন আর যাঁরা করবেন না, তাঁরা পাপী হবেন না। এর দলীলসমূহ দেখুন-

'মিরকাত' গ্রন্থে الاعتصام অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَرُوِىَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ حَسَنٌ وَفِى حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ وَلَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

হযরত ইব্নে মাস্উদ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে-যে কাজকে মুসলমানগণ ভাল মনে করে, তা আল্লাহ তা'আলার নিকটেও ভাল হিসেবে গণ্য এবং হাদীছে মরফুতে (যে হাদীছে বর্ণনার দিক দিয়ে কোন দুর্বলতা নেই) আছে যে উম্মতে মুহাম্মদী গুমরাহীতে কখনও ঐক্যমত হবে না।

মিশকাত শরীফের শুরুতে আছে-

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِاِمْرِءٍ مَانَوٰى

(আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভর করে এবং মানুষের বেলায় তাই হবে, যা নিয়ত করে।)

দুররুল মুখতার ১ম খণ্ডের مستحبات وضو শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَمُسْتَحَبُّهُ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ

أُخْرٰى وَمَا اَحَبَّهُ السَّلَفُ.

(মুস্তাহাব হচ্ছে ওইসব কাজ, যা হুযূর আলাইহিস সালাম কোন সময় করেছেন, আবার কোন সময় করেননি এবং ওইসব কাজ, যা অতীতের মুসলমানগণ ভাল মনে করতেন।)

ফাতওয়ায়ে শামীর পঞ্চম খণ্ডে কুরবাণী শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে- فَاِنَّ النِّيَّاتِ تَجْعَلُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتٍ، (সদুদ্দেশ্য অভ্যাসকে ইবাদতে পরিণত করে) অনুরূপ 'মিরকাত' গ্রন্থের নিয়ত শীর্ষক আলোচনাতেও উল্লেখিত আছে।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ ও ফকীহগণের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বোঝা গেল, যেসব বৈধ কাজ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হবে বা মুসলমানগণ একে ছওয়াবের কাজ মনে করে, তা আল্লাহর নিকটও ছওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য। মুসলমানগণ হচ্ছেন আল্লাহর সাক্ষী; যা ভাল বলে সাক্ষ্য দিবেন, তা ভাল, আর যা মন্দ বলবেন, তা মন্দ হিসেবে গণ্য হবে। সাক্ষ্যের বিস্তৃত বিশ্লেষণ আমার কিতাব 'শানে হাবীবুর রহমান' দেখুন এবং এ কিতাবেও 'বুযুর্গানে কিরামের উরস' শীর্ষক বর্ণনায় এর কিছু আলোচনা করা হবে ইন্শা আল্লাহ।

আবশ্যিক বিদ্আত- (بدعت واجبه) এমন ধরনের নতুন কাজ, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ নয় এবং একে বাদ দিলে ধর্মে ক্ষতি হয়। যেমন- কুরআনে হরকত দেয়া, ধর্মীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং ইলমে নাহু ইত্যাদি শিক্ষা করা। এর বিস্তারিত বিবরণ আগে দেয়া হয়েছে।

মাকরূহ বিদ্আত- (بدعت مكروهه) এমন ধরনের নতুন কাজ, যার দরুণ কোন সুন্নাত রহিত হয়ে যায়। যদি সুন্নাতের গাইর মুয়াক্কাদা রহিত হয়, তাহলে তা বিদ্আতে মাকরূহ তান্যীহ এবং যদি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা রহিত হয়ে যায়, তাহলে তা বিদ্আতে মাকরূহ তাহরীমী হিসেবে গণ্য হবে। এর উদাহরণ ও প্রমাণসমূহও ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হারাম বিদ্আত- (بدعت حرام) এমন নতুন কাজ যদ্দারা ওয়াজিব রহিত হয়ে যায় অর্থাৎ ওয়াজিব বিলুপ্তকারী হিসেবে প্রতিভাত হয়।

দুররূল মুখতারের আযান অধ্যায়ে আছে যে, আযানের পরে সালাম দেয়া ৭৮১ হিজরীতে চালু হয়েছে। কিন্তু তা বিদ্আতে হাস্না হিসেবে গণ্য। এর প্রেক্ষাপটে ফাত

ওয়ায়ে শামীতে 'আযানে জাউক' (দ্বৈত কণ্ঠে আযান দেয়া) প্রসংগে বলা হয়েছে-

فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ لِاَنَّ الْمُتَوَارِثَ لَايَكُوْنُ مَكْرُوْهًا وَكَذَالِكَ تَقُوْلُ فِى الْاَذَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْخَطِيْبِ فَيَكُوْنُ بِدْعَةً حَسَنَةً اِذَا مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ حَسَنٌ.

(সুতরাং, প্রমাণিত হলো যে, এ কাজ মাকরূহ নয়। কেননা, পুনঃ পুনঃ হওয়ার ফলে অথবা যুগ পরম্পরায় মুসলমানদের আমলের ফলে কোন কাজ মাকরূহ হয় না। অনুরূপ খুৎবা প্রদানকারীর সামনে আযান দেয়া বিদ্আতে হাস্না বলে গণ্য করা হয়। যখন মুমিনগণ ভাল মনে করে কোন কাজ করে, তা আল্লাহর কাছেও ভাল হিসেবে বিবেচিত।

এর থেকে প্রতীয়মান হলো যে, কোন বৈধ কাজ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলে, এতে ছওয়াব নিহিত রয়েছে।

এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে ইসলামের কোন ইবাদতই বিদ্আতে হাস্না থেকে মুক্ত নয়। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা দেখুন।

ঈমান- মুসলমানের ঈমানে মুজ্মাল ও ঈমানে মুফাস্সাল শিখানো হয়। ঈমানের এ দু'প্রকরণ এবং এ দু'টি নাম বিদ্আত, কেননা কুরূনে ছালাছায় (সাহাবী, তাবেয়ীও তবে তাবেয়ীনের যুগ) এ সবের হদিস ছিল না।

কালেমা- প্রত্যেক মুসলমান ছয়টি কলেমা শিখেন। এ ছয় কলেমা এবং এর ধারাবাহিকতা অর্থাৎ এটা প্রথম কলেমা, ওটা দ্বিতীয় কলেমা, এবং এদের নাম সব বিদ্আত। কুরূনে ছালাছায় এ ধরনের কোন নাম নিশানাও ছিল না।

কুরআন- কুরআন শরীফকে ত্রিশ পারায় বিভক্তকরণ, এর মধ্যে রূকু নির্ধারণ, হরকত দেয়া, জিলদ হিসেবে তৈরি করা, এর ব্লক তৈরি করে ছাপানো সবই বিদ্আত। এ সম্পর্কে কুরূনে ছালাছায় কোন উল্লেখ নেই।

হাদীছ- হাদীছকে কিতাবের আকারে একত্রিতকরণ, এর সনদ বর্ণনা, সনদের বাছাইকরণ, হাদীছকে বিভিন্নভাবে বিভক্তকরণ অর্থাৎ এ হাদীছটা সহীহ, ওটা হাসন, সেটা জঈফ, এটা মুফাস্সিল, ওটা মুদাল্লিস এবং এ প্রকরণের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ঠিক করা অর্থাৎ প্রথম নং সহীহ, দ্বিতীয় নং হাসন, তৃতীয় নং জঈফ। আবার এদের হুকুমাদি ঠিক করা, যেমন- হালাল-হারামের বিষয়সমূহ হাদীছে সহীহ দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং ফজায়েলের ক্ষেত্রে জঈফ হাদীছও গ্রহণযোগ্য। মোট কথা

সম্পূর্ণ হাদীছের বিষয়টা বিদ্‌আত, যার কোন বর্ণনা কুরআনে ছালাছায় নেই।

উছুলে হাদীছ- এ বিষয়টা সম্পূর্ণ বিদ্‌আত বরং এর নামটাও বিদ্‌আত। এর সমস্ত কায়দা কানুন বিদ্‌আত।

ফিক্‌হ- বর্তমান যুগে ধর্মটা ফিক্‌হের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ বিষয়টা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্‌আত। কুরআনে ছালাছায় যার কোন নাম-গন্ধ নেই।

উসুলে ফিক্‌হ ও ইলমে কালাম- জ্ঞানের এ শাখাও বিলকুল বিদআত। এর কায়দা কানুন ও নিয়মগুলো সবই বিদ্‌আত।

নামায- নামায পড়ার সময় মুখে নিয়ত করাটা বিদ্‌আত। কেননা এর কোন প্রমাণ কুরআনে ছালাছায় নেই। রমযান মাসে বিশ রাকাআত তারবীহ্ নামাযের উপর অটল থাকাটা বিদ্‌আত। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) ফরমান- نِعْمَةُ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ (এটা খুবই উত্তম বিদ্‌আত।) ইফতারের সময় اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ এবং সাহরীর সময় اَللّٰهُمَّ بِالصَّوْمِ لَكَ غَدًا نَوَيْتُ الخ মুখে বলাটা বিদ্‌আত।

যাকাত- সমসাময়িক মুদ্রা দ্বারা যাকাত আদায় করাটা বিদ্‌আত। কুরআনে ছালাছায় এ ধরনের ছবি সম্বলিত মুদ্রা ছিল না এবং এর দ্বারা যাকাত আদায় করা হতো না। বর্তমান মুদ্রা ও শস্য দ্বারা যে ফিত্‌রা আদায় করা হয়, তাও বিদ্‌আত।

হজ্ব- রেল, লরি, মোটর ও উড়োজাহাজযোগে হজ্জে গমন করা, মোটর গাড়িযোগে আরাফাত যাওয়া বিদ্‌আত। কেননা তখনকার পবিত্র যুগে না এসব যানবাহন ছিল, না এগুলোর সাহায্যে হজ্ব করা হতো।

তরীকত- তরীকতের প্রায় সমস্ত কাজ এবং তাসাউফের প্রায় সমস্ত মাসা'য়িল বিদ্‌আত। মুরাকেবা, চিল্লে, আত্ম সংশোধন, শাইখের স্মরণ, নানা রকম যিকর সবই বিদ্‌আত। এসব ব্যাপারে কুরআনে ছালাছায় কোন হাদিস পাওয়া যায় না।

চার সিলসিলা-শরীয়ত ও তরীকত উভয়ের চার চারটি সিলসিলা। যথা- হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, অনুরূপ কাদেরী, চিশ্‌তী, নকশবন্দী ও সরওয়ার্দী। এসব সিলসিলা সম্পূর্ণ বিদ্‌আত। এগুলোর মধ্যে কয়েকটির নাম পর্যন্ত আরবি নয়, যেমন- চিশ্‌তী বা নকশবন্দী। কোন সাহাবী বা তাবেয়ী হানাফী বা কাদেরী ছিলেন না।

এখন দেওবন্দীরা বলুন, বিদ্‌আত থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মীয় জীবন যাপন করাটা সম্ভ

বপর হবে কি? যখন ঈমান ও কলেমার মধ্যে বিদ্‌আত ঢুকে গেছে, তখন বিদ্‌আত থেকে রেহাই কিভাবে সম্ভব হবে?

পার্থিব বস্তুসমূহ- বর্তমান পৃথিবীতে এমন সব বস্তুসমূহ আবিষ্কার হয়েছে, যার কোন নাম-নিশানা কুরআনে ছালাছায় ছিল না এবং এগুলোকে বাদ দিয়ে পার্থিব জীবন যাপন করা অসম্ভব। প্রত্যেকেই এগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য। রেল, মোটর, উড়োজাহাজ, রিক্সার, টাংগা, ঘোড়াগাড়ি, চিঠি, খাম, তারবার্তা, টেলিফোন, রেডিও, মাইক ইত্যাদি এবং এদের ব্যবহার বিদ্‌আত। অথচ প্রত্যেক মতবাদের লোক এগুলোকে বিনা সংকোচে ব্যবহার করেন।

দেওবন্দী ওহাবীরা! বলুন, বিদ্‌আতে হাস্‌নাকে বাদ দিয়ে দুনিয়াবী জিন্দেগী যাপন করা কি সম্ভব? কখনই নয়।

একটি রহস্যাবৃত বৃত্তান্ত- জনৈক মৌলবী সাহেব কোন এক ব্যক্তির বিবাহ পড়াতে গিয়েছিলেন। বরের গলায় ফুলের মালা ছিল। মৌলবী সাহেব যাওয়া মাত্র বললেন "এ মালা বিদ্‌আত, শিরক, হারাম। হুযূর (দঃ) সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন-কেউ এ মালা ব্যবহার করেননি। বলুন, মালা পরা সম্বন্ধে কোন্ কিতাবে লিখা আছে? তখন লোকেরা মালা খুলে ফেললেন। নিকাহ পড়ার পর বরের পিতা মৌলবী সাহেবকে দশটাকার একটি নোট দিলেন। মৌলবী সাহেব নোটটি পকেটে রাখতে যাচ্ছিলেন, অমনি উক্ত বর মৌলবীর হাত ধরে ফেললেন এবং বল্‌লেন "মৌলবী সাহেব, নিকাহ পড়িয়ে টাকা নেয়াটা বিদ্‌আত, হারাম, শিরক। হুযূর (দঃ), সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তবে তাবেঈনের মধ্যে কেউ টাকা নেননি। বলুন, নিকাহ পড়িয়ে ফিস নেয়া কোন্ কিতাবে লিখা আছে? মৌলবী সাহেব বল্‌লেনঃ "এতো খুশী হয়ে দিলেন।" উত্তরে বর বল্‌লেনঃ "মালাটা খুশীর ছিল, দুঃখের ছিল না।" মৌলবী সাহেব লজ্জায় মাথা নত হয়ে গেল। এটিই হচ্ছে ওইসব মহারথীদের দৃষ্টিতে বিদ্‌আত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্আতের প্রদত্ত সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ এবং এসবের জবাব

আমি বিদ্আতে আমলী প্রসংগে বলেছি যে, ধর্মীয় বা দুনিয়াবী যে কাজ হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগের পরে, হয়তো সাহাবায়ে কিরামের যুগে বা এর পরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বিদ্আত। এ প্রসংগে দু'টি প্রসিদ্ধ আপত্তি আছে।

আপত্তি নং- (১) বিদ্আত এমন ধর্মীয় কাজকে কেবল বলা হবে, যা হুযূর আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের পরে চালু হয়েছে। দুনিয়াবী নতুন কাজ বিদ্আত নয়। সুতরাং, মীলাদ মাহ্ফিল ইত্যাদি বিদ্আত কিন্তু তার-বার্তা, টেলিফোন, রেলগাড়িতে আরোহণ বিদ্আত নয়। কেননা হাদীছ শরীফে আছে مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (যে ব্যক্তি আমার ধর্মে নতুন কোন কিছু চালু করে, সে মরদুদ (ধর্মত্যাগী।)

اَمْرِنَا শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পার্থিব আবিষ্কৃত বস্তুসমূহ বিদ্আত নয় এবং ধর্মীয় বিদ্আত বলতে কোনটাই হাস্না (উত্তম) নয়, সবই হারাম। কেননা হাদীছ শরীফে সে সবের হোতাকে মরদুদ বলা হয়েছে।

উত্তরঃ ধর্মীয় কাজের শর্তারোপ করাটা মনগড়া কথা এবং সহীহ হাদীছ, উলামায়ে কিরাম, ফকীহগণ ও মুহাদ্দিছেনে কিরামের উক্তি সমূহের বিপরীত। হাদীছ শরীফে আছে- كُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ প্রত্যেক নতুন কাজ বিদ্আত। এখানে ধর্মীয় বা দুনিয়াবী কাজের কোন উল্লেখ নেই। অধিকন্তু আমি মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আশ্আতুল লুমআত ও 'মিরকাতের' ভাষ্য উদ্ধৃত করেছি; দ্বীনি কোন শর্তারোপ করা হয়নি। তদুপরি আমি প্রথম অধ্যায়ে মিরকাত ও শামীর ইবারত উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে গ্রন্থকারদ্বয় উন্নতমানের খাদ্য-পরিবেশন, ভাল কাপড় পরিধান করা বিদ্আতে জায়েয হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ এসব দুনিয়াবী কাজ। কিন্তু এগুলোকে বিদ্আত হিসেবে গণ্য করেছেন। সুতরাং, ওই ধরনের শর্তারোপ করাটা ভুল। যদি এটা মেনেও নেয়া হয় যে বিদ্আতের ক্ষেত্রে দ্বীনি কাজের শর্ত আছে, তাতেও কিছু আসে যায় না। দ্বীনি কাজতো ওগুলোকে বলা হয়, যার জন্য ছওয়াব পাওয়া যায়। মুস্তাহাব, নফল, ওয়াজিব ও ফরয কাজ সমূহ সবই ধর্মীয় কাজ। এগুলো মানুষ ছওয়াবের উদ্দেশ্যে করে থাকে। দুনিয়াবী কোন কাজ সৎ উদ্দেশ্যে করা হলে, এর জন্য ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছ শরীফে আছে-মুসলমানের সাথে প্রফুল্ল মন নিয়ে সাক্ষাৎ করলে সদকার ছওয়াব পাওয়া

যায়। حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِىْ فِىْ اِمْرَاَتِكَ এমনকি স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটি তুলে দেওয়া হয়, তাতেও ছওয়াব রয়েছে। এখন বলুন, সৎ নিয়তে পোলাও খাওয়াটা বিদ্আত কিনা? আর দ্বীনি কাজের শর্তারোপ করাতে আপনাদের কোন লাভ নেই। কেননা, দেওবন্দ মাদ্রাসা, ওখানকার সিলেবাস, দাওরায়ে হাদীছ, বেতন নিয়ে মাদ্রাসাতে পড়ানো, পরীক্ষা, ছুটি, কুরআন শরীফের হরকত দেয়া, কুরআন ও বুখারী শরীফের খতম পড়া, যেমন- দেওবন্দ মাদ্রাসায় পনের টাকা নিয়ে পড়া হয়, সমস্ত হাদীছের বিষয় সমূহ, হাদীছ সমূহকে কিতাবের আকারে সংগৃহীত করা, কুরআন শরীফকে কাগজে সংরক্ষণ করা, এতে রূকু স্থাপন করা, ত্রিশ পারায় বিভক্ত করা ইত্যাদি সবই ধর্মীয় কাজ এবং বিদ্আত। কেননা হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের যুগে এসব কাজের কোনটাই হয়নি। বলুন, এগুলো হারাম, না হালাল? তাহলে মাহফিলে মীলাদ শরীফ ফাতিহা শরীফ কি অপরাধ করলো, যা হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে প্রচলিত না থাকার দরুণ হারাম সাব্যস্ত হলো আর উপরোক্ত সব কাজ হালাল গণ্য হলো?

আমি মৌলবী ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে মুনাজিরা করার সময় বলেছিলাম, আপনারা চারটি বিষয়ের অর্থাৎ বিদ্আত, শিরক, দ্বীন ও ইবাদতের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করুন, যাতে কোন আপত্তি না থাকে এবং ব্যাখ্যাটা যেন পরিপূর্ণ হয়। এরপর আমার থেকে যা খুশী পুরস্কার নিন। আল্লাহর উপর ভরসা করে বলতে পারি, দুনিয়ার কোন দেওবন্দী, কোন লা-মাযহাবী এবং শিরক ও বিদ্আত নিয়ে সারাক্ষণ বক্বককারী ওই চারটি বিষয়ের বর্ণনা এমনভাবে কখনও করতে পারবে না, যাতে তাদের মাযহাবের উপর কোন আঁচ না লাগে। এখনও প্রত্যেক দেওবন্দী ও লা-মাযহাবীর কাছে সাধারণ ঘোষণা দেয়া আছে যে ওসবের এমন সঠিক বর্ণনা দিক, যাতে মাহফিলে মীলাদ হারাম আর রেসালায়ে কাসেম ও পরচায়ে আহলে হাদীছ হালাল প্রতিভাত হয়; আল্লাহর ওলীদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা শিরক আর পুলিশ ও অন্যান্যদের থেকে সাহায্য চাওয়া ইসলাম সম্মত বোঝা যায়। ইন্শা আল্লাহ এসবের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এবং পারবেও না। তাদের উচিৎ, এ ভিত্তিহীন মাযহাব থেকে তওবা করে যেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাওফীক দিক। তারা যে হাদীছটি পেশ করেছে, সেটা প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করেছি যে, مَا শব্দ দ্বারা আকাইদ বোঝানো হয়েছে; কেননা ধর্ম হচ্ছে আকীদার উপর নির্ভরশীল। যদি আমল বোঝানো হয়, তাহলে لَيْسَ مِنْهُ বাক্যাংশ দ্বারা ওসব আমল বোঝানো হয়েছে, যা সুন্নাত বা ধর্মের বিপরীত নয়। আমি এর রেফারেন্সও ইতোপূর্বে প্রদান করেছি।

'প্রত্যেক বিদ্আত হারাম। বিদ্আতে হাসনা বলতে কিছু নেই'-এ রকম বলাটা

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত ওই হাদীছের বিপরীত, যেটাতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে যিনি ইসলামে ভাল কাজের সূচনা করবেন, তিনি ছওয়াবের ভাগী হবেন; যে মন্দ কাজের প্রচলন করবে, সে আযাবের ভাগী হবে। অধিকন্তু উক্ত অধ্যায়ে ফাত্ওয়ায়ে শামী, আশ্আতুল লুমআত ও মিরকাতের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, বিদ্আত পাঁচ প্রকার- জায়েয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও হারাম। যদি মেনেও নেয়া হয় যে প্রত্যেক বিদ্আত হারাম, তাহলে মাদ্রাসা ইত্যাদিকে ধ্বংস করে দিন। কেননা তাও হারাম। তাছাড়া ফিক্হের মাসায়েল; সুফিয়ানে কিরামের যিক্র-আযকার, যা কুরূনে ছালাছার পরে আবিষ্কৃত হয়েছে, সবই হারাম সাব্যস্ত হবে। শরীয়তের চারটি সিলসিলা- হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী অনুরূপ তরীকতের চারটি সিলসিলা- কাদেরী, চিশতী, নকশ্বন্দী ও সরওয়ার্দী এ সব হুযূর আলাইহিস সালামের বরং সাহাবায়ে কিরামের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। তদুপরি ইজতিহাদী মাসায়েল, আমলসমূহ, ওজীফা, মুরাকাবা, চিল্লে ইত্যাদি সব পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সকলেই এগুলোকে দ্বীনের কাজ মনে করে থাকেন। ছয় কলেমা, ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সল, কুরআনের ত্রিশ পারা হাদীছের প্রকারভেদ এবং আহ্কাম অর্থাৎ সহীহ জঈফ, হাসন বা মুফাসসিল ইত্যাদি পার্থক্যকরণ, আরবী মাদ্রাসার নেসাব, দস্তারবন্দীর সভা, সনদ বিতরণ, পাগড়ী পরানো ইত্যাদি বিষয়র সম্পর্কে কুরআন হাদীছে কোন নাম নিশানা নেই। কোন দেওবন্দী ওহাবী ওসব বিষয়ের একটি নামও কোন হাদীছে দেখাতে পারবে না। আবার হাদীছের সনদ এবং রিওয়ায়েতকারীদের ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ কুরূনে ছালাছা থেকে প্রমাণিত নয়। মোট কথা শরীয়ত ও তরীকতের এমন কোন আমল নেই, যেখানে বিদ্আতের ছোঁয়াছ লাগেনি।

মৌলবী ইসমাঈল ছাহেব তাঁর 'সিরাতুল মুস্তাকীম' এর ৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন-

نیزاکابرطریقت نے اگرچہ از کار ومراقبات وریاضت ومجاہدات کی تعیین میں جو راہ ولایت کی مبادی ہیں کوشش کی ہے لیکن بحکم ہر سخن وقتی وہرنکتہ مقامی دارد- ہرہر وقتکے مناسب اشغال اور ہرہر قرن کے مطابق حال ریاضت جداجدا ہیں.

(তারীকতের শাইখগণ যদিওবা যিক্র-আযকার, মুরাকাবাত, রিয়াজাত ও মুজাহেদাতের ক্ষেত্রে যে পথটি বেলাদত প্রাপ্তির সহায়ক, চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রত্যেক

সময় অনুযায়ী আশগাল এবং প্রত্যেক যুগ অনুযায়ী রিয়াজাতের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন।)

এ ইবারত থেকে বোঝা গেল যে তাসাউফের যিক্র-আযকার সমূহ সুফিয়ানে কিরামের আবিষ্কৃত এবং যুগে যুগে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে এবং এটি বৈধ। বরং সুলুকের পথ তাদের দ্বারাই লাভ করা হয়। বলুন এখন আপনাদের সেই দাবী অর্থাৎ প্রত্যেক নতুন কাজ হারাম, কোথায় রইলো? মানতেই হবে যে, যে কাজ সুন্নাতের বিপরীত তা মন্দ, বাকী সব পছন্দনীয় ও ভাল।

আপত্তি নং- (২) বিরুদ্ধবাদীগণ এটাও বলে থাকেন যে, যে কাজ হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বা সাহাবায়ে কিরাম বা তাবেঈন বা তবে তাবেঈনের আবিষ্কৃত হয়ে থাকে, তা বিদ্আত নয়। এ যুগ সমূহের পর যা আবিষ্কার হবে সেটা বিদ্আত এবং এগুলোর কোনটাই জায়েয নয়, সবই হারাম। সুতরাং, প্রতীয়মান হলো যে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তবে তাবেঈনের আবিষ্কৃত কাজসমূহ সুন্নাত হিসাবে গণ্য। এ জন্য মিশ্কাত শরীফের الاعتصام অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ.

(তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও হিদায়েত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে দাঁত দ্বারা শক্ত করে ধরে থাকা।)

উক্ত হাদীছ খুলাফায়ে রাশিদীনের কাজসমূহকে সুন্নাত বলা হয়েছে এবং এসবের অনুসরণ করার জন্য জোর দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে তাঁদের আবিষ্কৃত কাজ সমূহ বিদ্আত নয়।

মিশকাত শরীফ فضائل الصحابه শীর্ষক অধ্যায়ে আছে-

خَيْرَ اُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ اِنَّ بَعْدَ ذَالِكَ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يَسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُوْتَمَنُوْنَ

(আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জামাত হচ্ছে আমার যুগের, অতঃপর যাঁরা ওদের সাথে সংশ্লিষ্ট, এর পর যারা ওদের সাথে সংশ্লিষ্ট। অতঃপর এমন একটি গোত্রের আবির্ভাব হবে, যারা সাক্ষী হিসেবে মনোনীত না হয়েও সাক্ষ্য দিবে, বিশ্বাসঘাতকতা

করবে এবং তারা বিশ্বস্ত হবে না।)

এতে বোঝা গেল যে ভাল যুগ হচ্ছে তিনটা- সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তবে তাবেঈনের যুগ। এর পর হচ্ছে মন্দ যুগ, তাই ভাল যুগে যা আবিষ্কৃত হবে, তা ভাল অর্থাৎ সুন্নাত এবং মন্দ যুগে যা আবিষ্কৃত হবে, তা মন্দ অর্থাৎ বিদ্আত। 'মিশকাত শরীফের' فضائل الصحابه অধ্যায়ে আরও উল্লেখিত আছে-

تَفْتَرِقُ اُمَّتِى عَلٰى ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِىَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِى.

(আমার উম্মত তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হবে এবং এক ফির্কা ব্যতীত বাকী সব জাহান্নামী হবে। আরয করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)। সেই এক ফির্কা কোন্টি? ইরশাদ ফরমালেনঃ যার উপর আমি ও আমার সাহাবা রয়েছেন।)

অতএব বোঝা গেল, সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ হচ্ছে বেহেশতের পথ। এজন্য তাঁদের আবিষ্কৃত বিষয়সমূহকে বিদ্আত বলা যায় না।

মিশ্কাত শরীফে فضائل الصحابه অধ্যায়ে আরও উল্লেখিত আছে-

اَصْحَابِى كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ.

(আমার সাহাবাগণ হচ্ছেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। তুমি যে কারো অনুসরণ কর না কেন, সঠিক পথ পেয়ে যাবে।)

এর থেকেও প্রমাণিত হয়, সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ নাজাতের সোপান। সুতরাং, সাহাবীদের আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ বিদ্আত নয় কেননা বিদ্আত তো হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী।

উত্তরঃ এ ধরনের প্রশ্ন কেবল ধোঁকা মাত্র। আমি মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মিরকাত' ও 'আশ্আতুল লুমআত' এর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছি যে বিদ্আত হচ্ছে- যে কাজ হুযূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরে চালু হয়েছে। ওখানে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের কোন উল্লেখ নেই। অধিকন্তু মিশকাত শরীফের قيام شهر رمضان শীর্ষক অধ্যায়ে আছে- হযরত উমর (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের যুগে নিয়মিতভাবে জামাত সহকারে তারাবীহ নামায আদায় করার হুকুম দিয়েছিলেন এবং জামাত অনুষ্ঠিত হতে দেখে বলেছেন-

www.AmarIslam.com

نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ (এতো বড়ই ভাল বিদ্আত।) দেখুন, হযরত উমর (রাঃ) নিজেই নিজের প্রচলিত কাজকে বিদ্আতে হাসনা বলেছেন। তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসায়ী এবং মিশ্কাত শরীফে القلوب। শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আবু মালেক আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমার পিতাকে ফজর নামাযে কুনুতে নাযেলা পড়া প্রসংগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি ফরমান, হে বৎস, এ হচ্ছে বিদ্আত। দেখুন, সাহাবায়ে কিরামের যুগের কাজকে বিদ্আতে সাইয়া বলেছেন। যদি সাহাবায়ে কিরামের আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ বিদ্আত না হতো, তাহলে তারাবীর জামাতকে কেন বিদ্আতে হাস্না বলা হলো এবং কুনুতে নাযেলাকে কেন বিদ্আতে সাইয়া আখ্যায়িত করা হলো? ও সময়তো বিদ্আতের কাল ছিল না। তৃতীয়তঃ প্রথম অধ্যায়ে মিরকাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে তারাবীর জামাত বিদ্আতে হাস্না অর্থাৎ তারাবীহ হচ্ছে সুন্নাত এবং জামাত সহকারে আদায় করা হচ্ছে বিদ্আতে হাস্না। তাঁরা হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) কাজকে বিদ্আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। চতুর্থতঃ বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড كتاب فضائل القران এর جمع القران শীর্ষক অধ্যায়ে আছে- হযরত সিদ্দীক (রাঃ) হযরত যায়েদ ইবন ছাবেত (রাঃ)কে যখন কুরআনে পাক একত্রিত করার হুকুম দিলেন, তখন তিনি আরয করলেন-

كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ هُوَ خَيْرٌ.

আপনি এ কাজ কেন করতে যাচ্ছেন, যা হুযূর আলাইহিস সালাম করেননি। হযরত সিদ্দীক (রাঃ) ফরমালেন, এতো ভালা কাজ। অর্থাৎ হযরত যায়েদ ইবন ছাবেত হযরত সিদ্দীক (রাঃ) এর সমীপে আরয করলেন, কুরআন একত্রিতকরণ হচ্ছে বিদ্আত। তাই আপনি কেন বিদ্আতে হাত দিচ্ছেন। তখন হযরত সিদ্দীক (রাঃ) ইরশাদ ফরমালেন- বিদ্আত বটে তবে উত্তম বিদ্আত। এর থেকে প্রমাণিত হলো- সাহাবায়ে কিরামের কাজ হচ্ছে বিদ্আতে হাস্না। বিরুদ্ধবাদীদের দলীলসমূহের জবাব দিয়ে প্রদত্ত হলোঃ- فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

এ হাদীছ খুলাফায়ে রাশেদীনের উক্তি ও কাজসমূহকে শাব্দিক অর্থে সুন্নাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ, আপনারা আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের পথসমূহ অনুসরণ করুন। যেমন আমি প্রথম অধ্যায়ে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছি-

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ سَنَّ فِى

www.AmarIslam.com

اَلْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً.

এ হাদীছে সুন্নাত অর্থ তরীকা বা পথ। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا.

আরও ইরশাদ ফরমান- سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ এ আয়াত ও হাদীছে উল্লেখিত সুন্নাতদ্বারা শরয়ী সুন্নাত বুঝানো হয়েছে এবং এটি বিদ্আতের মুকাবিলায় নয় বরং এখানে তরীকা বা পন্থা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্নাতে ইলাহীয়া হচ্ছে আল্লাহর তরীকা, সুন্নাতে আম্বিয়া হচ্ছে নবীদের তরীকা এবং অন্যান্য।

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ الخ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত 'আশ্আতুল লুমআত' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

وبحقیقت سنت خلفائے راشدین ہماں پیغمبر است کہ

درزماں آنحضرت علیہ السلام شہرت نیافتہ بود

ودرزماں ایشاں مشہور ومضاف بہ ایشاں شدہ۔

"খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত বল্তে আসলে সুন্নাতে নববী, যা হুযূর আলাইহিস সালামের সময় প্রকাশ পায়নি, তাঁদের যুগেই প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁদের বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে।" এর থেকে প্রতীয়মান হলো যে সুন্নাতে খুলাফা আসলে সুন্নাতে রসূলুল্লাহকেই বলা হয়, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে প্রচলনকারী হচ্ছেন খুলাফায়ে রাশেদীন। পঞ্চমতঃ মুহাদ্দিছীন ও ফকীহগণ বলেন- খুলাফায়ে রাশিদীনের নির্দেশ সুন্নাতের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সুন্নাত নয়, সুন্নাতের সাথে সংযোজন করা হয়েছে। যদি তাঁদের আবিষ্কৃত কাজ সুন্নাত সাব্যস্ত হতো, তাহলে সংযোজনের কিইবা অর্থ হতে পারে? 'নূরুল আনোয়ার' গ্রন্থের শুরুতে আছে-

وَقَوْلُ الصَّحَابِىْ فِيْمَا يُعْقَلُ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ وَفِيْمَا لَايُعْقَلُ فَمُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ.

(সাহাবায়ে কিরামের যেসব বাণী যুক্তি নির্ভর, তা কিয়াসের সাথে সম্পৃক্ত আর যে সব বাণী যুক্তির উর্ধে, তা সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত।) যদি সাহাবায়ে কিরামের সমস্ত উক্তি ও কর্ম সুন্নাত বলে গণ্য হতো, তাহলে কিয়াস ও সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্তের কি অর্থ হতে পারে? 'আশ্আতুল লুমআত' এ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ এর প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত

আছে-

پس ہرچہ خلفائے راشدین بداں حکم کردہ باشند. اگرچہ باجتہاد وقیاس ایشاں بود موافق سنت نبوی است اطلاق بدعت براں نتواں کرد.

(যে বিষয়ে খুলাফায়ে রাশেদীন রায় দিয়েছেন, তা যদি নিজস্ব কিয়াস ও ইজতিহাদ দ্বারা হয় এবং সুন্নাতে নববী অনুযায়ী হয়, তবে তাকে বিদ্আত বলা সমীচীন নয়।) এ ভাষ্য থেকে একেবারে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলো যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত শাব্দিক অর্থে বলা হয়েছে এবং শরয়ী সুন্নাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। একে সম্মান স্বরূপ বিদ্আত বলা যাবে না। কেননা বিদ্আত বলতে প্রায় সময় বিদ্আতে সাইয়াকে বোঝা- নো হয়।

(৫) خَيْرُ اُمَّتِيْ قَرْنِيْ এ হাদীছ থেকে এটাইতো বোঝা গেলে যে এ তিন যুগ (কুরূনে ছালাছা) পর্যন্ত ভাল কাজ বেশি হবে এবং এদের পর ভাল কম মন্দ বেশি হবে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে এ তিন যুগে যে কোন কাজ আবিষ্কৃত হোক কিংবা যে কেউ আবিষ্কার করুক, তা-ই সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে। এ হাদীছে সুন্নাত হওয়ার উল্লেখ কোথায় আছে? তাহলে জবরিয়া মাযহাব এবং কদরিয়া মাযহাব তাবেঈনের যামানায় আবির্ভূত হয়েছিল-এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত ও হাজ্জাজের জুলুম ঐ যুগেই সংঘটিত হয়েছিল। তাহলে কি (মায়াজাল্লা) এগুলোকে সুন্নাত বলা হবে?

(৩-৪) مَااَنَاعَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ (যার উপর আমি এবং আমার সাহাবা) এবং اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ (আমার সাহাবাগণ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত) এ হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ হচ্ছে হিদায়ত প্রাপ্তির সহায়ক এবং বিরোধিতা করা হচ্ছে গুমরাহীর নামান্তর। এটি নিঃসন্দেহে সঠিক এবং এর উপর প্রত্যেক মুসলমানের আস্থা রয়েছে কিন্তু একথা কোথা থেকে বুঝা গেল যে তাঁদের প্রত্যেক কাজই শরয়ী সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত? অনেক সময় বিদ্আতে হাস্নার অনুসরণও ওয়াজিব হয়ে পড়ে। যেমন মিশকাত শরীফের لاعتصام। অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ.

(বড় জামাতের অনুসরণ করুন। যে এর থেকে পৃথক রইল, সে দোযখে পৃথক অবস্থায় থাকবে।) আরও উল্লেখিত আছে-

مَـارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ.

মুসলমান যাকে ভাল মনে করে, আল্লাহর কাছেও সে ভাল। মুসলমানগণের জামাত থেকে যে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমাণও পৃথক রইল, সে যেন ইসলামের রশি নিজ গলা থেকে ফেলে দিল। কুরআনে করীমে আছে-

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ.

যে মুসলমানের পথ থেকে ভিন্ন পথ চলে, আমি তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে দেব এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো।

এ আয়াত ও হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে আকীদা ও আমলসমূহের ব্যাপারে মুসলমানদের বড় জামাতের অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজন; ওদের বিরোধিতা করা মানে দোযখের পথ পরিষ্কার করা। কিন্তু তা দিয়ে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে মুসলিম জামাতের আবিষ্কৃত কোন কাজই বিদ্আত নয়, সবই সুন্নাত সাব্যস্ত হবে। তা কখনও হতে পারে না। বিদআতই হবে, তবে বিদ্আতে হাস্না। যেভাবে সাহাবায়ে কিরামের আবিষ্কৃত কাজকে সুন্নাতে সাহাবা বলা হয়, তদ্রূপ সলফে সালেহীনের আবিষ্কৃত কাজকে শাব্দিক অর্থে সুন্নাতে সালফ অর্থাৎ পছন্দনীয় ধর্মীয় তরীকা বলা হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যারা প্রত্যেক বিদ্আত অর্থাৎ প্রত্যেক নতুন কাজকে হারাম মনে করে থাকেন, তারা এ মূলনীতির ব্যাপারে কি বলবেন- اَلْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ (সমস্ত বস্তু মূলতঃ মুবাহ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ মুবাহ এবং হালাল তবে যদি শরীয়ত কোন বস্তুকে নিষেধ করে তাহলে সেটা হারাম বা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। সুতরাং, নতুন হওয়ার জন্য নয় বরং নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম প্রমাণিত হবে। এ মূলনীতিটা কুরআনে পাক, সহীহ হাদীছ সমূহ ও ফকীহগণের উক্তিসমূহ থেকে প্রমাণিত এবং মুকাল্লিদের দাবীদার কোন ব্যক্তি এ মূলনীতি অস্বীকার করতে পারে না। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَااللّٰهُ عَنْهَا.

(হে ঈমানদারগণ, এ রকম বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করো না, যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে খারাপ লাগবে এবং যদি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ওসব বিষয়ে

জিজ্ঞাসা কর, তাহলে প্রকাশ করে দেয়া হবে। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

এ থেকে বোঝা গেল যেটা সম্পর্কে হালাল হারাম কিছুই বলা হলো না, সেটা ক্ষমার যোগ্য। এজন্য কুরআন শরীফ, যে সব মহিলাদের বিবাহ করা হারাম, ওদের বর্ণনার পর ইরশাদ ফরমান- وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ (ওদের বাদ বাকী সমস্ত মহিলা তোমাদের জন্য হালাল।) আরও ইরশাদ ফরমান وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ (তোমাদের কাছে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ওসব বিষয়, যা তোমাদের জন্য হারাম) অর্থাৎ হালাল জিনিস সমূহের বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই, সব জিনিসই হালাল তবে কিছু জিনিস নিষিদ্ধ রয়েছে, যার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ওগুলো বাদ দিয়ে সবগুলো হালাল। মিশকাত শরীফ كتاب الاطعمة باب اداب الطعام এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছে।

اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَمَاسَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّاعَفٰى عَنْهُ.

(হালাল হচ্ছে, যা আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কিতাবে (কুরআন) হালাল করেছেন আর হারাম হচ্ছে, যা আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন। এবং যেটা সম্পর্কে নীরব রয়েছে, সেটা মাফ।)

এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল জিনিস তিন রকমের হয়ে থাকে, প্রথমতঃ ওই ধরনের জিনিস, যার হালাল হওয়া সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, দ্বিতীয়তঃ সে ধরনের জিনিস, যার হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, তৃতীয়তঃ যে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, তা মাফ। ফাত্ওয়ায়ে শামী প্রথম খণ্ড কিতাবুত্তাহারাত শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

اَلْمُخْتَارُ اَنَّ الْاَصْلَ الْاِبَاحَةُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.

অধিকাংশ হানাফী ও শাফেঈদের এ মতামতই রয়েছে যে প্রত্যেক কিছু মূলত মুবাহ (পাপ-পুণ্য হীন) হয়ে থাকে। তাফসীরে খাযেন, রূহুল বয়ান, খাযায়েনুল ইরফান ও অন্যান্য তাফসীরেও একই রকম ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক কিছু মূলতঃ মুবাহ; নিষেধাজ্ঞার ফলে নাজায়েয হয়ে যায়।

এখন যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে জিজ্ঞাসা করে যে মীলাদ শরীফ উদ্‌যাপন করাটা কোথায় লিখা আছে? বা হুযূর আলাইহিস সালাম বা সাহাবায়ে কিরাম,

তাবেঈন বা তবে তাবঈন কখনও উদ্‌যাপন করেছিলেন কিনা? এটা নিছক ধোঁকা মাত্র। আহ্‌লে সুন্নাতের উচিত তাদের জিজ্ঞাসা করা- বলুন মীলাদ শরীফ করা যে হারাম, তা কোথায় লিখা আছে? যখন আল্লাহ হারাম করলো না; রসূল আলাইহিস সালাম নিষেধ করলেন না এবং কোন দলীল থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হলো না, তাহলে আপনারা কোন্ যুক্তিতে হারাম বলছেন? মীলাদ শরীফ ইত্যাদির প্রমাণ না থাকাটা জায়েয হওয়ারই লক্ষণ। আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ ফরমান-

قُلْ لَّا اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً الاٰيَة.

বলুন, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে, লোক যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি, কেবল মরা........।

আরও ইরশাদ ফরমান- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ الاٰيَة. বলুন, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছে, তা কে নিষিদ্ধ করেছেন?

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে হারামের কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলে হালালই প্রমাণিত হয়, হারাম প্রমাণিত হয় না। অথচ তারা এর থেকে হারাম প্রমাণিত করছেন। কি আশ্চর্য! এ একটা উল্টা যুক্তি। আচ্ছা বলুন দেখি, রেলগাড়ি যোগে ভ্রমণ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা কোথায় লিখা আছে? বা এটা যে হালাল বা কোন সাহাবা বা তাবেঈন যে করেছেন, এর কোন প্রমাণ আছে কি? অতএব এসব যেরূপ হালাল, তাও সেরূপ জায়েয এবং হালাল।

মাহফিলে মীলাদ শরীফের বর্ণনা

এতে দু'টি অধ্যায় রয়েছে- প্রথম অধ্যায়ে মীলাদ শরীফের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও এসবের জওয়াব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মীলাদ শরীফের প্রমাণ

প্রথমে এটি জানা দরকার যে মীলাদ শরীফের হাকীকত কি এবং এর কি হুকুম? অতঃপর এও জানা দরকার যে এর প্রমাণসমূহ কি কি? মীলাদ শরীফের হাকীকত হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্মগ্রহণের অবস্থা বর্ণনা করা অর্থাৎ গর্ভাবস্থার ঘটনাবলী, নূরে মুহাম্মদীর কারামত, বংশ পরিচয়, শৈশবাবস্থা ও হযরত হালীমা (রাঃ) এর সেখানে লালন-পালন হওয়ার বর্ণনা এবং হুযূর আলাইহিস সালামের শানে গদ্যে বা পদ্যে কিছু পাঠ করাটাও এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, এসব একাকী বর্ণনা করুন বা মাহফিলের আয়োজন করে বর্ণনা করুন যেভাবে হোক না কেন মীলাদ শরীফ বলা হবে। মাহফিলে মীলাদ শরীফের আয়োজন করা, পবিত্র জন্মের আনন্দ প্রকাশ করা, মীলাদের সময় সুগন্ধি লাগানো ও গোলাপ জল ছিটানো, মিষ্টান্ন বিতরণ মোট কথা বৈধ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করা সবই মুস্তাহাব এবং বিশেষ বরকত ও আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম।

(১) হযরত ঈসা (আঃ) দু'আ করেছিলেন

رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا.

(হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করুন, যাতে এটা আমাদের আগে পরে সবার জন্য ঈদে পরিণত হয়।)

বোঝা গেল যে হযরত মসীহ (আঃ) খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করেছেন, কেননা ঐদিনই খাদ্য ভর্তি দস্তরখানা অবতীর্ণ হয়েছিল। হুযূর আলাইহিস সালামের আগমন আমাদের জন্য ঐ খাঞ্চা থেকে অনেক বড় নিয়ামত। সুতরাং, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র জন্মদিনও ঈদের দিনের মত। তবে হ্যাঁ, এ পবিত্র মজলিসে কোন হারাম কাজ করা বড় অপরাধ ও পাপ। যেমন মেয়েদের এতটুকু বড় কণ্ঠে না'ত শরীফ পাঠ করা, যা অপরিচিত পুরুষ শুনতে পায়, এটি একান্ত নিষেধ। কেননা মেয়েলোকের আওয়াজ অপরিচিত পুরুষ শুনাটা জায়েয নয়। যদি কোন পুরুষ নামাযরত অবস্থায় কাউকে সামনে দিয়ে যেতে বাধা

দিতে চায়, তাহলে আওয়াজ করে যেন 'সুবহানাল্লাহ্' سُبْحَانَ اللّٰه বলে দেয়। কিন্তু কোন মহিলা কাউকে বাধা দিতে চাইলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে না বরং বাম হাতের পিঠে ডান হাত মারবে। এতে বোঝা গেল নামাযের অবস্থায় প্রয়োজনের সময়ও মহিলা কাউকে নিজ আওয়াজ শুনাতে পারে না। অনুরূপ মীলাদ শরীফকে বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে না'ত পাঠ করা বড়ই পাপ। কেননা বাদ্য যন্ত্র হচ্ছে খেলাধুলার ব্যাপার ও নিকৃষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। তদুপরি বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা খেল-তামাসা করাটা হারাম। না'ত পাঠ হচ্ছে ইবাদত তুল্য, একে বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে পাঠ করাটা খুবই অন্যায়; যদি কোন জায়গায় মীলাদ শরীফে এ ধরনের অন্যায় কাজ করা হয়, তাহলে এসব অন্যায়কে অপসারণ করতে হবে কিন্তু মূল মীলাদ শরীফকে বন্ধ করা যাবে না। যদি কোন মহিলা উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করে বা কোন ব্যক্তি বাদ্যসহকারে কুরআন করীম তিলাওয়াত করে, তাহলে এসব অন্যায়কে প্রতিরোধ করুন। তবে কুরআন তিলাওয়াত করায় বাধা দিবেন না, কেননা এটা ইবাদত।

কুরআন, হাদীছ ওলামায়ে কিরামের উক্তি এবং ফিরিশতা ও নবীগণের কর্মধারা থেকে মীলাদ শরীফ প্রমাণিত। কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ.

(তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শুকর গুজার কর।) হুযূর আলাইহিস সালামের আগমন আল্লাহর বড়ই নিয়ামত। মীলাদ শরীফে এরই আলোচনা করা হয়। সুতরাং, মীলাদ মাহফিল হচ্ছে এ আয়াতের অনুসরণ।

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(স্বীয় প্রভুর নিয়ামতের গুণকীর্তন কর।) ধরাধামে হুযূর আলাইহিস সালামের শুভ আগমন সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর জন্য গর্ববোধ করেছেন। সুতরাং, এ সম্পর্কে আলোচনা করাটা এ আয়াতেরই অনুসরণ। আজকাল কারো সন্তান হলে প্রতি বছর জন্ম তারিখে জন্ম দিনের অনুষ্ঠান করা হয়, কেউ রাজত্ব লাভ করলে, প্রতি বছর ঐ দিনে আনন্দ উৎসব করা হয়। তাহলে যেদিন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নিয়ামতের আগমন ঘটেছে, তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করাটা কেন নিষিদ্ধ হবে? স্বয়ং কুরআন করীম বিভিন্ন জায়গায় হুযূর আলাইহিস সালামের মীলাদ বর্ণনা করেছেন। যেমন এক জায়গায় আছে لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ – الاٰية *(হে মুসলমানগণ, তোমাদের কাছে সম্মানিত রসুল (দঃ) আগমন করেছেন।)* এখানে জন্মের বর্ণনা করা হয়েছে। এর পর مِنْ اَنْفُسِكُمْ *(তোমদের মধ্যে থেকে বা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশ থেকে)* দ্বারা বংশ পরিচয়ের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ থেকে শেষ পর্যন্ত হুযূর আলাইহিস সালামের গুণকীর্তন করা হয়েছে। বর্তমান মীলাদ শরীফেও এ তিনটি বিষয়েই আলোচনা করা হয়।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا.

(আল্লাহ মুসলমানদের উপর বড়ই ইহ্‌সান করেছেন যে তাদের কাছে স্বীয় নবী আলাইহিস সালামকে পাঠিয়েছেন।)

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ.

(বিশ্ব প্রতিপালক সেই ক্ষমতাবান, যিনি স্বীয় নবী আলাইহিস সালামকে হিদায়েত ও সঠিক দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন।) মোট কথা এ রকম অনেক আয়াত আছে, যেখানে হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র জন্ম বৃত্তান্তের কথা বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল মীলাদের বর্ণনা করা আল্লাহরই সুন্নাত। জমাত সহকারে নামাযের মধ্যে আমাদের আকা মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ পালিত হয়। দেখুন, ইমামের পিছনে সমাবেশও রয়েছে, কিয়ামও হচ্ছে, আবার বেলাদত শরীফের বর্ণনাও হচ্ছে। এমনকি স্বয়ং কলেমায়ে তৈয়্যবায় মীলাদ শরীফের বর্ণনা রয়েছে, কেননা এ কলেমাতে আছে- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসুল) رسول শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রেরিত আর প্রেরণ যেখানে আছে, সেখানে নিশ্চয়ই আগমনও আছে। অতএব, হুযূর আলাইহিস সালামের তশরীফ আনয়নের বর্ণনা হয়ে গেল এবং আসল মীলাদই পাওয়া গেল। কুরআন শরীফ আম্বিয়া আলাইহিস সালামেরও মীলাদ বর্ণনা করেছেন। সূরা মরিয়মে হযরত মরিয়ম (আঃ) এর গর্ভধারণ, হযরত ঈসা (আঃ) এর পবিত্র জন্মের বর্ণনা এমনকি হযরত মরিয়মের কষ্ট পাওয়া, কষ্টের সময় যে কথাগুলো বলেছেন يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا। অতঃপর ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা লাভ, এরপর ওই সময় হযরত মরিয়ম কি খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন, অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালামের কওমের সাথে কথা বলা, মোট কথা সবই বর্ণনা করেছেন। এও বর্ণনা করা হয়েছে যে হযরত আমিনা খাতুন নবীজীর (দঃ) পবিত্র বেল্লাদতের সময় অমুক অমুক মুজিযা দেখেছেন। অতঃপর আরও ইরশাদ করেন যে বেহেশ্‌তের হুরগণ তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং পবিত্র কা'বা শরীফ হযরত আমিনা খাতুনের ঘরকে সিজ্‌দা করেন, ইত্যাদি ইত্যাদিও হচ্ছে সেই কুরআনী সুন্নাত। অনুরূপ কুরআন শরীফ হযরত মুসা (আঃ) এর জন্ম, তাঁর শৈশবাবস্থা, তাঁর লালন-পালন, তাঁর চালচলন, মাদয়ানে গমন, হযরত শুয়াইবের খিদমতে হাযির হওয়া,

ওখানে অবস্থান ছাগল[illegible] চরানো, বিবাহ, নবুয়াত লাভ ইত্যাদি সবকিছু বর্ণনা করেছেন। মীলাদে এসব কথাগুলোই পর্যালোচনা করা হয়।

মুদারেজুন নাবুয়াত ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখিত আছে যে, সমস্ত নবীগণই নিজ নিজ উম্মতদের কাছে হুযূর আলাইহিস সালামের শুভাগমনের খবর দিয়েছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী কুরআনে উদ্ধৃতি করা হয়েছে-

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِىْ مِنْ بَعْدِى اِسْمُهٗ اَحْمَدُ.

(আমি এমন রসূলের শুভ সংবাদদাতা, যিনি আমার পরে তশরীফ আনয়ন করবেন, যাঁর পবিত্র নাম আহমদ।) সুবহানাল্লাহ! শিশুদের জন্মের সপ্তম দিন মা বাপ নাম রাখেন। কিন্তু নবীজীর (দঃ) বেলাদতের ৫৭০ বছর আগে হযরত মসীহ (আঃ) বলেন যে তাঁর (দঃ) নাম আহমদ। কিন্তু 'আহমদ হবে' এ রকম বলেননি। বোঝা গেল যে তাঁর পবিত্র নাম আল্লাহ তাআলাই রেখেছেন। তবে কখন রেখেছেন, তা তিনিই জানেন। এ-ও এক প্রকার মীলাদ শরীফ। তবে এটুকু পার্থক্য যে উনারা স্বীয় কওমের সমাবেশে বলেছেন যে তিনি (দঃ) তাশরীফ আনবেন আর আমরা আমাদের সমাবেশে বলি যে তিনি (দঃ) তাশরীফ এনেছেন। কথা একই, শুধু অতীত ও ভবিষ্যতের পার্থক্য। এতে বোঝা গেল মীলাদ শরীফ নবীদেরও সুন্নাত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا.

(অর্থাৎ- আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের ব্যাপারে বেশী করে আনন্দ প্রকাশ কর।) এতে বোঝা গেল যে আল্লাহর অনুগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করা আল্লাহরই হুকুম। তাহলে হুযূর আলাইহিস সালাম আল্লাহর অনুগ্রহও, আবার রহমতও। সুতরাং, তাঁর পবিত্র বেলাদতের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা এ আয়াত অনুযায়ী আমলই প্রকাশ পায়।

এখানে আনন্দ উল্লাস বলতে সর্ব প্রকার বৈধ আনন্দ উল্লাসকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং, মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা, এর জন্য সাজসজ্জা ইত্যাদি সব ছওয়াবের কাজ।

(৪) মওয়াহেবুল লাদুনিয়া, মুদারেজুন নাবুয়াত ও অন্যান্য কিতাবে বেলাদত প্রসংগে আলোচনায় উল্লেখিত আছে যে পবিত্র বেলাদতের রাতে ফিরিশ্তাগণ হযরত আমিনা খাতুন (রাঃ) এর দুয়ারে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করেছিলেন। তবে চির অভিশপ্ত শয়তান দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পলায়নপর অবস্থায় ছিল। এর থেকে বোঝা গেল মীলাদ শরীফ ফিরিশতাদেরও সুন্নাত এবং এ-ও বোঝা গেল, নবী করীম (দঃ)

এর পবিত্র জন্মের সময় দাঁড়িয়ে থাকা ফিরিশতাদের কাজ আর পালিয়ে থাকাটা হচ্ছে শয়তানে কাজ। এখন এটা জনগণেরই ইখতিয়ার, চাহে ফিরিশতাদের কাজ অনুযায়ী আমল করুক বা শয়তানেরই কাজ অনুযায়ী।

(৫) স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে স্বীয় বেলাদতে পাক এবং স্বীয় গুণাবলী বয়ান করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মীলাদ পাঠ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরও সুন্নাত।

মিশকাত শরীফের ২য় খণ্ড فضائل سيد المرسلين শীর্ষক অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমি একদিন হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। সম্ভবতঃ হুযূর আলাইহিস সালামের কাছেও সংবাদটা পৌঁছেছিল যে কতেক লোক আমাদের পবিত্র বংশ মর্যাদা সম্পর্কে বিদ্রূপ করে। فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ اَنَا.

(তখন নবী আলাইহিস সালাম মিম্বরের উপ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন, আমি কে? সবাই আরয করলেন- আপনি আল্লাহর রসুল। তিনি ইরশাদ ফরমালেন আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টজীবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অতঃপর এদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন- আরবী ও আযমী। আমাদিগকে যেটা বেশী মর্যাদাবান অর্থাৎ আরবীয়দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার আরবীয়দের মধ্যে কয়েকটি গোত্র আছে তন্মধ্যে যেটা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আমাদেরকে। পুনরায় কুরাইশ গোত্রের মধ্যে কয়েকটি বংশের উদ্ভব হয়েছে। আমাদেরকে সে সবের শ্রেষ্ঠ বংশের অর্থাৎ বনি হাশিমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই মিশকাত শরীফে সেই একই পরিচ্ছেদে আরও উল্লেখিত আছে- আমি হলাম খাতেমুন নবীয়ীন অর্থাৎ নবীদের শেষ নবী। আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দু'আ, হযরত ঈসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিজ আম্মাজানের প্রত্যেক্ষ দর্শন, যিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন যে তাঁর থেকে এমন একটি নূর বিকশিত হয়েছিল যদ্বারা শাম দেশের অট্টালিকাগুলো তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। ওই সমাবেশে হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় বংশ পরিচয়, গুণাবলী ও পবিত্র জন্মের ঘটনা বর্ণনা করেন। এ সবই মীলাদ শরীফে আলোচিত হয়। এ রকম হাজার হাজার হাদীছ পেশ করা যেতে পারে।

(৬) সাহাবায়ে কিরাম একে অপরের কাছে গিয়ে আবদার করতেন যে আমাকে হুযূর আলাইহিস সালামের না'ত শরীফ শোনান। বোঝা গেল মীলাদ সাহাবায়ে কিরামেরও সুন্নাত। যেমন মিশ্কাত শরীফের فضائل سيد المرسلين শীর্ষক

ও দেশবরেণ্য আলিমগণ এর বড় বড় উপকার ও বরকতের কথা বর্ণনা করেছেন। আমি ইতোপূর্বে হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি-যে কাজকে মুসলমানগণ ভাল মনে করে, তা আল্লাহর কাছেও ভাল হিসেবে গণ্য। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ (যাতে তোমরা হে মুসলমান, সাক্ষী হও। হাদীছ শরীফে উল্লেখিত আছে- اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ (তোমরা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ্য।) সুতরাং পবিত্র মীলাদ মাহফিল মুস্তাহাব। 'মুজমাউল বিহার' গ্রন্থের শেষে ৫৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে শাইখ মুহাম্মদ জাহির (মুহাদ্দিছ) রবিউল আউয়াল প্রসংগে বলেন-

فَاِنَّهُ شَهْرٌ اُمِرْنَا بِاظْهَارِ الْحَبُوْرِ فِيْهِ كُلَّ عَامٍ.

(নিশ্চয় এটি এমন একটি মাস, যে মাসে প্রতি বছর আনন্দ প্রকাশ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।) বোঝা গেল যে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসে আনন্দ প্রকাশের নির্দেশ রয়েছে।

তাফসীরে রূহুল বয়ানের ২৬ পারায় সূরা ফাত্হের আয়াত محمد رسول الله। প্রসংগে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ-

وَمِنْ تَعْظِيْمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مُنْكَرٌ قَالَ الْاِمَامُ السُّيُوْطِىُّ يُسْتَحَبُّ لَنَا اِظْهَارُ الشُّكْرِ لِمَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

মীলাদ শরীফ করাটা হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি সম্মান, যদি এটা মন্দ কথাবার্তা থেকে মুক্ত হয়। ইমাম সয়ূতী (রহঃ) বলেন- হুযূর আলাইহিস সালামের বেলায়েতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা আমাদের জন্য মুস্তাহাব।

অতপর বলেন-

وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْحَجَرِ الْهَيْتَمِىُّ اِنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلٰى نَدْبِهَا وَعَمَلُ الْمَوْلِدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَالِكَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ السَّخَاوِىُّ لَمْ يَفْعَلْهُ اَحَدٌ مِّنَ الْقُرُوْنِ الثَّلٰثَةِ وَاِنَّمَا حَدَثَ بَعْدُ ثُمَّ لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ مِنْ سَائِرِ الْاَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْكِبَارِ يَعْمَلُوْنَ الْمَوْلِدَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِاَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُوْنَ مِنْ بَرَكَاتِهِ عَلَيْهِمْ كُلَّ فَضْلٍ

عَظِيْمٍ قَالَ اِبْنُ الْجَوْزِىِّ مِنْ خَوَاصِهِ اَنَّهُ اَمَانٌ فِىْ ذَالِكَ الْعَامِ وَبُشْرٰى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ وَاَوَّلُ مَنْ اَحْدَثَهُ مِنَ الْمُلُوْكِ صَاحِبُ اَرْبَلِ وَصَنَّفَ لَهُ اِبْنُ وَحْيَةَ كِتَابًا فِى الْمَوْلِدِ فَاَجَازَهُ بِاَلْفِ دِيْنَارٍ وَقَدْ اِسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ اَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ وَكَذَا الْحَافِظُ السُّيُوْطِىُّ وَرَدَّ عَلٰى اِنْكَارِهَا فِىْ قَوْلِهِ اِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ.

(ইবনে হাজর হাইতমী (রঃ) বলেন যে বিদ্আতে হাস্না মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে সবাই একমত। মীলাদ শরীফের আয়োজন করা এবং এতে লোকের জমায়েত হওয়া অনুরূপ বিদ্আতে হাস্না। ইমাম সাখাবী (রঃ) বলেন যে তিন যুগের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীর যুগ) মধ্যে কেউ মীলাদ শরীফ করেননি। পরবর্তীতে চালু হয়েছে। অতঃপর চারিদিকে ও প্রতিটি শহরে-বন্দরে মুসলমানগণ সব সময় মীলাদ শরীফ করে আসছেন ও নানা রকম দান-খয়রাতও করে যাচ্ছেন, এবং হুযূর আলাইহিস সালামের মীলাদ পাঠের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এ পবিত্র মাহফিলের বরকতে তাঁদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ নাযিল হয়। ইমাম ইবনে জুযী বলেন যে মীলাদ শরীফের বরকতে সারা বছর নিরাপদ থাকা যায় এবং এর ফলে উদ্দেশ্য সাধনের শুভ সংবাদ রয়েছে। যে বাদশাহ সর্বপ্রথম এটা চালু করেছিলেন, তিনি হলেন শাহ আরবল। আল্লামা ইবনে ওয়াহিয়া এর জন্য একটি মীলাদ শরীফের কিতাব রচনা করেন, যার জন্য বাদশাহ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ দেন। হাফেজ ইবনে হাজর ও হাফেজ সয়ূতী (রাঃ) মীলাদের উৎপত্তি সুন্নাত দ্বারা প্রমাণ করেছেন এবং যারা একে বিদ্আতে সাইয়া বলে নিষেধ করে থাকে, তা অগ্রাহ্য করেছেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) مورد الروى নামক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন-

لَازَالَ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَحْتَفِلُوْنَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ جَدِيْدَةٍ وَيَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَظِيْمٍ

(মুসলমানগণ প্রতি নববর্ষে মাহফিল করে আসছেন এবং তাঁরা মীলাদ পাঠের আয়োজন করেন। এর ফলে তাদের প্রতি অসীম রহমতের প্রকাশ ঘটে। ভূমিকায় এ কবিতাগুলোও উল্লেখ করেন।

لِهٰذَا الشَّهْرِ فِى الْاِسْلَامِ فَضْلٌ - وَمَنْقَبَةٌ تَفُوْقُ عَلَى الشُّهُوْرِ

رَبِيْعٌ فِىْ رَبِيْعٍ فِىْ رَبِيْعٍ - وَنُوْرٌ فَوْقَ نُوْرٍ فَوْقَ نُوْرٍ

(অর্থাৎ ইসলামে এ পবিত্র মাসের বিরাট মর্যাদা ও ফযীলত রয়েছে, যার ফলে মাসটি অন্যান্য মাসের উপর প্রাধান্য পেয়েছে। সত্যিই এটা বসন্তের বসন্ত ও নূরের নূর।)

উপরোক্ত ইবারতসমূহ থেকে তিনটি বিষয় বোঝা গেল- এক, পূর্ব-পশ্চিমের সকল মুসলমানগণ একে ভাল মনে করে পালন করেন; দুই, বড় বড় আলিমগণ, ফকীহগণ, মুহাদ্দিছগণ, তাফসীরকারকগণ ও সূফিয়ানে কিরাম, যেমন আল্লামা ইবনে হাজর, ইমাম সয়ূতী, হাইতমী, ইমাম সাখাবী, জুযী, হাফেজ ইবনে হাজর প্রমুখ একে ভাল কাজ মনে করেছেন। তিন, এ মীলাদ শরীফের বরকতে সারা বছর বাড়িঘর নিরাপদ থাকে ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

(৯) যুক্তিও বলে যে মীলাদ শরীফ বড় কল্যাণকর মাহফিল। এতে অনেক উপকার রয়েছে। প্রথমতঃ হুযূর আলাইহিস সালামের ফযীলতসমূহের কথা শুনে মুসলমানদের অন্তরে হুযুরের মুহব্বত বৃদ্ধি পায়। শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী এবং অন্যান্য সূফিয়ানে কিরাম বলেন যে হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি মুহব্বত বৃদ্ধির জন্য বেশী করে দরূদ শরীফ পড়া এবং হুযুরের (দঃ) জীবন বৃত্তান্ত পর্যলোচনা করা প্রয়োজন। লেখাপড়া জানা লোকেরা বই-পুস্তক থেকে হুযুরের (দঃ) জীবন বৃত্তান্ত জানতে পারে। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা পড়তে পারে না। তাই তারা এভাবে শোনার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের পবিত্র মাহফিল বিধর্মীদের জন্য তবলীগের কাজ করে। তারাও এখানে শরীক হতে পারে, হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত শোনার সুযোগ পায় এবং ইসলামের সৌন্দর্য দেখতে পায়। খোদায় তাওফীক দিলে মুসলমানও হয়ে যেতে পারে। তৃতীয়তঃ এ ধরনের মাহফিল দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় মাসায়েল বর্ণনার সুযোগ পাওয়া যায়। কতেক গ্রাম্যলোকেরা জুমআর নামাযে আসে না। তাদেরকে ডাকলেও তারা সাড়া দেয় না। তবে হ্যাঁ, মীলাদ মাহফিলের নাম বল্‌লে বড় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সমবেত হয়ে যায়। স্বয়ং আমি এর অনেক পরীক্ষা করে দেখেছি। এসব মজলিসে ধর্মীয় মাসায়েল বর্ণনা করুন, তাদেরকে হিদায়েত করুন; এটি সুবর্ণ সুযোগ। চতুর্থতঃ মীলাদ মাহফিলে এ ধরনের কবিতা-ই রচনা করে পাঠ করা হবে, যাতে দ্বীনি মাসায়েলের বিবরণ থাকে এবং মুসলমানদেরকে হিদায়েত করা হবে। কেননা গদ্যের তুলনায় পদ্য মানুষের মন বেশী আকর্ষণ করে এবং সহজেই স্মরণ থাকে। পঞ্চমতঃ এসব মজলিসের মাধ্যমে শুনতে শুনতে মুসলমানগণ হুযূর আলাইহিস সালামের বংশ পরিচয়, সন্তান-সন্ততি, পবিত্র স্ত্রীগণ,

জন্মবৃত্তান্ত, শৈশবাবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে। আজকাল মিরজায়ী, রাফেজী প্রমুখ সম্প্রদায়গণ নিজ নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে। রাফেজী সম্প্রদায়ের শিশুদেরও বার ইমাম ও খুলাফায়ে রাশিদীনের নামের উপর অভিসম্পাত করার কথা স্মরণ থাকে। কিন্তু আহলে সুন্নাতের শিশুরা কেন, বৃদ্ধরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে উদাসীন। আমি অনেক বৃদ্ধকে হুযূর আলাইহিস সালামের সন্তান-সন্ততি কয়জন? জামাতা কত জন? জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু তাতে তাঁদেরকে অজ্ঞ পেয়েছি। যদি এসব মজলিসে এর পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে অনেক উপকারে আস্‌বে।

গড়ে উঠা কোন জিনিসকে নষ্ট না করে বরং নষ্ট হয়ে যাওয়া কোন জিনিসকে ঠিক করার চেষ্টা করুন।

(১০) বিরুদ্ধাবাদীদের পীর ও মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব "ফয়সালা-এ হাপ্ত মাসায়েলা" নামক পুস্তিকায় মীলাদ শরীফকে জায়েয ও বরকতময় বলেছেন, যেমন তিনি ঐ পুস্তিকার ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- "অধমের নীতি হচ্ছে যে, আমি মাহফিলে মীলাদ শরীফে যোগদান করি। বরং বরকত লাভের উপায় মনে করে প্রতি বছর এর আয়োজন করি এবং কিয়ামে তৃপ্তি ও আনন্দ পাই। আশ্চর্যের বিষয়! পীর সাহেবতো মীলাদ শরীফকে বরকতময় মনে করে প্রতি বছর এর আয়োজন করেন; অথচ, তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের আকীদা হচ্ছে মীলাদ মাহফিল শিরক ও কুফরী। জানি না, পীর সাহেবের ক্ষেত্রে কোন্ ফত্ওয়া বর্তাবে?

(১১) আমি উরস শীর্ষক আলোচনায় আরয করবো যে ফিক্হশাস্ত্রবিদগণের মতে বিনা দলীলে হারাম তো দূরের কথা, মাকরূহ তানযীহও প্রমাণ করা যায় না। আর মুস্তাহাবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে মুসলমানগণ একে ভাল মনে করেন। তাহলে যে কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় এবং মুসলমানরা যেটা সদুদ্দেশ্যে করে থাকেন বা সাধারণ মুসলমানগণ যেটাকে ভাল মনে করেন, তা মুস্তাহাব। এর প্রমাণ বিদ্আতের আলোচনায়ও করা হয়েছে। অতএব, মীলাদ শরীফ প্রসংগে বলা যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি নিষিদ্ধ নয়, মুসলমানরা এটাকে ছওয়াবের কাজ মনে করেন এবং সদুদ্দেশ্যে করেন। সুতরাং, এটি মুস্তাহাব। হারাম আখ্যাদানকারীরা এর হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট দলীল কুরআন বা হাদীছ থেকে পেশ করতে পারবে কি? শুধু শুধু বিদ্আত বল্‌লে চলবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীলাদ শরীফ প্রসংগে আপত্তি ও জবাবসমূহ

বিরোধিতাকারীগণের উত্থাপিত আপত্তি সমূহ এবং এর জবাবসমুহ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১ নং আপত্তিঃ মাহফিলে মীলাদ হচ্ছে বিদ্আত। কেননা এটি হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে, সাহাবার যুগে, বা তাবেয়ীর যুগে হয়নি। প্রত্যেক বিদ্আতই হারাম। অতএব, মীলাদও হারাম।

উত্তরঃ মীলাদ শরীফকে বিদ্আত বলাটা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, মূল মীলাদ শরীফ আল্লাহর, নবীগণের, ফিরিশতাগণের, রসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, সাহাবায়ে কিরামের ও পূর্বসূরী পুণ্যাত্মা মনীষীদের সুন্নাত এবং সাধারণ মুসলমানগণের অনুসৃত আমল। এর পরও বিদ্আত কিভাবে হতে পারে? আর যদি বিদ্আতই হয়ে থাকে, প্রত্যেক বিদ্আতই তো আর হারাম নয়। আমি বিদ্আতের আলোচনায় বর্ণনা করেছি যে বিদ্আত ওয়াজিবও হতে পারে, মুস্তাহাব ও জায়েযও হতে পারে, আবার মাকরূহ ও হারামও হতে পারে। অধিকন্তু প্রথম অধ্যায়ে তাফসীরে রূহুল বয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি যে এ মাহফিলে মীলাদ হচ্ছে বিদ্আতে হাস্না ও মুস্তাহাব। হুযূর আলাইহিস সালাম প্রসংগে বর্ণনা কিভাবে হারাম হতে পারে?

২নং আপত্তিঃ এ ধরনের মাহফিলে হারাম কাজ হয়ে থাকে। যেমন নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশা, দাঁড়িবিহীন ব্যক্তি কর্তৃক না'ত পাঠ, ভুল রেওয়ায়েত বর্ণনা, মোট কথা, এ ধরনের মাহফিল হচ্ছে হারাম কাজের ডিপো। সুতরাং, এটা হারাম।

উত্তরঃ প্রথমতঃ এসব হারাম কাজ প্রত্যেক মীলাদ মাহফিলে হয় না। বরং অধিকাংশ মীলাদে এ রকম হয় না। মেয়েরা পর্দার আড়ালে পৃথক বসেন আর পুরুষেরাও পৃথক বসেন। মীলাদ পাঠকারী শরীয়তের অনুসারী হয়ে থাকেন এবং সহীহ রেওয়ায়েতও বর্ণনা করেন। বরঞ্চ, আমি নিজেই দেখেছি যে মীলাদ পাঠকারী ও শ্রোতাগণ ওযু সহকারে বসেন এবং একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়; মাঝে মধ্যে চোখের পানিও দেখা যায়। এ ধরনের মাহফিলে হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবনী বর্ণনা হয়ে থাকে।

لذت بادہ عشقش زمن مست مپرس

ذوق ایں مے نہ شناسی بخدا تانہ چشی

(অর্থাৎ আল্লাহর প্রেমের শরাবে কি স্বাদ তোমাকে আমি কিভাবে বুঝাবো? যতক্ষণ

না এ শরাব পান করবে, ততক্ষণ কিছুই উপলব্ধি করতে পারবে না।)

ہائے کمبخت تونے پی ہی نہیں

(হায়রে অভাগা! তুমিতো পান করতে পারলে না।)

যদি কোন জায়গায় আপত্তিকারীর কথা অনুযায়ী ওই ধরনের হয়েও থাকে, তাহলে নিশ্চয় হারাম হবে। কিন্তু আসল মীলাদ শরীফ অর্থাৎ হুযুরে মুস্তাফা আলাইহিস সালামের পবিত্র বেলাদতের বর্ণনা হারাম হবে কেন? উরস বিষয়ক আলোচনায় আমি আরয করবো যে, হারাম বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটলে কোন সুন্নাত বা বৈধ কাজ হারাম হয়ে যায় না। তা যদি না হয় সর্ব প্রথমে ধর্মীয় মাদ্রাসাসমূহ হারাম হয়ে যাবে। কেননা ওখানে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র দাঁড়িবিহীন শিশু ও যুবকের সাথে উঠা বসা করে, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক গড়ে উঠে। কোন কোন সময় এর খারাপ পরিণতিও প্রকাশ পায়। ওখানে তিরমিযী, বুখারী, ইবনে মাজা ইত্যাদি কিতাব ও তাফসীর পড়ানো হয়। ওসবের সমস্ত রেওয়ায়েতই বিশুদ্ধ নয়, কোন কোন রেওয়ায়েত জঈফ (দুর্বল) এমনকি মওযুও (মনগড়া) হয়ে থাকে। কতেক ছাত্র এমনকি কতেক শিক্ষকও দাঁড়িমুণ্ডানো থাকে। তাহলে কি এর জন্য মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হবে? কখনই নয়, বরং ওইসব হারাম কাজই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হবে। বলুন, যদি দাঁড়িমুণ্ডানো ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, তাহলে কি রকম হবে? কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কি বন্ধ করে দেয়া হবে? কখনই নয়, তাহলে দাঁড়িমুণ্ডানো ব্যক্তি মীলাদ শরীফ পাঠ করলে, কেন নিষেধ করবেন?

৩নং আপত্তিঃ মাহ্ফিলে মীলাদের কারণে রাতে দেরীতে শোয়া হয়, যার ফলে ফজরের নামায কাযা হয়। তাই যেটার জন্য ফরয বাদ পড়ে, সেটা হারাম। অতএব, মীলাদও হারাম।

উত্তরঃ মীলাদ শরীফ তো সব সময় রাতে হয় না। অনেক সময় দিনেও হয়ে থাকে। যেখানে রাতে হয়, সেখানেও বেশী রাত হয় না, ১১/১২ টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। লোকেরা সাধারণতঃ এতটুকু রাত এমনি জাগ্রত থাকে। আর যদি দেরীও হয়ে যায়, যাঁরা জামাত সহকারে নামায আদায় করেন, তাঁরা ফজরের নামাযের সময় ঠিকই জেগে যান। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং, এ ধরনের আপত্তি কেবল রসুল আলাইহিস সালামের শানমান বর্ণনা থেকে বাধা দেয়ার অজুহাত মাত্র। যদি কোন সময় মীলাদ শরীফ দেরীতে শেষ হলো এবং এর কারণে নামাযের সময় চোখ খুলতে পারলো না, তাহলে কি এর জন্য মীলাদ শরীফ হারাম হয়ে গেল? ধর্মীয় মাদ্রাসার বার্ষিক সভা ও অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতীয় সভা অনেক রাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক জায়গায়

বিবাহের অনুষ্ঠানও শেষ রাতে হয়, মাঝে মধ্যে রাতের বেলা রেলে ভ্রমণ করতে হয়, তাতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাক্‌তে হয়। তাহলে এখন বলুন, এসব সভা, বিবাহ অনুষ্ঠান, রেলে ভ্রমণ হালাল, না হারাম? যখন এসব কিছু হালাল, তাহলে মাহফিলে মীলাদে পাক কেন হারাম হবে? অন্যথায় এ পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৪নং আপত্তিঃ আল্লামা শামী (রঃ) ফাত্ওয়ায়ে শামীর দ্বিতীয় খণ্ডে কিতাবুস সওমের نذر اموات শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন যে, মীলাদ শরীফ হচ্ছে সবচে নিকৃষ্ট জিনিস। অনুরূপ তাফ্‌সীরাতে আহমদীয়া শরীফে মীলাদ মাহফিলকে হারাম বলা হয়েছে এবং একে যারা হালাল মনে করে, তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল মীলাদ শরীফ খুবই খারাপ জিনিস।

উত্তরঃ আল্লামা শামী (রঃ) মীলাদ শরীফকে হারাম বলেননি বরং যে মাহফিলে গান-বাজনা ও খেল-তামাশা হয় এবং মানুষ একে মীলাদ বলে আখ্যায়িত করে ও ছওয়াবের কাজ মনে করে, তাকেই নিষেধ করেছেন- যেমন সেই একই পরিচ্ছেদে তিনি বলেন-

وَاَقْبَحُ مِنْهُ النَّذْرُ بِقِرَاَةِ الْمَوْلِدِ فِى الْمَنَايِرِ مَعَ اِشْتِمَالِهِ عَلَى الْغِنَاءِ وَاللَّعِبِ وَاِيْهَابِ ثَوَابِ ذَالِكَ اِلَى حَضْرَتِ الْمُصْطَفَى.

(মিনারসমূহে মীলাদ পড়ার মানত করা এর থেকেও নিকৃষ্ট। কেননা ওই ধরনের মাহফিলে গান-বাজনা ও খেল-তামাশা হয়ে থাকে এবং এর ছওয়াব হুযূর আলাইহিস সালামকে বখশিশ করা হয়।) অনুরূপ, তফসীরাতে আহমদীয়ায় এ ধরনের গানের মজলিসকে নিষেধ করা হয়েছে, যেখানে খেল-তামাশা, এমনকি শরাব পানও হয়ে থাকে এবং সাধারণ লোক একে সেমার অনুষ্ঠান আখ্যায়িত করে ছওয়াবের কাজ মনে করে। তাফ্‌সীরাতে আহমদীয়ায় এসব নিন্দনীয় কাজের ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। যেমন উক্ত তাফ্‌সীরে সূরা লুকমানের আয়াত- وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَالْحَدِيْثِ.

এর ব্যাখ্যা দেখুন। আমিও শুরুতে উল্লেখ করেছি যে মীলাদ মাহফিলে যেন খেল-তামাশা জাতীয় কিছু না হয়। আমি করাচিতে নিজেই দেখেছি, কোন কোন জায়গায় বাদ্যযন্ত্র সহকারে না'ত পাঠ করে এবং একে মীলাদ শরীফ বলে আখ্যায়িত করে। এক সময় বদায়ূন্ জেলার সাহসওয়ানের কাছে কোন এক গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তার পিতার ফাতিহা দেয়। সে কুরআন তিলওয়াতের পরিবর্তে গ্রামোফোনে সূরা ইয়াসিনের রেকর্ড বাজিয়ে এর ছওয়াব বাপের রূহের প্রতি বখশিশ করে দেয়। এ ধরনের বেহুদা ও হারাম কাজকে কে জায়েয বলে? সম্ভবতঃ তাঁদের যুগে এর রকম

খেল-তামাশা ও বাজে অনুষ্ঠান হতো। তাঁরা এগুলোকে নিষেধ করেছেন। যদি বিনা শর্তে মীলাদ শরীফকে জায়েয মনে করাটা কুফরী হয়, তাহেল হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবও *(যিনি তাঁদের পীর ও মুর্শিদ)* এর মধ্যে গণ্য হয়ে যায়।

৫নং আপত্তিঃ না'ত পাঠ করা উত্তম ইবাদত। সমগ্র কুরআন শরীফ হুযূর আলাইহিস সালামের না'ত। (আমার রচিত 'শানে হাবীবুর রহমান' কিতাবে এর বিবরণ দেখুন।) বিগত নবীগণ হুযূর আলাইহিস সালামের না'ত পাঠ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম এবং সমস্ত মুসলমান না'ত শরীফকে মুস্তাহাব মনে করে থাকেন। স্বয়ং হুযূর আলাইহিস সালাম নিজেই না'ত শরীফকে মুস্তাহাব মনে করে থাকেন। স্বয়ং হুযূর আলাইহিস সালাম নিজেই না'ত শুনেছেন এবং না'ত পাঠকারীদেরকে দু'আ করেছেন। হযরত হাসসান (রাঃ) হুযূর আলাইহিস সালামের প্রশংসা এবং কাফিরদের প্রতি তিরস্কার মূলক কবিতা রচনা করে হুযূর আলাইহিস সালামের খেদমতে পেশ করতেন। হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য মসজিদে মিম্বর (আসন) বিছিয়ে দিতেন। হযরত হাসসান এর উপর দাঁড়িয়ে না'ত শরীফ শোনাতেন এবং হুযূর আলাইহিস সালাম দু'আ করতেন- اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ। হে আল্লাহ হাস্‌সানকে রুহুল কুদ্দুস দ্বারা সাহায্য করুন। (মিশকাত শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড শে'র شعر অধ্যায়ে দেখুন।) এ হাদীছ থেকে এটি বোঝা গেল যে না'ত বলা বা পাঠ করা এমন উচ্চ ইবাদত যে, এর কারণে হযরত হাসসান (রাঃ)কে মজলিসে মুস্তাফার (দঃ) মিম্বর দেয়া হয়েছে। হযরত আবু তালিব না'ত লিখেছেন। কসীদা বুর্দার শরাহ 'খরফুতী' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে- কসীদায়ে বুর্দার লিখকের অর্ধাঙ্গ রোগ হয়েছিল। কোন চিকিৎসায় উপকার হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি কসীদায়ে বুর্দা রচনা করেন। রাতে স্বপ্নের মধ্যে তিনি হুযূর আলাইহস সালামের খিদমতে দাঁড়িয়ে শোনালেন। এতে তিনি আরোগ্যও লাভ করলেন এবং চাদর মুবারকও পুরস্কার পেলেন। এতে বোঝা গেল না'ত শরীফ দ্বারা দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানে পুরস্কার পাওয়া যায়। আল্লামা জামী (রঃ), ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হুযূরে গাউছে পাক (রঃ) মোট কথা সমস্ত ওলী ও আলিমগণ না'ত রচনা ও পাঠ করেছেন। উল্লেখিত মনীষীদের না'ত ও কসীদা সুপ্রসিদ্ধ। হাদীছ ও ফিক্‌হ গ্রন্থে গান-বাজনারই ক্ষতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, না'তের নয়। যেসব গানে চরিত্র বিনষ্টকারী বক্তব্য থাকে, মেয়েলোকের ও শরাবের প্রশংসা করা হয়, বাস্তবিকই সে ধরনের গান নাজায়েয। এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতের مايقال بعد التكبير। অধ্যায়ে এবং الشعر। অধ্যায়ে দেখুন।

ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ কাব্যালঙ্কার সমৃদ্ধ কবিতা শিখানো ফরযে কিফায়া বলেছেন যদি না এর বিষয়বস্তু দূষণীয় হয়। কেননা, এসব কবিতার শব্দ থেকে জ্ঞান লাভ করা

যায়। এজন্যই দেওয়ানে মুতনবী ও এ জাতীয় অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ ধর্মীয় মাদ্রাসার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। অথচ এগুলোর বিষয়বস্তু খুবই নোংরা। তাহলে না'ত শিখা, মুখস্থ করা ও পাঠ করা এবং যার বিষয়বস্তুও উন্নতমানের ও পবিত্র শব্দ ভাণ্ডারে ভরপুর, কিভাবে নাজায়েয হতে পারে? ফত্ওয়ায়ে শামীর ভূমিকায় شعر শীর্ষক আলোচনায় উল্লিখিত আছে-

وَمَعْرِفَةُ شِعْرِهِمْ رَوَايَةً وَدَرَايَةً عِنْدَ فُقَهَاءِ الْاِسْلَامِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِاَنَّهُ تَثْبَتُ بِهِ قَوَاعِدَ الْعَرَبِيَّةِ وَكَلَامُهُمْ وَاِنْ جَازَ فِيهِ الْخَطَاءُ فِى الْمَعَانِىْ فَلَا يَجُوْزَ فِيهِ الْخَطَاءُ فِى الْاَلْفَاظِ.

জাহেলিয়াত যুগের কবিদের কবিতা শিখা, বোঝা ও বর্ণনা করা ইসলামী ফকীহগণের মতে ফরযে কিফায়া। কেননা, এর দ্বারা আরবী নিয়ম-কানুন প্রমাণ করা যায় এবং ওদের কাব্যে যদিও অর্থগত ভুল থাকা সম্ভব কিন্তু শব্দগত ভুল হয় না।

'উরস' শীর্ষক আলোচনায় 'কাউয়ালী' পরিচ্ছেদে গানের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হবে, ইন্শাআল্লাহ।

শিরনী বিতরণ খুব ভাল কাজ। আনন্দের সময় খানা-খাওয়ানো, মিষ্টি বিতরণ করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। আকীকা, ওলিমা, ইত্যাদিতে খানার দাওয়াত করা সুন্নাত কেন জানেন, এজন্যে যে, এটা আনন্দের সময়। ঠিক বিবাহের সময় খুরমা বিতরণ এমন কি ছিটিয়ে দেয়া সুন্নাত। মাহবুবে পাকের আলোচনা সভায় মুসলমানগণ আনন্দ প্রকাশার্থে দাওয়াত করেন, দান-খয়রাত করেন এবং শিরনী বিতরণ করেন। এ রকম উস্তাদগণের একটা নিয়ম আছে যে দ্বীনি কিতাব শুরু ও শেষ করার সময় ছাত্রের দ্বারা শিরনী বিতরণ করানো হয়। আমি আলীগড় জিলার মিন্ডাতে কিছুদিন লেখাপড়া করেছি। ওখানে দেওবন্দীদের মাদ্রাসা ছিল। সেখানে কিতাব শুরু করার সময় শিরনী বন্টন করা হতো। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার প্রারম্ভে এবং শেষান্তে শিরনী বিতরণ ভূতপূর্ব নেকবান্দাগণের সুন্নাত। মীলাদ মাহফিলও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হেতু এর প্রারম্ভে প্রতিবেশী, মীলাদ পাঠকারী ও মেহমানগণকে খানা খাওয়ানো এবং পরে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে শিরনী বিতরণ ঐটার পর্যায়ভুক্ত। এ শিরনী বিতরণের মূল কুরআন হাদীছে পাওয়া যায়। যেমন কুরআন ইরশাদ ফরমান-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً. ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ. (সূরা মুজাদেলা)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা রসুলের কাছে কিছু আরয করতে চাও, তাহলে এর আগে কিছু হাদিয়া দিয়ে দাও। এটি তোমাদের জন্য ভাল ও অনেক পবিত্র।

এ আয়াত থেকে প্রমাণ মিলে ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধনীদের উপর এটি জরুরী ছিল যে হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে কোন জরুরী পরামর্শ নিতে চাইলে প্রথমে যেন কিছু হাদিয়া পেশ করেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ) এক দিনার হাদিয়া দিয়ে হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে দশটি মাসায়েল জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অবশ্য পরে এর বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে গেছে (তাফ্সীরে খাযায়েনুল ইরফান, খাযেন ও মাদারেকে দেখুন।) তবে যদিওবা বাধ্যবাধকতা রহিত হয়ে গেছে, কিন্তু মুবাহ ও মুস্তাহাব হিসেবে এখনও বলবৎ রয়েছে। এর থেকে বোঝা গেল যে আল্লাহর ওলীদের মাযারে শিরনী নিয়ে যাওয়া, মুর্শিদ ও নেকবান্দাদের সমীপে কিছু পেশ করা মুস্তাহাব। অনুরূপ, হাদীছ, কুরআন ও দ্বীনি কিতাবাদি শুরু করার সময় কিছু সদ্কা করা ভাল। মীলাদ শরীফ পাঠের প্রারম্ভেও কিছু দান করা পুণ্যের কাজ। কেননা এসবই আসলে হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলার মত। তাফসীরে ফতহুল আযীযের ৮৬ পৃষ্ঠায় শাহ আবদুল আযীয সাহেব একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন-

وبیہقی درشعب الایمان از ابن عمر روایت کردہ کہ عمر ابن الخطاب سورہ بقرا باحقائق آں درمدت دوازدہ سال خواندہ فارغ شد دردزے ختم شتری راکہ کشتہ طعام وافرپختہ یاران حضرت پیغمبررا خورا نید.

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) شعب الايمان কিতাবে হযরত ইবনে উমর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত ফারুক (রাঃ) বারো বছর সূরা বাকারা ভাবার্থ সহকারে পড়েছেন। যেদিন সমাপ্ত করলেন, সেদিন একটি উট যবেহ করে অনেক খানার ব্যবস্থা করে সাহাবায়ে কিরামকে খাইয়েছেন। অতএব গুরুত্বপূর্ণ ভাল কাজ সমাধা করার পর শিরনী বিতরণ ও খানা পরিবেশন প্রমাণিত হলো। মীলাদে পাকও নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বুযুর্গানে দ্বীন বলেন, যে কোন নিকট আত্মীয়ের কাছে যেতে হলে খালি হাতে যেওনা, কিছু নিয়ে যেও। تَهَادُوْا وَتَحَبُّوْا একে অপরকে হাদিয়া দিন, এতে মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে) ফকীহগণ বলেন- যখন দেয়ারে মাহবুব অর্থাৎ মদীনা পাকে যাবেন, তখন ওখানকার গরীবদেরকে দান করবেন। কেননা তারা রসুলুল্লাহ (দঃ) এর প্রতিবেশী। আল্লাহর দরবারেও প্রথম প্রশ্ন হবে আমার জন্য কি হাদিয়া

এনেছ?

حق بفـــرمــــايد چه آوردى مـــرا - اندران مـــهلت كه من دادم ترا.

(অর্থাৎ আমি তোমাকে পৃথিবীতে কিছু সময় দিয়েছিলাম, আমার জন্য কি এনেছ?) এ ধরনের শির্‌নী বিতরণ কোন অপব্যয় নয়। জনৈক ব্যক্তি সৈয়্যদেনা ইবনে উমর (রাঃ)কে বললেন لَاخَيْرَ فِى السَّرْفِ (অপব্যয়ে কোন লাভ নেই) তিনি সংগে সংগে উত্তর দিলেন- لَاسَرْفَ فِى الْخَيْرِ (ভাল কাজে খরচ করা অপব্যয় নয়।)

৬নং আপত্তিঃ মীলাদ মাহ্‌ফিলে একে অপরকে আহবান করা হারাম। দেখুন, লোকদেরকে ডেকে নফল নামাযের জামাত পড়াও নিষেধ। তাহলে কি মীলাদ এর থেকেও বড়? (বারাহিন)।

উত্তরঃ ওয়াজ মাহ্‌ফিল, ওলিমার দাওয়াত, বিবাহ ও আকীকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে জনগণকে ডাকা হয়। বলুন, এসব কাজ হারাম হবে, না কি হালাল থাকবে? যদি বলেন বিবাহ ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়হেতু এসবের জন্য জমায়েত হালাল, তাহলে জনাব রসুলুল্লাহ (দঃ)- এর তাযীম অতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্তহেতু এর জন্যও জমায়েত হওয়া হালাল। নামাযের সাথে অন্যান্য বিষয়ের অনুমান করা বড় বোকামী। যদি কেউ বলে যে নামায যেহেতু ওযু ছাড়া নিষেধ সেহেতু কুরআন তিলাওয়াতও ওযু ছাড়া নিষেধ হওয়া দরকার, সে বোকা। কেননা এটা অসামঞ্জস্য অনুমান।

৭ নং আপত্তিঃ কারো স্মৃতি অনুষ্ঠান করা এবং এর জন্য দিন তারিখ নির্ধারণ করা শির্‌ক। মীলাদ শরীফে এ দুটি পাওয়া যায়। সুতরাং এ-ও শির্‌ক।

উত্তরঃ আনন্দঘন বিষয়ের স্মরণীয় অনুষ্ঠান করাও সুন্নাত এবং এর জন্য দিন তারিখ নির্ধারণ করাটা উত্তম। একে শির্‌ক বলাটা শেষ সীমার বোকামী ও ধর্মহীনতার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ) কে হুকুম দিলেন وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ। অর্থাৎ বনী ইসরাইলকে সে দিনের কথাও স্মরণ করিয়া দাও, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি নিয়ামত সমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন- যেমন- ফিরাউনের নিমজ্জন, মন্নাসলওয়ার অবতরণ ইত্যাদি (খাযায়েনুল ইরফান।) এর থেকে বোঝা গেল, যে সব দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন, একে স্মরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মিশ্‌কাত শরীফ কিতাবুস সাওম صوم التطوع অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছে-

سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُّ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَىَّ وَحْىٌ.

হুযুর আলাইহিস সালামকে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি ইরশাদ ফরমান, ওইদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং ওই দিন আমার উপর ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছিল।

প্রমাণিত হলো যে সোমবারের রোযা এ জন্যেই সুন্নাত, যেহেতু এ দিনই হুযুর আলাইহিস সালামের জন্মদিন। এর থেকে তিনটা বিষয় জানা গেল- স্মৃতিচারণ করা, এরজন্য দিন তারিখ নির্ধারণ করা এবং হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র জন্মের খুশি উদ্‌যাপনার্থে ইবাদত করা সুন্নাত। ইবাদত শারীরিক হতে পারে, যেমন রোযা, নফল নামায ইত্যাদি বা আর্থিকও হতে পারে, যেমন সদ্‌কা, দান খয়রাত, শির্‌নী বিতরণ ইত্যাদি। মিশ্‌কাত শরীফের একই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে যে যখন হুযুর আলাইহিস সালাম মদীনা শরীফে তশরীফ আনলেন, তখন ওখানে ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা রাখতে দেখলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা আরয করলেন এদিন হযরত মুসা (আঃ)কে আল্লাহ তা'আলা ফিরাউন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন; আমরা এর শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রাখি। তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ফরমালেন- فَنَحْنُ اَحَقُّ وَاَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ (আমরা তোমাদের থেকে মুসা (আঃ) এর বেশী হকদার ও নিকটতর) فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ (অতঃপর তিনি (দঃ) নিজে রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকে আশুরার রোযার নির্দেশ দিলেন।) উল্লেখ্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ রোযা অত্যাবশ্যক ছিল। এখন অত্যাবশ্যকতা রহিত হয়ে গেছে কিন্তু মুস্তাহাব হিসেবে তা স্থিত আছে। মিশকাত শরীফের একই অধ্যায়ে আরোও আছে যে, আশুরার রোযা প্রসংগে কেউ হুযুর আলাইহিস সালামের সমীপে আরয করলেন যে, এতে ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তখন তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমান, ঠিক আছে, বেঁচে থাকলে আগামী বছর দু'টি রোযা রাখবো অর্থাৎ বর্জন করেননি বরং বৃদ্ধি করে ওদের সাদৃশ্য থেকে রক্ষা পেলেন। আমি 'শানে হাবীবুর রহমান' কিতাবে বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের রাকাআত বিভিন্ন কেন অর্থাৎ ফজরে দুই, মগরিবে তিন, আসরে চার রাকাআত কেন? ওখানে উত্তর দেয়া হয়েছে যে এ নামায সমূহ হচ্ছে বিগত নবীগণের স্মৃতি। যেমন হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে এসে রাত দেখে মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। ভোর বেলায় দু'রাকাত শুকরিয়া নামায আদায় করলেন; হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তান হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ফিদ্‌য়া হিসেবে দুম্বা লাভ করলেন; প্রাণপ্রিয় সন্তানের প্রাণ বেঁচে

গেল এবং কুরবানীও মঞ্জুর হলো। তখন তিনি চার রাকআত শুকরিয়া নামায আদায় করলেন। তা' যুহর হিসেবে ঠিক হলো। অন্যান্য গুলোও এভাবে ঠিক হয়েছে। বোঝা গেল যে নামাযের রাকাআতও অন্যান্য নবীগণের স্মৃতি বহন করে। পবিত্র হজ্ব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত হাজেরা, ইসমাঈল ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্মৃতিরূপে বিদ্যমান। এখন ওখানে না পানির অভাব আছে, না কুরবানীর ব্যাপারে শয়তানের পক্ষে কোন বাধা আছে। তবুও সাফা মারওযার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা, মিনাতে পাথর নিক্ষেপ আগের মত যথারীতি বলবৎ রয়েছে। এসব কেবল স্মৃতি রক্ষার জন্য। এর সূক্ষ্ম আলোচনা 'শানে হাবীবুর রহমানে' দেখুন।

মাহে রমযান বিশেষ করে শবে কদর এ জন্যই আফযল, যেহেতু কুরআন করীম নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ.

(রমযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।) আরও ইরশাদ ফরমান - اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (নিশ্চয় আমি এটি (কুরআন) পবিত্র কদর রাত্রে অবতীর্ণ করেছি।) যখন কুরআন অবতীর্ণের কারণে এ মাস ও রাত কিয়ামত পর্যন্ত উচ্চ মর্যাদাশীল হয়ে গেল, তাহলে সাহেবে কুরআন (দঃ) এর পবিত্র বেলাদতের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত রবিউল আউয়াল মাস এবং এর ১২ তারিখ কেন উচ্চ মর্যাদাশীল ও আফযল হবে না? হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কুরবানীর দিনকে ঈদের দিন ঘোষণা করা হয়েছে। বোঝা গেল যে, যে দিন বা তারিখে আল্লাহর প্রিয় বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, সেই দিন ও তারিখ কিয়ামত পর্যন্ত রহমতের দিন হয়ে যায়। দেখুন জুম্আর দিন এ জন্যই আফযল যেহেতু এ দিনে আম্বিয়া কিরামের প্রতি খোদায়ী অবদান রেখেছেন- যেমন, হযরত নূহ (আঃ) ফিরাউন থেকে নাজাত লাভ এবং আগামীতে কিয়ামতও হবে জুমআর দিন। তাই জুম্আবার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে গণ্য।

আবার এর বিপরীত অর্থাৎ যেসব জায়গায় ও যেসব তারিখে বিভিন্ন কউমের প্রতি খোদায়ী গজব নাযিল হয়েছে, এর থেকে সজাগ থাকুন। মঙ্গলবার রক্তমোক্ষণ করো না, কেননা, এটা খুন খারাবীর দিন। এ দিনেই হাবিল খুন হয়েছিল। এ দিনই হযরত হাওয়া (আঃ)-এর ঋতুস্রাব শুরু হয়েছিল। দেখুন উল্লেখিত দিন সমূহে এসব ঘটনা কোন সময়ে মাত্র একবার সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু সেসব ঘটনার কারণে উল্লেখিত দিন সমূহ চিরদিনের জন্য মর্যাদাবান বা মর্যাদাহীন হয়ে গেল।

প্রতীয়মান হলো যে, বুযুর্গানে কিরামের আনন্দঘন মুহূর্ত ও ইবাদতের স্মৃতিচারণও

ইবাদত। এখনও বিরোধিতাকারীগণ নিজেরাই ঈসমাইল শহীদ দিবস ও মৌলানা কাসেম দিবস পালন করে থাকে। যদি কোন দিন তারিখ নির্ধারণ করা শির্ক হয়ে যায়, তাহলে দেওবন্দ মাদ্রাসার পরীক্ষার তারিখ, ছুটির জন্য রমযান মাস, দস্তারবন্দীর জন্য দাওরায়ে হাদীছ, শিক্ষকদের বেতন, খানাপিনা ও বিশ্রামের জন্য সময় নির্ধারণ, বিবাহ, ওলিমা ও আকীকার জন্য তারিখ ঠিক করা শিরক হবে। জোশের বশবর্তী হয়ে মীলাদ শরীফকে শির্ক বলে নিজ ঘরে আগুন লাগাবেন না। এসব তারিখ সমূহ কেবল অভ্যাস হিসেবে করা হয়। একথা কেউ মনে করে না যে ওই নির্ধারিত তারিখ ব্যতীত অন্য তারিখে মীলাদ মাহফিল জায়েয নয়। এ জন্য আমাদের উত্তর প্রদেশে প্রত্যেক বিপদাপদের সময় এবং কারো ইন্তিকালের পরে মীলাদ শরীফের আয়োজন করা হয়। কাথিয়া ওয়ার্ড নামক স্থানে ঠিক বিবাহের দিন, কুলখানি, দশম ও চালিশার দিন মীলাদ মাহফিল করা হয়। আবার রবিউল আউয়াল মাসে সারা মাসব্যাপী মীলাদ শরীফ হয়ে থাকে। দেওবন্দ ব্যতীত প্রত্যেক জায়গায় নিয়ম হচ্ছে এরূপ। এমনকি এটা শোনা যায় যে দেওবন্দের সাধারণ বাসিন্দারাও নিয়মিত মীলাদ শরীফ করে থাকেন।

স্মরণ রাখা দরকার যে দিন বা স্থান নির্ধারিতকরণ কয়েকটি কারণে নিষেধ। প্রথমতঃ ঐদিন বা জায়গা কোন মূর্তির সাথে সম্পর্কিত হলে, যেমন হোলী ও দেওয়ালীর দিন এবং এর সম্মানার্থে খানাপিনার ব্যবস্থা করা বা মন্দিরে গিয়ে কিছু দান-দক্ষিণা করা। এ জন্য মিশকাত শরীফের النذر অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে কেউ বয়ানাতে উট যবেহ করার মানত করলো। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমালেন- ওখানে কি কোন মূর্তি বা কাফিরদের মেলা ছিল? আরয করলেন, না। ইরশাদ ফরমালেন, যাও, নিজের মানত পূর্ণ কর। অথবা এ ধরনের নির্ধারণের দ্বারা যদি কাফিরদের সাদৃশ্য বোঝায় বা এ নির্ধারণকে অত্যাবশ্যক মনে করে। এ জন্যে মিশকাত শরীফের صوم النفل অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে শুধু জুমআবার রোযা রাখা নিষেধ ফরমায়েছেন, কেননা এতে ইহুদীদের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। বা একে আবশ্যক মনে করাটা নিষেধ বা জুমআবার হচ্ছে ঈদের দিন। একে রোযার দিন হিসেবে পরিণত করো না।

এসব আপত্তি সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, নিষেধকারীদের কাছে হারাম সাব্যস্ত করার কোন দলীল মওজুদ নেই। এ হচ্ছে এক প্রকার মানসিক বিকার। এজন্য নিছক মনগড়া অনুমানের দ্বারা হারাম বলে। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন-

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائنگے اعدا تیرے.

نہ مٹاہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔

অর্থাৎ হে মাহবুব (দঃ)! আপনার শত্রুরা ধ্বংস হয়ে গেছে, হয়ে যাচ্ছে ও হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার মীলাদ মাহফিল বন্ধ হয়নি, বন্ধ হবেও না।

মীলাদ শরীফে কিয়ামের বর্ণনা

এ আলোচনায় একটি ভূমিকা ও দু'টি অধ্যায় রয়েছে। কিয়াম সম্পর্কিত কিছু জরুরী কথা ভূমিকায় আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

নামাযের মধ্যে দু'ধরনের ইবাদত পাওয়া যায়- মৌখিক ও শারীরিক। মৌখিক ইবাদত হচ্ছে কুরআন তিলওয়াত, রুকু সিজ্‌দায় তসবীহ, তাশাহুদ ইত্যাদি পাঠ করা। আর শারীরিক ইবাদত চার রকম- কিয়াম, রুকু, সিজ্‌দা ও বসা। কিয়ামের অর্থ হলো এভাবে সোজা দণ্ডায়মান হওয়া যেন হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছতে না পারে আর রুকুর অর্থ হলো এতটুকু ঝোঁকা যেন হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে যায়। এজন্যে বেশি কুঁজো লোকের পেছনে সুস্থ লোকের নামায পড়া জায়েয নয়। কেননা, সে ব্যক্তি কিয়াম করতে পারে না, সব সময় রুকুতেই থেকে যায়। সিজ্‌দার অর্থ হচ্ছে সাতটি অংগ মাটিতে লাগানো। অংগগুলো হচ্ছে দু'পায়ের তলা, দু'হাঁটু, দু'হাতের তালু, নাক ও কপাল। ইসলাম ধর্মের আগে অন্যান্য নবীগণের উম্মতদের মধ্যে কারো তাযীম বা সম্মানের জন্য দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজ্‌দা করা, বসা ইত্যাদি কাজ বৈধ ছিল। তবে ইবাদতের নিয়তে নয়, বরং সম্মানার্থে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ফিরিশতাদের দ্বারা আদম (আঃ)কে সিজ্‌দায়ে তাযীমী করায়েছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর অন্যান্য সন্তানেরা হযরত ইউসুফ (আঃ)কে তাযীমী সিজ্‌দা করেছিল (কুরআন করীম)। কিন্তু ইসলাম তাযীমী কিয়াম ও তাযীমী বসাটাকে জায়েয রেখেছে এবং তাযীমী রুকু ও সিজ্‌দাকে হারাম করে দিয়েছে। এতে প্রতীয়মান হলো কুরআন হাদীছের দ্বারা রহিত হয়। কেননা খোদা ভিন্ন অপরের বেলায় তাযীমী সিজ্‌দা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে কিন্তু এটাকে হাদীছ দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এও স্মরণ রাখা দরকার যে কারো সামনে মাথা নত করা বা মাটিতে মাথা রাখা হারাম হবে, যদি রুকু-সিজ্‌দার নিয়তে এ কাজ করে। কিন্তু যদি কোন বুযুর্গের জুতা সোজা করার উদ্দেশ্যে বা হাত-পা চুমো দেয়ার জন্য মাথা নত করে, তাহলে যদিওবা মাথা নত পাওয়া গেছে, কিন্তু এতে রুকূর নিয়ত না থাকায় তা রুকু হিসেবে গণ্য হবে না। তবে রুকুর মত ঝুঁকে সালাম করা হারাম অর্থাৎ সম্মানার্থে রুকু পর্যন্ত নত হওয়া হারাম। তবে অন্য কাজের জন্য যেমন জুতা ইত্যাদি সোজা করার উদ্দেশ্যে সম্মান পূর্বক ঝুঁকা জায়েয। এ পার্থক্যটা যেন নিশ্চয় স্মরণ থাকে। এটি খুবই সূক্ষ্ম বিষয়। ফত্‌ওয়ায়ে শামীর পঞ্চম খণ্ডে কিতাবুল কারাহিয়ার অধ্যায়ের শেষে লিপিবদ্ধ আছে-

اَلْاِيْمَاءُ فِى السَّلَامِ اِلٰى قَرِيْبِ الرُّكُوْعِ كَالسُّجُوْدِ وَفِى الْمُحِيْطِ اَنَّهٗ يُكْرَهُ الْاِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهٖ.

(সালাম দেয়ার সময় রুকু পর্যন্ত ঝুঁকে ইশারা করাটা সিজ্‌দার মত (হারাম)। মুহিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে বাদশাহের সামনে মাথা নত করা মকরূহ তাহরীমা।

প্রথম অধ্যায়

মীলাদ শরীফে কিয়ামের প্রমাণ

কিয়াম অর্থাৎ দণ্ডায়মান হওয়া ছয় প্রকার- জায়েয, ফরয, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূহ ও হারাম। প্রত্যেক প্রকারের কিয়ামকে সনাক্ত করার নিয়ম আমি বাত্‌লে দিচ্ছি, যার ফলে সহজেই বোঝা যাবে এ কিয়াম কি ধরনের।

(১) পার্থিব প্রয়োজনে দাঁড়ানো জায়েয। এর হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে। যেমন- দাঁড়িয়ে দালান তৈরি করা এবং অন্যান্য দুনিয়াবি কাজকর্ম ইত্যাদি করা। কুরআন মজিদে উল্লেখিত আছে- فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ. (যখন জুম্‌আর নামায হয়ে যাবে, তখন তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়।) না দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়া কখনও সম্ভব নয়।

(২) পাঁচ ওয়াক্তিয়া ও ওয়াজিব নামাযে দাঁড়ানো ফরয। যেমন وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ আল্লাহর সামনে আনুগত্য প্রকাশ করতঃ দণ্ডায়মান হও। অর্থাৎ যদি কোন লোক সামর্থ্য থাকা সত্তেও বসে আদায় করে, তাহলে নামায হবে না।

(৩) নফল নামাযে দণ্ডায়মান হওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য বসেও জায়েয। তবে দাঁড়িয়ে পড়াতে ছওয়াব বেশি।

(৪) কয়েকটি বিশেষ সময় দাঁড়ানো সুন্নাত। প্রথমতঃ ধর্মীয় মর্যাদাশীল জিনিসের সম্মানার্থে দাঁড়ানো। এ জন্য যমযমের পানি ও ওযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। হুযূর আলাইহিস সালামের রওযা পাকে উপস্থিত হওয়া যদি আল্লাহ্‌ নসীব করেন, তখন নামাযের মত হাত বেঁধে দাড়ানো সুন্নাত। ফাত্‌ওয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম খণ্ডে কিতাবুল হজ্বের শেষে زيارت قبر النبى عليه السلام শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِى الصَّلٰوةِ وَيُمَثِّلُ صُوْرَتَهُ الْكَرِيْمَةَ كَاَنَّهٗ

نَائِمٌ فِىْ لَحْدِهٖ عَالِمٌ بِهٖ يَسْمَعُ كَلَامَهٗ.

পবিত্র রওযা শরীফের সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যেভাবে নামাযে দাঁড়ানো হয় এবং সেই পবিত্র চিত্র মনের মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করবে, যাতে মনে হয় হুযূর আলাইহিস সালাম রওযা পাকে আরাম ফরমাচ্ছেন, তাকে চিন্‌ছেন ও তার কথা শুন্‌তেছেন।

অনুরূপ মুমিনদের কবরে ফাতিহা পাঠ করার সময় কেবলার দিকে পিঠ এবং কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো সুন্নাত। আলমগীরী কিতাবুল কারাহিয়ার زيارت القبور অধ্যায়ে আছে - يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ ثُمَّ يَقِفُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلًا لِوَجْهِ الْمَيِّتِ. প্রথমে জুতা খুলে ফেলুন। অতঃপর কাবার দিকে পিঠ করে এবং মৃত ব্যক্তির দিকে মুখ করে দাঁড়ান। রওযা পাক, যমযম ও ওযুর পানি, মুমিনের কবর সবই পবিত্র জিনিস। কিয়ামের দ্বারা এগুলোর তাযীম করানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যখন কোন ধর্মীয় নেতা আসেন, তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাত। অনুরূপ কোন ধর্মীয় নেতা সামনে দাঁড়ালে তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা সুন্নাত। কিন্তু বসে থাকা বেআদবী। মিশ্‌কাত শরীফের প্রথম খণ্ড কিতাবুল জিহাদে حكم الاسراء ও القيام শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে যে যখন হযরত সাআদ ইবনে মুআয (রাঃ) মসজিদে নববীতে উপস্থিত হন, তখন হুযূর আলাইহিস সালাম আনসারদেরকে হুকুম দিলেন- قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ আপনাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যান। এ দাঁড়ানো ছিল সম্মানবোধক। তাদেরকে বাধ্য করে দাঁড় করানো হয়নি। অধিকন্তু ঘোড়া থেকে নামানোর জন্য ২/১ জনই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সবাইকে কেন বললেন যে দাঁড়িয়ে যাও। আর ঘোড়া থেকে নামানোর জন্য মজলিসে আগতদের মধ্যে থেকে কাউকে ডাকা যেত। কিন্তু নির্দিষ্ট করে আনসারদেরকে কেন হুকুম করলেন? স্বীকার করতেই হবে যে, এ কিয়ামটা ছিল সম্মান বোধক। হযরত সাআদ আনসারদের নেতা ছিলেন। তাই তাদের দ্বারা তাযীম করানো হয়েছে। যাঁরা উপরোক্ত বাক্যে ব্যবহৃত الى শব্দ দ্বারা ধোঁকা দিয়ে বলেন যে এ দাঁড়ানোটা ছিল রোগীর সাহায্যার্থে, তারা তাহলে এ আয়াতে কি বলনে-

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ (যখন আপনারা নামাযের জন্য দাঁড়াবেন।)

নামাযও কি তাহলে রোগী যে এর সাহায্যার্থে দাঁড়াতে হয়?

আশআতুল লুমআত গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীছ প্রসংগে বর্ণিত আছে-

حکمت درمراعات توقیر واکرام سعد دریں مقام وامر

تعظیم وتکریم او دریں ہاآں باشد کہ اورا برائے حکم کردن طلبیدہ بودند پس اعلان شان او دریں مقام اولی وانسب باشد.

এখানে হযরত সাআদের প্রতি তাযীম করানোর রহস্য হচ্ছে যে তাঁকে বনি কুরায়জার উপর শাসন করার জন্য ডাকা হয়েছিল। তাই এ জায়গায় তাঁর শান-মান প্রকাশের সঠিক সময় ও প্রয়োজন ছিল। মিশকাত শরীফের القيام অধ্যায়ে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আছে-

فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهٖ.

যখন হুযূর আলাইহিস সালাম বৈঠক থেকে উঠতেন, তখন আমরা দাঁড়িয়ে যেতাম এবং এতটুকু পর্যন্ত দেখতাম যে তিনি তাঁর কোন পবিত্র বিবির ঘরে প্রবেশ করছেন। আশআতুল লুমআত কিতাবুল আদাবের কিয়াম শীর্ষক অধ্যায়ে قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

اجماع کردہ اند جماہیر علماء باین حدیث براکرام اہل فضل از علم یا صلاح یا شرف ونوری گفتہ کہ ایں قیام مراہل فضل را وقت قدوم آوردن ایشاں مستحب است واحادیث دریں باب درود یافتہ ودرنہی ازاں صریحا چیزے صحیح نہ شدہ ازقنیہ نقل کردہ کہ مکردہ نیست قیام جالس

ازبرائے کسی کہ در آمدہ است بروے بجہت تعظیم.

এ হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম পুণ্যাত্মা উলামায়ে কিরামের তাযীম করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন। ইমাম নববী বলেন যে বুযুর্গানে কিরামের তাশরীফ আনয়নের সময় দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এর সমর্থনে অনেক হাদীছ রয়েছে কিন্তু এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হাদীছ নেই। 'কীনা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে যে আগমনকারী কারো সম্মানার্থে বসে থাকা লোকের দাঁড়িয়ে যাওয়া মাকরূহ নয়। ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবুল কারাহিয়ার ملاقات الملوك শীর্ষক

অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

يَجُوْزُ الْخِدْمَةُ بِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْقِيَامِ وَاَخْذِ الْيَدَيْنِ وَالْاِنْحِنَاءِ.

খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে দাঁড়িয়ে, করমর্দন করে বা নত হয়ে সম্মান করা জায়েয।

এখানে নত হওয়া বলতে রুকু থেকে কম নত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। কেননা রুকু পর্যন্ত নত হওয়াতো নাজায়েয। এ প্রসংগে আমি ভূমিকায় আলোকপাত করেছি। দূর্‌রুল মুখতার গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড কিতাবুল কারাহিয়ার الاستبراء অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত আছে-

يَجُوْزُ بَلْ يُنْدَبُ الْقِيَامُ تَعْظِيْمًا لِلْقَادِمِ يَجُوْزُ الْقِيَامُ وَلَوْ لِلْقَارِىْ بَيْنَ يَدَىِ الْعَالِمِ.

আগমনকারী কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয বরং মুস্তাহাব যেমন আলিমের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া কুরআন তিলওয়াতকারীর জন্য জায়েয।

এ থেকে বোঝা গেল যে কারো কুরআন তিলওয়াতরত অবস্থায় কোন ধর্মীয় আলিম আসলে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। এ প্রসংগে ফত্‌ওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে-

وَقِيَامُ قَارِئِ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ يَجِئُ تَعْظِيْمًا لَا يُكْرَهُ اِذَا كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيْمَ.

কুরআন তিলাওয়ারত অবস্থায় আগমনকারী কারো সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া মকরূহ নয়, যদি তিনি সম্মান পাওয়ার উপযোগী হন।

ফত্‌ওয়ায়ে শামী প্রথম খণ্ড الامامت শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে যদি কেউ মসজিদের প্রথম কাতারে জামাতের অপেক্ষায় বসে আছেন। ইত্যবসরে কোন আলিম আসলে তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজে পিছনে চলে যাওয়া মুস্তাহাব। বরং এর জন্য প্রথম কাতারে নামায পড়া থেকে এটা আফযল। এটাতো উলামায়ে উম্মতের তাযীমের জন্য, কিন্তু হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) তো নামায পড়ানো অবস্থায় হুযূর আলাইহিস সালামকে তশরীফ আনতে দেখে নিজে মুক্তাদী হয়ে গেলেন এবং নামাযের মাঝামাঝি হুযূর আলাইহিস সালাম ইমাম হলেন। (মিশ্‌কাত শরীফের مرض النبى অধ্যায় দ্রষ্টব্য) উপরোক্ত বিবরণ থেকে বোঝা গেল যে ইবাদতরত অবস্থায়ও বুযুর্গানে দ্বীনের

তাযীম করা যায়েয,মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে حديث توبه ابن مالك অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

فَقَامَ طَلْحَةُ اِبْنِ عُبَيْدِاللّٰهِ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِىْ وَهَنَّأَنِىْ.

অতঃপর তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

এর প্রেক্ষাপটে নববীতে উল্লেখিত আছে-

فِيْهِ اِسْتِحْبَابُ مُصَافَحَةِ الْقَادِمِ وَالْقِيَامِ لَهُ اِكْرَامًا وَالْهَرْوَلَةِ اِلٰى لِقَاءِهٖ।

এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে আগমনকারীর সাথে মুসাফাহা করা, এর সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং দৌড়ে এর কাছে আসা মুস্তাহাব।

তৃতীয়তঃ যখন নিজের কোন প্রিয়জন আসে, তখন এর আগমনের আনন্দে দাঁড়িয়ে যাওয়া, হাত-পা ইত্যাদি চুমু দেয়া সুন্নাত। মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল আদব المصافحة। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) মুস্তাফা আলাইহিস সালামের পবিত্র দরজার সামনে আসলেন এবং দরজার কড়া নাড়লেন-

فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا فَاعْتَنَقَهٗ وَقَبَّلَهٗ.

হুযূর আলাইহিস সালাম চাদর বিহীন অবস্থায় তাঁর প্রতি দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর কোলাকুলি করলেন এবং চুমু খেলেন।

একই অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে যে যখনই হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে হাযির হতেন-

قَامَ اِلَيْهَا فَاَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِىْ مَجْلِسِهٖ.

তখন তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, হাত ধরে হাত চুমু খেতেন এবং নিজের জায়গায় তাঁকে বসাতেন। অনুরূপ হুযূর আলাইহিস সালাম যখন হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ) এর কাছে তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনি (ফাতিমা)ও দাঁড়িয়ে যেতেন, দস্ত মুবারকে চুমু খেতেন এবং স্বীয় জায়গায় হুযূর আলাইহিস সালামকে বসাতেন।

মিরকাত المشئ بالجنازة। অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে -

وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى نَدْبِ الْقِيَامِ لِتَعْظِيمِ الْفُضَلَاءِ وَالْكُبَرَاءِ

অর্থাৎ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সম্মানে দাঁড়ানো জায়েয। চতুর্থতঃ যখন কোন প্রিয়জনের কথা শুনে বা অন্য কোন শুভ সংবাদ পায়, তখন সে সময় দাঁড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব এবং সাহাবা ও পূর্ববর্তীগণের সুন্নাত। মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল ঈমানের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত উছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমাকে হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) যখন একটি শুভ সংবাদ শোনালেন-

فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.

তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম আপনার প্রতি আমার মা-বাপ কুরবান, আপনিই এর উপযোগী।

তাফসীরে রুহুল বয়ানের ২২ পারায় সূরা ফাত্‌হের আয়াত محمد رسول الله এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে যে, ইমাম তকিউদ্দিন সুবকী (রঃ) এর দরবারে উলামায়ে কিরামের একটি দল উপস্থিত ছিলেন। একজন না'ত আবৃত্তিকারী দুটি নাত পাঠ করলেন-

فَعِنْدَ ذَالِكَ قَامَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ وَجَمِيعُ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ فَحَصَلَ أُنْسٌ عَظِيمٌ بِذَالِكَ الْمَجْلِسِ.

তখন সাথে সাথে ইমাম সুবকী ও মজলিসে আগত সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাতে বেশ আনন্দ পাওয়া গেল। পঞ্চমতঃ কোন কাফির যিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের নেতা, যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রতি আগ্রহান্বিত হন, তাহলে তাঁর আগমনে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানো সুন্নাত। যেমন হযরত উমর (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য হুযুরের খিদমতে হাযির হলেন, তখন হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁকে নিজের পবিত্র বুকের সাথে লাগালেন (ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

ফত্‌ওয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল কারাহিয়া শীর্ষক اهل الذمة অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

إِنْ دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إِسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ.

কোন যিম্মি কাফির মুসলমানের কাছে আসলো, মুসলমান তার ইসলাম গ্রহণের আশায় তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলেন, এটা জায়েয।

www.AmarIslam.com

(৫) কয়েক জায়গায় দাঁড়ানো মাকরূহ। প্রথমতঃ যমযম ও ওযুর পানি ব্যতীত অন্যান্য পানি পান করার সময় বিনা কারণে দাঁড়ানো মাকরূহ, দ্বিতীয়তঃ পার্থিব লালসায় বিনা কারণে দুনিয়াবী লোকের সম্মানে দাঁড়ানো মাকরূহ। তৃতীয়তঃ ধনদৌলতের কারণে কাফিরের সম্মানার্থে দাঁড়ানো মাকরূহ।

ফত্‌ওয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল কারাহিয়া শীর্ষক اهل الذمة অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- وَإِنْ قَامَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا أَوْ قَامَ طَمَعًا لِغِنَاهُ كُرِهَ لَهُ ذَالِكَ.

যদি কারো জন্য উল্লেখিত অবস্থাদি ব্যতীত দাঁড়ানো হয় বা সম্পদের লালসায় দাঁড়ানো হয়, তাহলে তা মাকরূহ হবে। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি নিজের তাযীমের জন্য লালায়িত, তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিষেধ। পঞ্চমতঃ যদি কোন বড় লোক মাঝখানে বসা অবস্থায় আছে এবং তার চারদিকে বিনীতভাবে মানুষ দাঁড়িয়ে রইল। এ ধরনের দাঁড়ানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিজের জন্য কারো দাঁড়িয়ে থাকা পছন্দ করাটাও নিষেধ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এর প্রমাণ দেয়া হবে ইনশা আল্লাহ। এ প্রকারভেদটা যেন স্মরণ থাকে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা নিঃসন্দেহে জানা গেল যে মীলাদ শরীফে পবিত্র বেলাদতের আলোচনা করার সময় কিয়াম করাটা সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের থেকে প্রমাণিত রয়েছে। আমি সুন্নাত কিয়ামের বর্ণনায় চতুর্থ পর্যায়ে সে ধরনের কিয়ামের কথা উল্লখ করেছি, যা কোন খুশির সংবাদ পেয়ে বা কোন প্রিয়জনের আলোচনার সময় করা হয় এবং প্রথম পর্যায়ে ওই ধরনের কিয়ামের কথা উল্লেখ করেছি, যা ধর্মীয় মর্যাদাশীল কোন জিনিসের সম্মানে করা হয়। সুতরাং, মীলাদ শরীফে কিয়াম কয়েক কারণে সুন্নাত। প্রথমতঃ এটা পবিত্র বেলাদতের আলোচনার সম্মানে করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এ জন্য যে, মুসলমানের জন্য যিক্‌রে বিলাদতের চেয়ে বড় খুশির বিষয় আর কি হতে পারে আর খুশির সংবাদে দাঁড়ানো সুন্নাত। তৃতীয়তঃ মুসলমানের কাছে নবী করীম (দঃ) থেকে বেশী প্রিয় আর কে আছে? মা-বাপ, ধন-সম্পদ ইত্যাদি সব কিছু থেকে বেশি প্রিয়ভাজন হচ্ছেন হুযূর আলাইহিস সালাম। তাঁর যিক্‌রের সময় দাঁড়ানো পূর্বসূরী নেকবান্দাদের সুন্নাত। চতুর্থতঃ পবিত্র বেলাদতের সময় ফিরিশতাগণ দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এজন্য পবিত্র বেলাদতের আলোচনার সময় দাঁড়ানো ফিরিশতাদের কাজের সাথে মিল রয়েছে। পঞ্চমতঃ আমি মীলাদ শরীফের আলোচনায় হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছি যে হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় গুণাবলী ও বংশ পরিচয়

www.AmarIslam.com

মিম্বরে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করেছেন। এতে কিয়ামের মূল বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ষষ্ঠতঃ শরীয়ত একে নিষেধ করেনি এবং প্রত্যেক দেশে সাধারণ মুসলমানগণ একে ছওয়াবের কাজ মনে করে পালন করে। যে কাজটা মুসলমানগণ ভাল মনে করে, সে কাজ আল্লাহর কাছেও ভাল বলে গণ্য । আমি এর বিশ্লেষণ মীলাদ ও বিদআতের আলোচনায় করেছি। অধিকন্তু প্রথমেই আরয করেছি যে মুসলমান যে কাজটাকে মুস্তাহাব হিসেবে জানে, শরীয়তেও তা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য। ফত্ওয়ায়ে শামীর তৃতীয় খণ্ড কিতাবুল ওয়াক্ফের وقف منقولات শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে-

لِاَنَّ التَّعَامُلَ يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ لِحَدِيْثِ مَارَأٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ حَسَنٌ.

অর্থাৎ ডেক্সি, জানাযার খাঁটিয়া ইত্যাদির ওয়াক্ফ ধারণামত নাজায়েয হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু সাধারণ মুসলমানগণ এর অনুসারী, সেহেতু কিয়াসকে বাদ দেয়া হয়েছে এবং ওটাকে জায়েয বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দেখুন, সাধারণ মুসলমানগণ যে কাজটা ভাল মনে করে এবং এর হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল না থাকে, তখন কিয়াসকে বাদ দেয়া প্রয়োজন।

দুর্‌রুল মুখতারের পঞ্চম খণ্ড কিতাবুল ইজারাতের اجارة الفاسده অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَجَازَا جَازَةَ الْحَمَّامِ لِاَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ حَمَّامَ الْحَجْفَةِ وَلِلْعُرْفِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَارَأٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ حَسَنٌ.

স্নানাগার ভাড়া দেয়া জায়েয, কেননা হুযূর আলাইহিস সালাম হাজফা শহরের স্নানাগারে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এজন্য এটা প্রচলন হয়ে গেছে। হুযূর আলাইহিস সালাম ফরমান, যেটা মুসলমানগণ ভাল মনে করেন, সেটা আল্লাহর কাছেও ভাল।

এর প্রেক্ষাপটে ফত্ওয়ায়ে শামীতে উল্লেখিত আছে যে হুযূর আলাইহিস সালামের হাজফা শহরের স্নানাগারে প্রবেশ করার বর্ণনাটি খুবই দুর্বল। কেউ কেউ একে মওজু বা বানাওট হাদীছ বলেছেন। সুতরাং, স্নানাগার জায়েয হওয়ার একটি মাত্র দলীল অবশিষ্ট রইল অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রচলনটাতো প্রমাণিত হলো। মুসলমানগণ যে কাজ

www.AmarIslam.com

টা সাধারণভাবে বৈধ মনে করে, তা জায়েয। একই জায়গায় শামীতে আরও উল্লেখ আছে-

لِاَنَّ النَّاسَ فِىْ سَائِرِ الْاَمْصَارِ يَدْفَعُوْنَ اُجْرَةَ الْحَمَّامِ فَدَلَّ اِجْمَاعُهُمْ عَلٰى جَوَازِ ذَالِكَ وَاِنْ كَانَ الْقِيَاسُ يَابَاهُ.

কেননা সব শহরগুলোতে মুসলমানগণ স্নানাগারের ফি দিয়ে থাকেন। সুতরাং, তাদের ঐক্যমতের কারণে জায়েয হওয়াটা বোঝা গেল, যদিওবা এটা কিয়াসের বিপরীত। কিয়াস অনুসারে স্নানাগারের ফি নাজায়েয হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কেননা কতটুকু পানি ব্যবহার হবে তা জানা যায় না। অথচ ভাড়ার ব্যাপারে লাভ ক্ষতি সম্পর্কে জানাটা প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু মুসলমানগণ সাধারণভাবে একে জায়েয মনে করে, সেহেতু এটা জায়েয। মীলাদ শরীফ কিয়াম করাটা সর্বসাধারণ মুসলমানগণ মুস্তাহাব মনে করেন। সুতরাং, এটা মুস্তাহাব। সপ্তমতঃ এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ (হে মুসলমানগণ,আমার নবীকে সাহায্য কর ও তাঁকে সম্মান কর।)

তাযীমের বেলায় কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, বরং যে যুগে বা যে জায়গায় তাযীমের যে রীতি প্রচলিত, সেভাবে তাযীম করুন, যদি শরীয়ত একে হারাম না করে থাকে। যেমন তাযীমী সিজ্‌দা ও রুকু করা হারাম। আমাদের যুগে রাজকীয় হুক্‌মাদিও দাঁড়িয়ে পাঠ করা হয়। সুতরাং হুযূর আলাইহিস সালামের যিক্‌রও দাঁড়িয়ে করা চাই। দেখুন كُلُوْا وَاشْرَبُوْا (খান ও পান করুন) বাক্যে শর্তহীনভাবে খানা পিনার অনুমতি রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক হালাল আহার্য গ্রহণ করুন। তাই বিরানী, জরদা, কোরমা ইত্যাদি সবই কুরূনে ছালাছায় থাকুক বা না থাকুক হালাল। এ রকম تُوَقِّرُوْهُ শব্দেও শর্তহীন নির্দেশ রয়েছে যে প্রত্যেক প্রকারের বৈধ তাযীম করুন কুরূনে ছালাছা থেকে এটা প্রমাণিত হোক বা না হোক। অষ্টমতঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিশানা সমূহের সম্মান করে, তা হবে আত্মার সংযমশীলতার বহিঃপ্রকাশ।

www.AmarIslam.com

তাফসীরে রুহুল বয়ানে আয়াত-

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে যে, যে জিনিসটা ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করেছে, তা আল্লাহর নিশানা সমূহের অন্তর্ভুক্ত, সে সবের সম্মান করা প্রয়োজন। যেমন, কোন বিশেষ মাস, কোন বিশেষ দিন বা স্থান সমূহ, কোন বিশেষ ... সময় ইত্যাদি। এ জন্যই সাফা-মারওয়া, কাবা মুয়াজ্জমা, মাহে রমযান, শবে কদরের তাযীম করা হয়। যিক্‌রে বিলাদতও আল্লাহর নিশানাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এর তাযীমও করণীয়, যা কিয়ামের মাধ্যমে আদায় হয়।

আমি আটটি দলিলের সাহায্যে কিয়াম মুস্তাহাব হওয়াটা প্রমাণ করলাম। কিন্তু বিরোধিতাকারীদের কাছে খোদার রহমতে হারাম প্রমাণ করার একটি দলীলও নেই। কেবল স্বীয় মনগড়া অভিমত দ্বারাই হারাম বলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীলাদ শরীফে কিয়াম প্রসংগে আপত্তি ও এর জবাব

১নং আপত্তিঃ যেহেতু মীলাদ শরীফে কিয়াম করাটা প্রথম তিন যুগে ছিল না, সেহেতু এটা বিদ্‌আত এবং বিদ্‌আত মাত্রই হারাম। হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি আমাদের থেকে সাহাবায়ে কিরামের কি বেশি মুহাব্বত ছিল না? যখন তাঁরা কিয়াম করেননি, আমরা কেন করতে যাব?

উত্তরঃ বিদ্‌আত সম্পর্কিত উত্তর অনেক বার দেয়া হয়েছে যে প্রত্যেক বিদ্‌আত হারাম নয়। বাকী রইল তাদের এ বক্তব্য-হুযূর আলাইহিস সালামকে ও ধরনের সম্মান করা হবে, যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এ নীতিটা কি কেবল হুযূর আলাইহিস সালামের সম্মানের বেলায় প্রযোজ্য, নাকি দেওবন্দী উলামা ও অন্যান্যদের বেলায়ও প্রযোজ্য? কেননা আলিম,কিতাব, মাদ্রাসা ও অন্যান্য সমস্ত জিনিসের ও ধরনের সম্মান চাই, যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। তাহলে দেওবন্দী আলিমদের আগমন উপলক্ষে স্টেশনে যাওয়া, ওদেরকে মাল্যদান করা, তাদের জন্য মিছিল বের করা, পাতাকা দ্বারা রাস্তা ও সভার স্থানকে সাজানো, চেয়ার বসানো, বক্তৃতার সময় 'জিন্দাবাদ' শ্লোগান দেওয়া, মঞ্চ তৈরী করা, কার্পেট বিছানো ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সম্মান প্রদান করার এমন কোন প্রমাণ কি পেশ করতে পারবেন যে সাহাবায়ে কিরাম হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি এ ধরনের

সম্মান করেছিলেন? কখনই পারবেন না। তাহলে বলুন, এ ধরনের তাযীম হারাম হবে, না কি হালাল? সুতরাং আপনাদের ফর্মূলা গলদ। বরং হারামকৃত রুকু সিজ্‌দা ব্যতীত যে দেশে যে রকম সম্মান প্রদর্শনের প্রচলন, সে রকম সম্মান জায়েয, মনের আবেগ যে দিকে পরিচালিত করে, সেটা ইবাদত। লক্ষ্ণৌতে মেথর বলা হয় নিম্ন শ্রেণীর ঝাড়ুদারকে। কিন্তু ফার্সীতে, কোন কোন জায়গায় উর্দুতেও মেথর সর্দার বা নেতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন সুতরালের নবাবকে সুতরালের মেথর বলা হয়। লক্ষ্ণৌতে এ 'মেথর' শব্দটি যদি কেউ কোন নবীর শানে ব্যবহার করে, সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু সুতরাল বা পারস্যে ব্যবহার করলে কাফির হবে না। এক এক দেশের এক এক রীতি।

ہندیاں را اصطلاح ہند مدح - سندیاں را اصطلاح سندہ قدح

(হিন্দী ভাষা-ভাষীদের পরিভাষায় হিন্দী প্রশংসনীয়, সিন্ধু বাসীদের পরিভাষায় সিন্ধু প্রশংসনীয়। মিরকাত ও আশ্‌আতুল লুমআতের ভূমিকায় ইমাম মালিক (রাঃ) এর জীবনী বর্ণনা প্রসংগে লিখেছেন যে তিনি মদীনা শরীফের পবিত্র যমীনে কখনো ঘোড়ায় আরোহণ করেননি। যখন হাদীছ বর্ণনা করতেন, এর আগে গোসল করে নিতেন, ভাল কাপড় পরতেন, সুগন্ধি লাগাতেন এবং ভীতি ও গাম্ভীর্য সহকারে বসতেন। বলুন মদীনায়ে পাক বা হাদীছ শরীফের প্রতি এ ধরনের সম্মান সাহাবীগণ কি করেছিলেন? না, করেননি। কিন্তু এটা ইমাম মালিক (রাঃ) এর মনের আবেগ তাড়িত বিধায় ছওয়াবের কাজ হিসেবে ধরা হবে। তফসীরে রূহুল বয়ানে مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ আয়াতটির প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়েছে যে আয়াযের সন্তানের নাম ছিল মুহাম্মদ। সুলতান মাহমুদ তার নাম ধরে ডাকতেন। একদিন সুলতান মাহমুদ গোসল খানায় গিয়ে ডাক দিলেন-'হে আয়াযের ছেলে, পানি নিয়ে এসো'। আয়ায আরয করলো, 'হুযূর, কি অপরাধ হলো ছেলের যে নাম নিলেন না?' তিনি বললেন, 'ও সময় আমি বেওযু ছিলাম, এবং বে-ওযু এ পবিত্র নাম আমি কখনো উচ্চারণ করি না।

ہزار بار بشویم دهن بمشك وگلاب

ہنوز نام توگفتن کمال بے ادبی است۔

অর্থাৎ মেশক ও গোলাপজল দিয়ে মুখকে হাজার বার ধৌত করার পরও তাঁর পবিত্র নাম নেয়া বে-আদবী মনে হয়।

বলুন, এ ধরনের তাযীমের কি প্রমাণ আছে? রসূল আলাইহিস সালামের প্রতি

সুলতান মাহমুদ ও ইমাম মালিক (রাঃ) এর মুহাব্বত কি সাহাবায়ে কিরাম থেকে বেশি ছিল?

২নং আপত্তিঃ যদি রসূল আলাইহিস সালামের যিক্‌রের তাযীম করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক যিক্‌রের সময় দাঁড়িয়ে থাকুন এবং মীলাদ শরীফের প্রথম থেকে দাঁড়িয়ে থাকুন। এটা কোন্ ধরনের সম্মান যে প্রথম ও শেষে বসে থাকা আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাওয়া?

উত্তরঃ এটাতো কোন আপত্তি হলো না। যদি কাউকে আল্লাহ তাওফীক দেয় এবং সে যদি প্রত্যেক যিক্‌র দাঁড়িয়ে পাঠ করে, আমরা নিষেধ করবো না। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকুন বা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ান প্রত্যেক রকম জায়েয। আলা-হযরত (কুঃ সিঃ) হাদীছ গ্রন্থ সমূহ দাঁড়িয়ে পড়াতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বলেছেন যে তিনি নিজেও দাঁড়াতেন এবং ছাত্ররাও দাঁড়াতেন। তাঁর এ কাজটা খুবই মুবারক ছিল। কিন্তু মীলাদ শরীফে যেহেতু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ লোকের জন্য কষ্টকর, সেহেতু কেবল পবিত্র বেলাদতের বর্ণনার সময় দাঁড়ানো হয়। অধিকন্তু, বসে থাকতে থাকতে কতেক লোকের ঘুম এসে যায়। তাই দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করুন, যাতে ঘুমের আবেগ কেটে যায়। এ জন্যেই ওই সময় গোলাপজল ইত্যাদি ছিটানো হয়, যেন ঘুমের ভাব চলে যায়। কেন জনাব! নামাযের মধ্যেওতো আপনি কতেক যিক্‌র দাঁড়িয়ে করেন, আবার কতেক যিক্‌র রুকু, সিজ্‌দা ও বসে করেন। প্রত্যেক যিক্‌র দাঁড়িয়ে করেন না কেন? আবার তাশাহুদের মধ্যে যখন اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ পড়েন, তখন আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার নির্দেশ আছে। কিন্তু অন্যান্য সময় এ কলেমা পাঠ করার সময় আঙ্গুলী কেন নাড়েন না? সুফিয়ানে কিরাম কতেক আমলের ক্ষেত্রে আঙুল দ্বারা ইশারা করার শর্তারোপ করেন। যেমন- কোন মামলা উপলক্ষে যখন বিচারকের সামনে যাবেন, তখন كهيعص এভাবে পাঠ করবেন, যেন প্রতি বর্ণ উচ্চারণ করার সময় এক একটি আঙুল বন্ধ করেন, যেমন كاف বলার সময় এক আঙুল ه বলার সময় এক আঙুল এভাবে। অতঃপর حمعسق পাঠ করবেন এবং এর প্রতি বর্ণ উচ্চারণ করার সময় এক এক আঙুল খুলবেন। এর পর বিচারকের দিকে ফুঁক দিবেন। কিন্তু কুরআন পাঠ করার সময় যখন এ শব্দগুলো আসে, তখন কেন ও ধরনের ইশারা করা হয় না? আর এ ধরনের আমলের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম থেকে কি প্রমাণ আছে? হিজবুল বাহার ইত্যাদি ওজীফা পাঠকগণ কতেক জায়গায় বিশেষ ইশারা করে থাকেন কিন্তু অন্যান্য সময় কেন করেন না? কাবা শরীফ তওয়াফ করার সময় প্রথম তওয়াফের চার চক্করে ইযতিবাহ করতে হয় এবং রমলও করতে হয় কিন্তু

এর পরে কেন করে না? এ ধরনের শত শত প্রশ্ন করা যায়। ইমাম বুখারী কতেক হাদীছ সনদসহকারে বর্ণনা করেছেন আবার কতেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন অন্যটার সঙ্গে সংযুক্তভাবে। সবগুলো একই রকম কেন বর্ণনা করলেন না? তাদের যুক্তি মতে এগুলোকেও তাহলে হারাম প্রমাণ করা যেতে পারে।

৩নং আপত্তিঃ জনগণ মীলাদ শরীফে কিয়াম করাটাকে জরুরী বলে ধরে নিয়েছেন, যারা করে না, তাদের সমালোচনা করে থাকেন। তাই অনাবশ্যককে আবশ্যক মনে করাটা নাজায়েয। সুতরাং কিয়াম নাজায়েয।

উত্তরঃ এটা মুসলমানদের প্রতি নিছক অপবাদ যে, এরা মীলাদকে ওয়াজিব মনে করেন। কোন আলিমে দ্বীন এরকম কোন কিতাব লিখেননি যে কেয়াম ওয়াজিব এবং এরূপ কোন ওয়াজ নসীহতেও বলেননি। সাধারণ লোকেরাও এটাই বলে যে কিয়াম ও মীলাদ শরীফ ছওয়াবের কাজ। এরপরও আপনারা তাদের প্রতি কিভাবে অভিযোগ আনয়ন করেন যে তারা ওয়াজিব মনে করেন? যদি কেউ ওয়াজিব মনে করেও থাকে তাহলে এ মনে করাটা পাপ হবে, কিন্তু মূল কিয়াম হারাম হবে না। ইমাম শাফেঈ (রাঃ) নামাযে দরূদ শরীফ পড়াটা জরুরী মনে করেন, কিন্তু হানাফীরা জরুরী মনে করেন না। তাই আমাদের মাযহাব অনুসারে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর উক্তি সঠিক হবে না। কিন্তু নামাযে দরূদ নিষেধ বলা যাবে না। হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব তাঁর রচিত 'হাফ্‌তে মাসায়েলা' পুস্তিকায় এর সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। এখন তাঁদের সেই কথাটার উত্তর বাকী রইলো যে মুসলমানগণ একে রুটিন মাফিক করে থাকেন এবং যারা করে না, তাদেরকে ওহাবী বলেন। এ ধরনের বলাটা একেবারে ন্যায় সংগত। মিশ্‌কাত শরীফে القصد فى العمل শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ আল্লাহর কাছে ভাল কাজ হচ্ছে সেটাই, যা সব সময় হয়, যদিওবা অল্প হোক। প্রত্যেক সৎ কাজকে নিয়মিতভাবে করাটা মুস্তাহাব। মুসলমানগণ প্রত্যেক ঈদে ভাল কাপড় পরিধান করে, প্রত্যেকে শুক্রবার গোসল করে, সুগন্ধি লাগায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি রমযান মাসে ও শুক্রবারে ছুটি হয়, প্রতি বৎসর পরীক্ষা নেয়া হয়, মুসলমান প্রতি রাতে ঘুম যায়, প্রত্যেক মধ্যাহ্ন খাবার খায়। তাই বলে কি এগুলোকে ওয়াজিব মনে করে বা নিয়মিত কারাটা কি ওয়াজিব হওয়ার লক্ষণ? এখন উত্তর দেয়া বাকী রইল সেই প্রসঙ্গটার যারা কিয়াম করে না, তাদেরকে ওহাবী মনে করা হয়। এর কারণ হচ্ছে, ইদানীং হিন্দুস্থানে এটা ওহাবীদের লক্ষণে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক যুগে ইমানদারদের লক্ষণসমূহের ভিন্নতা রয়েছে। তাই যুগ অনুযায়ী কাফিরদের লক্ষণসমূহ থেকে দূরে থাকা এবং

ঈমানদারদের লক্ষণ সমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইসলামের প্রথম যুগে বলা হয়েছিল, যে لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ বলেছে, সে জান্নাতী হয়ে গেছে, (মিশকাত কিতাবুল ঈমান দ্রষ্টব্য) কেননা ওই সময় কলেমা পড়াটাই ছিল ঈমানদারদের লক্ষণ। পরবর্তীতে কলেমা পাঠকারীদের মধ্যে যখন মুনাফিকের সৃষ্টি হলো, তখন কুরআনে পাক ইরশাদ করেন, আপনার সামনে মুনাফিক এসে বলে যে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রসূল (দঃ); আল্লাহও জানেন যে, আপনি আল্লাহর রসূল (দঃ)। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে (তারা) মুনাফিক, মিথ্যুক। বলুন, তারা কথাতো সত্যই বলছে কিন্তু তারা মিথ্যুক। হাদীছ শরীফে উল্লেখিত আছে যে একটি কওম খুবই ধর্মপরায়ণ হবে। কিন্তু তারা ধর্ম থেকে এমনিভাবে দূরে সরে যাবে, যেমনি করে তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। হাদিছে আরও উল্লেখিত আছে যে, খারেজীদের চিহ্ন হলো মাথা মুণ্ডানো। (হাদিছদ্বয় মিশ্কাত শরীফের কিতাবুল কিসাস, قتال اهل الردة শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে) তিনটি যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এ তিনটি আলামত বা চিহ্ন বর্ণিত হয়েছে। 'শরহে ফিক্হে আকবর' গ্রন্থে মোল্লা আলী কারী বর্ণনা করেছেন যে কোন এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, সুন্নীর আলামত কি? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন-

حَبُّ الْخَتَنَيْنِ تَفْضِيْلُ الشَّيْخَيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(দুই ইমাম অর্থাৎ হযরত আলী ও উছমান (রাঃ) এর প্রতি মুহাব্বত রাখা, শায়খাইন অর্থাৎ হযরত সিদ্দীক ও ফারুক (রাঃ)কে সবার থেকে আফযল মনে করা এবং চামড়ার তৈরী মোজার উপর মুসেহ করা।) তাফসীরাতে আহমদীয়ায় সূরা আনআমের আয়াত وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত আছে যে সৈয়্যদেনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন- যাঁর কাছে নিম্নে বর্ণিত দশটি অভ্যাস থাকবে, তিনি সুন্নী বলে গণ্য হবেন। এগুলো হচ্ছে-

تَفْضِيْلُ الشَّيْخَيْنِ - تَوْقِيْرُ الْخَتَنَيْنِ - تَعْظِيْمُ الْقِبْلَتَيْنِ
اَلصَّلٰوةُ عَلَى الْجَنَازَتَيْنِ. اَلصَّلٰوةُ خَلْفَ الْاِمَامَيْنِ - تَرْكُ
الْخُرُوْجِ عَلَى الْاِمَامَيْنِ - اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ - وَالْقَوْلُ
بِالتَّقْدِيْرَيْنِ - وَالْاِمْسَاكُ عَنِ الشَّهَادَتَيْنِ وَاَدَاءُ الْفَرِيْضَتَيْنِ.

(১) শায়খাইন অর্থাৎ হযরত সিদ্দীক ও ফারুক (রাঃ)কে সবার থেকে আফযল জ্ঞান করা, (২) ইমামাইন অর্থাৎ সৈয়্যদেনা আলী ও উছমান (রাঃ) এর সাথে মুহাব্বত

রাখা, (৩) দুই কিব্লা অর্থাৎ মক্কা ও বায়তুল মুকাদ্দসের প্রতি সম্মান করা, (৪) দুই জানাযায় অর্থাৎ ফাসিক ও নেকবান্দার জানাযায় শরীক হওয়া, (৫) দুই ইমামের অর্থাৎ ফাসিক ও নেককার ইমামের পিছনে নামায পড়া, (৬) ন্যায় বিচারক বা জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকা, (৭) সফর ও মুকিম অবস্থায় দুই মোজায় মুসেহ করা, (৮) ভাল মন্দ উভয় তকদীর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বলে স্বীকার করা, (৯) কাউকে বেহেশতী বা দোযখী বলা থেকে বিরত থাকা, (১০) দুই ফরয অর্থাৎ নামায ও যাকাত আদায় করা। মিরকাতের প্রারম্ভে المسح على الخفين শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

سُئِلَ اَنَسُ ابْنُ مٰلِكٍ عَنْ عَلَامَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَقَالَ اَنْ تُحِبَّ الشَّيْخَيْنِ وَلَا تَطْعَنِ الْخَتَنَيْنِ وَتَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

হযরত আনাস ইবনে মালিককে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞসারা করা হয়েছিল। তখন তিনি ফরমান- শায়খাইন অর্থাৎ হযরত সিদ্দীক ও উমর (রাঃ)কে মুহাব্বত করা, হযরত আলী ও উছমান (রাঃ) এর সমালোচনা না করা এবং চামড়ার মোজাদ্বয়ের মুসেহ করা। দুর্‌রুল মুখতারে المياه অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَالتَّوَضُّوءُ مِنَ الْحَوْضِ اَفْضَلُ رَغْمًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

মুতাযিলাদেরকে উত্তেজিত করার জন্য হাউজের পানি দ্বারা ওযু করা আফযল। একই জায়গায় ফত্ওয়ায়ে শামীতে উল্লেখিত আছে-

لِاَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ لَا يُجِيْزُوْنَهُ مِنَ الْحِيَاضِ فَنَرْغَمُهُمْ بِالْوَضُوْءِ مِنْهَا.

অর্থাৎ মুতাযিলাগণ হাউজ থেকে ওযু করাকে না জায়েয বলে। তাই আমরা হাউজ থেকে ওযু করে তাদেরকে উত্তেজিত করবো। দেখুন, হাউজ থেকে ওযু করা, চামড়ার মোজায় মুসেহ করা ইত্যাদি ওয়াজিব নয়, কিন্তু যেহেতু সেই যুগে এগুলোর অস্বীকারকারীর আবির্ভাব হয়েছিল, সেহেতু এগুলোকে সুন্নীদের লক্ষণ সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অনুরূপ, কিয়াম, মীলাদ, ফাতিহা ইত্যাদি ওয়াজিব সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু যখন এসবের অস্বীকারকারী সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই বর্তমানকালে হিন্দুস্থানে এগুলো সুন্নী হওয়ার লক্ষণ, এবং মীলাদ মাহফিলে কিয়ামের সময় একাকী বসে থাকা দেওবন্দী হওয়ার লক্ষণ। مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ যে যেই কওমের সাথে সাদৃশ্য রাখে, সে ওদেরই অন্তর্ভুক্ত।) সুতরাং এর থেকে মুক্ত থাকা চাই। ফত্ওয়ায়ে

শামী থেকে এটা বোঝা গেল, যদি কেউ কোন জায়েয বা মুস্তাহাব কাজ বিনা কারণে বাধা দেয়, তাহলে ওটা যেন নিশ্চয় করে। বর্তমান হিন্দুস্থানে হিন্দুরা গাভী দ্বারা কুরবানী করা থেকে বাধা দিয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানগণ স্বীয় রক্ত দিয়ে একে চালু রেখেছেন, যদিওবা কেবল গাভী দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব নয়। মীলাদ মাহফিল, কিয়াম ইত্যাদি ও তদ্রূপ। ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের মতে পৈতা বাঁধা, হিন্দুদের মত মাথায় টিকি রাখা, ময়লা আবর্জনায় কুরআন শরীফ রাখা কুফরী, কেননা এগুলো কাফিরদের মাযহাবী লক্ষণ।

বিঃদ্রঃ- এ প্রশ্নটা (৩নং) দেওবন্দীরা প্রায় সময় করে থাকে এবং ফাতিহা, উরস, মীলাদ ইত্যাদি সব কিছুকে হারাম বলে। এটাও বলে, আপনারা নিজেরাই সুন্নী হওয়ার লক্ষণ আবিষ্কার করলেন। অথচ হাদীছ-কুরআনে এসব লক্ষণের কোন উল্লেখ নেই। সব ক্ষেত্রে উপরোক্ত জবাব দেয়া যাবে। এতে অনেক উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।

৪নং আপত্তিঃ কারো সম্মানে দাঁড়ানো নিষেধ। যেমন, মিশকাত শরীফের بـاب القـيـام এ আছে وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهٖ لِذَالِكَ সাহাবায়ে কিরাম যখন হুযূর আলাইহিস সালামকে দেখতেন, দাঁড়াতেন না, কেননা তাঁরা জানতেন, এটা হুযূর আলাইহিস সালামের কাছে অপছন্দ। একই অধ্যায়ে আরো বর্ণিত আছে-

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

যিনি পছন্দ করে যে লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন দোযখে তার ঠিকানা অনুসন্ধান করে। মিশ্কাত শরীফের সেই অধ্যায়ে আর এক জায়গায় আছে-

لَاتَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ (আজমী (যারা আরবী নয়) লোকদের মত দাঁড়িও না।) এ হাদীছ সমূহ থেকে বোঝা গেল, কোন বড় লোক যদি কোন স্থানে আগমন করেন, তাঁর সম্মানে দাঁড়াবেন না। মীলাদ শরীফেতো হুযূর আলাইহিস সলাম আসেনওনা, তথাপি তাযীমী কিয়াম কিভাবে জায়েয হতে পারে?

উত্তরঃ উপরোক্ত হাদীছ সমূহ সব কিয়ামের ব্যাপারে নিষেধ করা হয়নি, কেবল যারা নিজের জন্য অন্যদের দণ্ডায়মান হওয়া কামনা করে, জনগণ বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল আর নেতাজী মাঝখানে বসে রইলেন, এ ধরনের দাঁড়ানো নিষেধ। তা না হলে প্রথম অধ্যায়ে আমি যে সব হাদীছ সমূহ ও ফকীহগণের উক্তি উদ্ধৃতি করেছি, এর বিপরীত হবে। আমিও লিখেছি, ওই দু'ধরনের দণ্ডায়মান নিষেধ। প্রথম হাদীছের প্রেক্ষাপটে আশ্আতুল লুমআতে লিখা হয়েছে-

وحاصل انکه قیام وترک قیام بحسب زمان واحوال واشخاص مختلف گردد وازیں جااست که گاہے کردند گاہے نه کردند.

সারকথা হলো, তাযীমী কিয়াম করা ও না করাটা যুগ, অবস্থা এবং ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অনুরূপ সাহাবায়ে কিরাম হুযূরের জন্য কোন সময় কিয়াম করেছেন আবার কোন সময় করেননি। এতে বোঝা গেল, সাহাবায়ে কিরাম হুযূর আলাইহিস সালামের তশরীফ আনয়নে কোন সময় দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কোন সময় দাঁড়াতেন না। না দাঁড়ানোর কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে এবং দাঁড়ানোর কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (দঃ) কিয়ামকে অপছন্দ করেছেন বিনয় ও ভদ্রতা হিসেবে। সুতরাং এখানে কিয়ামকে সার্বিকভাবে নিষেধ করেননি, সব সময় দাঁড়িয়ে থাকাকে নিষেধ করা হয়েছে। উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীছ প্রসংগে 'আশ্আতুল লুমআতে' আছে-

قیام مکرده بعینه نیست بلکه مکروه محبت قیام است اگروے محبت قیام نه دارد قیام برائے دے مکروه نیست. قاضی عیاض مالکی گفته که قیام منہی درحق کسی است که سته باشد وایستاده باشند پیش دے ودرقیام تعظیم برائے اہل بجہت دنیائے ایشاں وعید دارد شد ومکروه است.

কিয়াম মাকরূহ নয় বরং কাম্য করাটা মাকরূহ। যদি কেউ কিয়াম কামনা না করেন, তাহলে তাঁর সম্মানে কিয়াম মাকরূহ নয়। কাজী আয়ায বলেছেন- কিয়াম ওই ব্যক্তির জন্য নিষেধ, যিনি নিজে বসে রইলেন আর লোকেরা দাঁড়িয়ে রইলো এবং দুনিয়াদারী ব্যক্তির জন্য তাযীমী কিয়াম করা সম্পর্কে সাবধানবাণী এসেছে এবং এটা মাকরূহ। অনুরূপ মিশ্কাত শরীফের কিতাবুল জিহাদ حکم الاسـرار শীর্ষক অধ্যায়ের হাশিয়ায় قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ হাদীছ প্রসংগে লিপিবদ্ধ আছে-

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْهِ اِكْرَامُ اَهْلِ الْفَضْلِ وَتَلَقِّيْهِمْ وَالْقِيَامُ اِلَيْهِمْ وَاحْتَجَّ بِهِ الْجَمْهُوْرُ وَقَالَ الْقَاضِىْ عِيَاضُ لَيْسَ هٰذَا مِنْ

الْقِيَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَاِنَّمَا ذَالِكَ فِيْمَنْ يَّقُوْمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَمْثِلُوْنَ لَهُ قِيَامًا طُوْلَ جُلُوْسِهِ.

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, বুযুর্গানে কিরামের প্রতি তাযীম, তাঁদের সাথে দেখা করা এবং তাঁদের জন্য দাঁড়ানো এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এর থেকে দলীল পেশ করেন। এ কিয়ামটা নিষিদ্ধ কিয়াম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিষিদ্ধ কিয়াম হচ্ছে লোক তাঁর সাম্নে দাঁড়িয়ে রইলো আর তিনি বসে আছেন এবং তাঁর বসে থাকা পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে রইলো।

এসব ভাষ্য থেকে বোঝা গেল, ওই হাদীছ দুটি দ্বারা বিশেষ বিশেষ কিয়াম নিষেধ করা হয়েছে। মীলাদ মাহফিলের কিয়াম এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অধিকন্তু যদি তাযীমী কিয়াম নিষেধ হয়, তাহলে দেওবন্দী উলেমা ও অন্যান্যদের আগমনে জনগণ যে সশরীরে দাঁড়িয়ে যান, তা কেন জায়েয হবে?

www.AmarIslam.com

ফাতিহা, কুলখানী, চেহলাম ইত্যাদির বর্ণনা

এ আলোচনায় একটি ভূমিকা ও দু'টি অধ্যায় রয়েছে।

ভূমিকা

দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব অন্য মুসলমানকে দান করা জায়েয এবং এটা ফলপ্রসূও হয়। কুরআন-হাদীছ ও ফকীহগণের উক্তি থেকে এর প্রমাণ মিলে। কুরআন করীম মুসলমানদেরকে একে অপরের জন্য দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জানাযার নামায এজন্যই আদায় করা হয়। মিশ্কাত শরীফের فضل الصدقة শীর্ষক অধ্যায়ে আছে, হযরত সাআদ (রাঃ) একটি কূপ খনন করে বলেছিলেন هٰذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ এটা সাআদের মায়ের নামে উৎসর্গিত হল। ফকীহগণও ঈসালে ছওয়াবের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে দৈহিক ইবাদতের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা নাজায়েয। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি অপরের বদলে নামায পড়লে, নামায আদায় হবে না। অবশ্য নামাযের ছওয়াব দান করা যেতে পারে। মিশ্কাত শরীফে باب الفتن الملاحم এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কাউকে বলেছিলেন-

مَنْ يَّضْمَنُ لِىْ مِنْكُمْ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ مَسْجِدِ الْعَشَارِ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ هٰذِهٖ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ.

(আমার পক্ষ হয়ে মসজিদে-আশারে দু'রাক্আত নামায পড়ার দায়িত্ব আপনাদের মধ্যে কে নিবেন? এবং কে বলবেন, এর ছওয়াব আবু হুরাইরার নামে উৎসর্গিত?) এর থেকে তিনটি মাসায়েল জানা গেল- এক, দৈহিক ইবাদত অর্থাৎ নামাযও কারো ঈসালে ছওয়াবের নিয়তে আদায় করা জায়েয, দুই, মুখে উচ্চারণ করে ঈসালে ছওয়াব করা অর্থাৎ 'হে খোদা, এর ছওয়াব অমুককে দান করুন' এরকম মৌখিকভাবে বলা অনেক উত্তম; তিন, বরকতের উদ্দেশ্যে বুযুর্গানে দীনের মসজিদ সমূহে নামায আদায়ে বিশেষ ছওয়াব রয়েছে। আর্থিক ইবাদত বা আর্থিক ও দৈহিক সমন্বিত ইবাদত, যেমন যাকাত ও হজ্বের ক্ষেত্রে যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি আমার পক্ষে যাকাত দিয়ে দাও। তাহলে সে দিতে পারে আর যদি আর্থিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির কাছে হজ্বের কার্যাদি সমাধা করার শক্তি না থাকে, তাহলে অন্যের দ্বারা বদলি হজ্ব করা যায়। প্রত্যেক ইবাদতের ছওয়াব নিশ্চয় পৌঁছে থাকে। যদি আমি কাউকে স্বীয় সম্পদ দিয়ে দেই, তাহলে সে মালিক হয়ে যাবে। এটাও তদ্রূপ। অবশ্য সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে এতে নিজের কোন স্বত্ব বাকী থাকে না আর কয়েকজনকে দিলে তা ওদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যায়। কিন্তু ছওয়াব যদি সবাইকে বখশিশ করা হয়, তাহলে সবাই পরিপূর্ণরূপে পায়

www.AmarIslam.com

এবং প্রদানকারী নিজেও বঞ্চিত হয় না,যেমন অন্যদেরকে কুরআন পড়ানো হলো; ওরা সবাই কুরআন পড়তে শিখল, এতে শিক্ষাদাতার জ্ঞান খর্ব হলো না।

এ প্রসঙ্গে ফত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ড دفن ميت শীর্ষক আলোচনাটুকু দেখুন। শিশুদের থেকে উপহার গ্রহণ করা নিষেধ, কিন্তু ছওয়াব গ্রহণ জায়েয। কতেক লোক বলেন যে ছওয়াব কারো কাছে পৌঁছে না, কেননা কুরআন করীমে উল্লেখিত আছে- لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ (প্রত্যেকের জন্য সেটাই কল্যাণকর বা ক্ষতিকর, যা সে নিজেই করেছে।) কুরআন করীমে আরো উল্লেখিত আছে لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى (মানুষের জন্য অন্য কিছু নেই, কিন্তু ওটা, যা নিজে আহরণ করে।)

এতে বোঝা গেল অপরের কাজে নিজের কোন লাভ নেই। কিন্তু এ ধারণাটা ভুল। কেননা لِلْاِنْسَانِ এর এ لَامْ (লাম) অব্যয়টা মূলধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য বিষয় ও মূলধন হচ্ছে নিজেরই আমলসমূহ। কেউ ঈসালে ছওয়াব করুক বা না করুক, এ আশায় যেন কেউ স্বীয় আমল থেকে উদাসীন না থাকে। (তফসীরে খাযায়েনুল ইরফান, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) অথবা এ হুকুমটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে প্রদত্ত সাহীফা সমূহের ছিল, ইসলামের নয়; এখানে সেটা উদ্ধৃত করা হয়েছে মাত্র। বা উপরোক্ত আয়াতটা এ আয়াত দ্বারা মনসুখ বা রহিত হয়েছে وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْاِيْمَانِ (ঈমানের ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা তাঁদের অনুসরণ করে।) এটাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বক্তব্য। এজন্যে মুসলমানের শিশুরা মা বাপের বদৌলতে বেহেশতে যাবে, এবং আমল ছাড়া পদমর্যাদা লাভ করবে। (তাফসীরে জুমুল ও খাযেন দেখুন) বা এ আয়াত দ্বারা দৈহিক আমল সমূহের ব্যাপারে অন্যের উপর ভারার্পণকে নাকচ করা হয়েছে। এ কারণেই ওই আয়াতদ্বয়ের كسب (সঞ্চয়) ও سعى (প্রচেষ্টা)- এর উল্লেখ আছে কিন্তু ঈসালে ছাওয়াবের উল্লেখ নেই বা এ আয়াতদ্বয়ে ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে এবং ওটা হচ্ছে ফযীলত। মোট কথা, এর অনেক বিশ্লেষণ রয়েছে।

ফাতিহা, কুলখানী, দশভী, চেহলাম ইত্যাদি সেই ঈসালে ছওয়াবের বিভিন্ন আনুসংগিক বিষয়মাত্র। ফাতিহাখানিতে কুরআন তিলওয়াত যা দৈহিক ইবাদত, এবং সদ্কা যা আর্থিক ইবাদত উভয় একত্রিত করে ছওয়াব পৌঁছানো হয়।

প্রথম অধ্যায়

ফাতিহাখানির প্রমাণাদি প্রসংগে

তাফসীর রূহুল বয়ানে সপ্তম পারায় সুরা আন্আমের আয়াত- وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত আছে-

وَعَنْ حُمَيْدِ الْاَعْرَجِ قَالَ مَنْ قَرَءَ الْقُرْاٰنَ وَخَتَمَهُ ثُمَّ دَعَا اَمَّنَ عَلٰى دُعَائِهِ اَرْبَعَةُ اٰلَافِ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَزَالُوْنَ يَدْعُوْنَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ اِلَى الْمَسَاءِ اَوْاِلَى الصَّبَاحِ.

(হযরত আরজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কুরআন খতম করেন, তাঁর মুনাজাতে চার হাজার ফিরিশ্তা আমীন বলেন এবং সন্ধ্যা বা সকাল পর্যন্ত তার জন্য দুআ ও মাগফিরাত কামনা করতে থাকেন।)

এ বক্তব্যটা ইমাম নববীর 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থে তিলওয়াতে কুরআন অধ্যায়েও উল্লেখিত আছে। এতে প্রতীয়মান হলো যে কুরআন খতমের সময় দুআ কবুল হয় এবং ঈসালে ছওয়াবও দুআ বিশেষ। তাই ওই সময় খতমে কুরআন পড়া উত্তম। আশ্আতুল লুমআত গ্রন্থের زيارت القبور অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

"وتصدق کرده شود از میت بعد رفتن او ازعالم تاہفت روز"

মৃত্যুর পর সাত দিন পর্যন্ত সদ্কা করা যাবে। সেই আশ্আতুল লুমআতের একই অধ্যায়ে আরও উল্লেখিত আছে-

"وبعض روایات امده است که روح میت مے آید خانه خودراشب جمعه پس نظرمی کند که تدقکنند ازوے یانه"

জুমআর রাতে মৃত ব্যক্তি আত্মা স্বীয় ঘরে আগমন করে এবং তার প্রতি লোকেরা সদ্কা করে কিনা তা অবলোকন করে।

এর থেকে বোঝা গেল, কতেক জায়গায় মৃত্যুর পর সাত দিন পর্যন্ত নিয়মিত রুটি দান আর সব সময় জুম্আর রাতে ফাতিহাখানি করার যে প্রচলন রয়েছে, এর মূল এটাই। আনোয়ারে সাতেয়ার ১৪৫ পৃষ্ঠায় এবং খজানাতুর রওয়ায়েতের হাশিয়ায় বর্ণিত

আছে যে, হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত আমীর হামযা (রাঃ) এর জন্য তৃতীয়, সপ্তম ও চল্লিশতম দিনে এবং ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সদ্‌কা দিয়েছেন। এটাই কুলখানি, ষান্মাষিক ও বার্ষিক ফাতিহার উৎস।

ইমাম নববী 'কিতাবুল 'আযকার' এর تلاوت القرآن শীর্ষক অধ্যায়ে বলেছেন যে হযরত আনাস ইবনে মালিক কুরআন খতমের সময় নিজ ঘরের সবাইকে একত্রিত করে মুনাজাত করতেন। হযরত হাকিম ইবনে আতবা বলেন, হযরত মুজাহিদ ও তাঁর গোলাম ইবনে আবিলুবাবা একটি জনগোষ্ঠীকে আহবান করলেন এবং বললেন, আপনাদেরকে এজন্য আহবান করা হয়েছে যে, আজ আমরা কুরআন পাক খতম করতে যাচ্ছি এবং খতমে কুরআনের সময় দুআ কবুল হয়। হযরত মুজাহিদ (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত মতে বর্ণিত আছে, বুযুর্গানে দ্বীন কুরআন খতমের সময় জনসমাবেশের ব্যবস্থা করতেন এবং বলতেন, এ সময় রহমত নাযিল হয়। (কিতাবুল আযকার দ্রষ্টব্য) সুতরাং কুলখানি ও চেহলাম উপলক্ষে জমায়েত হওয়া পূর্ববর্তী মনীষীদের সুন্নাত। দুররুল মুখতারে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত শীর্ষক আলোচনার الدفن অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে -

وَفِي الْحَدِيْثِ مَنْ قَرَءَ الْاِخْلَاصَ اَحَدَ عَشَرَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهَا لِلْاَمْوَاتِ اُعْطِيَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ.

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এগারবার সূরা ইখলাস পাঠ করে এর ছওয়াব মৃতদের প্রতি বখ্‌শিশ করে দেয়, এর ছওয়াব সকল মৃতব্যক্তিগণ পাবে। এ জায়গায় ফত্‌ওয়ায়ে শামীতে আছে-

وَيَقْرَءُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاتَيَسَّرَلَهُ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَاَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَاٰيَةِ الْكُرْسِيِّ وَاٰمَنَ الرَّسُوْلُ وَسُوْرَةِ يٰسٓ وَتَبَارَكَ الْمُلْكِ وَسُوْرَةِ التَّكَاثُرِ وَالْاِخْلَاصِ اِثْنَىْ عَشَرَ مَرَّةً اَوْ اِحْدٰى عَشَرَ اَوْ سَبْعًا اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَوْصِلْ ثَوَابَ مَاقَرَأْنَاهُ اِلٰى فُلَانٍ اَوْ اِلَيْهِمْ.

(যতটুকু সম্ভব হয় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবেন। সূরা ফাতিহা সূরা বাকারার প্রথম কয়েক আয়াত, আয়াতুল কুরসী, আমানার রসুল, সূরা ইয়াসিন, তাবারাকাল মূলক, সূরা তাকাছুর ও সুরা ইখলাস বার বা এগারবার অথবা সাত বা তিনবার পাঠ

করবেন। অতঃপর বলবেন- হে আল্লাহ; আমি যা কিছু তিলাওয়াত করলাম, এর ছওয়াব অমুককে বা অমুক লোকদের মাঝে পৌঁছে দিন।)

উপরোক্ত ইবারতে প্রচলিত ফাতিহাখানির পূর্ণ নিয়মটা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের বিভিন্ন অংশ থেকে পাঠ করা; অতঃপর ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে দুআ করা। দুআ করার সময় হাত উঠানো সুন্নাত। তাই হাত উঠাবেন। মোট কথা, প্রচলিত ফাতিহাখানি পূর্ণরূপে প্রমাণিত হলো। ফতওয়ায়ে আযীযিয়ার ৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

طعامیکه ثواب آں نیاز حضرت امامین نمایند براں قل وفاتحه ودرود خواندن متبرك مى شود وخوردن بسيار خوب است.

যে খাদ্যদ্রব্য হযরত হাসান-হুসাইন (রাঃ) এর নামে উৎসর্গ করার নিয়ত করা হয় তাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফাতিহা ও দরূদ শরীফ পড়া মুবারক এবং ওটা খাওয়া খুবই ভাল। একই ফত্‌ওয়ার ৪১ পৃষ্ঠায় আছে-

اگرمالیده وشیر برائے فاتحه بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پخته بخوراند جائز است مضائقه نیست.

(যদি কোন বুযুর্গের ফাতিহার জন্য ঈসালে ছওয়াবের নিয়তে দুগ্ধজাত কোন কিছু তৈরী করে পরিবেশন করা হয়, তা জায়েয এবং এতে কোন ক্ষতি নেই।)

বিরোধিতাকারীদেরও মান্যবর হযরত শাহ ওলীউল্লাহ ছাহেবেরও কুলখানি হয়েছিল। যেমন হযরত আবদুল আযীয ছাহেব স্বীয় মলফুজাতের ৮০ পৃষ্ঠায় এর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন-

روز سوم کثرت ہجوم مردم آں قدر بود که بیروں از حساب است ہشتا دویك كلام الله به شمار آمده وزیاده شده باشد وکلمه را حضر نیست.

(তৃতীয় দিন জনগণের এত সমাগম হয়েছিল, যা গণনার বাইরে ছিল। একাশিবার খতমে কুরআন হিসেব করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এর থেকে আরও বেশী হতে পারে। আর কলেমা তৈয়্যবারতো কোন হিসেব নেই।)

এ থেকে শাহ ছাহেবের কুলখানি হওয়া ও এ উপলক্ষে খতমে কুরআন করাটা

প্রমাণিত হলো। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলবী মুহাম্মদ কাসেম ছাহেব রচিত 'তাহযিরুন নাস' গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন- জুনাইদের কোন এক মুরীদের চেহারা হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি (জুনাইদ বাগদাদী রাঃ) এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মুরীদ বলল, আমি কশফের সাহায্যে আমার মাকে দোযখে দেখতেছি। হযরত জুনাইদ (রাঃ) একলাখ পঞ্চাশ হাজার বার কালেমা পাঠ করেছিলেন এ আশায় যে কতেক রেওয়ায়েতে এ পরিমাণ কলেমা পড়ার ছওয়াবে মাগফিরাত লাভের কথা বর্ণিত আছে। তিনি সাথে সাথে এর ছওয়াব ওর মাকে বখ্‌শিশ করে দেন কিন্তু ওকে কিছু জানাননি। বখশিশ করার সাথে সাথে তিনি সেই জওয়ানটাকে আনন্দ উৎফুল্ল দেখছিলেন। এর কারণ জিজ্ঞোসা করলে সে আরয করল, আমার মাকে বেহেশ্‌তে দেখছি। তিনি এর পরিপ্রেক্ষিতে বললেন, সে জওয়ানটির কশফ-শক্তির অধিকারী হওয়াটাতো হাদীছ থেকে আমার জানা ছিল এবং হাদীছের সত্যতা ওর কশফ থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল। এ ইবারত থেকে বোঝা গেল, একলাখ পঞ্চাশ হাজারবার কলেমা পাঠ করে মৃতব্যক্তির আত্মার প্রতি বখশিশ করে দিলে, এর দ্বারা নাজাত পাবার সম্ভাবনা আছে এবং কুলখানির সময় চনাবুটের মাধ্যমে তা-ই পাঠ করা হয়।

এসব ভাষ্য থেকে ফাতিহা, কুলখানি ইত্যাদির প্রচলিত নিয়ম বৈধ প্রতিভাত হলো। উপরোক্ত ভাষ্য থেকে ফাতিহা শরীফে পাঁচ আয়াত পাঠ করা, অতঃপর ঈসালে ছওয়াবের জন্য হাত তুলে মুনাজাত করা, কুলখানির দিন কুরআন তিলাওয়াত, কলেমা শরীফের খত্‌ম, খাবার তৈরি করে কাংগালী ভোজের ব্যবস্থা করা সবই বোঝা গেল। কেবল খানা সামনে রেখে হাত তুলে মুনাজাত করার প্রসংগটা বাকী রইল। এর নানাবিধ প্রচলন রয়েছে। কাথিয়াওয়ার্ড নামক স্থানে খানা তৈরী করে প্রথমে গরীবদেরকে খাওয়ানো হয়। এরপর ঈসালে ছওয়াব করা হয়। ইউ, পি, পাঞ্জাব ও আরবে খাবার সামনে রেখে প্রথমে ঈসালে ছওয়াব করা হয় এবং পরে খাবার পরিবেশন করা হয়। উভয় রকম প্রচলন বৈধ এবং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মিশ্‌কাত শরীফেও অনেক রেওয়ায়েত মওজুদ আছে যে, হুযূর আলাইহিস সালাম খাবার গ্রহণ করার পর ছাহেবে মেজবানের জন্য দুআ করেছেন বরং নির্দেশ দিয়েছেন, দাওয়াত খাওয়ার পর ছাহেবে মেজবানের জন্য দুআ করুন। এ মিশকাত শরীফের اداب طعام শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে হুযূর আলাইহিস সালাম খাওয়া-দাওয়া শেষে ইরশাদ ফরমাতেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰه حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مُكَفِّيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًا عَنْهُ رَبَّنَا.

(আল্লাহর অনেক পবিত্র মুবারক শুকর, হে খোদা, এতে অফুরন্ত, অসীম ও অতৃপ্ত বরকাত দিন।)

এর থেকে বোঝা গেল, খাওয়ার পর পালনীয় দু'টি সুন্নাত রয়েছে- খোদার প্রশংসা করা ও ছাহেবে মেজবানের জন্য দুআ করা। ফাতিহা শরীফে এ দু'টি বিষয় মওজুদ রয়েছে। আশা করি, বিরোধিতাকারীরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। এখন বলতে হয় খাবার সামনে রেখে দুআ করা প্রসংগে। এ প্রসংগে অনেক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। মিশ্‌কাত শরীফের المعجزات। অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে- হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ফরমান- আমি কিছু খোরমা হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে পেশ করলাম এবং এর বরকতের জন্য দুআ করতে আরয করলাম। فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَالِيْ فِيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ. তখন তিনি (দঃ) এগুলোকে একত্রিত করলেন ও বরকতের জন্য দু'আ করলেন। সেই মিশ্‌কাত শরীফের المعجزات। অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে তবুকের যুদ্ধে ইসলামী সেনা বাহিনীর খাদ্য ঘাটতি দেখা দিল। হুযূর আলাইহিস সালাম সকল সৈনিককে নির্দেশ দিলেন- 'যার কাছে যা আছে, তা নিয়ে এসো।' সবাই কিছু না কিছু আনলেন। দস্তরখানা বিছিয়ে দেওয়া হলো এবং এর উপর এগুলো রাখা হলো-

فَدَعَارَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوْا فِيْ اَوْعِيَتِكُمْ.

অতঃপর হুযূর আলাইহিস সালাম এসবের বরকতের জন্য দুআ করলেন এবং ইরশাদ ফরমালেন আপনারা এখান থেকে নিয়ে নিজ নিজ প্লেটে রাখুন। একই মিশ্‌কাত শরীফের একই অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে- হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত যয়নাব (রাঃ)কে বিবাহ করা উপলক্ষে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ওলিমা হিসেবে যৎসামান্য খাবার তৈরী করলেন। কিন্তু অনেক লোককে দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَرِيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَاشَاءَاللّٰهُ.

হুযূর আলাইহিস সালাম ওই খাবারের উপর হস্ত মুবারক রেখে কিছু পাঠ করলেন।

একই মিশ্‌কাত শরীফের একই অধ্যায়ের আর এক জায়গায় বর্ণিত আছে, হযরত জাবির (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধের দিন যৎসামান্য খাবার তৈরী করে হুযূর আলাইহিস

সালামকে দাওয়াত দিলেন। হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর ঘরে যখন তশরীফ আনলেন তখন তাঁর সামনে ময়দার তৈরি খাবার পেশ করা হলো। তিনি (দঃ) এতে পবিত্র থুথু ফেললেন, এবং বরকতের জন্য দুআ করলেন। এরকম আরো অনেক রেওয়ায়েত পেশ করা যায়। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট বলে মনে করি।

আল্লাহর শুকর, ফাতিহাখানির আনুষংগিক যাবতীয় বিষয় সমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। বিবেকও বলে যে ফাতিহাখানিতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, যেমন আমি ভূমিকায় আরয করেছি, ফাতিহা হচ্ছে দু'টি ইবাদতের- তিলাওয়াতে কুরআন ও সদ্‌কার সমষ্টির নাম। এ দু'টি কাজ যদি পৃথক পৃথকভাবে করলে জায়েয হয়, তাহলে একত্রিতভাবে করলে হারাম হবে কেন? বিরিয়ানী খাওয়াটা কোথাও প্রমাণিত নেই, অথচ তা হালাল। কেননা, বিরিয়ানী হচ্ছে চাউল, মাংস, ঘি ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরী। তাই এর সমস্ত আইটেম যেহেতু হালাল, সেহেতু বিরিয়ানীও হালাল। অবশ্য সুনির্দিষ্ট যেসব ক্ষেত্রে কয়েকটি হালাল বিষয়কে একত্রিত করাটা হারাম বলা হয়েছে, সেটা হারাম। যেমন সহোদর দুবোনকে একসাথে বিবাহ করা বা কয়েকটি হালাল বস্তু একত্রিত করার ফলে কোন হারাম জিনিস সৃষ্টি হলে যেমন মাদকদ্রব্য তা হারাম। তাহলে বোঝা গেল যে উল্লেখিত কারণে হালাল বস্তুর একত্রিতকরণ হারাম হবে। কিন্তু ফাতিহা উপলক্ষে কুরআন তিলাওয়াত ও সদ্‌কার একত্রিতকরণ শরীয়ত কর্তৃক হারাম করা হয়নি। আর এর ফলে কোন হারাম জিনিসও সৃষ্টি হলো না। তবুও কাজটা কেন হারাম হবে?

দেখুন, একটি ছাগল মারা যাচ্ছে, যদি এমনি মারা যায়, তাহলে হারাম আর যদি আল্লাহর নামে যবেহ করে দেয়া হয়, তাহলে হালাল হয়ে গেল। কুরআন করীম মুসলমানদের জন্য রহমত ও শেফা স্বরূপ। যদি এর তিলাওয়াতের কারণে খাবার হারাম হয়ে যায়, তাহলে কুরআন রহমত হলো কিভাবে? এটাতো অভিশাপ (নাউযুবিল্লাহ)। তবে হ্যাঁ এটা মোমিনদের জন্য রহমত আর কাফিরদের জন্য অভিশাপ। وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا। এর থেকে জালিমগণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তিলাওয়াত করার কারণে ওরা খাবার থেকে বঞ্চিত হলো।

যেটার জন্য দুআ করা হয়, ওটা সামনে রেখেই করা চাই। মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে জানাযার নামায আদায় করা হয়। কেননা, এর জন্যই দুআ করা হয়। অনুরূপ খাবার সামনে রেখে দুআ করলে, এতে কি ক্ষতি রয়েছে? কবর যিয়ারতের সময়ও কবরকে সামনে রেখে দুআ করা হয়। হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় উম্মতের পক্ষে কুরবানী দিয়ে যবেহকৃত জানোয়ারকে সামনে রেখে বলতেন-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ (হে আল্লাহ, এটা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া হলো।) হযরত খলিলুল্লাহ (আঃ) কাবা ঘরকে সামনে রেখে দুআ (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا الاية) করেছিলেন। এখনও আকীকার পশুকে সামনে রেখে দুআ পাঠ করা হয়। সুতরাং ফাতিহাখানিতে খাবার সামনে রেখে যদি ঈসালে ছওয়ার করা হয়, তাতে ক্ষতি কি?

বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাবার শুরু করা হয় এবং বিস্‌মিল্লাহ্ হচ্ছে কুরআন শরীফের আয়াত। যদি খাবার সাম্‌নে রেখে কুরআন শরীফ পাঠ করা নিষেধ হয়, তাহলে বিস্‌মিল্লা পড়াটাও নিষেধ হওয়া চাই।

বিরোধিতাকারী যাকে মুরুব্বী বলে স্বীকার করেন, তিনিও প্রচলিত ফাতিহাকে জায়েয মনে করেন। যেমন শাহ ওলীউল্লাহ ছাহেব الانتباه فی سلاسل اولياء الله নামক স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

پس ده مرتبه درود خوانند ختم تمام كنند وبر قدرے شیرنی فاتحه بنام خواجگان چشت عموما بخوانند وحاجت از خدا سوال نمایند.

অতঃপর দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করবেন এবং সম্পূর্ণ কুরআন খত্‌ম করবেন। তারপর কিছু শির্‌নীতে সমস্ত আওলিয়া কিরামের নামে ফাতিহা দিবেন ও খোদার কাছে দুআ করন। শাহ ওলীউল্লাহ ছাহেব زبدة النصائح নামক কিতাবের ১৩২পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন-

وشيربربخ بنابر فاتحه بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشاں پزند وبخورند مضائقه نیست واگر فاتحه بنام بزرگے داده شود اغنیارا هم خوردن جائز است.

ঈসালে ছওয়াবের নিয়তে দুধ ও চাউলের উপর কোন নেককার বান্দার নামে ফাতিহা দিলে, তা, রান্না করতে পারেন ও খেতে পারেন এবং যদি কোন বুযুর্গের নামে ফাতিহা দেয়া হয়, তা স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরও খাওয়া জায়েয। মৌলবী আশরাফ আলী ও রশীদ আহমদ ছাহেবের মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব, ফয়সালায়ে হাপ্ত মাসায়েলা' নামক পুস্তিকায় লিখেছেন-

"মৃত ব্যক্তিদের রূহের প্রতি ঈসালে ছওয়াবের বেলায় কারো আপত্তি নেই, তবে যদি এক্ষেত্রে বিশেষ কোন সময় বা কাল নির্ধারণ করাটা ছওয়াব মনে করা হয় বা ওয়াজিব অথবা ফরয করা হয়, তাহলে নিষেধ। কিন্তু যদি এ ধরনের কোন ধারণা না থাকে, কেবল বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে অনুরূপ করা হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। যেমন কোন যুক্তি সংগত কারণে নামাযে বিশেষ বিশেষ সূরা নির্ধারণ করাকে অভিজ্ঞ ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ জায়েয বলেছেন। তাহাজ্জুদ নামাযের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মাশায়েখ এ নীতিরই অনুসারী।" তিনি আরও বলেন, নামাযের জন্য মনে মনে নিয়ত করাটা যথেষ্ট; কিন্তু মুখ ও অন্তরের সামঞ্জস্যতার জন্য সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে মুখে বলাটা উত্তম। এক্ষেত্রেও যদি মুখে বলেন, হে আল্লাহ, এর ছওয়াব অমুককে পৌঁছে দিন, তাতে কল্যাণ রয়েছে। এরপর কারো এ ধারণা হলো যে (ফাতিহার জন্য তৈরী) খাবারটা সামনে রাখলে মনের আবেগটা বৃদ্ধি পাবে, তাই খাবারটা সামনে রাখলেন। আবার কেউ মনে করলেন যে এটা এক প্রকার দুআ বিশেষ। তাই এর সাথে যদি কিছু কালামে পাক পড়া হয়, তাহলে দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী এবং সাথে সাথে কালামে পাক পড়ার ছওয়াবও পৌঁছবে। এতে দু'টি ইবাদতের সংমিশ্রণ হলো। তিনি আরও বলেন, গাউছে পাকের গিয়ারভী শরীফ, দশভী, বিশভী, চেহলাম, ষান্মাসিক, বাৎসরিক ফাতিহা ইত্যাদি এবং শেখ আবদুল হক (রহঃ) এর তোশা (সদ্কা বিশেষ) হযরত শাহ্ বু-আলী কালান্দরের বাৎসরিক ফাতিহা, শবে বরাতের হালুয়া রুটি এবং ঈসালে ছওয়াবের অন্যান্য পদ্ধতি উপরোক্ত নিয়মনীতির ভিত্তিতে প্রচলিত আছে।"

পীর ছাহেবের এ বক্তব্যে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। আলহামদুল্লিাহ! আকলী ও নকলী দলীলসমূহ এবং বিরোধিতাকারীদের উক্তিসমূহ থেকে ফাতিহার মাসআলাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে হক কবুল করার শক্তি দান করুন। আমীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফাতিহা সম্পর্কে আপত্তি এবং এর জবাবসমূহ

ফাতিহা সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের নিম্নলিখিত আপত্তিসমূহ উল্লেখযোগ্য।

১নং আপত্তিঃ ফকীহগণের অনেকেই মৃতব্যক্তির নামে তৃতীয় ও সপ্তম দিন খাবার তৈরী করা নিষেধ বলেছেন (ফত্ওয়ায়ে শামী ও আলমগীরী দেখুন) বরং আল্লামা বাযাযিয়া (রাঃ) লিখেছেন وَبَعْدُ الْاَسْبُوْعِ সাতদিনের পরেও খাবার তৈরী করা নিষেধ। এতে বাৎসরিক, ষান্মাসিক, চেহলাম সবই এসে যায়। অধিকন্তু কাজী ছানাউল্লাহ ছাহেব পানিপথী ওসীয়ত করেছিলেন-

که بعد مردن من رسوم دنیاوی وہم وبستم وچہلم وششماہی وبرسینی. ہیچ نه کنند که رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاده از سه روز ماتم کردن جائز نه داشته.

মৃত্যুর পর দুনিয়াবী রেওয়াজ অনুযায়ী দশভী, বিশভী, চেহলাম, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক বেহুদা কাজ করো না, কেননা রসূলুল্লাহ (দঃ) তিনদিনের অধিক শোক প্রকাশ করাটা নাজায়েয মনে করেছেন। অধিকন্তু হুযূর আলাইহিস সালাম ফরমান, মৃতব্যক্তির নামে উৎসর্গীকৃত খাবার গ্রহণে মনের মৃত্যু ঘটে ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তরঃ ফকীহ্গণ মৃতব্যক্তির জন্য ঈসালে ছওয়াব করার ব্যাপারে নিষেধ করেননি বরং করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- প্রথম অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে ফকীহগণ যেটা নিষেধ করে সেটা অন্য জিনিস। সেটা হচ্ছে মৃতব্যক্তির ওসীলায় আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক খাবার আদায় করা অর্থাৎ সামাজিক সমালোচনা থেকে বাচাঁর জন্য মৃতব্যক্তির কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদিতে আত্মীয়-স্বজনকে যে দাওয়াত দেয়া হয়, সেটা নাজায়েয। কেননা এটা হচ্ছে মান সম্মান রক্ষার জন্য। অথচ এখানে সেটার প্রশ্নই আসতে পারে না। গরীবদেরকে যদি ঈসালে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ফাতিহা দিয়ে খাবার পরিবেশন করা হয়, তা সকলের মতে জায়েয। ফাত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ড কিতাবুল জানায়েযের الدفن শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَيُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ اَهْلِ الْمَيِّتِ لِاَنَّهُ شُرِعَ فِى السُّرُوْرِ لَافِى الشُّرُوْرِ.

অর্থাৎ মৃতব্যক্তির ওয়ারিস থেকে দাওয়াত নেয়া মাকরূহ। কেননা এটা খুশীর সময় করা হয়, শোকের সময় নয়। এখানে দাওয়াত নেয়া বলতে দাওয়াত দিতে বাধ্য করাকে বোঝানো হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ে আরও উল্লেখিত আছে-

وَهٰذِهِ الْاَفْعَالُ كُلُّهَا لِلسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ فَيُحْتَرَزُ عَنْهَا لِاَنَّهُمْ لَايُرِيْدُوْنَ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ.

(এ সমস্ত কাজ কেবল দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং এসব থেকে দূরে থাকুন। কেননা এর দ্বারা আল্লাহর রেযামন্দি কামনা করা হয় না।) পরিষ্কার বোঝা গেল, গর্ববোধ করে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া নিষেধ। আরও উল্লেখিত আছে-

وَاِنِ اتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا. (মৃতব্যক্তির ওয়ারিস যদি গরীবদের জন্য খাবার তৈরী করে, তাহলে খুবই ভাল) এতে ফাতিহার বৈধতা প্রমাণিত হলো।

কাজী ছনাউল্লাহ ছাহেব পানিপথী কর্তৃক স্বীয় কুলখানি ও দশভী না করার জন্য বলাটা একেবারে যুক্তি সংগত। তিনি বলেছেন পার্থিব প্রথা অনুযায়ী যে ধরনের কুলখানি ইত্যাদি করা হয়, তা কর না। এখন প্রশ্ন হলো, পার্থিব প্রথাটা কি? এটা হচ্ছে, কুলখানি ইত্যাদিতে মহিলারা জামায়েত হয়ে কান্নাকাটি বা বিলাপ করা, যা বাস্তবিকই হারাম। এ জন্যেই তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করাকে নাজায়েয বলা হয়েছে।

কিন্তু এখানেতো ঈসালে ছওয়াব ও ফাতিহার কোন উল্লেখ নেই। উপরোক্ত বক্তব্যের ভাবার্থ হলো- কুলখানি ইত্যাদিতে যেন মাতম করা না হয়। আর মৃতব্যক্তির নামে প্রদত্ত খাবার গ্রহণে মন মরে যাওয়ার যে কথা বলেছেন, সে ধরনের হাদীছ আমি কোথাও দেখিনি। যদি এটা হাদীছ হয়ে থাকে, তাহলে ওসব হাদীছের,যেগুলোতে মৃতব্যক্তির পক্ষে দান-খায়রাত করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে, কি ভাবার্থ হতে পারে? আপনারাওতো বলেন, দিন তারিখ ঠিক না করে মৃতব্যক্তির নামে দান খয়রাত জায়েয। এ দান খয়রাত কে খাবে? মানুষ খেলেতো মন মরে যাবে। তাহলে কি ফিরিশ্‌তারা খাবে?

একটি মাসআলা- মৃতব্যক্তির নামে প্রদত্ত খাবার কেবল গরীবদেরকে খাওয়ানো চাই। আলা হযরত (কুঃসিঃ) এ প্রসংগে- جلى الصوت الهنى الدعوت عن الموت নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মতে, আলা হযরত কোন মৃতব্যক্তির পরিবার পরিজনের কাছে শোক প্রকাশ করতে গেলে, তথায়

পান তামাক ইত্যাদিও গ্রহণ করতেন না। তাঁর স্বীয় ওসীয়ত নামায় উল্লেখিত আছে 'আমার নামে প্রদত্ত ফাতিহার খাবার যেন গরীবদেরকে খাওয়ানো হয়।' যদি মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ফাতিহা দিতে হয়, তাহলে এটা খেয়াল রাখতে হবে, যেন অনুপস্থিত ওয়ারিস ও নাবালেগের অংশ থেকে ফাতিহা দেয়া না হয়। অর্থাৎ প্রথমে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। অতঃএব কোন বালেগ ওয়ারিসের অংশ থেকে এসব কাজ সমাধা করা হবে। তা যদি না হয়, এ খাবার কারো জন্য জায়েয হবে না। কেননা মালিকের বিনা অনুমতিতে ও নাবালেগের জিনিস খাওয়া জায়েয নেই। এ মাসআলাটা যেন অবশ্যই স্মরণ থাকে।

২নং আপত্তিঃ ফাতিহার জন্য তারিখ নির্ধারণ করা নাজায়েয। এগারভী তারিখ বা তেসেরা, দশভী বিশভী চল্লিশা, বাৎসরিক ইত্যাদি দিন তারিখ নির্ধারণ অনর্থক মাত্র। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান- وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (মুসলমানগণ বেহুদা কাজ থেকে যেন বিরত থাকেন) যত তাড়াতাড়ি পারেন ঈছালে ছওয়াব করুন, তৃতীয় দিনের অপেক্ষায় থাকবেনা। আর কুলখানির জন্য ভুনা চনা নির্ধারণ করা একেবারে ফালতু কাজ। এজন্য কুলখানি ইত্যাদি করা নিষেধ।

উত্তরঃ দিন তারিখ নির্ধারণ করার উত্তর আমি 'মীলাদে কিয়াম' শীর্ষক আলোচনায় দিয়েছি। কোন বৈধ কাজের জন্য দিন-তারিখ নির্ধারণ করা এজন্যই হয়ে থাকে যে নির্ধারিত দিনে সবাই একত্রিত হবেন এবং সবাই মিলে এ কাজ সমাধা করবেন। যদি কোন একটা সময় নির্ধারণ করা না হয়, তাহলে সুচারুভাবে সে কাজের আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। এ জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) স্বীয় ওয়াজের জন্য প্রতি বৃহস্পতিবারকে নির্ধারণ করেছিলেন। শ্রোতাগণ আরয করেছিলেন প্রতিদিন ওয়াজ করার জন্য। এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আপনাদেরকে কষ্ট দেয়া আমার পছন্দ নয়, (মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল ইলম দেখুন) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ প্রসংগে বুখারী শরীফে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় খাড়া করেছেন। এটা কেবল সুবিধার জন্য করা হয়। আজ ও মাদ্রাসা সমূহের পরীক্ষা, বার্ষিক সভা ও ছুটির মাস ও তারিখ নির্দিষ্ট থাকে, প্রতি বছর জনগণ নির্দিষ্ট তারিখে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে জমায়েত হয়। ওসবের বেলায়ও একই উদ্দেশ্যে তা করা হয়। তবে এখন প্রশ্ন হলো এসব তারিখই বা কেন নির্ধারণ করা হলো? তাহলে শুনুন, গিয়ারবী অর্থাৎ ১১ তারিখ নির্ধরণ করার কারণ হচ্ছে, তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিটি অফিস আদালতে চাঁদের দশ তারিখ বেতন দেয়া হতো এবং কর্মচারীদের এটাই বাসনা থাকতো যে তাদের বেতনের প্রথম পয়সা যেন হুযূরে গাউছে পাকের ফাতিহাতে ব্যয় হয়। তাই তারা যখন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ঘরে

ফিরতেন, সাথে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে আসতেন এবং মাগরিবের পরে অর্থাৎ ১১ তারিখের রাতে ফাতিহা দিতেন। এ প্রচলনটা মুসলমানদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে এ ফাতিহা গিয়ারভী শরীফ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এখন যে কোন তারিখেই হুযূর গাউছে পাকের ফাতিহা শরীফ করা হবে বা তার নামে সদ্কা করা হবে, গিয়ারভীই বলা হয়। ইউ.পি. ও কাথিয়াওয়ার্ড নামক স্থানে সারা রবিউছ ছানি মাসে হুযূর গাউছে পাকের ফাতিহা হয়, কিন্তু বলা হয় 'গিয়ারভী শরীফ'। অধিকন্তু বুযুর্গানে কিরামের সংগে বড় বড় ঘটনাবলী ১০ তারিখেই সংঘটিত হয়েছে এবং যার পরে আগমন ঘটেছে এগার তারিখের এই শুভরাত। হযরত আদম (আঃ) এর পৃথিবীর পদার্পণ এবং তার তওবা কবুল হওয়া, হযরত নূহ (আঃ) এর জাহাজ কূলে আসা, হযরত ইসমাইল (আঃ) জাবেহ থেকে মুক্তি পাওয়া, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে বের হয়ে আসা, হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বীয় সন্তানের সাক্ষাত লাভ, হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন থেকে মুক্তি লাভ, হযরত আয়ুব (আঃ) এর আরোগ্যলাভ, ইমাম হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত বরণ ও শহীদদের সরদারের মর্যাদা অর্জন সবই দশ তারিখেই সংঘঠিত হয়েছে। এরপর প্রথম যে রাতটি আসে, সেটা এগার তারিখের রাতই। সুতরাং এ রাতটি খুবই বরকতময়। এ কারণে গিয়ারভী শরীফের ফাতিহা প্রায় সময় এগার তারিখের রাতেই হয়ে থাকে। কেননা বরকতময় রাত সমূহে সদ্কা খয়রাত ইত্যাদি করাটা বাঞ্ছনীয়।

এ কথাটা বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত বরং এ ব্যাপারে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা রয়েছে যে যদি প্রতি চাঁদের এগার তারিখ কিছু নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পয়সা খরচ করে নিয়মিতভাবে ফাতিহাখানি করা হয়, তাতে যথেষ্ট বরকত রয়েছে। খোদার শুকরিয়া যে আমি এ কাজটা একান্ত নিয়মিতভাবে পালন করি এবং এতে অনেক বরকতও লাভ করি। یازده مجلس নামক কিতাবে লিখা আছে হুযূর গাউছে পাক (রাঃ) হুযূর আলাইহিস সালামের বারভী অর্থাৎ বার তারিখের মীলাদ শরীফ একান্ত নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপন করতেন। একবার স্বপ্নে হুযূর (দঃ) বললেন, হে আবদুল কাদির, তুমি আমাকে বারভীতে (বার তারিখের মীলাদ) স্মরণ করেছ; আমি তোমাকে গিয়ারভী দান করলাম অর্থাৎ জনগণ তোমাকে গিয়ারভীতে (১১ তারিখের ফাতিহা) স্মরণ করবে। এ জন্যে রবিউল আউয়াল মাসে সাধারণতঃ মীলাদে মুস্তাফা (দঃ) অনুষ্ঠিত হয় এবং রবিউছ ছানিতে হুযূর গাউছে পাকের গিয়ারভী শরীফ উদ্‌যাপন করা হয়। যেহেতু এটা হুযূর আলাইহিস সালামের আবদান, সেহেতু এটা সারা দুনিয়ায় প্রসার লাভ করেছে। বিরোধীরা এটাকে শিরক ও বিদ্‌আত বলে বিলোপ সাধনের চেষ্টা করেছে, কিন্তু দিন দিন এর অগ্রগতি হচ্ছে।

www.AmarIslam.com

تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے

جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا

(অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যদি তোমাকে উন্নতি দান করে কেউ শত চেষ্টা করেও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।)

কুলখানির জন্য তৃতীয় দিন নির্ধারণ করার পেছনেও যুক্তি রয়েছে। প্রথম দিন লোকজন মৃতব্যক্তির কাফন দাফনে ব্যস্ত থাকে, দ্বিতীয় দিন বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তৃতীয় দিন সবাই একত্রিত হয়ে ফাতিহাখানি, কুলখানি ইত্যাদি পাঠ করে। এ তৃতীয় দিন হচ্ছে, শোক প্রকাশের শেষ দিন। এরপর শোক প্রকাশ করা নিষেধ। ফত্ওয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল জানায়েযে الدفن। অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَوَقْتُهَا مِنْ حِيْنَ يَمُوْتُ اِلَى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَيُكْرَهُ بَعْدَهَا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْمُعَزِّىْ اَوِ الْمُعَزّٰى اِلَيْهِ غَائِبًا.

শোক প্রকাশের সময় হচ্ছে মৃত্যুর পর তিন দিন পর্যন্ত। এরপর শোক প্রকাশ করা মাকরূহ। কিন্তু সমবেদনা জ্ঞাপনকারী বা গ্রহণকারী অনুপস্থিত হলে, মাকরূহ নয়।

তৃতীয় দিন পর্যন্ত লোক শোক প্রকাশের জন্য আসতে থাকে। এর পর যেহেতু আর আসবে না, তাই তৃতীয় দিন ঈসালে ছওয়াব করেই বিদায় নেবে। আর দূরের আত্মীয়-স্বজনও ফাতিহায় অংশ গ্রহণ করে এবং তিন দিনের মধ্যে মুসাফিরও ঘরে পৌঁছতে পারে। চেহলাম, বার্ষিকী ইত্যাদি উদ্‌যাপন করার কারণ হচ্ছে, মুসলমানদের অভিপ্রায় হলো সারা বছর মৃতব্যক্তির কাছে ধারাবাহিকভাবে ছওয়াব পৌঁছতে থাকুক। কেননা মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম মৃতব্যক্তির বিদেহী আত্মা স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের স্মরণে ব্যাকুল থাকে। অতঃপর ক্রমান্বয়ে এদিক থেকে মন উঠে যায়। মেয়েকে বিবাহ দেওয়ার পর শ্বশুর বাড়ীতে পাঠানো হয়। প্রথম প্রথম আসা-যাওয়া এবং উপহার সামগ্রী প্রেরণটা ঠিকমত চালু থাকে। অতঃপর যতই সময় যেতে থাকে, এগুলোও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কেননা প্রথম দিকে ওখানে মন বসে না। এর উৎস হাদীছ শরীফ থেকেও পাওয়া যায়। দাফন করার পর কিছুক্ষণ কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ঈসালে ছওয়াব করা ও তলকীনের মাধ্যমে মৃতব্যক্তির সাহায্য করা বাঞ্ছনীয়। হযরত উমর ইব্‌নে আস (রাঃ) ওসীয়ত করেছিলেন- দাফনের পরে কিছুক্ষণ যেন আপনারা আমার কবরের পার্শ্বে থাকেন, যাতে আপনাদের কারণে আমার মন টিকে যায় এবং মনকীর-নকীরের প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতে পারি। যেমন- মিশ্কাত শরীফে الدفن। অধ্যায়ে তাঁর এ আবেদনটি উদ্ধৃত করা হয়েছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ثُمَّ اُقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ حَتّٰى اَسْتَانِسَ بِكُمْ اُجِيْبُ مَاذَا اُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّىْ.

এজন্যই তাড়াহুড়া করে ঈসালে ছওয়াব করা হয়। শাহ আবদুল আজীজ ছাহেব তাফসীরে আযীয়ীর আমপারার وَالْقَمَرُ اِذَا تَشَقَّ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

اول حالتے كه بمجرد جدا شدن روح ازبدن خواهد شد فى الجمله اثر حيات سابقه والفت تعلق بدن وديگر معروفان از انباء جنس خود باقى است وآں وقت گويا برزخ است كه چيزے ازاں طرف وچيزے ازيں طرف معدد زندگاں بمردن دريں حالت زودترمى رسد ومرد گاں منتظر لحوق مدد ازيں طرف مى باشد صدقات وادعيه وفاته ودريں وقت بسيار بكار آدمى آيد وازيں است كه طوائف بنى آدم تايك سال وعلى الخصوص يك چله بعد موت دريں نوع امداد گوشش تمام مى نمايند.

(মৃতব্যক্তির প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ শরীর থেকে রূহ বের হওয়ার সময় রূহের মধ্যে পূর্ববর্তী জীবনের কিছুটা প্রভাব এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কের কিছুটা রেশ বাকী থাকে। এ সময় রূহটা কিছুটা এদিকে কিছুটা ঐদিকে অর্থাৎ দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজ করে। এসময় জীবিতদের সাহায্য মৃতদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে এবং মৃতব্যক্তিও সাহায্যের অপেক্ষায় থাকে। ওই সময় সদ্কা, দুআ, ফাতিহা মৃতব্যক্তির খুবই কাজে আসে। এ কারণে সবাই এক বছর পর্যন্ত বিশেষ করে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত এধরনের সাহায্য পৌঁছানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেন।) একই অবস্থা জীবিতদেরও হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম খুবই শোকাতুর অবস্থায় থাকে। অতঃপর সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানসিক বিষণ্ণতা কমতে থাকে। তাই সারা বছর ব্যাপী সদ্কা পৌঁছানোর অভিপ্রায়ে বছরের প্রতি ভগ্নাংশ সদ্কা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন বছরান্তে বার্ষিকী, এর অর্ধাংশে ষান্মাসিক, এর অর্ধাংশে ত্রৈমাসিক ফাতিহা এবং এর অর্ধাংশে অর্থাৎ পয়ঁতাল্লিশ দিনের ফাতিহা হওয়াটা যথার্থ ছিল। কিন্তু যেহেতু চল্লিশ সংখ্যাটি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক উন্নতির প্রতীক, সেহেতু চল্লিশতম দিনের ফাতিহা অর্থাৎ চেহলাম করার কথা বিবেচিত হয়েছে। অতঃপর এর অর্ধাংশে বিশতম দিনের ফাতিহা এবং এর অর্ধাংশে দশম দিনের ফাতিহা করার কথা বলা হয়েছে।

'চল্লিশ', সংখ্যার কি বৈশিষ্ট্য, তা এখন শুনুন। হযরত আদম (আঃ) এর খামির চল্লিশ বছর পর্যন্ত একই অবস্থায় ছিল। অতঃপর চল্লিশ বছরে এটা শুকিয়ে ছিল। মায়ের পেটে শিশু প্রথম চল্লিশ দিন বীর্য; অতঃপর চল্লিশ দিন জমাট বাঁধা রক্ত, এরপর চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড হিসেবে থাকে। (মিশ্কাত শরীফের الايمان بالقدر অধ্যায়ে দেখুন) জন্ম হওয়ার পর চল্লিশ দিন যাবৎ মায়ের নিফাস (রক্তক্ষরণ) থাকে। চল্লিশ বছর বয়সে জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়। এ জন্য অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কিরামকে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত প্রদান করা হয়েছে। সুফিয়ানে কিরাম ওজীফা সমূহের ক্ষেত্রে চিল্লা অর্থাৎ চল্লিশ দিনের সাধনা করে থাকেন, এতে তাঁদের রূহানী উন্নতি হয়। হযরত মুসা (আঃ)কেও নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, 'তুর পর্বতে গিয়ে চল্লিশ দিন ইতিকাফ করুন।' অতঃপর তাওরাত কিতাব প্রদান করা হয়েছিল। وَاِذْوَاعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (যখন মুসা (আঃ) চল্লিশ রাত অবস্থান করে ওয়াদা পূর্ণ করলেন) 'আনওয়ারে সাতেয়া' কিতাবে চেহলাম শীর্ষক আলোচনায় বায়হাকী শরীফের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

اَنَّ الاَنْبِيَاءَ لايَتْرَكُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَلٰكِنْ هُمْ يَصَلُّوْنَ بَيْنَ يَدِىِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَخُ فِى الصُّوْرِ.

ইমাম যুরকানী (রাঃ) শরহে মুয়াহেব গ্রন্থে এ হাদীছের অর্থ এভাবে করেছেন- আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহ মুবারকের সম্পর্ক তাদের কবরস্থ শরীরের সাথে চল্লিশ দিন পর্যন্ত খুবই বেশী থাকে। এরপর ওসব রূহ আল্লাহর সান্নিধ্যে ইবাদতে নিয়োজিত হয় এবং শরীরী আকার ধারণ করে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণ্যে এ বিশ্বাস রয়েছে যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঘরের সাথে মৃতব্যক্তির আত্মার সম্পর্ক থাকে। এ ধারণার পিছনে সম্ভবতঃ কোন ভিত্তি রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, চল্লিশ দিন পর রদবদল ও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং চল্লিশ দিনের দিন ফাতিহা করা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

কুলখানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রচলন রয়েছে। কাথিয়াওয়ার্ড নামক স্থানে প্রায় সময় তৃতীয় দিন কেবল কুরআনখানিই হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে সাধারণতঃ তৃতীয় দিন দুধ ও কিছু ফল ফাতিহা দেয়া হয়। ইউ, পি,তে তৃতীয় দিন কুরআনখানিও হয় এবং ভুনা চনায় কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করে ঈসালে ছওয়াবও করা হয়। আমি প্রথম অধ্যায়ে মৌলবী কাসেম ছাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি যে মৃতব্যক্তিকে এক লাখ পাঁচ হাজার বার কলেমা শরীফ পড়ে বখশিশ করলে, এতে সেব্যক্তির মাগফিরাত হয়। এ প্রসংগে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। তাই একলাখ কলেমা তৈয়্যবা পড়ানোর জন্য সাড়ে বার সের চনা বুট নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা হিসাব করে দেখা গেছে যে, এ পরিমাণে একলাখ হয়ে যায়। এটা কেবল গণনার সুবিধার্থে করা হয়েছে। এ পরিমাণ

তাসবীহ বা ফলের আটি বা পাথরের টুকরা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই এ ব্যাপারে চনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এতে কলেমা গণনার কাজও হলো এবং পরে সদ্‌কাও করা গেল। আর ভূনা চনা এ জন্যেই বাছাই করা হলো যে কাঁচা চনা হলে ফেলে দেবে বা গাধা-ঘোড়ার খাদ্যে পরিণত হবে। এতে কলেমার অবমাননা হবে। কিন্তু ভূনা চনাবুট কেবল (লোকের) খাবার হিসেবেই ব্যবহৃত হবে।

৩নং আপত্তিঃ ফাতিহা ইত্যাদি হিন্দুদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। তারাও মৃতদের ত্রয়োদশী কর্ম পালন করে। হাদীছ শরীফে আছে مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ যিনি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখেন তিনি সে সম্প্রদায়ের বলে গণ্য হয়। সুতরাং এ ধরনের ফাতিহা করা নিষেধ।

উত্তরঃ কাফিরদের সাথে সব রকমের সাদৃশ্য নিষেধ নয়, কেবল দুষণীয় বিষয়ে সাদৃশ্য নিষেধ। আবার সেই সাদৃশ্যটা এ রকম হওয়া চাই, যা কাফিরদের ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক চিহ্নে পরিণত হয়েছে এবং যেটা দেখে লোকেরা তাকে কাফির সম্প্রদায়ের লোক মনে করবে। যেমন- ধুতি, টিকি, পৈতা, হ্যাট ইত্যাদি। তা নাহলে আমরা যেমন মক্কা শরীফ থেকে যমযম কূপের পানি আনয়ন করি, হিন্দুরাও তেমনি গংগা থেকে গংগাজল আনয়ন করে। আমরা যেমন মুখ দিয়ে খাই, পায়ের সাহায্যে চলি, কাফিরেরাও তদ্রূপ করে। হুযূর আলাইহিস সালাম আশুরার রোযা রাখার হুকুম দিয়েছিলেন। অথচ তাতে ইহুদীদের সাথে সদৃশ্য ছিল তাই পুনরায় বললেন, ঠিক আছে, আমরা দু'রোযা রাখবো। এভাবে কিছু পার্থক্য করে দিয়েছেন, কিন্তু বন্ধ করে দেননি। অনুরূপ আমাদের ফাতিহায় কলেমা, কুরআন পাঠ করা হয়; মুশরিকদের সেখানেতো এগুলো পাঠ করা হয় না। তাহলে সাদৃশ্য কোথায় রইলো? এর বিস্তারিত বিবরণ ফত্ওয়ায়ে শামীর مكروهات الصلوة শীর্ষক অধ্যায়ে দেখুন। অবশ্য যে কাজটা কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, সেটা নিষেধ। ফাতিহার পূর্ণ বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ কিতাব আনোয়ারে সাতেয়ায় দেখুন।

৪নং আপত্তিঃ যদি ফাতিহায় শারীরিক আর্থিক উভয় ইবাদত পাওয়া যায়, তাহলে কোন নাপাক জিনিস দান করার সময় ফাতিহা পড়ে নিন। যেমন- গোবর ইত্যাদিতে ফাতিহা পাঠ করে কাউকে দিয়ে দিন। যখন মেথর ঘরের পায়খানা পরিষ্কার করে মল-মূত্র নিয়ে যায়, তখন ফাতিহা দেওয়ার পরই একে ঘর থেকে বের হতে দিবেন। (দেওবন্দী তাহজীব)

উত্তরঃ নাপাক জিনিসের উপর ও নাপাক জায়গায় তিলাওয়াত কুরআন হারাম। সুতরাং ওসবের দান দক্ষিণার সময় তিলাওয়াত করা যায় না। ঢেকুর আসলে আল হামদু লিল্লাহ' বলা হয়। কিন্তু বায়ু ছাড়লে তা বলা হয় না। কেননা এটা নাপাক ও ওযু ভংগকারী। অনুরূপ হাঁচি আসলে আল-হামদু লিল্লাহ বলা হয় কিন্তু নাক দিয়ে রক্ত বের হলে তা বলা হয় না।

জানাযার নামাযের পর দুআ প্রসঙ্গে আলোচনা

এ আলোচনাটা দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এ দুআর প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও এর জবাবসমূহ দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

জানাযার নামাযের পর দুআ করার প্রমাণ

মুসলমান মারা যাবার পর তিন অবস্থায় থাকে। (১) জানাযার নামাযের আগে, (২) জানাযার নামাযের পর ও দাফনের আগে এবং (৩) দাফনের পর। এ তিন অবস্থায় মৃতব্যক্তির জন্য দুআ ও ঈসালে ছওয়াব করা জায়েয এবং উত্তম। অবশ্য মৃতব্যক্তির গোসলের আগে এর পার্শ্বে বসে কেউ যদি কুরআন পড়তে চান, তাহলে লাশকে ঢেকে রাখবেন, কেননা তখন তা নাপাক। গোসলের পর যে কোন অবস্থায় কুরআন ইত্যাদি পড়তে পারেন। বিরোধিতাকারিরা নামাযের আগে ও দাফনের পরে দুআ ইত্যাদি করা জায়েয মনে করে। কিন্তু নামাযের পর ও দাফনের আগে দুআ করাকে নাজায়েয, হারাম, বিদ্‌আত, শিরক আরও কত কিছুইনা বলে। এ অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দুআ করার সমর্থনে প্রমাণ দেয়া হয়েছে। মিশ্‌কাত শরীফের صلوة الجنازة অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ .

(যখন তোমরা মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ে ফেল, তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে) এখানে فَ (ফা) এর দ্বারা বোঝা যায় যে নামাযের পর যেন অনতিবিলম্বে দুআ করা হয়। যারা উপরোক্ত বাক্যের এ অর্থ করে- 'নামাযের মধ্যে এর জন্য দুআ কর, তারা فَ (ফা) এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী صَلَّيْتُمْ হচ্ছে শর্ত এবং فَاخْلِصُوا এর জযা। শর্ত ও জযার মধ্যে প্রভেদ থাকা প্রয়োজন; একটা অন্যটার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর صَلَّيْتُمْ হলো অতীত কাল জ্ঞাপক ক্রিয়া এবং فَاخْلِصُوا হলো নির্দেশাত্মক ক্রিয়া। তাই বোঝা গেল, নামায পড়ার পরই দুআর নির্দেশ রয়েছে। যেমন فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا যখন খাওয়া শেষ হবে, তখন ছড়িয়ে পড়।) এতে খাওয়ার পর যেতে বলা হয়েছে, খাওয়ার মাঝখানে-নয়। এবং إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর।) এতে নামাযের জন্য তৈরী হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। নামাযের কিয়ামের কথা বলা হয়নি, যা إِلَى অব্যয় দ্বারা প্রতীয়মান হলো। আর এখানে নামায পড়ার ইচ্ছা পোষণ করার পরই ওযুর কথা বলা হয়েছে। তাই فَ (ফা) দ্বারা বিলম্ব অর্থই প্রকাশ পায়। বিনা কারণে আসল অর্থ বাদ দিয়ে

www.AmarIslam.com

রূপক অর্থ গ্রহণ করা না জায়েয। মিশ্‌কাত শরীফের একই জায়গায় আরও উল্লেখিত আছে قَرَءَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (হুযূর আলাইহিস সালাম জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন।

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আশ্‌আতুল লুমআত গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

واحتمال دارد كه برجنازه بعد از نماز ياپيش ازاں بقصد تبرك خوانده باشد چنانكه آلاں متعارف است.

সম্ভবতঃ হুযূর আলাইহিস সালাম নামাযের পর বা আগে বরকতের জন্য সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন। যেমন আজকাল এর প্রচলন দেখা যায়। এর থেকে বোঝা গেল, শেখ আবদুল হক (রহঃ) এর যুগেও জানাযার নামাযের আগে ও পরে বরকতের জন্য সূরা পাঠ প্রচলন ছিল। তিনি একে নিষেধ করেননি, বরং এটাকে হাদীছের অনুসরণই বলতে চেয়েছেন।

প্রসিদ্ধ 'ফতহুল কাদির' গ্রন্থের كتاب الجنائز এর জানাযার নামায পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে, হুযূর আলাইহিস সালাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে মুতা যুদ্ধের খবর দিলেন। এর মধ্যে হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এর শাহাদাতের খবরও দিলেন।

فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَالَهُ وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لَهُ

(অতঃপর তার জানাযার নামায পড়লেন এবং তার জন্য দুআ করলেন এবং লোকদেরকে বললেন তোমরাও তার মাগফিরাতের জন্য দুআ কর। উল্লেখিত ইবারতে دَعَا শব্দের আগে ব্যবহৃত و অব্যয় দ্বারা বোঝা যায় যে, এ দুআ নামাযের পরেই করা হয়েছিল। মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে فِيْمَا أَخْبَرَ مِنَ الْغُيُوْبِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপরোক্ত ঘটনা হুবহু বর্ণনা করার পর বলেছেন- ثُمَّ قَالَ اِسْتَغْفِرُوْا اِسْتَغْفِرُوْلَهُ (অতঃপর ফরমালেন, মাগফিরাত কামনা করুন, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করুন) একই রকম হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে রওয়াহা (রাঃ) জানাযার পর দুআ করেছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, জানাযার পর মাগফিরাতের জন্য দুআ করা জায়েয। কনযুল উম্মাল নামক কিতাবে الجنائز শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত ইব্রাহীম হিজরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَئَيْتَ اِبْنَ اَبِىْ اَوْفَى وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مَاتَتْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِبْنَتَهُ اِلَى اَنْ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ ذَالِكَ قَدْرَمَابَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ وَقَالَ رَءَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ هٰكَذَا.

আমি ইব্‌নে আবি আওফা (রাঃ)কে দেখেছি, যিনি বায়তুর রিদওয়ানওয়ালে সাহাবী ছিলেন। তাঁর এক কন্যা মারা গিয়েছিল। তিনি তার জানাযায় চার তক্‌বীর বলেছিলেন। অতঃপর দুই তক্‌বীরের মাঝখানের বিরতির সমপরিমাণ দাঁড়িয়ে দুআ করেছেন এবং বলেছেন আমি হুযূর আলাইহিস সালামকে এরকম করতে দেখেছি। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে-

وَعَنِ الْمُسْتَظِلِّ ابْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ.

হযরত মুসতাজিল ইব্‌নে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত আলী (রাঃ) একবার এক জানাযা নামাযের পর দুআ প্রার্থনা করেছিলেন। 'মদুনাতুল কুবারা' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

يَقُوْلُ هٰكَذَا كُلَّمَا كَبَّرَ وَاِذَا كَانَ التَّكْبِيْرَ الْاٰخِرُ قَالَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

প্রত্যেক তক্‌বীরে এ রকম বলবে। যখন শেষ তক্‌বীর হবে, তখনও অনুরূপ বলবে। অতঃপর বলবে আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ।

এর থেকে বোঝা গেল, জানাযার নামাযের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে। কাশফুল ইজা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

فاتحه ودعا برائے ميت پيش از دفن درست است وهمين است روايت معمو له كذا فى خلاصة الفتح.

দাফন করার পূর্বে মৃতব্যক্তির জন্য ফাতিহা ও দুআ প্রার্থনা করা বৈধ। এ রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমল করা হয়েছে। 'খুলাসাতুল ফতেহ' কিতাবেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

শামসুল আয়িম্মা সরখ্‌সি (রহঃ) রচিত مبسوط নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় غسل الميت শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে

www.AmarIslam.com

উমর একবার এক জানাযার নামাযের পর উপস্থিত হন এবং বলেন-

اِنْ سَبَقْتُمُوْنِىْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ فَلَاتَسْبِقُوْنِىْ بِالدُّعَاءِ.

যদিওবা তোমরা আমার আগে নামায পড়ে ফেলেছ, কিন্তু দুআর বেলায় আমার আগে যেয়ো না অর্থাৎ এসো, আমার সাথে দুআয় শরীক হও। এ 'মবসুত' কিতাবের একই জায়গায় অর্থাৎ غسل الميت অধ্যায়ে হযরত ইব্‌নে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইব্‌নে সালাম (রাঃ) থেকে প্রমাণিত করেছেন যে, তাঁরা জানাযা নামাযের পর দুআ করেছেন এবং উপরোক্ত হাদীছে فَلَا تَسْبِقُوْا এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ওই দুআর উপর সাহাবায়ে কিরাম আমল করতেন। মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ ছাহেব বুরহানপুরী তাঁর রচিত 'মিফতাহুস সালাত' গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

چوں از نماز فارغ شوند مستحب است که امام یاصالح دیگر فاتحه بقرتا مفلحون طرف سر جنازه وخاتمه بقرامن الرسول طرف پائیں بخواند که در حدیث وارداست ودر بعض حدیث بعد از دفن واقع شده هردو وقت که میسر شود مجوز است.

যখন জানাযার নামায শেষ হবে, তখন এটা মুস্তাহাব যে ইমাম বা অন্য কোন নেক্‌কার ব্যক্তি সূরা বাকারার প্রথম রুকু مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত মইয়তের শিয়রে এবং শেষ আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوْلُ মৃতব্যক্তির বাম পার্শ্বে পাঠ করবেন। কেননা এ রকম হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে। কতেক হাদীছে দাফনের পরে এ রকম করার কথা উল্লেখ আছে। সম্ভব হলে উভয় সময় পড়া জায়েয আছে।

'যাদুল আখিরাত' গ্রন্থে নাহারুল ফায়েক শরহে কনযুদ দাকায়েক ও বাহরে জুখখার থেকে উদ্ধৃত করেছেন-

بعد از سلام بخواند اَللّٰهُمَّ لَا تُحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ.

সালাম ফিরানোর পর এ দুআটা পড়বেন اَللّٰهُمَّ لَا تُحْرِمْنَا الخ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর ছওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং এরপরে আমাদেরকে

ফিতনা ফ্যাসাদে ফেলো না। আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। তাহতাবী শরীফে বর্ণিত আছে-

وَاِنَّ اَبَاحَنِيْفَةَ لَمَّا مَاتَ فَخُتِمَ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قَبْلَ الدَّفْنِ (যখন ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) ইন্তিকাল ফরমান, তখন দাফনের আগে তাঁর জন্য সত্তর হাজারবার কুরআন খতম করা হয়।

কাশ্‌ফুল গুম্মা, ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী ও শামীর تعزيت الدفن অধ্যায়ে শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে- وَهِىَ بَعْدَ الدَّفْنِ اَوْلٰى مِنْهَا قَبْلَهٗ দাফনের আগের চেয়ে দাফনের পরে শোক প্রকাশ করাটা উত্তম। একই জায়গায় শামী ও আলমগীরীতে আরও উল্লেখিত আছে- وَهٰذَا اِذَا لَمْ يُرَ مِنْهُمْ جَزْعٌ شَدِيْدٌ وَاِلَّا قُدِّمَتْ এটা যেহেতু এ জন্যে যে ওর পরিবার পরিজনের মন যাতে খুব বেশী রকম ভেংগে না পড়ে। অন্যথায় দাফনের আগে শোক প্রকাশ করা যেতে পারে। জওহরে জহিরিয়াতে বর্ণিত আছে- وَهِىَ بَعْدَ الدَّفْنِ اَوْلٰى مِنْهَا قَبْلَهٗ.

দাফনের আগের থেকে পরে সমবেদনা জ্ঞাপন করা উত্তম।

ইমাম শারানি (রহঃ) রচিত মীযানুল কুবরা গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ وَالثَّوْرِىُّ اَنَّ التَّعْزِيَةَ سُنَّةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ لَابَعْدَهٗ لِاَنَّ شِدَّةَ الْحَزْنِ تَكُوْنُ قَبْلَ الدَّفْنِ فَيُعَزِّىْ وَيَدْعُوْا لَهٗ.

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম ছওরী (রাঃ) বলেন যে দাফনের পরে নয়, দাফনের আগে সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত। কেননা দাফনের আগে বিরহ বেদনাটা বেশী থাকে, সুতরাং (দাফনের আগে) শোক প্রকাশ করবেন এবং মইয়তের জন্য দুআ প্রার্থনা করবেন।

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে প্রমাণিত হলো যে দাফনের আগে, নামাযের আগে বা পরে হোক, শোক প্রকাশ করা জায়েয এবং সুন্নাত। আর সমবেদনায় মৃতব্যক্তি ও তার উত্তরাধিকারীর জন্য যথাক্রমে ছওয়াব ও ধৈর্যের জন্যইতো দুআ করা হয়। বিবেকও বলে যে নামাযে জানাযার পর দুআ জায়েয। কেননা নামাযে জানাযা এক হিসেবে দুআ বিশেষ, কারণ এতে মৃতব্যক্তিকে সামনে রাখা হয় এবং এতে রুকু সিজ্‌দা তাশাহুদ ইত্যাদি নেই। আবার আর এক হিসেবে নামাযও বলা যায়, কারণ এর জন্য গোসল, অযু, সতর ডাকা, কিবলামুখী হওয়া, জায়গা ও কাপড় পাক হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং জামাত সহকারে পড়া সুন্নাত। যদি এটা কেবল দুআই হতো, তাহলে নামাযের মত এসব

শর্তসমূহ কেন আরোপ হলো? অন্যান্য দুআর মত যে কোন প্রকারে আদায় করলেই হয়ে যেত। তাই স্বীকার করতেই হবে যে এটা এক হিসেবে নামাযও এবং প্রত্যেক নামাযের পর দুআ প্রার্থনা করা সুন্নাত ও কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যেমন- মিশ্‌কাত শরীফে اَلذِّكْرُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلٰوٰةِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

(হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে আরয করা হয়েছিল কোন্ দুআটি বেশী কবুল হয়? তিনি (দঃ) ইরশাদ ফরমান- শেষ রাত্রির মধ্যবর্তী সময় ও ফরয নামায সমূহের পরে।) জানাযার নামাযও ফরয। তাই এরপর দুআ কেন করা যাবে না? অধিকন্তু যে কোন সময় দুআ প্রার্থনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুদ দাওয়াতে বর্ণিত আছে- اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (দুআ এক প্রকার ইবাদত) একই জায়গায় এটাও উল্লেখ আছে اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দুআ ইবাদতের মূল) দুআ প্রার্থনা করার জন্য সময় কালের কোন বিধি নিষেধ নেই। তাহলে এটার কি কারণ থাকতে পারে যে জানাযার আগে ও দাফনের পরে দুআ করা জায়েয, কিন্তু নামাযের পরে ও দাফনের আগে হারাম? জানাযার নামায কোন্ যাদুমন্ত্র যে এটি পড়ার সাথে সাথে দুআ ও ঈসালে ছওয়াব হারাম হয়ে গেল এবং দাফনের পর ওই যাদু অপসারিত হলো ও সব কিছু হালাল হয়ে গেল। যে কোন সময় দুআ প্রার্থনা ও ঈসালে ছওয়াব জায়েয, এর জন্য কোন সময়ের বিধি নিষেধ নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ দুআ প্রসংগে আপত্তি ও জবাবসমূহ

জানাযার পর দুআ প্রসঙ্গে চারটি আপত্তি আছে- তিনটি আকলী (যুক্তি ভিত্তিক) ও একটি নকলী (কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক)। এগুলো ব্যতীত আর কোন আপত্তি নেই।

১নং আপত্তিঃ সেই পুরানো মুখস্থ করা বুলি-এ দুআ বিদ্‌আত এবং প্রত্যেক বিদ্‌আত যেহেতু হারাম, সেহেতু এ দুআও হারাম, শিরক ও অনৈসলামিক।

উত্তরঃ এ দুআ বিদ্‌আত নয়, হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র বাণী ও কর্মে এর প্রমাণ রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামও এর উপর আমল করেছেন। ফকীহগণও এর অনুমতি দিয়েছেন, যেমন প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি একে বিদ্‌আত

বলে মেনেও নেয়া হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা প্রত্যেক বিদ্‌আত হারাম নয়। পাঁচ প্রকারের বিদ্‌আত রয়েছে। (বিদ্‌আত শীর্ষক আলোচনা দেখুন)

২নং আপত্তিঃ জানাযার নামায হচ্ছে দুআ। পুনরায় দ্বিতীয়বার দুআ প্রার্থনা করা জায়েয নেই। প্রথম দুআই যথেষ্ট।

উত্তরঃ এ আপত্তিটা একেবারে মামুলী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে দুআ আছে। ইসতাহারা, চন্দ্র গ্রহণ ও বৃষ্টির জন্য নামায সবই দুআর উদ্দেশ্যেই পড়া হয়। কিন্তু এসবের পরেও দুআ প্রার্থনা করা জায়েয বরং সুন্নাত। হাদীছ শরীফে আছে اَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ (বেশী করে দুআ প্রার্থনা করুন) দুআর পরে দুআ প্রার্থনা করাটাই হচ্ছে অতিরিক্ত দুআ। এটাতো কেবল দুআ মাত্র। অথচ কোন কোন অবস্থায় জানাযার নামায দ্বিতীয়বার হয়ে থাকে। যেমন যদি মৃতব্যক্তির ওলিকে (উত্তরসূরী) বাদ দিয়ে অন্যরা নামায পড়ে ফেলেছেন, তখন তিনি দ্বিতীয়বার নামায পড়তে পারবেন। সোমবারে হুযূর আলাইহিস সালামের তিরোধান হয়েছিল এবং বুধবারে দাফন করা হয়েছিল। (শামী কিতাবুস সালাত الامامت অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) এ দু'দিন দলে দলে মানুষ আসতে থাকে ও জানাযার নামায আদায় করতে থাকে, কেননা তখন পর্যন্ত হযরত সিদ্দীক আকবর (যিনি ওলি ছিলেন) নামায পড়েননি। অতঃপর যখন হযরত সিদ্দীক (রাঃ) শেষ দিন নামায পড়ে নিলেন, এরপর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর কারো জন্য বৈধ রইলো না। (ফত্‌ওয়ায়ে শামীর

صلواة الجنازة بحث ومن احق بالامامت শীর্ষক অধ্যায়ে দেখুন) এখন বলুন এ নামাযতো দুআই ছিল। এটা আদায়ও হয়ে গিয়েছিল। তবুও দ্বিতীয়বার নামায কিভাবে হলো? এ প্রশ্নটা যেন এ রকম-কেউ বললেন খানা খাওয়ার পর পানি পান করো না। কেননা খাবারে পানি মওজুদ রয়েছে, তা পানি দ্বারা রান্না হয়েছে।

৩নং আপত্তিঃ দুআ প্রার্থনা করার কারণে দাফন কার্যে দেরী হয় এবং এটা হারাম।

উত্তরঃ এ আপত্তিটাও ভিত্তিহীন। প্রথমতঃ আপনারা এ দুআকে যে কোন অবস্থায় নিষেধ করে থাকেন। এবং উপরোক্ত আপত্তি থেকে বোঝা যায় যে দাফন কার্যে যদি দেরী হয়, তাহলে নিষেধ, অন্যথায় নয়। তাহলে বলুন, যদি এখনও কবর তৈরী হতে দেরী আছে অথচ নামাযে জানাযা হয়ে গেছে। তাহলে এ অবস্থায় দুআ ইত্যাদি পাঠ করবে কিনা? কেননা এখানে দাফন কার্যে বিলম্বটা দুআর জন্য নয় বরং কবর তৈরীতে বিলম্ব হেতু। দ্বিতীয়তঃ দুআ করতে বেশী দেরী হয় না। বেশী হলে দু-তিন মিনিট সময় লাগে। এরকম ক্ষীণ বিলম্বটা আদৌ ধর্তব্য নয়। এ রকম দেরী বরং এর থেকে আরও

বেশী দেরী হয় আস্তে আস্তে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে, ধীরে সুস্থে গোসলের কাজ সমাধা করতে এবং ধৈর্য সহকারে কবর খনন করতে। যদি এতটুকু দেরীও হারাম হয়, তাহলে গোসল ও কাফনদাতাকে বিদ্যুৎ গতিতে গোসল ও কাফনের কাজ সমাধা করতে হবে, কবর খননকারীদেরকে মেশিনের মত চটপট কবর খনন করতে হবে, কফিন বহন কারীদেরকে ইঞ্জিনের মত দৌড়ে যেতে হবে এবং সাথে সাথে কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে। তৃতীয়তঃ আমি প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃতি সহকারে বর্ণনা করেছি যে দাফনের আগে মৃতব্যক্তির পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, তাদেরকে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া জায়েয বরং সুন্নাত। তাহলে নামাযের আগে হোক বা পরে সমবেদনা জ্ঞাপন ও সান্ত্বনা দিতে সময় লাগবে কিনা? নিশ্চয় লাগবে। কিন্তু ধর্মীয় কাজ হেতু এটা জায়েয। চতুর্থতঃ আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি যে, হুযূর আলাইহিস সালামের ওফাত শরীফ সোমবার এবং দাফন করা হয়েছে বুধবারে। আল্লামা শামী (রাঃ) ফত্ওয়ায়ে শামীর কিতাবুস সালাতে'র الامامت। শীর্ষক অধ্যায়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেছেন-

وَهٰذِهِ السُّنَّةُ بَاقِيَةٌ اِلَى الْاٰنِ لَمْ يُدْفَنْ خَلِيْفَةٌ حَتّٰى يُوَلّٰى غَيْرُهٗ.

এ সুন্নাত এখনও বলবৎ আছে। কোন খলীফা ততক্ষণ পর্যন্ত দাফন করা হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন খলীফা মনোনীত না হয়।

এর থেকে বোঝা গেল, দুনিয়াবী কারণে দাফনকার্যে দেরী করা মাকরূহ কিন্তু ধর্মীয় কারণে জায়েয। যেমন খলীফা মনোনীত করা ধর্মীয় কাজ। এ জন্য দাফনকার্যে দেরী করার কথা বলা হয়েছে। দুআ প্রার্থনা করাও ধর্মীয় কাজ। যদি কেউ নামাযের শেষ মুহূর্তে শামিল হয়, তাহলে সে দুআ পড়ে সালাম ফিরাতে পারবে। কিন্তু যদি নামাযের পরে সংগে সংগে লাশ উঠিয়ে ফেলে, তাহলে সে লোকটি দুআ শেষ করতে পারবে না। কেননা উঠানো জানাযার নামায হয় না। সুতরাং পরে আসা নামাযীদের জন্যও জানাযার নামাযের পর দুআ করার ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়েছে। যদি দেরীটা আঁচ করার মত নয়, তাহলে জায়েয। পঞ্চমতঃ শর্তহীনভাবে দাফনকার্যে দেরী করাটা যে হারাম, কোন্ কিতাবে আছে? ফকীহগণ বলেন, জুমাবার কেউ মারা গেলে, জুমার নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই বরং সম্ভব হলে জুমার আগেই দাফন করবেন। কিন্তু এটা বলেননি যে এ অপেক্ষা করাটা হারাম, শিরক, কুফরী। আল্লাহ মাফ করুন।

৪নং আপত্তি- ফকীহগণ জানাযার পর দুআ করা নিষেধ বলেন। যেমন 'জামেউর রমুজ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে لَا يَقُوْمُ دَاعِيًا لَّهٗ (জানাযার নামাযের পর দুআর জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যখিরাতুল কুবরা ও 'মুহিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে- لَايَقُوْمُ

بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ. জানাযার নামাযের পর দুআর জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখিত আছে- لَايَدْعُوْا بَعْدَهٗ فِىْ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (মাযহাবের প্রকাশ্য অভিমত হচ্ছে, এরপর দুআ না করা। মিরকাত শরহে মিশকাতে বর্ণিত আছে وَلَايَدْعُوْا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ لِاَنَّهٗ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ. (জানাযার নামাযের পর মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করবেন না। কেননা, এটা নামাযে জানাযার পরিবর্ধনের মত।) কাশফুল গিতারে বর্ণিত আছে- قائم نه شود از نماز برائے دعا (জানাযার নামাযের পর দুআর জন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন না। জামেউর রমুযে আছে وَلَايَقُوْمُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوْهٌ জানাযার নামাযের পর দুআ করা মাকরূহ। কেননা এটা পরিবর্তন সদৃশ। ইবনে হামিদ থেকে বর্ণিত আছে- اِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوْهٌ. (জানাযার নামাযের পর দুআ করা মাকরূহ।)

উপরোল্লিখিত ভাষ্য সমূহ থেকে বোঝা গেল, জানাযার নামাযের পর দুআ ইত্যাদি নাজায়েয।

উত্তরঃ এ আপত্তির দু'রকমের উত্তর দেয়া যায়-সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে। সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, এ দুআ নিষেধ করার পিছনে তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ চতুর্থ তক্বীরের পর সালামের আগে যদি দুআ করা হয়, দ্বিতীয়তঃ দুআটা যদি দীর্ঘক্ষণ হয়, যার ফলে দাফনে দেরী হয়। এজন্যে জুম্আর অপেক্ষায় দাফনকার্যে দেরী করা নিষেধ। তৃতীয়তঃ যদি নামাযের মত কাতারবন্দী অবস্থায় এভাবে দুআ করা হয় যে, দর্শকরা নামায হচ্ছে বলে মনে করে। কেননা এটা পরিবর্ধন সদৃশ। সুতরাং যদি সালাম ফিরানোর পর বসে কিংবা কাতার ভেংগে মাত্র অল্পক্ষণ দুআ করা হয়, তাহলে মাকরূহহীনভাবে জায়েয। এ কারণ সমূহ এ জন্যেই বের করা হয়েছে, যাতে ফকীহগণের ইবারতসমূহে পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এবং উপরোক্ত উক্তিসমূহ যেন প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীছসমূহের ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ও আমলের বিপরীত না হয়।

বিশ্লেষণমূলক উত্তর হচ্ছে উপরোক্ত ইবারত সমূহের মধ্যে জামেউর রুমুয, যখিরা, মুহিত ও কাশফুল গিতারের ইবারত সমূহে দুআ করা সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বরং দাঁড়িয়ে দুআ করাকে নিষেধ বলেছেন। আমরাও সেটা নিষেধ করি। মিরকাত ও জামেউল রুমুযে এটাও উল্লেখিত আছে لِاَنَّهٗ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ, এটা অতিরিক্ত সদৃশ অর্থাৎ যে দুআর ফলে নামাযে জানাযার মধ্যে পরিবর্ধন হয়েছে বলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এর থেকে বোঝা গেল এভাবে দুআ করা নিষেধ, যেখানে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকে। যেমন কাতার বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুআ করা। যদি কাতার

ভেংগে ফেলে বা বসে পড়ে, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। ফরয জামাতের পর নির্দেশ আছে যে মুসল্লীগণ যেন কাতার ভেংগে দিয়ে সুন্নাত পড়ে, যাতে জামাত হচ্ছে বলে কারও সন্দেহ না হয়। (ফত্ওয়ায়ে শামী ও মিশকাত শরীফের السنن অধ্যায় দেখুন) এর থেকে এটা প্রকাশ পায় না যে ফরযের পরে সুন্নাত পড়া নিষেধ বরং ফরযের সাথে মিলিয়ে পড়াটাই নিষেধ। জানাযার পর দুআটাও তথৈবচ। আলমগীরীর যে ইবারত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা ভুল। এর আসল ইবারত হচ্ছে

وَلَيْسَ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ.

চতুর্থ তকবীরের পর সালামের আগে কোন দুআ নেই। অর্থাৎ জানাযার নামাযে প্রথম তিন তকবীরের পর কিছু না কিছু পাঠ করা হয় কিন্তু চতুর্থ তকবীরের পর কিছুই পাঠ করা যাবে না, যেমন আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি। বদাইয়া, কেফাইয়া ও এনায়া গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

لَيْسَ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ.

(চতুর্থ তকবীরের পর সালামের আগে কোন দুআ নেই।) ইবনে হামিদের নামে যে ইবারত উদ্ধৃত করা হয়েছে, এটা আসলে কুনিয়া গ্রন্থের ইবারত। কিন্তু কুনিয়া কোন গ্রহণযোগ্য কিতাব নয়। এর থেকে ফত্ওয়া দেয়া যায় না। মুকাদ্দমায়ে শামীর رسم المفتى শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে যে, কুনিয়া গ্রন্থের রচয়িতা দুর্বল রিওয়ায়েতও গ্রহণ করে। তাই ওই গ্রন্থ থেকে ফত্ওয়া দেয়া জায়েয হবে না। শামীর ইবারতটা হচ্ছে এ রকম-

اَوْ لِنَقْلِ الْاَقْوَالِ الضَّعِيْفَةِ فِيْهَا كَالْقُنْيَةِ لِلزَّاهِدِيْ فَلَا يَجُوْزُ الْاِفْتَاءُ مِنْ هٰذِهٖ.

আলা হযরত (কুঃ সিঃ) 'বজলুল জওয়ায়ে' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কুনিয়া গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছে মুতাযলী ফিরকাভুক্ত। এবং যদি কুনিয়ার এ ইবারত সঠিকও মেনে নেয়া হয়, তা স্বয়ং বিরোধিতাকারীদেরও বিপরীত হবে, কেননা ছাহেবে কুনিয়া বলেন যে জানাযার পর দুআ করা নিষেধ; তাহলে দাফনের পরও দুআ নাজায়েয হওয়া উচিত। কারণ এ সময়টাও নামাযে জানাযার আগে নয়। মোটকথা কোন ইবারতই আপনাদের অনুকূলে নয়। জানাযার নামাযের পর দুআ জায়েয বরং সুন্নাত।

www.AmarIslam.com

আওলিয়া কিরামের মাযারের উপর গম্বুজ তৈরী করা প্রসঙ্গে আলোচনা

মুসলমানকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সাধারণ মুসলমানগণ একশ্রেণীভুক্ত এবং উলামা, মাশায়িখ ও আওলিয়া কিরাম, যাদের তাযীম আসলে ইসলামেরই তাযীম, অন্য শ্রেণীভুক্ত। (১) সাধারণ মুসলমানদের কবরকে পাকা করা বা এর উপর গম্বুজ তৈরী করা যেহেতু অনর্থক, সেহেতু নিষেধ। তবে তাঁদের কবরের নিশানা ঠিক রাখার অভিপ্রায়ে মাটি ইত্যাদি দেয়া ও ফাতিহা ইত্যাদি পাঠ করা জায়েয। (২) উলামা, মাশায়িখ ও আওলিয়া কিরামের মধ্যে যাদের মাযার সমূহে জনগণের ভিড় থাকে, এবং লোকেরা ওখানে বসে কুরআনখানি, ফাতিহা ইত্যাদি পাঠ করে, আগতদের আরামের জন্য এবং ছাহেবে কবরের শান-মান প্রকাশ করার জন্য এবং আশে-পাশে ছায়ার জন্য গম্বুজ বিশিষ্ট ঘর ইত্যাদি তৈরী করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয বরং সুন্নাতে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত। (৩) যেসব সাধারণ মুসলমানদের কবর সমূহ পাকা করা বা এর উপর গম্বুজ বিশিষ্ট ঘর তৈরী করা নিষেধ, তাদের কবর সমূহ যদি পাকা করে ফেলা হয়, তাহলে এগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা হারাম। প্রথম মাসআলা সম্পর্কে সবাই একমত কিন্তু শেষের দু'মাসায়েলা প্রসংগে আপত্তি রয়েছে। এজন্য আমি আলোচ্য বিষয়টাকে দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে এর সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপন এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

আওলিয়া কিরামের মাযারের উপর ইমারতের প্রমাণ

এখানে তিনটি বিষয় জানার আছে-এক, কবর পাকা করা; দুই, কবরকে সুন্নাত পরিমাণ থেকে অর্থাৎ এক হাত থেকে বেশী উঁচু করা; তিন, কবরের আশে-পাশে ইমারত তৈরী করা জায়েয কিনা। আবার কবর পাকা করার দুটি রূপ রয়েছে। একটি হচ্ছে কবরের আভ্যন্তরীন অংশ পাকা করা, যা লাশের সাথে জড়িত থাকে, অপরটি হচ্ছে কবরের উপরাংশ পাকা করা, যা কবরের উপরে দেখা যায়।

(১) কবরের আভ্যন্তরীণ অংশ পোড়া ইটদ্বারা পাকা করা এবং ওখানে লাকড়ী স্থাপন করা নিষেধ। তবে পাথর ও সিমেন্ট ব্যবহার করা জায়েয আছে। কেননা লাকড়ী ও ইটের মধ্যে আগুনের প্রভাব রয়েছে। কবরের বহিরাংশ সাধারণ মুসলমানদের বেলায় পাকা করা নিষেধ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ উলামা ও মাশায়িখের জন্য জায়েয।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) কবরের চৌহদ্দী একহাত থেকে বেশী উঁচু করা নিষেধ। তবে যদি আশে পাশে উঁচু করে কবরকে একহাত পরিমাণ উঁচু করা জায়েয।

(৩) কবরের আশে-পাশে বা কবরের সন্নিকটে কোন ইমারত তৈরী করা সাধারণ মুসলমানদের কবরের ক্ষেত্রে নিষেধ। কিন্তু ফকীহ ও আলিমগণের কবরের বেলায় জায়েয। এর দলীল সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(১) মিশকাত শরীফের কিতাবুল জানায়েযের الدفن শীর্ষক অধ্যায়ে আবু দাউদ শরীফের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে- হযরত উছমান ইবনে মযউন (রাঃ) কে যখন দাফন করা হয়, তখন হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর কবরের শিয়রে একটি পাথর রাখলেন এবং ইরশাদ ফরমান-

اَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ اَخِىْ وَاَدْفِنُ اِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِىْ.

আমরা এর দ্বারা নিজের ভাইয়ের কবর সনাক্ত করতে পারবো এবং এখানে স্বীয় আহ্‌লে বাইতের লাশ সমূহ দাফন করবো।

(২) বুখারী শরীফে কিতাবুল জানায়েয الجريد على القبر শীর্ষক অধ্যায়ে অন্য হাদীছের সনদের সাথে সংযুক্ত করে একটি হাদীছ হযরত খারেজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- আমরা হযরত উছমানের যুগে জীবিত ছিলামঃ

اَنَّ اَشَدَّ نَا وَثْبَةً اَلَّذِىْ يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ اِبْنِ مَظْعُوْنٍ حَتّٰى يُجَاوِزَهٗ.

তখন আমাদের মধ্যে সেই বড় লম্ফদানকারী ছিলেন, যিনি উছমান ইব্‌নে মযউনের কবরকে অতিক্রম করতে পারতেন।

মিশকাত শরীফের রেওয়ায়েত থেকে বোঝা গেল- হযরত উছমান ইব্‌নে মযউনের কবরের মাথার দিকে পাথর ছিল এবং বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় তাঁর কবরের উপরিভাগ ঐ পাথরের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। উভয় রেওয়ায়েতটা এভাবে একত্রিকরণ করা যায় যে মিশকাত শরীফে কবরের মাথার দিকে যেই পাথর স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে,এর অর্থ হচ্ছে কবরের উপরই মাথার দিক থেকে এটা স্থাপন করা হয়েছে। বা ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে কবরটা সম্পূর্ণ উক্ত পাথরের ছিল, কিন্তু এ হাদীছে শুধু শিয়রের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ দু'হাদীছ থেকে এটা প্রমাণিত হলো যে কোন বিশেষ কবরের চিহ্ন বহাল রাখার জন্য যদি কবরকে কিছু উঁচু করে দেয়া হয় বা পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করে দেয়া হয়, তা জয়েয আছে, যেন

বুঝতে পারা যায় যে এটা কোন বুযুর্গের কবর। এর আগে আরও দু'টি মাসআলা জানা গেছে। অধিকন্তু ফকীহগণ বলেন- যদি মাটি নরম হয় এবং লোহা বা কাঠের বাক্সে লাশ রেখে দাফন করতে হয়, তাহলে ভিতরের অংশের চারিদিকে মাটির সাথে মিলিয়ে দিন। (ফতওয়ায়ে শামী, আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাবের دفن الميت অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) এর থেকে আরও বোঝা গেল যে কবরের নিম্ন ভাগ কাঁচা হওয়া চাই। দু'টি মাসায়েলই প্রমাণিত হলো।

(৩) উলামা' মাশায়িখ ও আওলিয়া কিরামের মাযারের আশে-পাশে বা এর সন্নিকটে ইমারত তৈরী করা জায়েয। কুরআন করীম, সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ মুসলমানদের আমল ও উলামায়ে কিরামের উক্তিসমূহ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআন করীম আসহাবে কাহাফের কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে ইরশাদ করেন-

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا.

তিনি বললেন, তাঁরা যে কাজে নিয়োজিত ছিলেন (ইবাদত বন্দেগীতে) তাঁদের সেই স্মৃতির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা হবে। তফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের بُنْيَانًا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লেখিত আছে-

لَايَعْلَمُ اَحَدٌ تُرْبَتَهُمْ وَتَكُوْنُ مَحْفُوْظَةً مِنْ تَطَرُّقِ النَّاسِ كَمَا حُفِظَتْ تُرْبَتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ بِالْحَظِيْرَةِ.

অর্থাৎ তাঁরা প্রস্তাব দিলেন, আসহাবে কাহাফের জন্য এমন একটি প্রাচীর তৈরী করুণ, যা তাদের কবরকে পরিবেষ্টিত করবে এবং তাদের মাযার সমূহ জনগণের আনাগোনা থেকে হিফাজতে থাকবে, যেমন হুযূর আলাইহিস সালামের রওযা পাককে চার দেয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলো, মসজিদই নির্মাণ করা হলো। উক্ত রূহুল বয়ানে مَسْجِدًا এর তফ্‌সীর এভাবে করা হয়েছে- يُصَلِّىْ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَيَتَبَرَّكُوْنَ بِمَكَانِهِمْ.

জনগণ সেখানে নামায আদায় করবে এবং ওদের থেকে বরকত হাসিল করবে। কুরআন করীম সেসব লোকদের দু'টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন; এক, আসহাবে কাহাফের আস্তানার আশে পাশে গম্বুজ ও সমাধি তৈরী করার পরামর্শ; দুই, ওদের সন্নিকটে মসজিদ তৈরী করার সিদ্ধান্ত। কুরআন করীম কোনটাকে অস্বীকার করেননি। যার ফলে প্রতীয়মান হলো যে, উভয় কাজটা তখনও জায়েয ছিল এবং এখনও জায়েয আছে। যেমন উসুলের কিতাবসমূহ দ্বারা প্রমানিত আছে- شَرَائِعُ قَبْلِنَا يَلْزِمُنَا

(আগের যুগের শরীয়ত আমাদের জন্য পালনীয়) হুযূর আলাইহিস সালামকে হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) এর কুটিরে দাফন করা হয়। যদি এটা নাজায়েয হতো, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম প্রথমে ওটা ভেংগে ফেলতেন, অতঃপর দাফন করতেন, কিন্তু তা করলেন না। হযরত উমর (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের যুগে এর চারিদিকে কাঁচা ইটের দেওয়াল তৈরী করে দিয়েছিলেন। অতঃপর ওলিদ ইব্নে আবদুল মালিকের যুগে সৈয়্যদেনা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর সকল সাহাবায়ে কিরামের জীবিত থাকা অবস্থায় ঐ ইমারতটাকে খুবই মজবুত করেছেন এবং এতে পাথর স্থাপন করেছেন। যেমন সৈয়দ সমহুদী (রহঃ) স্বীয় خلاصة الوفا باخبار دار المصطفے নামক কিতাবের ১০ম পরিচ্ছেদের ১৯৬ পৃষ্ঠায় হুযূরা সম্পর্কিত আলোচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন-

عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ وَّعُبَيْدِاللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ زَيْدٍ قَالَا لَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى بَيْتِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جِدَارٌ فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ بَنٰى عَلَيْهِ جِدَارًا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ. قَالَ عُبَيْدُاللّٰهِ ابْنُ اَبِىْ زَيْدٍ كَانَ جِدَارُهٗ قَصِيْرًا ثُمَّ بَنَاهُ عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَلخ وَقَالَ اَلْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ كُنْتُ اَدْخُلُ بُيُوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنَا غُلَامٌ مُرَاهِقٌ اَوْ اَنَالُ السَّقْفَ بِيَدِىْ وَكَانَ لِكُلِّ بَيْتٍ حَجْرَةٌ وَكَانَتْ حَجْرَةٌ مِنَ الْكِعْسَةِ مِنْ سَعْيْرٍ مَرْبُوْطَةٍ فِىْ خُشُبٍ عَرْعَرَةٍ.

(উপরের বক্তব্যটাই এর অনুবাদ) বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড কিতাবুল জানায়েযের مَاجَاءَ فِىْ قَبْرِ النَّبِىِّ وَاَبِىْ بَكْرٍوعُمَرَ শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত ওরওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- ওলিদ ইব্নে আবুদল মালিকের যুগে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রাওযা পাকের একটি দেওয়াল ধসে পড়ে গিয়েছিল। যখন اَخَذُوْا فِىْ بِنَائِهٖ সাহাবায়ে কিরাম একে মেরামত করার কাজে নিয়োজিত হলেন-

فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهَا قَدَمُ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

তখন একটি পা দৃষ্টিগোচর হলো। এতে তাঁরা ঘাবড়ে গেলেন এবং মনে করলেন- এটা হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র কদম মোবারক।

حَتّٰى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَاللّٰهِ مَاهِىَ قَدَمُ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاهِىَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ.

শেষ পর্যন্ত হযরত ওরওয়াহ (রাঃ) বললেন, খোদার কসম, এটা হুযূর আলাইহিস সালামের কদম নয়, এটা হযরত ফারুকের (রাঃ) কদম।

'জযবুল কুলুব ইলা দেয়ারিল মাহবুব' গ্রন্থে শেখ আবদুল হক (রহঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ৫৫০ হিজরীতে জামাল উদ্দিন ইস্ফাহানী তথাকার উলামায়ে কিরামের উপস্থিতিতে দেয়ালের চারিদিকে চন্দন কাঠের জালী তৈরী করে দিয়েছিলেন এবং ৫৫৭ হিজরীতে কয়েকজন ঈসায়ী ধার্মিকের ছদ্মবেশে মদীনা শরীফ এসেছিল এবং সুড়ংগ খনন করে লাশ মুবারক বের করে নিতে চেয়েছিল। হুযূর আলাইহিস সালাম তৎকালীন বাদশাকে তিনবার স্বপ্ন দেখালেন। অতঃপর বাদশাহ তাদেরকে কতল করার নির্দেশ দিলেন এবং রওযা পাকের চারিদিকে পানির স্তর পর্যন্ত ভিত্তি খনন করে সীসা ঢেলে একে ভরাট করে দিয়েছিলেন। আবার ৬৭৮ হিজরীতে সুলতান কালাউন সালেহী সবুজ গম্বুজটা, যা এখনও মওজুদ আছে, তৈরী করিয়েছিলেন।

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে এটা বোঝা গেল যে, পবিত্র রওযা মুবারক সাহাবায়ে কিরাম তৈরী করিয়েছিলেন। যদি কেউ বলে, এটাতো হুযূর আলাইহিস সালামের বিশেষত্ব, এর উত্তরে বলা যাবে, এ রওযা শরীফে হযরত সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) কেও দাফন করা হয়েছ এবং হযরত ঈসা (আঃ)কেও দাফন করা হবে। সুতরাং এটা হুযূর আলাইহিস সালামের বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড কিতাবুল জানায়েয এবং মিশকাত শরীফের البكاء على الميت শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যখন হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাঃ) ইন্তিকাল করেছিলেন- ضَرَبَتْ اِمْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلٰى قَبْرِهٖ سَنَةً তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর কবরের উপর এক বছর পর্যন্ত গম্বুজ বিশিষ্ট্য ঘর তৈরী করে রেখেছিলেন।

এটাও সাহাবায়ে কিরামের যুগে সবার বর্তমানে হয়েছিল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করেননি। অধিকন্তু তাঁর স্ত্রী ওখানে একবছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন, অতঃপর ঘরে ফিরে আসেন। এ হাদীছ থেকে বুযুর্গানে কিরামের মাযার সমূহের কাছে খাদিমের অবস্থান করাটাও প্রমাণিত হলো।

এ পর্যন্ত কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত করা হলো। এবার ফকীহ, মুহাদ্দীছ, তাফসীরকারীগণের উক্তি সমূহ প্রত্যক্ষ করুন।

রূহুল বয়ানের তৃতীয় খণ্ডে দশম পারায় إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন-

فَبِنَاءُ قِبَابٍ عَلٰى قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَالِكَ التَّعْظِيْمَ فِىْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَا يَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ هٰذَ الْقَبْرِ.

অর্থাৎ উলামা, আওলিয়া ও বুযুর্গাণে কিরামের কবরের উপর ইমারত তৈরী করা জায়েয যদি মানুষের মনে শ্রেষ্ঠতম ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; যাতে লোকেরা ঐ কবরবাসীকে নগণ্য মনে না করে।

মিরকাত শরহে মিশকাতের কিতাবুল জানায়েযে دفن الميت অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

قَدْ اَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلٰى قُبُوْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَشْهُوْرِيْنَ لِيَزُوْرَهُمُ النَّاسُ وَيَسْتَرِيْحُوْا بِالْجُلُوْسِ.

পূর্বসূরী আলিমগণ, মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরামের কবর সমূহের উপর ইমারত তৈরী করা জায়েয বলেছেন, যাতে লোকেরা যিয়ারত করে এবং ওখানে বসে আরাম পায়।

শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী 'শরহে সফরুস সা'আদত কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

درآخر زمان بجهت اقتصار نظرعوام برظاهر مصلحت در تعمير وترويج مشاهد ومقابر مشائخ وعظماء ديده چيزها افزوزندتا آنجا هيبت وشوكت اهل اسلام واهل اصلاح پيدا آيد خصوصا درديار هند كه اعدائے دين ازهنود وكفار بسيارانـد. وترويج واعلاء شان اين مقامات باعث رعب وانقياد ايشان است وبسيار اعمال وافعال واوضاع كه درزمان سلف ازمكروهات بوده اندر رآخرزمان از مستحسنات گشته.

অর্থাৎ শেষ জামানায় সাধারণ মানুষ যখন বাহ্যিক বেশভূষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে

গেল, তখন মাশায়িখ ও বুযুর্গানে কিরামের কবর সমূহের উপর ইমারত তৈরী করার প্রতি বিশেষ অভিপ্রায়ে জোর দেয়া হয়, যেন মুসলমান ও আওলিয়া কিরামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পায়। বিশেষ করে হিন্দুস্থানে, যেথায় হিন্দু, কাফির ও অনেক শত্রুর অবস্থান, তথায় পুণ্যাত্মা মনীষীদের শান-মান প্রকাশ, সেসব কাফিরদের মনে ভীতি ও আনুগত্য সৃষ্টির সহায়ক। অনেক কাজ আগের যুগে মাকরূহ ছিল কিন্তু শেষ জামানায় মুস্তাহাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ফত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ড الدفن অধ্যায়ে লিখা আছে-

وَقِيْلَ لَايُكْرَهُ الْبِنَاءُ اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ.

যদি মৃতব্যক্তি মাশায়িখ, উলামা বা সৈয়দ বংশ থেকে কেউ হয়ে থাকেন, তাঁর কবরের উপর ইমারত তৈরী করা মাকরূহ নয়। সেই একই অধ্যায়ে দুর্রুল মুখতারে উল্লেখিত আছে-

لَايُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَقِيْلَ لَابَأْسَ بِهٖ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

(কবরের উপর ইমারত তৈরী করা অনুচিত। কেউ কেউ বলেছেন, এতে কোন ক্ষতি নেই। এবং এ অভিমতটাই পছন্দনীয়।) কতেক লোক বলেন যে, শামী ও দুর্রুল মুখতারে ইমারতের বৈধতার কথাটা যেহেতু শব্দ قِيْلَ দ্বারা ব্যক্ত করেছেনে, সেহেতু এ অভিমতটা দুর্বল। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। ফিকাহ শাস্ত্রে قِيْلَ শব্দ ব্যবহারটা দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং কোন কোন স্থানে একটি মাসআলার জন্য দু'টি মতামত ব্যক্ত করা হলে উভয় মতামতই قِيْلَ শব্দ দ্বারা অর্থাৎ পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা যায়। তবে হ্যাঁ, যুক্তি বিদ্যায় قِيْلَ শব্দটা দুর্বলতার নিদর্শন। কবরে আযান শীর্ষক আলোচনায় قِيْلَ শব্দের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। 'তাহতাবী আলা মরাকিল ফলাহ' গ্রন্থের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَقَدْ اِعْتَادَ اَهْلُ الْمِصْرِ وَضْعَ الْاَحْجَارِ حِفْظًا لِلْقُبُوْرِ عَنِ الْاِنْدِرَاسِ وَالنَّبْشِ وَلَابَأْسَ بِهٖ وَفِى الدُّرَرِ وَلَا يُجَصَّصُ وَلَايُطَيَّنُ وَلَايُرْفَعُ عَلَيْهِ بِنَاءٌ وَقِيْلَ لَابَأْسَ بِهٖ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.

অর্থাৎ মিসরের লোকেরা কবর সমূহের উপর পাথর স্থাপন করে, যাতে বিলীন বা

উচ্ছেদ হয়ে না যায় এবং কবরকে যেন পলেস্তারা করতে না পারে আর যেন কবরের উপর ইমারত তৈরী করতে না পারে। কেউ কেউ এগুলোকে জায়েয বলেন এবং এটাই গ্রহণযোগ্য।

'মীযানুল কুবরা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষে কিতাবুল জানায়েযে ইমাম শা'রানী (রহঃ) বলেন-

وَمِنْ ذَالِكَ قَوْلُ الْاَئِمَّةِ اَنَّ الْقَبْرَ لَايَبْنٰى وَلَا يُجَصَّصُ مَعَ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ يَجُوْزُ ذَالِكَ قَالَ الْاَوَّلُ مُشَدَّدٌ وَالثَّانِىْ مُخَفَّفٌ.

অর্থাৎ অন্যান্য ইমামগণের মতামত হচ্ছে, কবরের উপর ইমারত তৈরী করা এবং একে চুন দিয়ে আলপনা করা যাবে না। তা সত্বেও ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য হচ্ছে এসব জায়েয। সুতরাং প্রথম উক্তিতে কঠোরতা এবং দ্বিতীয় উক্তিতে নমনীয়তা প্রকাশ পায়।

এখনতো আর কিছু বলার নেই। স্বয়ং মযহাবের ইমাম হযরত আবু হানীফার অভিমত পাওয়া গেল যে, কবরের উপর গম্বুজবিশিষ্ট ইমারত ইত্যাদি তৈরী করা জায়েয।

আল্লাহর শুকর, কুরআন হাদীছ ও ফিক্বাহের বিভিন্ন ইবারত এমন কি স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার উক্তি থেকে প্রমাণিত হলো যে আওলিয়া ও উলামায়ে কিরামের কবরের উপর গম্বুজ ইত্যাদি তৈরী করা জায়েয। বিবেকও বলে যে এটা জায়েয। কারণ প্রথমতঃ এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, সাধারণ কাঁচা কবরের প্রতি জনগণের মনে তেমন কোন আদব বা সম্মানবোধ থাকে না, তাতে না ফাতিহা পাঠ করা হয়, না শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় বরং জনগণ একে পদদলিত করে। কিন্তু যদি কোন পাকা কবর সামনে পড়ে এবং এর উপর গিলাফ ইত্যাদি চড়ানো দেখে, মনে করে যে এটা কোন বুযুর্গের মাযার হবে। তখন সসম্মানে একে অতিক্রম করে এবং আপনা থেকে মুখে ফাতিহা পাঠ এসে যায়। মিশ্কাত শরীফের الدفن অধ্যায়ে এবং মিরকাতে উল্লেখিত আছে জীবিত কালে এবং মৃত্যুর পর একই রকম সম্মান করা উচিৎ। অনুরূপ ফত্ওয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল কারাহিয়াত এবং 'আশ্আতুল লুমআত' গ্রন্থের الدفن অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, মা-বাপের কবরকে চুমা দেয়া জায়েয। ফকীহগণ আরও বলেন যে, কবর থেকে এতটুকু দূরত্বে বসবেন, যে পরিমাণ দূরত্বে কবরস্থ ব্যক্তির সামনে জীবিত অবস্থায় বসতেন। এর থেকে বোঝা গেল মৃত ব্যক্তি তার জীবিত থাকাকালীন সম্মানের

অধিকারী। ইহজগতে আল্লাহর ওলীগণ বাধ্যতামূলক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং মৃত্যুর পরও তাঁরা সম্মানের অধিকারী। কবরের উপর ইমারত তৈরী করা হচ্ছে সেই সম্মান প্রকাশের মাধ্যম বিশেষ। তাই তাকে কমপক্ষে মুস্তাহাব ধরে নেয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ইমারত সমূহের মধ্যে সরকারী ভবন বা মসজিদসমূহ হচ্ছে বিশেষ খ্যাত। যাতে লোকেরা অনায়াসে সেগুলোকে খুঁজে বের করে উপকৃত হতে পারে। উলামায়ে কিরামের বেশভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদ জ্ঞানী সুলভ হওয়া চাই। যেন লোকেরা তাদেরকে সনাক্ত করে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। অনুরূপ মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরামের কবর সমূহ অন্যান্যদের কবর থেকে উন্নততর হওয়া চাই, যেন লোকেরা সনাক্ত করে ফয়েজ হাসিল করতে পারেন। তৃতীয়তঃ আল্লাহর ওলীগণের মাযার আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ, যেমন আমি ইতিপূর্বে তফসীরে রূহুল বয়ানের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রয়োজন, যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং কবরসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন উচিৎ। সম্মান প্রদর্শন স্থান ও কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। যে কোন প্রকারের সম্মান প্রদর্শন, যদি তা ইসলাম বিরোধী না হয়, জায়েয। হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগে হাড় ও চামড়ার উপর কুরআন লিখা হতো, মসজিদে নববী ছিল কাঁচা এবং এর ছাউনি ছিল খেজুর পাতার, যেখানে বৃষ্টির সময় পানি টপকিয়ে পড়তো। কিন্তু পরবর্তী যুগে মসজিদে নববীকে খুবই শানদার করে এবং রওযা পাককে একান্ত যত্ন সহকারে তৈরী করা হয়েছে, কুরআন শরীফকে উন্নতমানের কাগজ দ্বারা ছাপানো হয়েছে।

দুর্রুল মুখতারে কিতাবুল কারাহিয়ায় البيع শীর্ষক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছে-

وَجَازَ تَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِه كَمَا فِىْ نَقْشِ الْمَسْجِدِ.

এ প্রসংগে শামীতে اَىْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন করীমকে সোনা-চান্দি দ্বারা অলংকৃত করা জায়েয। কেননা এতে এর প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়, যেমন মসজিদে কারুকার্য করা হয়। সাহাবায়ে কিরামের যুগে নির্দেশ ছিল কুরআনকে আয়াত, রুকু এবং ইরাব (যের যবর, পেশ ইত্যাদি) থেকে মুক্ত রাখুন। কিন্তু পরবর্তী যুগে যখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন এসব কাজ বৈধ এবং আবশ্যক হয়ে গেছে। সেই একই জায়গায় আরও বর্ণিত আছে-

وَمَارُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ جَرِّدُ وَالْقُرْاٰنَ كَانَ فِىْ زَمَنِهِمْ وَكَمْ مِنْ شَيْئٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

ইবনে মস্উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- 'কুরআনকে ইরাব ইত্যাদি থেকে মুক্ত

রাখুন।' এ আদেশটা তৎকালীন যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিল কিন্তু অনেক বিষয় কাল ও স্থানের পরিবর্তনের ফলে পাল্টে যায়। একই জায়গায় শামীতে আরও উল্লেখিত আছে কুরআনকে ছোট করে ছাপাবেন না অর্থাৎ ছোট আকারের করবেন না বরং এর কলম মোটা, হরফ বড় এবং আয়াত চিহ্ন স্পষ্ট হওয়া চাই। এ সব নির্দেশ কেন? একমাত্র কুরআনের মর্যাদার জন্যই এসব নির্দেশাবলী। অনুরূপ প্রথম যুগে কুরআন তিলওয়াত, আযান ও ইমামতির জন্য পারিশ্রামিক নেওয়া হারাম ছিল, যা হাদীছ ও ফিকাহ গ্রন্থে বিদ্যমান আছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রয়োজন বোধে জায়েয করা হয়েছে। হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে জীবিতদের জন্য পাকা ঘর তৈরী নিষেধ ছিল। জনৈক সাহাবী একটি পাকা ঘর তৈরী করেছিলেন। এতে হুযূর আলাইহিস সালাম নাখোশ হয়েছিলেন এমন কি তাঁর সালামের জবাবও দেননি। ওই ঘরটি ভেংগে ফেলার পরই সালামের জবাব দিয়েছিলেন। (মিশকাত শরীফের كتاب الرقاق এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখুন) একই পরিচ্ছেদে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

اِذَا لَمْ يُبَارَكْ لِلْعَبْدِ فِىْ مَالِهٖ جَعَلَهٗ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ .

সম্পদে না-বরকত হয়, যদি তা ইটের কাজে ব্যয় করে। কিন্তু এ সব নির্দেশ থাকা সত্বেও মুসলমানগণ পরবর্তী যুগে পাকা ঘর তৈরী করেছেন এবং মসজিদও পাকা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়! যারা আল্লাহর ওলীদের কবর সমূহ পাকা করা বা ওগুলোর উপর গম্বুজবিশিষ্ট ঘর তৈরী করাকে হারাম বলে, তারা নিজেদের ঘর সমূহকে কেন আলিশান ও পাকা করে? اَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ তারা কি কতেক হাদীছকে বিশ্বাস আর কতেককে অস্বীকার করে? আল্লাহ্ তাদেরকে বোধ শক্তি দান করুন। চতুর্থতঃ আল্লাহর ওলীগণের কবর সমূহ পাকা হওয়া এবং সেগুলোর উপর ইমারত স্থাপিত হওয়া ইসলাম প্রচারের সহায়ক। আজমীর শরীফ ও অন্যান্য মাযারে দেখা গেছে যে তথায় মুসলমানদের থেকে বেশী হিন্দু ও কাফিরগণ যাতায়াত করে। আমি এমন অনেক হিন্দু ও রাফেজীকে দেখেছি, যারা খাজা সাহেবের দরবারের শান-শওকত দেখে মুসলমান হয়ে গেছে।

বর্তমান হিন্দুস্থানে কাফিরগণ মুসলমানদের ওই সমস্ত ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা, গুলো দখল করে নিচ্ছে, যে গুলোতে কোন নিদর্শন নেই। এভাবে অনেক মসজিদ, খান্‌কা কবরস্থান নিদর্শন বিহীন হওয়ার কারণে ওদের দখলে চলে গেছে। কবরস্থানের সমস্ত কবর কাঁচা হলে, এ গুলো কিছু দিন পর ভেংগে চুরে সমান হয়ে যায়, এ সুযোগে কাফিরগণ দখল করে নেয়। সুতরাং এখন প্রত্যেক কবরস্থানের কিছু কিছু কবর পাকা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে কবরস্থানের চিহ্ন এবং এর সীমানা জানা থাকে।

www.AmarIslam.com

আমি নিজ গ্রামে স্বয়ং দেখেছি যে, দু'টি কবরস্থান ভরাট হয়ে গিয়েছিল। একটিতে কেবল দু'তিনটি কবর ছাড়া বাকী সবই কাঁচা কবর ছিল, অপরটির কিছু অংশে পাকা কবর ছিল, গরীব মুসলমানেরা গোপনে এ কবরস্থান দু'টি বিক্রী করে দিয়েছিল, যার জন্য মুকাদ্দমা হয়েছিল। প্রথম কবরস্থানটির পাকা কবরগুলো বাদ দিয়ে বাকী অংশ মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কেননা ওটাকে হাকিম নাল জমিন হিসেবে সাব্যস্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় কবরস্থানের অর্ধেকাংশ অর্থাৎ যে পর্যন্ত পাকা কবর ছিল, মুসলমানেরা পেয়েছিল, বাকী অংশের যেথায় কাঁচা কবর ছিল এবং সমতল হয়ে গিয়েছিল, কাফিরদের হাতে চলে যায়। কেননা সেই কবরস্থানের সীমানা পাকা কবরের চিহ্ন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং বাকী অংশের বিক্রয় সঠিক বলে রায় দেয়া হয়েছিল। এর থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে হিন্দুস্থানে কিছু কবর পাকা করা বিশেষ দরকার। কেননা, এটা ওয়াক্‌ফ বলবৎ রাখার মাধ্যম বিশেষ, যেমন মসজিদের জন্য মিনার।

১৯৬০ সালের জুলাই মাসে সংবাদপত্র সমূহে এ খবরটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল যে, মৌলভী ইসমাইল সাহেবের পীর সৈয়দ আহমদ সাহেব বেরলভীর কবর, যা বালাকোটে অবহেলিত অবস্থায় আছে, মেরামত করা হবে এবং এর উপর গম্বুজ হতে যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে জুলাই মাসের ২৯ তারিখ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান কায়েদে আযমের কবরের উপর ইমারত তৈরীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রায় এক লাখ মুসলমান অংশ গ্রহণ করেছিল এবং এ ইমারতের জন্য পঁচাত্তর লাখ টাকা বাজেট করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে দেওবন্দীদের নেতা মৌলভী ইহতেশামুল হক থানবীও বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য রাওয়াল পিন্ডির দৈনিক জংগ পত্রিকায় ১৯৬০ সালের ১২ই আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন- "অশেষ ধন্যবাদ, আজ বিপ্লবের নায়ক পাকিস্তানের জনকের কবরের উপর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। পাকিস্তানের বিগত সরকারগুলো এ পবিত্র কাজে অনেক অবহেলা করেছেন'। মুসলমানগণ, এরাই সেই দেওবন্দী, যারা এখনও মুসলমানদের কবর সমূহ ভেংগে ফেলার পক্ষপাতি এবং যারা নযদী সরকারকে সাহাবায়ে কিরামের কবর সমূহ ভেংগে ফেলার কারণে তার যোগে মুবারকবাদ জানিয়েছিল। অথচ আজ তারা কায়েদে আযমের কবরের উপর গম্বুজ ইত্যাদি তৈরী করায় অভিনন্দন জানাচ্ছে। তাদের কিতাবী মাযহাব এক ধরনের আর মৌখিক আমলী মাযহাব অন্য ধরনের। তাদের কথা হলো যেদিকে বাতাস সেদিক চলো। যা হোক দেওবন্দীরাও মাযারের উপর গম্বুজ তৈরী করার সমর্থক হলো।

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবরের উপর ইমারত তৈরী প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব

এ বিষয়ের উপর কেবল দু'টি আপত্তি রয়েছেঃ

১নং আপত্তিঃ মিশকাত শরীফের الدفن। অধ্যায়ে মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে-

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقَبُوْرُوَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ وَاَنْ يُّقْعَدَ عَلَيْهِ.

হুযূর আলাইহিস সালাম কবরের উপর চুনকাম করা, ইমারত তৈরী করা এবং এর উপর বসাটা নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু অধিকাংশ ফকীহগণ يُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقُبُوْر। কবরের উপর ইমারত তৈরী করাকে না পছন্দ করেছেন। উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা তিনটি কাজ হারাম বোঝা গেল- কবর পাকা করা, কবরের উপর ইমারত তৈরী করা এবং কবরের পাশে খাদিম বনে অবস্থান করা।

উত্তরঃ তিন ধরনের কবর পাকা করা নিষেধ- এক, কবরের আভ্যন্তরীন অংশ যা লাশের সাথে সংযুক্ত। এ জন্য হাদীছ শরীফে- اَنْ يُّجَصَّصَ الْقُبُوْرُ বলা হয়েছে, কিন্তু عَلَى الْقُبُوْر বলা হয়নি। দুই, সাধারণ মুসলমানদের কবর পাকা করা। কেননা এতে কোন ফায়দা নেই। তাই নির্বিশেষে প্রত্যেক কবরকে পাকা করতে নিষেধ করেছেন। তিন, কারুকার্য করার উদ্দেশ্যে, লৌকিকতার কারণে বা গর্ববোধ করার জন্য কবর পাকা করা। এ তিন ধরনের কবর পাকা করা নিষেধ। কিন্তু স্মৃতি রক্ষার জন্য যদি কোন আল্লাহর ওলীর কবর পাকা করা হয়, তাহলে জায়েয। কেননা হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত উছমান ইবনে মযউনের কবর পাথর দ্বারা তৈরী করিয়েছিলেন, যেমন প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত 'আশ্আতুল লুমআত' গ্রন্থে اَنْ يُّجَصَّصَ الْقُبُوْرُ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে لِمَا فِيْهِ مِنَ الزِّيْنَةِ وَالتَّكَلُّفِ কেননা এতে কেবল সজ্জিতকরণ ও লৌকিকতা প্রকাশ পায়। তাই বোঝা গেল যে যদি এজন্য না হয়, তাহলে জায়েয আছে। اَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ (কবরের উপর ইমারত তৈরী করা) এরও কয়েকটি অর্থ আছে এক, কবরের উপর এভাবে ইমারত তৈরী করা যে, কবরটা ওয়ালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন ফত্ওয়ায়ে শামীর 'দাফন' শীর্ষক অধ্যায়ে আছে-

وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ كَمَا فِى الْمُسْلِمِ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُّجَصَّصَ الْقُبُوْرَ وَاَنْ يُّبْنٰى عَلَيْهِ.

কবরকে এক হাত থেকে বেশী উঁচু করা নিষেধ। কেননা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আলাইহিস সালাম কবরকে পাকা করা এবং এর উপর কিছু তৈরী করা নিষেধ বলেছেন। একই অধ্যায়ে দুররুল মুখতারে বর্ণিত আছে-

وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ الْبِنَاءِ

কবরের উপর মাটির স্তুপ করা নিষেধ। কেননা এটা ইমারত তৈরী করার পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। এর থেকে বোঝা গেল যে, কবরের উপর তৈরী করা মানে কবর দেওয়ালের অভ্যন্তরে পতিত হওয়া। কিন্তু গম্বুজ যা কবরের চারিদিক পরিবেষ্টিত করে তৈরী করা হয়, নিষেধ নয়। দুই, এ নিষেধাজ্ঞা সাধারণ মুসলমানদের কবরের বেলায় প্রযোজ্য। তিন, এ ইমারত তৈরীর বিশ্লেষণ স্বয়ং অন্য হাদীছে রয়েছে, যেমন মিশকাত শরীফের المساجد। শীর্ষক অধ্যায়ে আছে-

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُّعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ.

(হে আল্লাহ, আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত কর না, যার পূজা করা হবে। ওই কওমের জন্য খোদার কঠিন গযব আছে, যারা স্বীয় নবীদের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

এর থেকে বোঝা গেল, কোন কবরকে মসজিদে পরিণত করা বা এর উপর ইমারত তৈরী করা বা সেদিক হয়ে নামায পড়া হারাম। এটাই হচ্ছে ঐ হাদীছের ভাবার্থ- কবরকে মসজিদে পরিণত করোনা। কবরকে মসজিদ বানানোর অর্থ হচ্ছে এর ইবাদত করা অথবা, একে কিবলা সাব্যস্ত করে সেদিকে সিজ্দা করা। আল্লামা ইবনে হাজর আস্কালানী (রহঃ) বুখারী শরীফের শরাহ ফত্হুল বারীতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ الْبَيْضَاوِىْ لَمَّا كَانَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى يَسْجُدُوْنَ لِقُبُوْرِ الْاَنْبِيَاءِ تَعْظِيْمًا لِشَانِهِمْ وَيَجْعَلُوْنَهَا قِبْلَةً يَتَوَجَّهُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ نَحْوَهَا وَاتَّخَذُوْهَا اَوْثَانًا لَعَنَهُمْ وَمَنَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَنْ مِثْلِ ذَالِكَ.

আল্লামা বয়যাবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে যখন ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় পয়গাম্বরদের কবর সমূহে তাযিমী সিজ্দা করতো এবং ওগুলোকে কেবলা বানিয়ে ওদিক হয়ে নামায পড়তো এবং ওনাদের কবর সমূহকে তারা মূর্তি বানিয়ে রেখেছিল,

তখন হুযূর আলাইহিস সালাম এর জন্য লানত দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে এর থেকে বারণ করেছেন।

এ হাদীছ দ্বারা আপত্তিকারীদের উপস্থাপিত হাদীছের ব্যাখ্যা হয়ে গেল এবং সুস্পষ্ট বোঝা গেল যে, গম্বুজ তৈরী করা থেকে নিষেধ করেননি বরং কবরকে সিজ্‌দাগাহে পরিণত করা থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁর এ নিষেধাজ্ঞা শরঈ হুকুম নয়; বরং এটা সংযম ও তক্ওয়ার শিক্ষা মাত্র। যেমন আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, বাসস্থান সমূহকেও পাকা করা থেকে বারণ করা হয়েছিল বরং পাকা ঘর ভেংগে দেয়া হয়েছিল। যদি ইমারত নির্মাণকারীর এ ধারণা থাকে যে ইমারতের দ্বারা মৃতব্যক্তির আরাম ও উপকার হয়, তাহলে নাজায়েয, কেননা এটা ভুল ধারণা। কিন্তু যিয়ারতকারীদের আরামের জন্য যদি ইমারত তৈরী করা হয়, তাহলে জায়েয।

আমি এসব বিশ্লেষণ এজন্য করছি যে, অনেক সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ বিশেষ কবরের উপর ইমারত তৈরী করেছেন। এটাকে সুন্নাতে সাহাবা বলা যায়। যেমন হযরত ফারুক (রাঃ) হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র কবরের চার পাশে ইমারত তৈরী করিয়েছেন। সৈয়্যদেনা হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একে আরও সুন্দর করেছেন। হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রাঃ) এর স্ত্রী তাঁর স্বামীর কবরের উপর তাঁবু স্থাপন করেছিলেন যা আমি মিশ্‌কাত শরীফের البكاء অধ্যায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি। হযরত যায়নুল আবেদীনের স্ত্রীর এ কার্যের প্রেক্ষাপটে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) তাঁর রচিত মিরকাত শরহে মিশকাতের البكاء অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন-

اَلظَّاهِرَ اَنَّهٗ لِاِجْتِمَاعِ الْاَحْبَابِ لِلذِّكْرِ وَالْقِرَأَةِ وَحُضُوْرِ الْاَصْحَابِ بِالْمَغْفِرَةِ اَمَّاحَمْلُ فِعْلِهَا عَلَى الْعَبْثِ الْمَكْرُوْهِ فَغَيْرُ لَائِقٍ لِصَنِيْعِ اَهْلِ الْبَيْتِ.

এটা সুস্পষ্ট যে, বন্ধুবান্ধব ও সাহাবা কিরামকে জমায়েত করার অভিপ্রায়ে এ ঘরটা তৈরী করা হয়েছিল, যাতে যিক্‌র আযকার, কুরআন তিলাওয়াত ও মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু উক্ত বিবি সাহেবানীর এ কাজকে অনর্থক অর্থাৎ মাকরূহ সাব্যস্ত করা আহলে বাইতের শানের পরিপন্থী।

পরিষ্কার বোঝা গেল, অনর্থক ইমারত তৈরী করা নিষেধ, কিন্তু যিয়ারতকারীদের আরামের জন্য জায়েয। অধিকন্তু হযরত উমর (রাঃ) হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শ (রাঃ) এর কবরের উপর গম্বুজবিশিষ্ট ঘর তৈরী করিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা

(রাঃ) নিজের ভাই হযরত আবদুর রহমান ও হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানীফা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করেছিলেন।

'মুনতকা শরহে মুতা ইমাম মালিক' গ্রন্থে হযরত আবু আবদে সুলায়মান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন-

وَضَرَبَهٗ عُمَرُ عَلٰى قَبْرِ زَيْنَبَ جَحْشٍ وَضَرَبَتْهُ عَائِشَةُ عَلٰى قَبْرِ اَخِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَضَرَبَهٗ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَلٰى قَبْرِابْنِ عَبَّاسٍ وَاِنَّمَا كَرِهَهٗ لِمَنْ ضَرَبَهٗ عَلٰى وَجْهِ السُّمْعَةِ وَالْمُبَاهَةِ.

হযরত উমর (রাঃ) যয়নব বিনতে জাহ্‌শের কবরের উপর, হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বীয় ভাই আবদুর রহমানের কবরের উপর এবং মুহাম্মদ ইবনে হানীফা (ইবনে হযরত আলী) ইবনে আব্বাসের কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করেছিলেন। যিনি গম্বুজ তৈরী করাকে মাকরূহ বলেছেন, তিনি এ শর্তে বলেছেন যে, যদি গর্ববোধ ও ভন্ডামী করার অভিপ্রায়ে এটা তৈরী করা হয়।

প্রসিদ্ধ 'বদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

رُوِىَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا مَاتَ بِالطَّائِفِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ وَجَعَلَ قَبْرَهٗ مُسَنَّمًا وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَطًا.

যখন তায়িফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইন্তিকাল ফরমান, তখন হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানীফা তাঁর জানাযার নামায পড়েছেন, কবর প্রস্তুত করেছেন এবং কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করিয়েছিলেন।

বুখারী শরীফের শরাহ আইনীতে আছে- ضَرَبَهٗ مُحَمَّدَابْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَلٰى قَبْرِابْنِ عَبَّاسٍ. হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানীফা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম এ কাজটি (অর্থাৎ গম্বুজ তৈরী) করলেন এবং সমস্ত উম্মত রসুলে খোদার রওযা মুবারকে যেতে আছে। কোন মুহাদ্দিছ, কোন ফকীহ কোন আলিম এ রওযা পাক নিয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। তাই উপরোক্ত হাদীছের সেই বিশ্লেষণই করতে হবে, যা আমি করেছি। আর কবরের উপর বসার অর্থ হচ্ছে, স্বয়ং কবরের উপর চড়ে বসা, যা নিষেধ। কিন্তু খাদিম হওয়া নিষেধ নয়। খাদিম হচ্ছে, যিনি কবরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, মাযারের দরজার চাবি নিজের কাছে রাখেন ইত্যাদি। এ কাজটা সাহাবায়ে কিরাম থেকে

প্রমাণিত আছে। মুসলমানদের মাতা হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) হুযূর আলাইহিস সালামের রওযা পাকের পরিচর্যাকারিনী ও চাবি রক্ষয়িত্রী ছিলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম যিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তাঁর দ্বারা তালা খুলে যিয়ারত করতেন। (মিশকাত শরীফের الدفن অধ্যায়ে দেখুন) এখনও হুযূর (দঃ) এর রওযা পাকের খাদিম নিয়োজিত আছেন এবং কেউ ওটাকে নাজায়েয বলেন নি।

২নং আপত্তি- মিশ্‌কাত শরীফের الدفن অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَعَنْ اَبِىْ هَيَاجِ نِ الْاَسَدِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَلِىٌّ اَلاَ اَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنْ لاَّتَدَعَ تِمْثَالاً اِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا اِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

আবু হায়াজ আসদী থেকে বর্ণিত আছে- হযরত আলী (রাঃ) আমাকে বলেছেন, "আমি কি তোমাকে ওই কাজের জন্য পাঠাবো না, যে কাজের জন্য আমাকে হুযূর আলাইহিস সালাম পাঠাতেন? কাজটি হচ্ছে কোন ফটো বিনষ্ট করা ছাড়া রাখিও না এবং কোন উঁচু কবর রাখিও না, একে সমান করে দাও।

বুখারী শরীফের প্রথম অধ্যায়ে কিতাবুল জনায়েযের الجريد على القبر শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَرَوٰى اِبْنَ عُمَرَ فُسطَاطًا عَلٰى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اِنْزَعْهُ يَاغُلاَمُ فَاِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত আবদুর রহমানের কবরের উপর তাঁবু দেখে বলেছিলেন "হে বৎস, একে সরিয়ে ফেল, কেননা ওর আমলই ওর উপর ছায়া দিচ্ছে।

এ হাদীছ দু'টি থেকে বোঝা গেল যে, যদি কোন কবরের উপর ইমারত তৈরী করা হয় বা কোন কবরকে উঁচু করা হয়, তাহলে ভেংগে দেয়া দরকার।

বিঃ দ্রঃ- এ হাদীছের আশ্রয় নিয়ে নজদী ওহাবীরা সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের মাযারসমূহ ভেংগে ধুলিস্যাৎ করে দেয়।

উত্তরঃ যেসব কবরকে ভেংগে ফেলার জন্য হযরত আলী (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওগুলো কাফিরদেরই কবর ছিল, মুসলমানদের নয়। এর কয়েকটি প্রমাণ রয়েছে- প্রথমতঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন- আমি তোমাকে ঐ কাজের জন্য পাঠাচ্ছি, যেটার জন্য আমাকে হুযূর আলাইহিস সালাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর

www.AmarIslam.com

আলাইহিস সালামের যুগে হযরত আলী (রাঃ) যেসব কবর ধ্বংস করেছিলেন, ওগুলো কিছুতেই মুসলমানদের কবর হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেক সাহাবার দাফন কার্যে হুযূর আলাইহিস সালাম অংশ গ্রহণ করতেন। অধিকন্তু সাহাবায়ে কিরামও হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতেন না। সুতরাং ঐ সময় মুসলমানদের যা কবর ছিল, ওগুলো হয়তো হুযূর আলাইহিস সালামের উপস্থিতিতে বা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে হয়েছিল। তাহলে ওগুলো আবার কোন্ মুসলমানদের কবর ছিল, যা অবৈধ হয়েছিল এবং ভেংগে ফেলতে হলো? অবশ্য ইহুদীদের কবর উঁচু করা হতো। যেমন বুখারী শরীফে মসজিদে নববীর নির্মাণের বর্ণনা প্রসংগে উল্লেখিত আছে-

اَمَرَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ.

হুযূর আলাইহিস সালাম মুশরিকদের কবর সমূহের বেলায় হুকুম দিয়েছিলেন। তখন ওগুলোকে উপড়ে ফেলা হয়েছিল।

হযরত হাফেজ ইবনে হাজর (রাঃ) ফতহুল বারী শরহে বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- اَىْ دُوْنَ غَيْرِهَا مِنْ قُبُوْرِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَتْبَاعِهِمْ لِمَا فِىْ ذَالِكَ اِهَانَةٌ لَهُمْ. অর্থাৎ নবীগণ ও এদের অনুসারীদের কবরসমূহ বাদ দিয়ে, কেননা ওনাদের কবর উপড়ে ফেলাটা ওনাদের প্রতি অবমাননাকর হবে। অন্যত্র আরও উল্লেখ করেছেন।

وَفِى الْحَدِيْثِ جَوَازُ تَصَرُّفِ فِى الْمَقْبَرَةِ الْمَمْلُوْكَةِ وَجَوَازُ نَبْشِ قُبُوْرِ الدَّارِسَةِ اِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمَةً.

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে কবরস্থান ইসলামী হুকুমতের অধীনে এসে গেছে, এতে হস্তক্ষেপ করা জায়েয এবং পুরাতন কবরসমূহের উপড়ে ফেলা যাবে। তবে শর্ত হলো, যেগুলো উপড়ে ফেলা হারাম, সেগুলো বাদ দিতে হবে।

উপরে উল্লেখিত হাদীছ এবং এর ব্যাখ্যা দ্বারা বিরোধিতাকারীদের উত্থাপিত হযরত আলী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা হয়ে গেল অর্থাৎ সে হাদীছে মুশরিকদের কবর ভেংগে ফেলার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীছে কবরের সাথে ফটোর কথাও উল্লেখিত আছে। কিন্তু মুসলমানদের কবরেতো ফটো থাকে না। তাই কাফিরদের কবরই বোঝা যায়, কেননা, ওদের কবরসমূহে মৃতব্যক্তির ফটোও দেয়া হয়। তৃতীয়তঃ উল্লেখিত হাদীছে বলা হয়েছে 'কবরকে যমীনের বরাবর করে দাও, কিন্তু মুসলমানদের কবরের বেলায় যমীন থেকে এক হাত উঁচু রাখা সুন্নাত। এতে যমীনের সাথে মিলিয়ে দেয়া' সুন্নাতের বরখেলাপ। তাই মানতেই হবে যে, ওই কবরসমূহ

www.AmarIslam.com

কাফিরদেরই ছিল। অন্যথায় আশ্চর্যকর মনে হবে যে, হযরত আলী (রাঃ) উচুঁ কবরসমূহ উপড়ে ফেলেছেন আর তাঁরই সন্তান মুহাম্মদ ইবনে হানীফা হযরত ইবনে আব্বাসের কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করলেন। যদি কোন মুসলমানের কবর অতিরিক্ত উঁচুও হয়ে যায়, তবুও একে উপড়ে ফেলা উচিত নয়, কেননা, এতে মুসলমানের অবমাননা হয়। প্রথমেই উঁচু করানো। তবে যদি হয়ে যায়, তাহলে ভেংগে ফেল না। দেখুন, ছোট সাইজের কুরআন ছাপানো নিষেধ (শামী, কিতাবুল কারাহিয়া দ্রষ্টব্য) কিন্তু যদি ছাপানো হয়ে গেল, তাহলে ফেলে দিও না বা জ্বালিয়ে ফেল না। কেননা এতে কুরআন শরীফের অবমাননা বোঝায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে- কবরের উপর বসা, ওখানে মলমূত্র ত্যাগ করা, জুতা পরে বা এমনি চলাফেরা করা নিষেধ। কিন্তু আফ্সোস! নজদী সরকার সাহাবায়ে কিরামের মাযার সমূহ ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। অথচ জিদ্দা শহরে খৃষ্টানদের উঁচু উঁচু কবর নিয়মিত হতেই আছে। হুযূর আলাইহিস সালাম ঠিকই বলেছেন يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَتْرُكُوْنَ اَهْلَ الْاَصْنَامِ (তারা মুসলমানদেরকেই হত্যা করবে এবং মূর্তি পূজারীদেরকে ছেড়ে দেবে।) প্রত্যেকের স্বজাতির প্রতি টান থাকে। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদীছ প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নিছক বোকামী বৈ কিছু নয়। তিনিতো স্বয়ং বলেছেন-মৃত ব্যক্তির ছায়ার জন্য তার আমল সমূহই যথেষ্ট। যার ফলে বোঝা গেল যে মৃত ব্যক্তির ছায়ার জন্য যদি গম্বুজ বানানো হয়, তাহলে নাজায়েয। তবে যিয়ারতকারীদের আরামের জন্যে বানানো হলে জায়েয। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আইনী"তে হযরত ইবনে উমরের এ হাদীছের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে-

وَهِيَ اِشَارَةٌ اِلَى اَنَّ ضَرْبَ الْفُسْطَاطِ بِغَرْضٍ صَحِيْحٍ كَالتَّسَتُّرِ مِنَ الشَّمْسِ مَثَلًا لِلْاَحْيَاءِ لَا لِاِظْلَالِ الْمَيِّتِ جَازَ.

এ হাদীছ দ্বারা ওইদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে বৈধ উদ্দেশ্যে তাঁবু টাঙানো অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ছায়ার জন্য নয়, জীবিতদেরকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য জায়েয আছে।

এ ব্যাপারে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। একবার দ্বিপ্রহরের সময় হযরত মোল্লা আবদুল হাকীম ফাজিলে শিয়ালকুটি (রঃ) এর মাযার যিয়ারত করার একান্ত বাসনা নিয়ে শিয়ালকোর্ট গিয়েছিলাম। কিন্তু কবরের উপর কোন ছাউনি না থাকায়, তদুপরি মাটির গরম ও প্রখর রৌদ্রের কারণে তাড়াহুড়ো করে কোন মতে দু'এক আয়াত পাঠ করে চলে আসতে বাধ্য হলাম। মনের আবেগ মনেই রয়ে গেল। ওই

দিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম মাযারের উপর ইমারত তৈরী করার অনেক ফায়দা রয়েছে। তাফসীরে রূহুল বয়ানে ২৬ পারা সূরা ফ'তাহের আয়াত اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে যে কতেক অহংকারী লোক বলে যে যেহেতু আজকাল লোকেরা আওলিয়া কিরামের কবর সমূহের তাযীম করে, তাই আমরা ওসব কবর সমূহ ভেংগে ফেলবো, যাতে এসব লোকেরা বুঝতে পারে যে আওলিয়া কিরামের কোন ক্ষমতা নেই। তা না হলে ওনারা নিজেদের কবর সমূহকে উচ্ছেদ করা থেকে রক্ষা করতেন-

فَاعْلَمْ اَنَّ هٰذَا الصَّنِيْعَ كُفْرٌ صُرَاحٌ مَا خُوْذٌ مِنْ قَوْلِ فِرْعَوْنَ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ او يظهر فى الارض الفساد.

কিন্তু জেনে রাখ যে, এ ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে কুফরী। এটা ফিরাউনের সে উক্তিরই প্রতিধ্বনি। (যেমন সে বলেছিল) "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মূসাকে কতল করব। সে ইচ্ছা করলে তার খোদাকে ডাকুক। আমার ভয় হচ্ছে যে, সে তোমাদের ধর্মকে পালটে দেবে এবং পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করবে।"

কেউ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, যদি আওলিয়া কিরাম ও সাহাবায়ে কিরামের কোন ক্ষমতা থাকতো, তাহলে নজদী- ওহাবীদের থেকে নিজেদের কবর সমূহকে কেন রক্ষা করতে পারলো না? বোঝা গেল যে এগুলো নিষ্প্রাণ। তাই ওদের সম্মান-অসম্মান আবার কিসের? আমি এর উত্তরে বলেছিলাম হুযূর আলাইহিস সালামের আগমনের আগে পবিত্র কা'বা শরীফে ৩৬০টি মূর্তি ছিল এবং হাদীছ শরীফে আছে যে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এক ব্যক্তি কা'বা শরীফকে ভেংগে ফেলবে। বর্তমান লাহোরের শহীদগঞ্জ মসজিদ শিখদের গুরদুয়ারায় পরিণত হয়ে গেছে এবং হিন্দুস্থানে অনেক মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তাহলে হিন্দুরা যদি বলে খোদার যদি শক্তি থাকতো, তাহলে আমাদের হাত থেকে তার ঘরকে কেন রক্ষা করলো না? এর উত্তরে কি বলবেন? আল্লাহর ওলীগণ বা তাঁদের মাযারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাঁদের খোদা প্রাপ্তির কারণেই করা হয়, কেবল ক্ষমতাবান বলে নয়, যেমন মসজিদসমূহ ও মক্কাশরীফের সম্মান করা হয়। ইবনে সাউদ অনেক মসজিদ ভেংগে ফেলেছে, যেমন সাফা পাহাড়ের উপর স্থাপিত হযরত বিলালের মসজিদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.AmarIslam.com

মাযারে ফুল অর্পণ, গিলাফ চড়ান ও বাতি জ্বালান প্রসঙ্গে আলোচনা

এখানে তিনটি মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে- কবরে ফুল অর্পণ, চাদর চড়ান ও বাতি জ্বালান। উলামায়ে আহলে সুন্নাতের অভিমত হলো প্রত্যেক মুমিনের কবরে সে আল্লাহর ওলী হোক বা গুনাহগার হোক ফুল অর্পণ জায়েয। এবং আওলিয়া, উলামা ও পুণ্যাত্মাদের কবরসমূহের উপর গিলাফ চড়ানও জায়েয। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের কবরের উপর নাজায়েয, কেননা এর দ্বারা ওর কোন উপকার হবে না। আর বাতি জ্বালান সম্পর্কে অভিমত হলো যে, সাধারণ মুসলমানের কবরে বিনা প্রয়োজনে বাতি জালানো না জায়েয, তবে প্রয়োজন বোধে জায়েয আছে। আর আওলিয়া কিরামের মাযারে সাহেবে মাযারের শান-মান প্রকাশার্থে বাতি জ্বালানো জায়েয। প্রয়োজনবোধ তিন ধরনের হতে পারে, যেমন রাত্রে লাশ দাফন করতে বাতির প্রয়োজন, তখন জায়েয। রাস্তার পার্শ্বে কবর রয়েছে তাই এ জন্যে বাতি জ্বালিয়ে রাখা প্রয়োজন, যেন কেউ হোঁচট না খায় বা কবর জেনে ফাতিহা পাঠ করলো, তাহলে জায়েয। অথবা কোন ব্যক্তি রাত্রে কোন মুসলমানের কবরে গেল এবং সেখানে কুরআন শরীফ ইত্যাদি দেখে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলো, তখন বাতি জ্বালিয়ে রাখা জায়েয। এ তিন অবস্থা ব্যতীত বাতি জ্বালানো যেহেতু অপব্যয় ও ব্যয় বহুলতা মাত্র, তাই নিষেধ। আওলিয়া কিরামের মাযারে উপরোক্ত কোন প্রয়োজন না থাকলেও ওলীর সম্মানে এক বা একাধিক বাতি জ্বালানো জায়েয। বিরোধিতাকারীরা এ তিনটা বিষয়কে না জায়েয মনে করে। তাই এ আলোচনাকে দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এসবের বৈধতার প্রমাণ করা হয়েছে। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মাযারে ফুল অর্পণ, গিলাফ চড়ান ও বাতি জ্বালানোর প্রমাণাদি

আমি এর আগের বহছে আরয করেছি যে আল্লাহর ওলীগণ ও তাঁদের মাযারসমূহ আল্লাহর নিদর্শন এবং আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অর্থাৎ ধর্মের নিশান সমূহের সম্মান করার জন্য কুরআনী নির্দেশ রয়েছে- وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ (কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে, এ-তো তার হৃদয়ের তাক্ওয়া সঞ্জাত)।

এ সম্মানের বেলায় কোন শর্তারোপ করা হয়নি। এক এক দেশে এক এক ধরনের রীতি প্রচলিত আছে। যেই দেশে এবং যেই সময়ে যে ধরনের বৈধ তাযীম প্রচলিত

আছে, সেই মতে করা জায়েয। তাঁদের কবরসমূহে ফুল অর্পণ, চাদর চড়ান ও বাতি জ্বালানো ইত্যাদির উদ্দেশ্য সম্মান প্রদর্শন, তাই এগুলো জায়েয। তাজা ফুলে যেহেতু এক প্রকার জীবন আছে, সেহেতু ওটা তসবীহ তাহলীল করে। যার ফলে মৃতব্যক্তি ছওয়াব পেয়ে থাকেন অথবা তাঁর শাস্তি হ্রাস পায় এবং যিয়ারতকারীগণ এর থেকে সুঘ্রাণ লাভ করে। তাই এটা প্রত্যেক মুসলমানের কবরের উপর অর্পন করা জায়েয। এর তাসবীহের বরকতে যে মৃতব্যক্তির আযাব হ্রাস পায়, এর প্রমাণ মিশ্কাত শরীফের اداب الخلاء অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের সেই হাদীছে রয়েছে, যেখানে বর্ণিত আছে একবার হুযুর আলাইহিস সালাম দু'কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ইরশাদ ফরমান মৃতদ্বয়ের আযাব হচ্ছে। এদের মধ্যে একজন প্রস্রাবের ছিটা থেকে সতর্ক থাকতো না এবং অপরজন পরনিন্দা করতো।

ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَفِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا.

অতঃপর তিনি (দঃ) একটি কাঁচা ডাল নিয়ে তা দু'ভাগ করে দু'কবরে গেঁড়ে দিলেন। সাহাবাগণ আরয করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি এরকম কেন করলেন? তখন তিনি বললেন- যতক্ষণ পর্যন্ত এ ডাল না শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের আযাব কম হবে। এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন-

وَقِيْلَ اِنَّهُمَا يُسَبِّحْنِ مَادَامَ رَطْبَتَيْنِ وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرْاءَةَ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهٰذَالْحَدِيْثِ اِذْ تِلَاوَتَ الْقُرْاٰنِ اَوْلٰى بِالتَّخْفِيْفِ مِنْ تَسْبِيْحِ الْجَرِيْدِ.

যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল কাঁচা থাকবে ততক্ষণ তসবীহ পাঠ করবে। এ জন্য আযাব কম হবে। এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে উলামায়ে কিরাম কবরের পার্শ্বে কুরআন পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কেননা আযাব কমানোর বেলায় ডালের তসবীহ থেকে কুরআন তিল্ওয়াতের গুরুত্ব অনেক বেশী।

'আশ্আতুল লুমআত' গ্রন্থে এ হাদীছের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে-

تمسك كنند جماعت به ايں حديث درانداختن سبزه وگل ريحان برقبور.

একটি জামাত এ হাদীছকে কবর সমূহে কাঁচা ফুল ও সুগন্ধি দেয়ার বৈধতার দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মিরকাতে বর্ণিত আছে-

وَمِنْ ثَمَّ اَفْتٰى بَعْضُ الْاَئِمَّةِ مِنْ مُتَاخِّرِىْ اَصْحَابِنَا بِاَنَّ مَا اعْتِيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدِ سُنَّةٌ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِىُّ اَنَّ يَرِيْدَ ابْنَ الْخَضِيْبِ الصَّحَابِىَّ اَوْصٰى اَنْ يُجْعَلَ فِىْ قَبْرِهٖ جَرِيْدَ تَانِ.

বোঝা গেল যে, মাযারে ফুল দেয়া সুন্নাত। প্রসিদ্ধ তাহ্তাবী আলা মরাকিল ফলাহ কিতাবের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

قَدْ اَفْتٰى بَعْضُ الْاَئِمَّةِ مِنْ مُتَاخِّرِىْ اَصْحَابِنَا بِاَنَّ مَا اعْتِيْدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدِ سُنَّةٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

আমাদের উলামায়ে কিরাম এ হাদীছ থেকে ফত্ওয়া দিয়েছেন যে, কবরে সুগন্ধি ও ফুল অর্পণের যে রীতি আছে, তা' সুন্নাত।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত ইবারত সমূহে "কতেক আলিম ফত্ওয়া দিয়েছেন" এর ভাবার্থ জায়েয বলা নয়, বরং এর ভাবার্থ হচ্ছে কতেক আলিম একে সুন্নাত মনে করেছেন। কেননা জায়েযতো সবাই বলেন, কেবল সুন্নাত বলার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবুল কারাহাত পঞ্চম খণ্ড زيارت القبور শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে- وَضْعُ الْوَرُوْدِ وَالرَّيَاحِيْنِ عَلَى الْقُبُوْرِ حَسَنٌ. কবর সমূহের উপর ফুল ও সুগন্ধি রাখা উত্তম। ফত্ওয়ায়ে শামীর زيارت القبور শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَيُوْخَذُ مِنْ ذَالِكَ وَمِنَ الْحَدِيْثِ نَدْبُ وَضْعِ ذَالِكَ لِلْاِتِّبَاعِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا اعْتِيْدَ فِىْ زَمَانِنَا مِنْ وَضْعِ اَغْصَانِ الْاٰسِ وَنَحْوِهٖ

এ হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছ থেকে ওই সমস্ত জিনিস কবরের উপরে রাখাটা মুস্তাহাব বোঝা যায় এবং এ সুবাদে কবরের উপর খেজুর গাছের ডাল ইত্যাদি দেওয়াটা, যা আমাদের যুগে প্রচলিত আছে, তা মুস্তাহাব বলা যাবে। একই জায়গায় শামীতে আরও উল্লেখিত আছে-

وَتَعْلِيْلُهٗ بِالتَّخْفِيْفِ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبِسَا اَىْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا بِبَرْكَةِ تَسْبِيْحِهِمَا اِذْ هُوَ اَكْمَلُ مِنْ تَسْبِيْحِ الْيَابِسِ لِمَا فِى الْاَخْضَرِ نَوْعُ حَيَاةٍ.

শুকনা না হওয়াটাই হচ্ছে আযাব কম হওয়ার কারণ অর্থাৎ ওইসবের তসবীহের বরকতে কবর আযাব কম হবে, কেননা কাঁচা ডালের তসবীহ শুকনা ডালের তসবীহ থেকে বেশী কার্যকর। কারণ ওটাতে এক প্রকার জীবন রয়েছে।

উপরোক্ত হাদীছ, মুহাদ্দেছীন ও ফকীহগণের ইবারতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল-একটি হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের কবরে সজীব বস্তু রাখা জায়েয। হুযূর আলাইহিস সালাম ওই দু'কবরের উপর ডাল পুঁতে দিয়েছিলেন, যাদের আযাব হচ্ছিল। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আযাব কম হওয়াটা কেবল হুযূর আলাইহিস সালামের দুআর কারণে নয় বরং এটা সজীব বস্তুর তসবীহের বরকতের ফল। যদি কেবল দুআয় আযাব কম হতো, তাহলে হাদীছে শুকনা হওয়ার শর্তারোপ কেন করা হলো? তাই, আজকাল আমরাও যদি ফুল ইত্যাদি অর্পণ করি, তাতেও ইনশাআল্লাহ্ মৃতব্যক্তির উপকার হবে। সাধারণ মুসলমানদের কবর কাঁচা রাখার এটাও একটা অভিপ্রায় যে বর্ষাকালে এর উপর সবুজ ঘাস জন্মাবে এবং এর তসবীহের বরকতে মৃতব্যক্তির আযাব কম হবে। অতএব, প্রমাণিত হলো, প্রত্যেক মুসলমানের কবরে ফুল ইত্যাদি অর্পণ জায়েয। মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব 'ইস্লাহুর রুসুম' গ্রন্থে লিখেছেন যে ফুলমূল ইত্যাদি পাপী তাপীদের কবর সমূহে অর্পণ করা উচিৎ, আওলিয়া কিরামের কবরে নয়। কেননা তাঁদের মাযার সমূহে আযাব হয় না। কথা ঠিক, তবে জেনে রাখা দরকার যে, যেই আমলসমূহ পাপীদের পাপ হ্রাস করে, তা নেকবান্দাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়তা করে। যেমন মসজিদের দিকে যাত্রা করলে আমাদের গুনাহ্ মাফ হয় আর নেকবান্দাদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ওনার যুক্তি থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে নেকবান্দাগণ যেন মসজিদে না আসেন এবং মাগফিরাতও কামনা না করেন, কেননা তাঁরা গুনাহ থেকে পবিত্র। জনাব, ওইসব ফুলের তসবীহের বরকতে তাঁদের কবরে খোদার রহম আরও বৃদ্ধি পায়, যেমনি কুরআন তিলাওয়াতের ফলে হয়ে থাকে।

(২) আওলিয়া কিরামের কবরের উপর চাদর বা গিলাফ চড়ান জায়েয, কেননা এ ফলে যিয়ারতকারীদের কাছে ছাহেবে কবরের মর্যাদা প্রকাশ পায়। ফত্ওয়ায়ে শামীর পঞ্চম খণ্ড কিতাবুল কারাহিয়া اللبس শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

قَالَ فِىْ فَتَاوٰى الْحُجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُوْرَ عَلَى الْقُبُوْرِ وَلٰكِنْ نَحْنُ نَقُوْلُ الْاٰنَ اِذَا قَصَدَبِهِ التَّعْظِيْمَ فِىْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ لَا يَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ بَلْ جَلْبُ الْخُشُوْعِ وَالْاَدَبِ لِلْغٰفِلِيْنَ وَالزَّائِرِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ.

অর্থাৎ ফত্ওয়ায়ে হুজ্জাতে আছে যে, কবরে গিলাফ চড়ান মাকরূহ। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, বর্তমান কালে যদি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সম্মানবোধ প্রত্যশা করা হয়, যাতে কবরবাসীর প্রতি অবজ্ঞা করা না হয় বরং উদাসীন ব্যক্তিদের মনে আদব ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, তাহলে গিলাফ চড়ান জায়েয। কেননা আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

ফত্ওয়াযে শামীর এ ইবারত থেকে বোঝা গেল যে, আল্লাহর ওলীগণের শান-মান প্রকাশ করার জন্য যে কোন বৈধ কাজ জায়েয। গিলাফ চড়ানোর গোড়ার কথা হলো যে, হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র যুগেও পবিত্র কাবা ঘরে গিলাফ ছিল। তিনি (দঃ) এটা নিষেধ করেননি। শত শত বছর থেকে হুযূর আলাইহিস সালামের রওযা পাকের উপর সবুজ রং এর রেশমী চাদর চড়ানো আছে, যা খুবই মুল্যবান। আজ পর্যন্ত কেউ একে নাজায়েয বলেননি। মকামে ইব্রাহীম অর্থাৎ যেই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত খলীল (আঃ) কাবা শরীফ তৈরী করেছিলেন, সেই পাথরের উপরও গিলাফ চড়ানো আছে এবং ইমারত তৈরী করা হয়েছে। খোদার কি শান! নজদী ওহাবীরাও ওগুলোকে পূর্ববৎ রেখে দিয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এগুলোর উপর কেন গিলাফ চড়ানো হলো? নিশ্চয় এসবের মর্যাদার জন্য তা করা হয়েছে। অনুরূপ আওলিয়া কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁদের কবর সমূহের উপরও গিলাফ ইত্যাদি রাখা মুস্তাহাব। তফসীরে রূহুল বয়ানের দশ পারায় সূরা তওবার আয়াত اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত আছেঃ-

فَبِنَاءُ الْقِبَابِ عَلٰى قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَوَضْعُ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلٰى قُبُوْرِهِمْ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَالِكَ التَّعْظِيْمَ فِىْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَا يَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ.

উলামা, আওলিয়া ও পুণ্যাত্মাদের কবরসমূহের উপর ইমারত তৈরী করা এবং

গিলাফ, পাগড়ী, চাদর চড়ানো জায়েয, যদি এর দ্বারা, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তাঁদের সম্মান প্রকাশ এবং লোকেরা যেন তাঁদেরকে নগণ্য মনে না করে, এ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

(৩) সাধারণ মুসলমানদের কবরে প্রয়োজনবোধে এবং আল্লাহর ওলীদের মাযারসমূহে তাদের শান-মান প্রকাশার্থে বাতি জ্বালানো জায়েয। যেমন প্রসিদ্ধ কিতাব হাদিকায়ে নদিয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া (মিসরী) দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

اِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ اِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَاِتْلَافُ مَالٍ كَذَافِى الْبَزَّازِيَّةِ وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا خَلَا عَنْ فَائِدَةٍ وَاَمَّا اِذَا كَانَ مَوْضِعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا اَوْ عَلٰى طَرِيْقٍ اَوْ كَانَ هُنَاكَ اَحَدٌ جَالِسًا اَوْ كَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ اَوْ عَالِمٍ مِنَ الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا لِرُوْحِهٖ اِعْلَامًا لِلنَّاسِ اَنَّهٗ وَلِيٌّ لِيَتَبَرَّكُوْابِهٖ وَيَدْعُوْا اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهٗ فَيَسْتَجَابَ لَهُمْ فَهُوَاَمْرٌجَائِزٌ.

কবরসমূহে বাতি নিয়া যাওয়া বিদ্আত এবং অপব্যয়। অনুরূপ ফত্ওয়ায়ে বযাযিয়াতেও উল্লেখিত আছে যে, এসব নির্দেশ তখনই প্রযোজ্য, যখন অনর্থক করা হবে। কিন্তু যদি কবরস্থানে মসজিদ হয় বা কবরটা রাস্তার পার্শ্বে হয় বা ওখানে কেউ বসে আছেন এমন হয়, অথবা যদি কোন ওলী বা কোন বিশিষ্ট আলিমের কবর হয়, তাহলে তাঁদের আত্মার প্রতি সম্মানের জন্য এবং জনগণের অবগতির জন্য, যাতে এটা ওলীর কবর বুঝতে পেরে ফয়েয হাসিল করতে পারে এবং ওখানে বসে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারে, বাতি জ্বালানো জায়েয।

তাফসীরে রূহুল বয়ানে দশ পারার সূরা তওবার আয়াত اِنَّمَايَعْمُرُمَسٰجِدَ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লেখিত আছে-

وَكَذَا اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْاِجْلَالِ لِلْاَوْلِيَاءِ فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَهُمْ وَمَحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ لَايَنْبَغِى النَّهْىُ عَنْهُ.

অনুরূপ আওলিয়া কিরাম ও পুণ্যাত্মাদের কবরের কাছে তাঁদের শান-মানের জন্য প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালানো যেহেতু সঠিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত, সেহেতু জায়েয এবং আওলিয়া কিরামের (মাযারের) জন্য তৈল ও মোমবাতি বা তাঁদের কবরের পার্শ্বে তাদেরই সম্মানার্থে জ্বালানো হয়। এ উদ্দেশ্যে মানত করা জায়েয। এ ব্যাপারে নিষেধ না করা উচিত।

আল্লামা নাবলুসী (রহঃ) স্বরচিত 'কাশপুন নূর আন আসহাবিল কুবুর' পুস্তিকায় একই বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বিবেকও তাই বলে। অর্থাৎ এসব কাজ জায়েয, যেমন আমি গম্বুজের আলোচনায় বলেছি যে ওসব আওলিয়া কিরামের মাযারের শান-শওকতের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ইসলামেরই শান-শওকত প্রকাশ পায়। ওয়ায়েজী আলিমের উন্নতমানের পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত। ঈদের দিন প্রত্যেক মুসলমানের ভাল কাপড় পরিধান করা ও সুগন্ধি ইত্যাদি লাগানো সুন্নাত কেন জানেন? যাতে, তার সাথে আলিংগন করতে লোক আগ্রহান্বিত হয়। এতে বোঝা গেল, যার সাথে সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্ক, তার উচিৎ পরিপাটি অবস্থায় থাকা। আওলিয়া কিরামের মাযারসমূহ আল্লাহর বান্দাদের যিয়ারতের স্থান। তাই ও গুলোকেও পরিপাটি অবস্থায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

আমি নজদী ওহাবীদের আমলে হজ্ব করতে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে দেখি কাবা শরীফের চারিদিকে বৃত্তাকারে অনেক বিজলী বাতি জ্বলছে এবং হাতিম শরীফের দেয়ালেও আলো ছিল। ঠিক কাবা শরীফের দরজার সামনে চার চারটি আলোকবর্তিকা জ্বালানো হতো। যখন মদীনা শরীফে এলাম সেখানে রওযা পাককে কাবা শরীফ থেকেও আলোকোজ্জ্বল দেখলাম। ওখানকার বাল্বগুলো খুবই প্রখর ও উজ্জ্বল ছিল। মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি ও মহত্ব প্রকাশ করার জন্যই এর আয়োজন। আওলিয়া কিরামের মাযারসমূহেও অনুরূপ আলোর ব্যবস্থা করলে ক্ষতি কি? আজকাল বিয়ে শাদী উপলক্ষে বাড়ীঘর আলোকসজ্জিত করা হয়ে থাকে। অনেক সময় তৈলের প্রদীপও জ্বালানো হয়, যার জন্য অনেক তৈল লাগে। মাদ্রাসার সভায় আলোকসজ্জাখাতে অনেক টাকা খরচ হয়। মাত্র কয়েক বছর আগের কথা, দেওবন্দীরা মুরাদাবাদে জমিয়তে উলামার এক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল, যেখানে চোখ ঝলসানো বিজলী বাতি লাগানো হয়েছিল। আমার মনে হয় কমপক্ষে দেড়শ টাকা (তৎকালীন) বিজলীর জন্য খরচ হয়েছিল। এটা কেবল সমবেত জনতাকে খুশী করার জন্যই করা হয়েছিল। অনুরূপ ধর্মীয় সভা-সমিতিতে রংবেরংগের পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং ওয়ায়েজীনের গলায় ফুলের মালা দেয়া হয়। কই, এগুলোকেত না অপব্যয় বলা হয়, না হারাম আখ্যা দেয়া হয়। তাই উরসের সমাবেশ যেহেতু ধর্মীয় সমাবেশ, সেহেতু তথায়ও এসব কাজ জায়েয।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও এর জবাব

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ে বিরোধিতাকারীগণ নিম্নবর্ণিত আপত্তিসমূহ নানাভাবে উত্থাপিত করে থাকে।

১নং আপত্তি- হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَأْمُرْنَا اَنْ نَكْسُوا الْحِجَارَةَ وَالطِّيْنَ.

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দেননি যে, পাথরসমূহ ও মাটিকে কাপড় পরাতে। (মিশকাত শরীফের التصاوير অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এর থেকে বোঝা যায়- কবরসমূহের উপর গিলাফ বা চাদর চড়ান হারাম, কারণ ওখানেও পাথর ও মাটি আছে।

উত্তর- এ হাদীছ দ্বারা ঘরের দরজাসমূহে বিনা প্রয়োজনে অহংকারমূলক পরদা টাঙানোকে বোঝানো হয়েছে এবং তাও তক্ওয়া স্বরূপ বলা হয়েছে অর্থাৎ ঘরবাড়ী সজ্জিতকরণ তক্ওয়ার বরখেলাপ। ওই হাদীছের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ঘরের দেয়ালে পর্দা দিয়েছিলেন। হুযূর আলাইহিস সালাম ওটা ছিঁড়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন। তাই আওলিয়া কিরামের কবরসমূহে অর্পিত চাদরের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কাবা শরীফে মূল্যবান কালো গিলাফ ও রসুলে পাকের রওযায় সবুজ গিলাফ রয়েছে। কাবা শরীফের গিলাফ হুযুরের যুগেই ছিল। তাই ওটা জায়েয হলে, কবরসমূহের চাদরও নিশ্চয় জায়েয হবে।

২নং আপত্তি- কবরসমূহে ফুল অর্পণ, চাদর চড়ান ও বাতি জ্বালানো ইস্রাফ (অনর্থক) ও অপব্যয় মাত্র। তাই এগুলো নিষেধ। আওলিয়া কিরামের কবর সমূহে অনেক ফুল অর্পণ ও বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। অথচ প্রয়োজন মিটাতে একটি ফুল একটি বাতিই যথেষ্ট।

উত্তর- ইস্রাফ অর্থ বেফায়দা পয়সা খরচ করা কিন্তু ওইসব ফুল, বাতি ও চাদর সমূহে কি ফায়দা রয়েছে, তা আমি প্রথম অধ্যায়ে আলোকপাত করেছি। সুতরাং এগুলোকে বেফায়দা বলা যাবে না, অপব্যয়ের অভিযোগও ভিত্তিহীন। আমরা কোর্তার উপর ওয়াজকোট পরি। আবার এর উপর আছকানও পরিধান করি, তাও মূল্যবান কাপড়ের হয়ে থাকে। অথচ একটি মামুলী কোর্তা দিয়ে কাজ চলে। তাহলে এটা অপব্যয় হলো কিনা? অনুরূপ ইমারত, সুস্বাদু খাদ্য, যানবাহন এবং অন্যান্য দুনিয়াবী আরামের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করা হয়। অথচ এর থেকে ঢের কম খরচেও কাজ চলে।

কিন্তু এ গুলোকে অপব্যয় বলা যায় না। যেটাকে শরীয়ত হালাল বলেছে, ওটা সর্বক্ষেত্রে হালাল।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَهَا لِلنَّاسِ .

(বলুন আল্লাহর সৌন্দর্যকে কে হারাম করেছে, যা মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে)

৩নং আপত্তি- মিশকাত শরীফের المساجد অধ্যায়ে আছে-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسْجِدَ وَالسُّرُجَ .

অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালাম কবর যিয়ারতকারীদের, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণকারীদের ও বাতি প্রজ্জলনকারীদের উপর লানত দিয়েছেন।

এর থেকে বোঝা গেল কবরে বাতি জ্বালান মানে লানতের ভাগী হওয়া। ফত্‌য়োয়ে আলমগীরীতে, বর্ণিত আছে- اِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ اِلَى الْمَقَابِرِ بِدْعَةٌ لَا اَصْلَ لَهٗ . অনুরূপ ফত্‌ওয়ায়ে বযাযিয়াতেও উল্লেখিত আছে, অর্থাৎ কবর স্থানে বাতি নিয়ে যাওয়া বিদ্‌আত। এর কোন ভিত্তি নেই। ফত্‌ওয়ায়ে শামীর দ্বিতীয় খণ্ড كتاب الصوم এ বর্ণিত আছে-

اَمَّا لَوْنَذَرَ زَيْتًا لِاِيْقَادِ قِنْدِيْلٍ فَوْقَ ضَرِيْحِ الشَّيْخِ اَوْفِى الْمَنَارَةِ كَمَا تَفْعَلُ النِّسَاءُ مِنْ نَذْرِ الزَّيْتِ لِسَيِّدِىْ عَبْدُ الْقَادِرِ وَيُوْقَدُ فِى الْمَنَارَةِ جِهَةَ الشَّرْقِ فَهُوَ بَاطِلٌ .

যদি কেউ কোন পীরবুযুর্গের কবরের উপর বা মিনারায় প্রদীপ জ্বালানোর উদ্দেশ্যে তৈল মানত করে, যেমন মহিলারা হুযুরে গউছে পাকের নামে তৈল মানত করে এবং পশ্চিম মিনারায় জ্বালায়, এগুলো সব বাতিল।

কাজী ছানাউল্লাহ ছাহেব পানিপথী 'ইরশাদুত্তালেবীন' গ্রন্থে লিখেছেন-

که چراغاں کردن بدعت است پیغمبر خدا برشمع افروزاں نزد قبر وسجده کنند گاں لعنت گفته .

বাতি জ্বালান বিদ্‌আত। হুযূর আলাইহিস সালাম কবরের পার্শ্বে বাতি প্রজ্জলনকারী ও সিজদাকারীদের উপর লানত দিয়েছেন। শাহ আবদুল আযীয ছাহেব তাঁর ফত্‌ওয়ার কিতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

واما ارتکاب محرمات از روشن کردن چراغها وملبوس ساختن قبور بدعت شنیعه اند .

(কিন্তু উরস্‌সমূহে হারাম কাজ করা যেমন বাতি জ্বালান, ওসব কবরে গিলাফ চড়ান ইত্যাদি সবই বিদ্‌আতে সাইয়া।)

উপরোক্ত ইবরাতসমূহ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা গেল মাযারসমূহে বাতি মাত্রই হারাম। হেরমাইন শরীফাইনে (মক্কা-মদীনা) বাতি জ্বালানোটা কোন দলীল হতে পারে না। কেননা, এটা খাইরুল কুরূনের (সাহাবী তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীনের যুগ) পর চালু হয়েছে, যার কোন গুরুত্ব নেই। তুর্কী সরকারই এটা চালু করেছে।

উত্তরঃ এ আপত্তিটা মূলতঃ ছয়টি আপত্তির সমষ্টি। এগুলোর বলে বলীয়ান হয়ে ভিন্নমত পোষণকারীরা অনেক গলাবাজী করে থাকে। তাই মনোযোগ সহকারে এবার জবাবটা শুনুন। আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে কোন কবরে বেফায়দা বাতি জ্বালানো নিষেধ, কারণ এটা অপব্যয় কিন্তু কোন ফায়দার উদ্দেশ্যে হলে, তখন জায়েয। চারটি ফায়দার কথা বর্ণনা করা হয়েছে- তিনটি সাধারণ মুসলমানদের কবরের বেলায় আর চতুর্থটি আওলিয়া, মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরামের কবরসমূহের সম্মানের জন্য। ওই হাদীছে কবরে বাতি জ্বালানোর ব্যাপারে যেই নিষেধবাণী রয়েছে, তা বেফায়দা জ্বালানোর বেলায় প্রযোজ্য। যেমন মিশকাত শরীফের হাশিয়ায় ওই হাদীছের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে-

وَالنَّهْىُ عَنْ اِتِّخَاذِ السُّرُجِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَضْيِيْعِ الْمَالِ .

(কবর সমূহে বাতি জ্বালান এজন্য নিষেধ, কারণ এতে অপব্যয় হয়) মিরকাত শরহে মিশকাত ও অন্যান্য কিতাবে অনুরূপ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হাদীকায়ে নদীয়া শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদীয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২৯ পৃষ্ঠায় ওই হাদীছের উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে।

اَىِ الَّذِيْنَ يُوْقِدُوْنَ السُّرُجَ عَلَى الْقُبُوْرِ عَبَثًا مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ .

অর্থাৎ সেসব লোকদের উপর লানত দিয়েছেন, যারা কবরসমূহে অনর্থক বাতি জ্বালায়। মিশকাত শরীফের الدفن অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ لَيْلاً فَاسْرِجَ لَهُ بِسِرَاجٍ.

নবী করীম (দঃ) এক রাত্রে লাশ দাফন করার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর জন্য বাতি জ্বালানো হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছ শরীফে আছে وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَجِدَ وَالسُّرُجَ (হুযূর আলাইহিস সালাম ওদের উপর লানত দিয়েছেন, যারা কবরের উপর মসজিদ তৈরী করেছে এবং বাতি জ্বালিয়েছে) মোল্লা আলী কারী, শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকারীগণ ওই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ স্বয়ং কবরের উপর এভাবে মসজিদ তৈরী করা যে কবরের দিকে সিজদা দিতে হয় বা কবর মসজিদের দেয়ালের ভিতর পড়ে যায়, এ ধরনের মসজিদ তৈরী করা নিষেধ। কিন্তু যদি কবরের পার্শ্বে বরকতের জন্য মসজিদ তৈরী করা হয়, তাহলে জায়েয। অর্থাৎ এ হাদীছে ব্যবহৃত عَلٰى শব্দটাকে তাঁরা হাকিকী (সঠিক) অর্থে প্রয়োগ করেছেন। যার ফলে স্বয়ং কবরের উপর বাতি জ্বালানোও নিষেধ বলতে বাধ্য। কিন্তু ঠিক কবরের উপর না হয়ে যদি আশে-পাশে হয়, তাহলে জায়েয, যেমন আমি গম্বুজ শীর্ষক আলোচনায় ব্যক্ত করেছি। অধিকন্তু প্রখ্যাত 'হাদীকায়ে নদিয়া' গ্রন্থে আল্লামা নাবলূসী (রহঃ) এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

اَلْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا اَىْ عَلَى الْقُبُوْرِ يَعْنِىْ فَوْقَهَا.

অর্থাৎ ঠিক কবরের উপর বাতি রাখা। এর কারণ হচ্ছে বাতি হলো আগুন এবং কবরের উপর আগুন রাখা পাপ। এ জন্যই ফকীহগণ কবরে শুকনা কাঠের তক্তা দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর মধ্যে আগুনের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কবরের পার্শ্বে থাকলে, তা নিষেধ নয়। তদ্রূপ বাতি আগুন হওয়ার কারণেই নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু কবরের তাযীমের জন্য নিষেধ করা হয়নি। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে এ হাদীছে ব্যবহৃত عَلٰى শব্দটি মসজিদ ও বাতি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা উক্ত শব্দটি মসজিদের জন্য এক অর্থে আর বাতির জন্য অন্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মসজিদের ক্ষেত্রে হাকীকী অর্থে (অর্থাৎ ঠিক কবরের উপর) আর বাতির ক্ষেত্রে মেজাযী অর্থে (অর্থাৎ কবরের কাছে) ব্যবহার করেছেন। এতে হাকীকী ও মেজাযীর সংমিশ্রণ প্রকাশ পায়, যা অবৈধ। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে عَلٰى শব্দটি হাকীকী অর্থে প্রযোজ্য। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে এ হাদীছের প্রেক্ষাপটে মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন-

قَيْدُ عَلَيْهَا يُفِيْدُ اَنَّ اِتِّخَاذَ الْمَسَاجِدِ بِجَنْبِهَا لَابَأْسَ بِهِ.

অর্থাৎ এ হদীছে 'উপরের' শর্তারোপ করা হয়েছে। যদ্বারা বোঝা গেল যে কবরের পার্শ্বে মসজিদ তৈরী করতে কোন বাধা নেই। عَلٰى শব্দ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কবরের বরাবর পার্শ্বে মসজিদ তৈরী করা জায়েয। অনুরূপ একই শব্দ থেকে এটাও বোঝা গেল যে কবরের পার্শ্বে বাতি জ্বালানো জায়েয।

তৃতীয়তঃ আমি 'গম্বুজ' শীর্ষক আলোচনায় ফত্ওয়ায়ে শামী ও অন্যান্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি যে, অনেক বিষয় সাহাবায়ে কিরামের যুগে নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। যেমন তফসীরে রূহুল বয়ানে ১০ম পারায় সুরা তওবার اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ আয়াতের তফ্সীরে লিখেছেন-

وَفِى الْاِحْيَاءِ اَكْثَرُ مَعْرُوْفَاتِ هٰذِهِ الْاَثَارِ مُنْكَرَاتٌ فِىْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ.

অর্থাৎ ইহইয়ায়ে উলুম গ্রন্থে ইমাম গায্যালী বলেছেন যে, এ যুগের অনেক মুস্তাহাব কাজ সাহাবায়ে কিরামের যুগে নাজায়েয ছিল। মিশকাত শরীফের কিতাবুল ইমারত ماعلى الولاة অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন কোন মুসলমান বিচারক খচ্চরের উপর আরোহণ না করেন, চাপাতি-রুটি না খান, পাতলা কাপড় পরিধান না করেন এবং নিজের দরজা প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য বন্ধ না করেন। এর পর বলেছেন-

فَاِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَالِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوْبَةُ.

যদি তোমরা এর কোন কিছু কর, তাহলে তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। একই মিশ্কাতের المساجد অধ্যায়ে আছে- مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسْجِدِ আমাকে উঁচু করে মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর হাশিয়ায় আছে-অর্থাৎ উঁচু করে মসজিদ তৈরী ও সাজসজ্জা করার নির্দেশ নেই।

একই মিশ্কাতে আরও আছে- لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বাঁধা দিও না। কুরআন শরীফে যাকাতের হকদার আট শ্রেণী বলা হয়েছে। অর্থাৎ মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (যুদ্ধকালীন সময়ে হুযূর আলাইহিস সালামকে সাহায্যকারী কাফির)কেও যাকাতের হকদার বলা হয়েছে। কিন্তু হযরত উমর ফারুকের যুগে কেবল সাত শ্রেণীকে বহাল রাখা হয়েছিল, এবং মুয়াল্লাফাতুল কুলুবকে

বাদ দেয়া হয়েছিল। (হিদায়া ও অন্যান্য কিতাব দেখুন) বলুন, এখনও কি আট শ্রেণী অটল আছে? এখন যদি বিচারকগণ সাদাসিদে অবস্থায় থাকেন, জনগণের কাছে কোন পাত্তা পাবে কি? কাফিরদের ঘর বাড়ী, মন্দির যদি সুউচ্চ অট্টালিকা হয়ে থাকে আর আল্লাহর ঘর মসজিদ যদি নিচু, কাঁচা এবং মামুলী ধরনের হয়ে থাকে, তাহলে এতে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। আর বর্তমান যুগে মহিলারা মসজিদে গেলে, অনেক অঘটন ঘটবে। কোন কাফিরকে যাকাত দেওয়া বর্তমানে জায়েয নেই। এখন প্রশ্ন হলো এ সমস্ত বিধানাবলীর কেন পরিবর্তন করা হলো? এ জন্যই যে ওগুলোর ইল্লত পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওই সময়ে বাহ্যিক চাকচিক্য ছাড়াই মুসলমানদের অন্তরে আওলিয়া কিরাম ও কবরস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাই তাদের জীবিত ও মৃত অবস্থা সাদাসিদে ছিল। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াবী অবস্থা পরিবর্তন ও টিপ্ টপ্ হয়ে যাবার ফলে, ওইগুলোকে জায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আগে নির্দেশ ছিল মাযারসমূহে আলোক সাজ্জা করো না। এখন জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে। তফসীরে রুহুল বয়ানে اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ আয়াতের পেক্ষাপটে বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দসের মিনারের উপর এমন আলোক সজ্জা করেছিলেন যে, বার মাইল দূরে বসে মহিলারা এ আলোতে সুতা কাটতো এবং অনেক সোনা-চাঁদি দ্বারা ওটাকে সজ্জিত করেছিলেন। বিরোধিতাকারীরা ফত্ওয়ায়ে আলমগীরীর যে ইবারত উদ্ধৃতি করেছে, তা ভুল। আসল ইবারত হচ্ছে-

اِخْرَاجَ الشُّمُوْعِ اِلٰى رَأْسِ الْقُبُوْرِ فِى اللَّيَالِى الْاُوَلِ بِدْعَةٌ.

সন্ধ্যায় কবরস্থানে বাতি নিয়ে যাওয়া বিদ্আত। উক্ত ইবারতে দু'টি শব্দ লক্ষ্যণীয় একটি اِخْرَاجٌ অপরটি فِى اللَّيَالِى الْاُوَلِ এ শব্দদ্বয় দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তৎকালীন যুগে লোকেরা নতুন কবরে সন্ধ্যায় গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতো। তারা মনে করতো যে এর ফলে মৃতব্যক্তি কবরে ভয় পাবে না। যেমন বর্তমান যুগে কতেক মহিলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবরস্থানে মৃতব্যক্তির পার্শ্বে বাতি জ্বালায়। তারা মনে করে যে, প্রত্যহ মৃতব্যক্তিদের রূহ কবরে আসে এবং অন্ধকার দেখলে ফিরে যায়। তাই বাতি জ্বালায়। এটা হারাম, কেননা, বিনা প্রয়োজনে তৈল খরচ বোঝায় এবং কুসংস্কারও বটে। এ ধরনের বাতি জ্বালানোকেই নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু উরসের বাতিতো আর এ নিয়তে হয় না। এবং রাতের শুরুতেও না। যদি উক্ত হাদীছের এ ভাবার্থ না হয়, তাহলে রাতের প্রারম্ভের শর্তারোপ কেন? শামীর ইবারততো একেবারে সুস্পষ্ট। তিনিও উরস শরীফের বাতি জ্বালানকে নিষেধ করেননি। তিনি বলছেন যে, আওলিয়া কিরামের সান্নিধ্যলাভের প্রত্যাশা নিয়ে তাদের নামে বাতি জ্বালাবার মানত

করা হারাম। দুরুল মুখতারে শামীর এ ইবারতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

وَاعْلَمْ اَنَّ النَّذْرَ الَّذِىْ يَقَعُ لِلْاَمْوَاتِ مِنْ اَكْثَرِ الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا اِلٰى ضَرَايِحِ الْاَوْلِيَاءِ تَقَرُّبًا اِلَيْهِمْ بِالْاِجْتِمَاعِ بَاطِلٌ.

জানা দরকার যে, সাধারণ লোকেরা মৃতব্যক্তির নামে যে মানত করে এবং তাদের থেকে আওলিয়া কিরামের সান্নিধ্য লাভের নামে যেই টাকা-পয়সা, মোমবাতি বা তৈল ইত্যাদি কবরে জ্বালানোর জন্য নেওয়া হয়, সর্বসম্মতভাবে বাতিল বলে গণ্য।

স্বয়ং শামীর ইবারতেই আছে (لَوْنَذَرَ) যদি মানত করে' এরপর শামীতে আরও বলা হয়েছে فَوْقَ ضَرِيْحِ الشَّيْخِ শেখের কবরের উপর বাতি জ্বালান। কবরের ঠিক জায়গাটাকে ضَرِيْحٌ বলা হয়। মুনতাখাবুল লুগাতে ضريح কবরের গর্তকে বলা হয়েছে। আমি নিজেও ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে স্বয়ং কবরের তাবুজের উপর বাতি জ্বালানো নিষেধ। অনুরূপ, যদি কোন কবর নয়, এমনি কোন বুযুর্গের নামে কোন জায়াগায় প্রদীপ রেখে জ্বালানো হয়। যেমন কতেক অজ্ঞ লোকেরা কতেক গাছে বা তাকে কারো নামে বাতি জ্বালায়, তাও হারাম। গাউছে পাকের নামে কোন পশ্চিমা মিনারে বাতি জ্বালানো বাতিল বলে যে বক্তব্যটা শামীতে আছে, তদ্বারা উপরোক্ত কথাটাই বোঝানো হয়েছে। গাউছে পাকের মাযার শরীফতো বাগদাদে অবস্থিত, অথচ এর জন্য বাতি জ্বালানো হচ্ছে সিরিয়ার মিনারে, এটাও বাতিল। সার কথা হলো আল্লামা শামী তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন (১) বাতি জ্বালানোর মানত করা, তাও আবার ওলীদের সান্নিধ্যলাভের নিয়তে, (২) ঠিক কবরের উপর বাতি জ্বালানো এবং (৩) কবর ছাড়া কারো নামে বাতি জ্বালানো। কিন্তু উরসের বাতি এ তিন বিষয়ের কোনটার পর্যায়ভুক্ত নয়।

মাসআলা- কতেক অজ্ঞব্যক্তি কোন গাছ বা জায়গায় এ মনে করে যিয়ারত করে ও বাতি জ্বালায় যে ওখানে অমুক বুযুর্গের আস্তানা আছে অর্থাৎ উনি ওখানে আসা যাওয়া করেন। এটা নিছক বাতুলতা মাত্র। তবে যদি কোন জায়গায় কোন বুযর্গ কোন সময় বসেছিলেন বা ওখানে ইবাদত করেছিলেন, তাহলে ওই জায়গাটা বরকতময় মনে করে ওখানে ইবাদত করা জায়েয বরং সুন্নাত। বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড কিতাবুস সালাতে بَابُ الْمَسْجِدِ الَّتِى الْمَسْجِدِ। শীর্ষক আলোচনায় নামে একটি অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন। ওখানে উল্লেখ করেছেন যে হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রাঃ) রাস্তার ওই সমস্ত স্থানে নামায আদায় করতেন, যেখানে হুযূর আলাইহিস সালাম কোন সময়

নামায পড়েছিলেন। এমন কি কোন কোন জায়গায় মসজিদ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ভুলবশতঃ কিছু ব্যবধানে স্থাপন করা হয়েছিল। তাই তিনি ওইসব মসজিদে নামায পড়তেন না বরং ওখানে পড়তেন, যেখানে হুযূর আলাইহিস সালাম নামায পড়েছিলেন।

فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُاللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّىْ فِىْ ذَالِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهٗ عَنْ يَّسَارِهٖ.

কেবল বরকত হাসিল করার জন্য এ রকম করেছিলেন। আজও কোন কোন হাজী সাহেবান গারে হেরায়, সেখানে হুযূর আলাইহিস সালাম ছয়মাস ইবাদত করেছিলেন, নামায আদায় করেন। সুতরাং খাজা আজমীরী ও অন্যান্য বুযুর্গানে কিরামের ইবাদতের স্থানসমূহে নামায আদায় করা, ওইগুলোর যিয়ারত করা এবং বরকতময় মনে করা সুন্নাতে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত।

মাসআলা-আল্লাহর ওলীগণের নামে যে মানত করা হয়, তা শরীয়তের পরিভাষায় ব্যবহৃত নযর নয়। এটা কেবল শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ উপহার যেমন আমি আমার শিক্ষককে বললাম, এটা আপনার (নযর) উপহার । এ ধরনের উপহার বা নযর সম্পূর্ণ জায়েয। ফকীহগণ ওলীগণের নামে ওই ধরনের নযর বা মানতকে হারাম বলেন, যা শরীয়তের পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়। এজন্যই تَقَرُّبًا اِلَيْهِمْ বলা হয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় ব্যবহৃত নযর বা মানত ইবাদত তুল্য, যা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো জন্য মানাটা নিঃসন্দেহে কুফরী। কেউ বললেন, "হে হুযূর গাউছে পাক, আমার জন্য দুআ করুন। যদি আমি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি, তাহলে আপনার নামে ডেক পাকাবো" এর ভাবার্থে আপনি আমার খোদা; এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করার পর আপনার এ ইবাদত করবো, এ রকম কখনও হতে পারে না। বরং এর ভাবার্থ হবে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে পোলাও সদ্কা করবো এবং এর থেকে যে ছওয়াব পাওয়া যাবে তা আপনাকে বখশিশ করবো। যেমন কোন ব্যক্তি কোন ডাক্তারকে বললো, যদি অসুখ থেকে ভাল হয়ে যাই, তাহলে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা নযরানা দেব। এতে কোন পাপ হতে পারে না। এ বক্তব্যটা ফত্ওয়ায়ে শামীর কিতাবুসসওমের اموات শীর্ষক আলোচনায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

بِاَنْ تَكُوْنَ صِيْغَةُ النَّذْرِ لِلّٰهِ تَعَالٰى لِلتَّقَرُّبِ اِلَيْهِ وَيَكُوْنُ ذِكْرُ الشَّيْخِ مُرَادًا بِهٖ فُقَرَاءُهٗ

অর্থাৎ নযর বা মানতটা আল্লাহর ইবাদতের অভিপ্রায়ে হয়ে থাকবে এবং বুযুর্গের

কবরের কাছে অবস্থানরত ফকীরগণ এর হকদার হবে। এ ধরনের মানত মাত্রই জায়েয়। এখানে সদ্কাটা হচ্ছে আল্লাহর নামে,ছওয়াবটা বখশিশ করা হচ্ছে শেখ বা ওলীর আত্মার নামে। আর ওই সদ্কার হকদার হচ্ছে ওলীর মাযারের খাদিমগণ ও ফকীরগণ। যেমন হযরত মরিয়ম (আঃ) এর জননী মানত করেছিলেন হে খোদা আমার পেটের বাচ্চাটা আপনার নামে মানত করছি। তাকে বায়তুল মুকাদ্দিসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে। اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا। দেখুন, শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নামে শপথ করা নিষেধ। কিন্তু খোদ কুরআন করীম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গায়রুল্লাহর নামে শপথ করেছেন। যেমন কুরআন করীমে আছে- وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ وَغَيْرُهٗ (ডুমুর ফুল, যায়তুন ও সিনাই পর্বতের শপথ ইত্যাদি) এবং হুযূর আলাইহিস সালাম বলেছেন اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ (ওর বাপের কসম, সে কৃতকার্য হয়েছে) এতে বোঝা গেল যে শরয়ী শপথের বেলায় শপথের সমস্ত আহ্কাম, কাফ্ফারা ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে এবং এটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে করা যাবে না। কিন্তু শাব্দিক শপথ, যা বক্তব্যের প্রতি কেবল জোর দেয়ার জন্য করা হয়, তা গায়রুল্লাহর নামে জায়েয। মানতের বেলায়ও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। একজন মানত করেছিলেন যে সে বায়তুল মুকাদ্দিসে বাতি জ্বালানোর জন্য তৈল পাঠাবে। হুযূর আলাইহিস সালাম ওকে সেই মানত পূর্ণ করার জন্য বলেছেন। মিশকাত শরীফ النذور। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি মানত করেছিল-আমি বুয়ানা নামক স্থানে উট যবেহ করবো। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-যদি ওখানে কোন মূর্তি ইত্যাদি না থাকে, তাহলে মানত পূর্ণ করুন। কেউ মানত করেছিল বাইতুল মুকাদ্দিসে নামায পড়বে। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম বললেন, মসজিদে হারামে নামায পড়ে নিন। এসব হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে, সদ্কা-খায়রাত মানত করার সময় কোন নির্দিষ্ট জায়গা বা ভিক্ষুকগোষ্ঠীর শর্তারোপ করা জায়েয। আওলিয়া কিরামের নামে নযর বা মানত করাটাও তদ্রূপ। ফত্ওয়ায়ে রশীদীয়ার ১ম খণ্ড الخطر والاباحت। অধ্যায়ের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- "মৃত ওলীগণের নামে যে মানত করা হয়, এর দ্বারা যদি তাঁদের আত্মার প্রতি ছওয়াব পৌঁছানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে জায়েয। কিন্তু যেই মানত নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের নামে করা হয়, তা হারাম"- (রশীদ আহমদ।)

মিশকাত শরীফের مناقب عمر শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন গৃহবধূ মানত করেছিলেন যে, যদি হুযূর আলাইহিস সালাম উহুদের যুদ্ধ থেকে সহীহ সালামতে ফিরে আসেন, তাহলে তাঁরা তাঁর (দঃ) সামনে দপ دف (এক প্রকার ঢোল) বাজাবেন। এখানেও নযর বা মানত শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শরয়ী অর্থে

নয়। অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালাম সমীপে আনন্দের উপহার স্বরূপ দপ বাজাবেন।

মোট কথা হল 'নযর' শব্দটি আভিধানিক ও শরীয়তের পারিভাষিক এ দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থে বুযুর্গানেদ্বীনের নামে মানত বা নযর করা জায়েয। যেমন তওয়াফের দু'টি অর্থ আছে- শাব্দিক, যার অর্থ হচ্ছে আশে-পাশে ঘোরা এবং শরীয়ী, যার অর্থ হচ্ছে কাবাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (যেন পুরানো ঘরের তওয়াফ করে) এখানে তওয়াফ শরয়ী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ করেছেন- يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ. (ওরা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটা-ছুটি করবে) এখানে শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। হযরত শাহ আবদুল আযীয ও কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) নিঃসন্দেহে দু'জন বড় বুযুর্গ আলিম ছিলেন। কিন্তু তাঁরা মুজতাহিদ ছিলেন না। যার ফলে তাঁদের কথা থেকে মাকরূহ তাহরীমী ও হারাম প্রমাণিত হয় না, এর জন্য স্বতন্ত্র শরয়ী দলীলের প্রয়োজন হয়। একজন আলিমের কথা থেকে মুস্তাহাব বা জায়েয প্রমাণ করা যেতে পারে। ওটাকেও মুস্তাহাব বলা হয়, যেটাকে আলিমগণ মুস্তাহাব মনে করে। কিন্তু মাকরূহ ও হারাম প্রমাণ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দলীলের প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু শাহ আবদুল আযীয ও কাজী সাহেব বাতি ও চাদরকে হারাম বলছেন। অন্যদিকে আল্লামা শামী চাদর চড়ানোকে এবং তফসীরে রূহুল বয়ান' ও হাদীকায়ে নদীয়ার রচয়িতাদ্বয় বাতি জ্বালানকে জায়েয বরং মুস্তাহাব বলেছেন। তাই এঁদের বক্তব্যই অধিক গ্রহণযোগ্য। আর শাহ্ সাহেব (রাঃ) ও কাজী সাহেব (রহঃ) এর বক্তব্যকে যদি গ্রহণ করি, তাহলে হারমাইন বিশেষ করে হুযূর পাক (দঃ) এর রওযা মুবারককে বিদ্আত ও হারাম কাজের কেন্দ্র বলতে হয়, কেননা সেখানে গিলাফও চড়ানো হয় আর বাতিও জ্বালানো হয় এবং আজ পর্যন্ত কোন আলিম বা ফকীহ এর প্রতিবাদও করেননি। তাহলে কি তাঁরা সবাই বিদ্আতী বা গুমরাহ ছিলেন? তাই তাঁদের দু'জনের ফত্ওয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না। শাহ রফিউদ্দিন সাহেব তাঁর রচিত রিসালায়ে নুযুর পুস্তিকায় বলেছেন-

نذریکه ایں جا مستمل میشود برمعنی شرعی است چه عرف
آنست که آنچه پیش بزرگاں می برند نزرونیاز می گویند.

এখানে মানত বলতে শরয়ী মানত বুঝানো হয়েছে কারণ জনসমাজে প্রসিদ্ধ এটাই যে বুযুর্গাণে কিরামের সামনে যা কিছু রাখা হয়, তা নযর নিয়ায বলে।

(৫) হারমাইন শরীফাইনের আলিমগণ কর্তৃক কোন বিষয়কে ভাল মনে করাটা মুস্তাহাব হওয়ারই প্রমাণ। এ পবিত্র যমীনে কখনও শির্ক হতে পারে না। হাদীছ

শরীফে আছে যে, শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে আহলে আরবের উপাসনা থেকে এবং পবিত্র মদীনা পাকের যমীন ইসলামের আশ্রয়স্থল এবং কাফির ও মুশরিকদের থেকে নিরাপদ। মিশ্কাত শরীফের حرم المدينة শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, মদীনা শরীফ পাপী লোকদেরকে এমনভাবে বের করে দেয়, যেমন কামারের ভাটি লৌহের মরিচা বের করে। অথবা কিছুদিন পর বা মৃত্যুর পর বের করে দেয়। জযবুল কুলুব' গ্রন্থে শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহ্লভী বলেন-

مواد نفي وابعاد شروفساد است از ساخت عزت ایں بلده
طیبه وخاصیت مذکوره دروے درجمیع ازمان هویداست"

এর ভাবার্থ হচ্ছে মদীনা শরীফের পবিত্র যমীন সমস্ত পাপী তাপীকে বের করে দেয় এবং এ রীতি তথায় সবসময়ের জন্য বলবৎ আছে। সুতরাং মদীনা শরীফের আলিমদের অনুসৃত আমলকে হঠাৎ শির্ক ও বিদ্আত বলে ফেলা মারাত্মক ভুল। এটাও তাদের ভুল ধারণা যে, তুর্কী শাসনামলে এ বাতি জ্বালানোর সুত্রপাত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ইমাম নুর উদ্দিন সমহুদী (রহঃ) ও জালাল উদ্দিন সয়ুতী (রহঃ) এর ইন্তিকাল ৯১১ হিজরীতে হয় এবং ইমাম নূর উদ্দিন সমহুদী তাঁর কিতাব খুলাসাতুল ওয়াফা শরীফ ৮৯৩ হিজরীতে রচনা করেন। ওই কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ের ষোলতম পরিচ্ছেদে মদীনা শরীফের বাতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

وَاَمَّا مُعَالِيْقَ الْحَجْرَةِ الشَّرِيْفَةِ الَّتِىْ تَعَلَّقُ حَوْلَهَا مِنْ قَنَادِيْلِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا فَلَمْ اَقِفْ عَلٰى اِبْتِدَاءِ حُدُوْثِهِمَا.

কিন্তু রওযা পাকের চারিদিকে সোনা-চান্দির যেসব আলোকবর্তিকা রয়েছে, তা কখন থেকে শুরু হয়েছে তা আমার জানা নেই। এরপর তিনি লিখেছেন-

وَقَدْ اَلَفَ السَّبْكِىْ تَالِيْفًا سَمَّاهُ تَنَزُّلَ السَّكِيْنَةِ عَلٰى قَنَادِيْلِ
الْمَدِيْنَةِ وَذَهَبَ فِيْهِ اِلٰى جَوَازِهَا وَصِحَّةِ وَقْفِهَا وَعَدَمِ جَوَازِ
صَرْفِ شَيْئٍ مِنْهَا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ.

অর্থাৎ ইমাম সুবকী (রহঃ) তানাযযুলুস সকিনা আলা কনা দিলিল মদীনা নামক একটি কিতাব লিখেছেন। উক্ত কিতাবে তিনি বলেছেন যে রওযা পাকের এসব আলোকবর্তিকা জায়েয এবং এগুলোর ওয়াকফও বৈধ। কিন্তু ওসবের কোন কিছু মসজিদের জন্য ব্যয় করা যাবে না।

আলহাম্দু লিল্লাহ্, বিরোধিতাকারীদের আপত্তির পরিপূর্ণ উত্তর হয়ে গেল।

পাঞ্জাব, ইউ, পি, ও, কাথিওয়ার্ড এলাকায় সাধারণভাবে প্রচলিত আছে যে, পবিত্র রমযান মাসে খতমে তারাবীহ্ এর সময় মসজিদসমূহে আলোক সজ্জা করা হয়। কতেক দেওবন্দী একে শির্ক ও হারাম বলে। এটা হচ্ছে তাদের ধর্মহীনতার পরিচায়ক। মসজিদের সৌন্দর্য হলো ঈমানের আলামত। তফসীরে রূহুল বয়ানে إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ اللَّهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে হযরত সুলায়মান বাইতুল মুকাদ্দিসে সতের শত বাতি জ্বালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। মসজিদে নববীতে প্রথম প্রথম খেজুর গাছের লাকড়ী জ্বালিয়ে আলোকিত করা হতো। পরে হযরত তমীম দারমী কিছু প্রদীপ রশি ও তৈল সংগ্রহ করে আনলেন এবং ওগুলোকে মসজিদে নববীর বীমের সাথে টাঙ্গিয়ে জ্বালিয়ে দিতেন। তা দেখে হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান نَوَّرْتَ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ عَلَيْكَ তুমি আমাদের মসজিদকে আলোকিত করেছ, আল্লাহ তোমাকে আলোকিত রাখুন। হযরত উমর (রাঃ)ও যখন বাতি জ্বালালেন ও প্রদীপ টাঙিয়ে দিলেন, তখন হযরত আলী (রাঃ) বলতেন نَوَّرْتَ مَسْجِدَنَا نَوَّرَ اللّٰهُ قَبْرَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ হে উমর, তুমি আমাদের মসজিদকে আলোকিত করেছ। আল্লাহ যেন তোমার কবরকে আলোকিত করেন। তাফ্সীরে কবীরে إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَسْرَجَ فِىْ مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ تَنْزِلِ الْمَلٰئِكَةُ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ مَادَامَ فِى الْمَسْجِدِ ضَوْءُهُ.

হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত আছে-যে কেউ মসজিদে বাতি জ্বালালে যতক্ষণ পর্যন্ত এর আলো থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্তাগণ ও আল্লাহর আরশ বহনকারীগণ তার মাগফিরাতের দুআ করেন।

ফত্ওয়ায়ে রশিদীয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে الخطر والاباحات শীর্ষক অধ্যায়ের ১১২ পৃষ্ঠায় স্বীকার করা হয়েছে যে হযরত উমর ফারুকের যুগে কতেক সাহাবায়ে কিরাম বাইতুল মুকাদ্দিসের আলোকসজ্জা দেখে এসে মসজিদে নববীতে নানা র'কম বাতি জ্বালিয়ে ছিলেন। অতঃপর বাদশা মামুনুর রশিদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মসজিদ সমূহে যেন ব্যাপক হারে বাতি জ্বালানো হয়। মোট কথা হলো মসজিদকে আলোকসজ্জিতকরণ আম্বিয়া, সাহাবা ও সাধারণ মুসলমানদের সুন্নাত।

কবরে আযান দেয়া সম্পর্কে বর্ণনা

মুসলমানের লাশ কবরে দাফন করার পর আযান দেয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জ মাতের মতে জায়েয। এর পিছনে অনেক দলীল রয়েছে। কিন্তু ওহাবী দেওবন্দীরা একে বিদ্আত, হারাম, শিরক আরও কত কিছু বলে। তাই এ আলোচনাকে দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এর প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহর রহমত ও মেহেরবাণীতে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

(কবরে আযান দেয়ার প্রমাণাদি)

দাফনের পর কবরে আযান দেয়া জায়েয। বিভিন্ন হাদীছ ও ফকীহগনের উক্তি থেকে এর প্রমাণ মিলে। মিশকাত শরীফের কিতাবুল জনায়েয ما يقال عند من حضرت الموت অধ্যায়ে বর্ণিত আছে لَقِّنُوْا مَوْتٰكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তোমাদের মৃতব্যক্তিদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শিখাও। পার্থিব জীবন শেষ হবার সাথে সাথে মানুষের জন্য দুটি খুবই ভয়াবহ সময় রয়েছে। একটি হচ্ছে জান কবয করার সময় এবং অপরটি হচ্ছে দাফন করার পর কবরে সওয়াল-জওয়াব হবার সময়। যদি জান কবয করার সময় শুভ সমাপ্তি নসীব না হয়, তাহলে সারা জীবনের সাধনা বিফল হয়ে গেল। আর কবরের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে পরবর্তী জীবন বরবাদ হয়ে গেল। পার্থিব জীবনে এক বছর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে, পরবর্তী বছর পুনরায় অংশগ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। এ জন্যে জীবিত ব্যক্তিদের উচিৎ, ওই দু' মুহূর্তে মৃতগামীদের যতটুকু সম্ভব সাহায্য করা। মৃত্যুর সময় কলেমা পাঠ করে শুনাবে এবং দাফন করার পরও কলেমার আওয়াজ পৌঁছাবে, যাতে কলেমা পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে এবং কবরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছের দু'ধরনের অর্থ হতে পারে-এক, যে মারা যাচ্ছে, তাকে কলেমা শিখাও। দুই, যে মারা গেছে, তাকে কলেমা শিখাও। এখানে উল্লেখিত প্রথম অর্থটা হচ্ছে রূপক এবং দ্বিতীয় অর্থটা হচ্ছে বাস্তব এবং বিনা প্রয়োজনে কোন শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহার করা ঠিক নয়। সুতরাং উল্লেখিত হাদীছের সঠিক অর্থ হচ্ছে- নিজেদের মৃতব্যক্তিদেরকে কলেমা শিখাও এবং এ সময়টা হচ্ছে দাফনের পর। যেমন ফত্ওয়ায়ে শামী প্রথম খণ্ড الدفن অধ্যায়ের تلقين بعد الموت শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

اَمَّا عِنْدَ اَهْلِ السُّنَّةِ فَالْحَدِيْثُ اَىْ لَقِّنُوْا مَوْتٰكُمْ مَحْمُوْلٌ عَلٰى

خَقِيْقَتِهِ وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ اَنَّهُ اَمَرَ بِالتَّلْقِيْنِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ اِبْنِ فُلَانٍ اُذْكُرْ دِيْنَكَ الَّذِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا.

(আহলে সুন্নাতের মতে এ হাদীছে لَقِّنُوْا مَوْتٰكُمْ বাক্যটি বাস্তব অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দাফনের পরে তল্‌কীনের (শিখিয়ে দেয়া) নির্দেশ দিয়েছেন। তাই কবরের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলুন, হে অমুকের পুত্র অমুক যেই ধর্মে ছিলেন, সেই ধর্মকে স্মরণ করুন। একই জায়গায় শামীতে আরো উল্লিখিত আছে-

وَاِنَّمَا لَا يَنْهٰى عَنِ التَّلْقِيْنِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِاَنَّهُ لَاضَرَرَفِيْهِ بَلْ نَفْعٌ فَاِنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَانِسُ بِالذِّكْرِ عَلٰى مَا وَرَدَ فِى الْاٰثَارِ.

দাফনের পর তল্‌কীন থেকে বারণ না করা চাই, কেননা এতে কোন ক্ষতিতো নেই বরং উপকারই রয়েছে। কারণ মৃতব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র থেকে সান্ত্বনা লাভ করে, যেমন বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে।

এ হাদীছ ও এসব উদ্ধৃতি থেকে বোঝা গেল যে, লাশ দাফন করার পর ওকে কলেমা তৈয়্যবার তল্‌কীন শিখিয়ে দেয়া মুস্তাহাব, যাতে মৃতব্যক্তি মুন্‌কার নকীরের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারে। যেহেতু আযানের মধ্যে কলেমাও রয়েছে সেহেতু আযানও কবর তলকীনের জন্য প্রয়োজ্য ও মুস্তাহাব বরং আযানের মধ্যেই পরিপূর্ণ তল্‌কীন পাওয়া যায়। কেননা মুন্‌কার নকীর মৃতব্যক্তির কাছে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে- এক, তোমার প্রভু কে? দুই, তোমার ধর্ম কি? তিন, ওই সোনালী জালিতে পরিবেষ্টিত সবুজ গম্বুজের মধ্য অবস্থানরত আকা মাওলা (দঃ) সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর আযানের মধ্যে রয়েছে। যেমন প্রথম প্রশ্নের উত্তর اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ আমার ধর্ম হচ্ছে ওটাই যে ধর্মে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। (ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছিল না) তৃতীয় প্রশ্নে উত্তর اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রসূল। দুররুল মুখতারের প্রথম খণ্ড আযান অধ্যায়ে দশ জায়গায় আযান দেয়া সুন্নাত বলা হয়েছে। এ দশ জায়গার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত কবিতার মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।

فَرْضُ الصَّلٰوةِ وَفِىْ اُذْنِ الصَّغِيْرِ وَفِىْ - وَقْتِ الْحَرِيْقِ وَالْحَرْبِ الَّذِىْ وَقَعَا

خَلْفِ الْمُسَافِرِ وَالْغِيْلَانِ اِنْ ظَهَرَتْ - فَاحْفَظْ لِسِتٍّ مَنْ لِلَّذِىْ قَدْ شَرَعًا

وَزِيْدَ اَرْبَعَ ذُوْهَمٍّ وَذُوْ غَضَبٍ - مُسَافِرٌ ضَلَّ فِىْ فَقْرٍ وَمَنْ صَرَعًا

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য, নবজাত শিশুর কানে, আগুন লাগলে, যুদ্ধের সময়, মুসাফিরের পিছনে, জ্বীনের উপদ্রব বৃদ্ধি পেলে, রাগান্বিত ব্যক্তির সামনে, যেই মুসাফির রাস্তা হারিয়ে ফেলে এবং মৃগী রোগীর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে ফত্‌ওয়ায়ে শামীতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে।

قَدْ يَسُنَّ الْاَذَانَ بِغَيْرِ الصَّلٰوةِ كَمَا فِىْ اٰذَانِ الْمَوْلُوْدِ وَالْمَهْمُوْمِ وَالْمَصْرُوْعِ وَالْغَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ اَوْ بَهِيْمَةٍ وَعِنْدَ مَزْدَهِمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيْقِ وَقِيْلَ عِنْدَ اِنْزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ قِيَاسًا عَلٰى اَوَّلِ خُرُوْجِهِ لِلدُّنْيَا لٰكِنْ رَدَّهُ اِبْنُ حَجْرٍ فِىْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيْلَانِ اَىْ تَمَرُّدِ الْجِنِّ.

নামায ব্যাতীত কয়েক জায়গায় আযান দেওয়া সুন্নাত যেমন নবাজাত শিশুর কানে, শোকাভূত, মৃগী রোগী ও রাগান্বিত ব্যক্তির কানে, যে জন্তু বা ব্যক্তির অভ্যাস খারাপ হয়ে যায় ওর সামনে, সৈনিকদের যুদ্ধ করার সময়, অগ্নিকাণ্ডের সময় এবং মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় এর জন্ম হওয়ার সময়ের সাথে অনুমান করে আযান দেয়া সুন্নাত বলা হয়েছে। কিন্তু এ আযান সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে ইব্‌নে হাজর (রহঃ) অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, এবং জ্বীনের উপদ্রবের সময় আযান দেয়া সুন্নাত। আল্লামা ইব্‌নে হাজরের অস্বীকৃতির জবাব দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেয়া হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

মিশকাত শরীফের فَضْلُ الْاَذَانِ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- তোমরা বিলালের আযানে সাহরী খাওয়া বন্ধ করো না। সে তো লোকদেরকে জাগানোর জন্য আযান দেয়। বোঝা গেল যে প্রিয় নবীর যুগে সাহরীর সময় ঘণ্টি বাজানো বা তোপ ধ্বনির পরিবর্তে আযান দেয়া হতো। তাই ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগানোর জন্য আযান দেয়া সুন্নাত প্রমাণিত হলো।

বিভিন্ন হাদীছ ও ফকীহগণের উক্তিসমূহ থেকে জানা যায় যে, আযানের সাতটি উপকার রয়েছে। আমি ওগুলো নিম্নে বর্ণনা করছি, যাতে অনায়াসে বোঝা যায় যে ওসব উপকারের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি মৃতব্যক্তির উপকারে আসবে। প্রথম, এর দ্বারা মৃতব্যক্তির তলকীন হয় যেমন আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, দ্বিতীয়, আযানের ধ্ব

নিতে শয়তান পালিয়ে যায়। যেমন মিশকাত শরীফের আযান অধ্যায়ে আছে-

إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطٰنُ لَهٗ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعُ التَّاذِيْنَ.

(যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বিদ্যুৎবেগে পালিয়ে যায়, যাতে আযান শুনতে না পায়) মৃত্যুর সময় মৃতগামী ব্যক্তিকে শয়তান ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যেভাবে প্রলোভিত করে, তদ্রূপ সে কবরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাকে খোদা বলার জন্য প্ররোচিত করে, যাতে মৃতব্যক্তি শেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। اَللّٰهُمَّ اِحْفَظْنَا مِنْهُ (হে আল্লাহ এর থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন) যেমন নওয়াদেরুল উসূল নামক গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নে আলি তিরমিযী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا سُئِلَ مَنْ رَبُّكَ يَرَى لَهُ الشَّيْطَانُ فَيُشِيْرُ اِلٰى نَفْسِهِ اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ فَلِهٰذَا وَرَدَ سُوَالَ التَّثَبُّتِ لَهُ حِيْنَ سُئِلَ.

অর্থাৎ মৃতব্যক্তিকে যখন প্রশ্ন করা হয়, তোমার প্রভু কে? তখন শয়তান তার নিজের দিকে ইশারা করে বলে 'আমি তোমার খোদা'। এজন্য হুযূর আলাইহিস সালাম প্রশ্নোত্তরের সময় মৃতব্যক্তি অটল থাকার জন্য দুআ করেছেন) তাই আযানের দ্বারা শয়তান দমে যায়, মৃত ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনা থেকে রেহাই পায়।

তৃতীয়, আযান মনের ভয়ভীতি দূর করে। যেমন হযরত আবু নঈম ও ইবনে আসাকির হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

نَزَلَ اٰدَمُ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَنَادٰى بِالْاَذَانِ.

হযরত আদম (আঃ) কে হিন্দুস্থানে (সিংহল) অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং তিনি খুবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন জিব্রাইল (আঃ) আসলেন ও আযান দিলেন। অনুরূপ মুদারেজুন নাবুয়াত প্রথম খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের ৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে- "এবং মৃতব্যক্তি ওই সময় আত্মীয়- স্বজনকে ত্যাগ করে একাকী অন্ধকার ঘরে উপনীত হয় এবং খুবই ভয়ের সঞ্চার হয় এবং এ ভয়ের কারণে হতভম্ব হয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার আশংকা থাকে। তাই আযানের দ্বারা মন আশ্বস্থ হবে এবং সঠিক উত্তর দিতে পারবে।" চতুর্থ, আযানের বরকতে মানসিক অশান্তি দূর হয় এবং আত্মিক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। মসনদুল ফিরদাউসে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

رَاٰنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِيْنًا فَقَالَ يَا اِبْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اِنِّيْ اَرَاكَ حَزِيْنًا فَمُرْ بَعْضَ اَهْلِكَ يُؤَذِّنَ فِيْ اُذُنِكَ فَاِنَّهٗ دَرْءُ الْهَمِّ.

অর্থাৎ আমাকে সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখে হুযূর আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন-কি কারণ তোমাকে মনমরা মনে হচ্ছে কেন? তুমি কাউকে বল যেন তোমার কানে আযান দেয়, কেননা আযান অশান্তি দূর করে। বুযুর্গানে দীন এমন কি আল্লামা ইব্‌নে হাজর (রহঃ) বলেন, جَرَّبْتُهٗ فَوَجَدْتُهٗ كَذَالِكَ فِى الْمِرْقَاتِ অর্থাৎ আমি এটা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং উপকার পেয়েছি। মিরকাতেও باب الاذان। শীর্ষক অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাহলে মৃতব্যক্তির অন্তরে ওই সময় যেই আঘাত লাগে, আযানের বরকতে তা দূর হয়ে যাবে এবং সান্ত্বনা লাভ করবে।

পঞ্চম, আযানের বরকতে প্রজ্জলিত আগুন নিবে যায়। হযরত আবু ইয়ালা আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেন-

يُطْفِئُوْا الْحَرِيْقَ بِالتَّكْبِيْرِ وَاِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيْقَ فَكَبِّرُوْا فَاِنَّهٗ يُطْفِئُ النَّارَ.

অর্থাৎ প্রজ্জলিত আগুনকে তকবীর দ্বারা নিভিয়ে দাও। এবং যখন তোমরা কোন জায়গায় আগুন লাগতে দেখ তকবীর বলবে কেননা এটা আগুন নিভিয়ে ফেলে। আযানের মধ্যেওতো তকবীর (আল্লাহু আকবর) রয়েছে। তাই মৃতব্যক্তির কবরে যদি আগুন লেগে থাকে, আশা করা যায় যে আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে নিভিয়ে দেবে। ষষ্ঠ, আযান আল্লাহর যিকির এবং এর বরকতে কবর আযাব দূরীভূত হয়; কবর প্রশস্ত হয়, এবং সংকীর্ণ কবর থেকে নাজাত পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ তিবরানী ও বায়হাকী (রহঃ) হযরত জাবির (রাঃ) থেকে হযরত সাআদ ইব্‌নে মুয়ায (রাঃ) এর দাফনের ঘটনা উদ্ধৃতি করে বর্ণনা করেছেন।

سَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ سَبَّحْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلٰى هٰذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ قَبْرُهٗ فَرَّجَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ.

দাফনের পর হুযূর আলাইহিস সালাম সুবহানাল্লাহ বললেন। অতঃপর আল্লাহু আকবর বললেন, অন্যরাও বললেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাসবীহ ও তাক্‌বীর বলার রহস্য কি? ইরশাদ ফরমালেন এ-নেকবান্দার

জন্য কবরটা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা একে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আল্লামা তিবী (রহঃ) এর ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন-

اَىْ مَازِلْتَ مُكَبِّرٌ اَوْتَكْبِرُوْنَ وَاُسَبِّحُ وَتُسَبِّحُوْنَ حَتّٰى فَرَّجَهُ اللّٰهُ.

অর্থাৎ আমি ও তোমরা তাসবীহ ও তকবীর বলতে আছি। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা তার কবরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সপ্তম, আযানের মধ্যে হুযূর আলাইহিস সালামের যিকর আছে এবং পুণ্যাত্মাদের যিক্‌রের সময় আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। ইমাম সুফিয়ান ইবনে আইনিয়া (রহঃ) বলেছেন ذِكْرُ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِيْلُ الرَّحْمَةِ। (নেক বান্দাদের যিক্‌রের ফলে রহমত নাযিল হয়) দাফনের পর মৃতব্যক্তির জন্য রহমতের খুবই প্রয়োজন। তাই আমাদের সামান্য মুখ নাড়ার ফলে যদি এত বড় বড় সাতটি উপকার হতে পারে, তাতে ক্ষতি কি? প্রমাণিত হলো যে, কবরে আযান দেয়া ছওয়াবের কাজ। ফত্‌ওয়ায়ে শামীর سنن الوضوء অধ্যায়ে আছে সমস্ত জিনিস মূলতঃ মুবাহ অর্থাৎ যেটা শরীয়ত নিষেধ করেনি, ওটা মুবাহ হিসেবে গণ্য। এবং যে মুবাহ কাজ সৎ নিয়তে করা হয়, তা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য। মিশ্‌কাত শরীফের শুরুতেই আছে اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল) শামীর سنن الوضوء অধ্যায়ে আরও উল্লেখিত আছে-

اِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ هُوَ النِّيَّةُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِلْاِخْلَاصِ.

অভ্যাস ও ইবাদতের মধ্যে খালেস নিয়তের দ্বারাই পার্থক্য প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে কাজে খালেস নিয়ত থাকবে না, তা অভ্যাসই বলা যাবে। দুরুল মুখতারে مستحبات الوضوء শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে-

وَمُسْتَحَبُّهُ هُوَمَا فَعَلَهُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ اُخْرٰى وَمَا اَحَبَّهُ السَّلَفُ.

মুস্তাহাব ওই কাজটাকে বলা হয়, যেটা হুযূর আলাইহিস সালাম কোন সময় করেছেন আবার কোন সময় করেননি এবং ওই কাজটাকেও বলা হয়, যেটা বিগত মুসলমানগণ ভাল মনে করেছেন। শামীতে দাফনের আলোচনায় ولا يجصص পর উল্লেখিত আছে-

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ.

নবী করীম (দঃ) ইরশাদ ফরমান, যে কাজটা মুসলমানগণ ভাল মনে করেন, সেটা আল্লাহর কাছেও ভাল হিসেবে গণ্য। উপরোক্ত ইবারতসমূহ থেকে প্রমাণিত হলো যে কবরে আযান দেয়া যেহেতু শরীয়তে নিষেধ নয়, তাই জায়েয এবং উহা মুস্তাহাব। আর মুসলমানগণ যেহেতু এটাকে ভাল মনে করে, তাই এটা আল্লাহর কাছেও ভাল হিসাবে গণ্য। স্বয়ং দেওবন্দীদের নেতা মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ফতওয়ায়ে রশিদীয়ার প্রথম খণ্ড কিতাবুল আকাইদের ১৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন - কেউ প্রশ্ন করেছিল যে, দাফনের পর তল্‌কীন জায়েয আছে কিনা। তখন জবাব দিয়েছিল যে, এ মাসআলাটা সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিতর্কিত ছিল। এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেউ দিতে পারে না। দাফনের পর তল্‌কীন করা এভাবে অর্থাৎ অমীমাংসিত রয়েছে। তাই যেটার উপরই আমল করা হোক না কেন, ঠিক আছে- রশীদ আহমদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(কবরে আযান দেয়া প্রসঙ্গে আপত্তি ও জবাবসমূহ)

এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারীগণ নিম্ন বর্ণিত আপত্তিগুলো উত্থাপন করে থাকেন। ইন্‌শা আল্লাহ, এগুলো ছাড়া তাদের আর কিছু বলার নেই।

১নং আপত্তি- কবরে আযান দেওয়াটা বিদআত। প্রত্যেক বিদ্‌আত হারাম হেতু এ আযানটাও হারাম। হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে এর কোন প্রমাণ নেই। সেই পুরানো কথারই পুনরাবৃত্তি।

উত্তর- আমি প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করেছি যে দাফনের পর আল্লাহর যিকর তসবীহ ও তকবীর বলা হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে প্রমাণিত আছে। যার মূল প্রমাণিত, সেটা সুন্নাত; এতে পরিবর্ধন নিষেধ নয়। ফকীহগণ বলেন যে হজ্বের মধ্যে তলবিয়ার (তকবীর বলা) যে শব্দগুলো হাদীছ হতে সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে যেন বাদ দেয়া না হয়। তবে যদি কিছু বর্ধিত করা হয়, তা জায়েয আছে। হিদায়া ও অন্যান্য ফিক্‌হ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) আযানের মধ্যে তকবীরও আছে এবং কিছু অতিরিক্তও আছে। সুতরাং এটা সুন্নাত বলে প্রমাণিত আর যদি বিদ্‌আতই বলতে চান, তাহলে বিদ্‌আতে হাসনাই বলতে হবে যেমন আমি বিদ্‌আতের আলোচনায় বর্ণনা করেছি। ফত্‌য়ায়ে রশিদীয়ার প্রথম খণ্ড কিতাবুল বিদ্‌আতের ৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে, "জনৈক ব্যক্তি দেওবন্দীদের নেতা রশীদ আহমদ থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল- কোন মসীবতের সময় বুখারী শরীফের খতম পড়ানো কুরূনে ছালাছা থেকে প্রমাণিত আছে কিনা এবং এটা বিদ্‌আত কিনা? এর উত্তরে তিনি বলেছেন- কুরূনে ছালাছায় বুখারী শরীফ সংকলিতও

হয়নি। কিন্তু এর খতম ঠিক আছে। যিক্‌রে খায়েরের পর দুআ কবুল হয়। এর মূল শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। তাই এটা বিদ্‌আত নয়- রশীদ আহমদ।" একই কিতাবের ৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে "নির্ধারিত তারিখে খানার আয়োজন করা বিদ্‌আত যদিওবা ছওয়াব পৌঁছবে- রশীদ আহমদ।" তাহলে এবার বলুন, খতমে বুখারী ও বার্ষিক ফাতিহায় ছওয়াব কেন হচ্ছে। এটাতো বিদ্‌আত এবং আপনাদের মতে প্রত্যেক বিদ্‌আত হারাম, হারাম কাজে আবার ছওয়াব কিসের?

বিশেষ দ্রষ্টব্য- দেওবন্দ মাদ্রাসায় মসীবতের সময় ছাত্রদের দ্বারা বুখারী শরীফের খতম পড়ানো হয়। দাওয়াতকারী কর্তৃক প্রদত্ত শিরনী ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং আদায়কৃত টাকাগুলো লাভ হিসেবে মাদ্রাসাই পেয়ে থাকে। প্রত্যেক দাওয়াতে কমপক্ষে পনের টাকা আদায় করা হয়। মনে হয় এ বিদ্‌আতটা এজন্যই জায়েয রাখা হয়েছে যে মাদ্রাসার টাকার প্রয়োজন এবং এটা টাকা আদায় করার একটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাহলে মুমিনদের কবরে আযান কেন হারাম হবে?

২নং আপত্তি- ফত্‌ওয়ায়ে শামীর বাবুল আযানের যেখানে আযানের স্থান সমূহের বর্ণনা করা হয়েছে, ওখানে আযানে কবরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সাথে সাথে বলা হয়েছে لٰكِنْ رَدَّهُ اِبْنُ حَجَرٍ فِىْ شَرْحِ الْعُبَابِ কিন্তু আল্লামা ইব্‌নে হাজর 'শরহে ইবাব' গ্রন্থে এ আযানকে অগ্রাহ্য করেছেন। অতএব বোঝা গেল যে, কবরে আযান দেয়াটা বাতুলতা মাত্র।

উত্তর- প্রথমতঃ আল্লামা ইব্‌নে হাজর (রহঃ) শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী। তিনি আযানে কবরকে অস্বীকার করেছেন, ইহা ঠিক। অথচ কয়েকজন হানাফী আলিমসহ অনেক উলামায়ে কিরাম আযানে কবরকে সুন্নাত বলেছেন। তাহলে বলুন, হানাফী মাযহাবের অনুসারীদেরকে কি অধিকাংশ আলিমের মতামত অনুযায়ী আমল করতে হবে, না শাফেঈ মাযহাবের উক্তি অনুযায়ী আমল করতে হবে? দ্বিতীয়তঃ আল্লামা ইব্‌নে হাজরও আযানে কবরকে নিষেধ করেননি বরং একে সুন্নাত বলতেই অস্বীকার করেছেন। যদি আমি বলি বুখারী শরীফ ছাপানো সুন্নাত নয়, তা একেবারে যথার্থই হয়েছে। কেননা হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে বুখারীও ছিল না, প্রেসও ছিল না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে এটা জায়েযও নয়। আল্লামা শামী ওই জায়াগায় বলেছেন وَقَدْ يُسَنُّ الْاَذَانُ ওই সমস্ত অবস্থায় আযান দেয়া সুন্নাত। অবস্থাসমূহের মধ্যে আযানে কবরের কথা উল্লেখ করার পর বললেন لٰكِنْ رَدَّهُ اِبْنُ حَجَرٍ কিন্তু ইব্‌নে হাজর এটাকে অস্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, কি অস্বীকার করেছেন? এর আগের ইবারত থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি সুন্নাত বলতেই অস্বীকার করেছেন। শামী বোঝার জন্য জ্ঞান ও ঈমানের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ যদি মেনে নেওয়া

হয় যে আল্লামা ইব্‌নে হাজর আযানকেই অস্বীকার করেছেন। এর ফলে মাকরূহ বা হারাম প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা, কোন আলিমের অস্বীকৃতির দরুণ মাকরূহ বা হারাম প্রমাণিত হয় না, বরং এর জন্য শরীয়তের অকাট্য দলীলের প্রয়োজন হয়। শরীয়তের দলীয় ছাড়া মাকরূহ তন্‌যীহও প্রমাণিত হয় না। ফত্‌ওয়ায়ে শামীর مستحبات الوضوء শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَلَا يَلْزِمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوْتُ الْكَرَاهَةِ اِذْ لَا بُدَّلَهُ مِنْ دُلِيْلٍ خَاصٍ.

অর্থাৎ মুস্তাহাব পরিত্যাগ করার দ্বারা মাকরূহ প্রমাণিত হয় না, কেননা মাকরূহ প্রমাণিত করার জন্য বিশেষ দলীলের প্রয়োজন। শামীর প্রথম খণ্ডে مكروهات الصلوة। শীর্ষক আলোচনা المستحب والسنة। এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

تَرَكُ الْمُسْتَحَبِّ لَا يَلْزِمُ مِنْهُ اَنْ يُّكُوْنَ مَكْرُوْهًا اِلَّا بِنَهْىٍ خَاصٍ لِاَنَّ الْكَرَاهَةَ حُكْمٌ شَرْعِىٌّ فَلَا بُدَّلَهُ مِنْ دُلِيْلٍ خَاصٍ.

মুস্তাহাব পরিত্যাগের ফলে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ছাড়া ওটাকে মাকরূহ বলা যাবে না। মাকরূহ হচ্ছে শরয়ী হুকুম; এর জন্য বিশেষ দলীলের প্রয়োজন। তারাতো কবরে আযান দেয়াটা হারাম বলছেন। অথচ ফকীহগণ সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছাড়া কোন কিছুকে মাকরূহ তন্‌যীহ বলতেও রাজি নন। যদি বলা হয়, আল্লামা শামী (রহঃ) কবরে আযান প্রসঙ্গটা قِيْلَ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন এবং قِيْلَ শব্দটা দুর্বলতার পরিচায়ক, এর জবাব হচ্ছে ফিক্‌হশাস্ত্রে قِيْلَ শব্দটা শুধু দুর্বলতা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় না। শামীর কিতাবুসসওম 'কাফ্‌ফারা' পরিচ্ছেদ আছে- فَتَعْبِيْرُ الْمُصَنِّف بِقِيْلَ لَيْسَ يَلْزَمُ الضُّعْفَ (গ্রন্থকার কর্তৃক قِيْلَ শব্দের প্রয়োগ দুর্বলতার পরিচায়ক নয়) অনুরূপ শামীর دفن ميت শীর্ষক আলোচনায় জানাযার সাথে যিক্‌র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে قِيْلَ تَحْرِيْمًا وَقِيْلَ تَنْزِيْهًا (মকরূহ তাহরীমি বলা হয়েছে এবং মাকরূহ তান্‌যীহও বলা হয়েছে) দেখুন, এখানে দু'টি উক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয় উক্তি قِيْلَ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। ফত্‌ওয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল ওয়াক্‌ফে, মসজিদ শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে وَقِيْلَ هُوَ مَسْجِدٌ اَبَدًا وَهُوَ الاصَحّ (এবং বলা হয়েছে যে ওটা চিরদিনের জন্য মসজিদেই থাকবে, এবং এ উক্তিটা সবচেয়ে সঠিক বলে গণ্য।) এখানে সবচেয়ে সঠিক উক্তিটা قِيْلَ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই قِيْلَ দুর্বলতার পরিচায়ক নয়। এবং قِيْلَ

শব্দকে যদি দুর্বলতার পরিচায়ক হিসেবে মেনেও নেওয়া হয়, তাতে আযানকে সুন্নাত বলার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে কিন্তু জায়েয বলার ক্ষেত্রে নয়। কেননা এটা সুন্নাত বলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। আমরাও কবরে আযানকে সুন্নাত বলি না, কেবল জায়েয ও মুস্তাহাব বলে থাকি।

৩ নং- আপত্তি- ফকীহগণ বলেন যে, কবরে গিয়ে ফাতিহা পাঠ ভিন্ন অন্য কোন কিছু যেন করা না হয়। আযানে কবর যেহেতু ফাতিহা ভিন্ন অন্য কিছু, তাই এটা হারাম। যেমন বাহারুর রায়েকে বর্ণিত আছে-

وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ كُلُّ مَالَمْ يُعْهَدْ مِنَ السُّنَّةِ وَالْمَعْهُوْدُ مِنْهَا لَيْسَ اِلاَّ زِيَارَتُهَا وَالدُّعَاءَ عِنْدِهَا قَائِمًا.

ফত্ওয়ায়ে শামীর কিতাবুল জানায়েযে উল্লেখিত আছে-

لَايَسَنُّ الْاَذَانَ عِنْدَ اِذْ خَالِ الْمَيِّتِ قَبْرِه كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ الْاٰنُ وَقَدْ صَرَّحَ اِبْنُ حَجْرٍ بِاَنَّهُ بِدْعَةٌ وَقَالَ مَنْ ظَنَّ اَنَّهُ سُنَّةٌ فَلَمْ يُصِبُ.

অর্থাৎ লাশ কবরে রাখার সময় আযান দেয়া যেমন আজকাল প্রচলিত আছে, সুন্নাত নয়, আল্লামা ইব্নে হাজর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, এটা বিদ্আত এবং কেউ একে সুন্নাত মনে করলে, ভুল করেছে। দুর্রুল বিহার গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

مِنَ الْبِدَعِ الَّتِىْ شَاعَتْ فِىْ بِلَادِ الْهِنْدِ الْاَذَانُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ.

যেসব বিদ্আত হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, এর মধ্যে দাফনের পর কবরে আযান দেওয়াটাও রয়েছে।

توشيخ شرح تنقيح নামক গ্রন্থে আল্লামা মাহমুদ বলখী (রহঃ) বলেন الْاَذَانُ عَلَى الْقَبْرِ لَيْسَ بِشَيْئٍ কবরে আযান দেয়াটা কিছুই না। মৌলভী ইসহাক ছাহেব মিয়াতা মাসায়েল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কবরে আযান দেয়া মাকরূহ। কেননা, এটার কোন প্রমাণ নাই এবং যেটা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয় সেটা মাকরূহ হয়ে থাকে।

উত্তর- 'বাহারুর রায়েক' গ্রন্থে কবরের কাছে গিয়ে যিয়ারত ও দুআ ভিন্ন অন্য কিছু করাকে মাকরূহ বলাটা একেবারে সঠিক হয়েছে।

কারণ এটা কবর যিয়ারতের সময় অন্য কিছু করার বেলায় বলা হয়েছে, অর্থাৎ ওখানে যখন যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাবেন, তখন কবরে চুমু দেয়া, সিজ্দা করা ও

অন্যান্য নাজায়েয কাজ যেন করা না হয়। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে, দাফনকালীন সময় নিয়ে,যিয়ারতকালীন সময় নিয়ে নয়। যদি দাফনকালীন সময়টাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে বলতে বাধ্য হবো যে লাশ কবরে রাখা, তক্তা ও মাটি দেয়া, দাফনের পর তল্কীন করা, যাকে ফত্ওয়ায়ে রশিদীয়াতেও জায়েয বলা হয়েছে, সবকিছু নিষেধ হবে। লাশ জংগলে ফেলে দিয়ে ফাতিহা পাঠ করে পালিয়ে আসা চাই। কারণ যিয়ারত কালীন সময় ফাতিহা ভিন্ন অন্য কিছু করা নিষেধ। তাই মানতেই হয়, উপরোক্ত বক্তব্যই বাহারুর রায়েকের উদ্দেশ্য। তা' নাহলে মৃতদেরকে সালাম করা, কবরে সবুজ তরুলতা বা ফুল অর্পণ করা সবার মতে জায়েয এবং এটা হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে প্রমাণিত। বাহারুর রায়েকে ওখানে যিয়ারত ও দাঁড়িয়ে দুআ করা ছাড়া অন্য কিছু না করার জন্য বলা হয়েছে। মৌলভী আশরাফ আলী ছাহেবের রচিত 'হিফজুল ঈমান' গ্রন্থে একটি প্রশ্নোত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটা হচ্ছে শাহ ওলীউল্লাহ্ ছাহেব কবরবাসীর অবস্থা অবলোকনের كشف القبور নিয়ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

وبعده ہفت کره طواف کند ودراں تکبیر بخواند وآغاز ازراست کند وبعده طرف پایاں رخسار نهد.

অর্থাৎ এরপর কবরকে সাতবার তওয়াফ করবেন এবং ডান দিক থেকে শুরু করবেন আর কবরের পায়ের দিকে নিজের কপাল রাখবেন। তাহলে কি কবরকে তওয়াফ ও সিজদা করা জায়েয? উক্ত গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় এর জবাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন এ তওয়াফটা পারিভাষিক নয়, যা সম্মান ও নৈকট্য লাভের জন্য করা হয় এবং যার নিষেধাজ্ঞা শরীয়তের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তাই এখানে তওয়াফ শব্দটা আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ কবর বাসীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ফয়েয লাভের উদ্দেশ্যে কেবল কবরের চারিদিকে ঘুরা। হযরত জাবির (রাঃ) এর কাহিনীতে এর প্রমাণ রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, তাঁর পিতা ঋণগ্রস্থ অবস্থায় ইন্তিকাল করেন এবং ঋণদাতা এর জন্য হযরত জাবিরের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তিনি হুযূর আলাইহিস সালামের সমীপে আরয করলেন- আপনি বাগানে তশরীফ আনয়ন করে এর একটা সুরাহা করিয়ে দিন। হুযূর আলাইহিস সালাম বাগানে তশরীফ নিয়ে গেলেন। এবং খেজুরের কয়েকটি স্তুপ করে বড় স্তুপের চারিদিকে তিন চক্কর দিলেন।

হুযূর আলাইহিস সালামের এ চক্করটা কোন তওয়াফ ছিল না, বরং এতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য চারিদিকে চক্কর দিয়েছেন। কবরের অবস্থা পরিদর্শনের আমলের বেলায়ও তা-ই করা হয়। এবার বলুন, যদি কবরে আযান এজন্য নিষিদ্ধ যে কবরে যিয়ারত ও দুআ ভিন্ন অন্য কিছু করা জায়েয নাই, তাহলে এ কবর তওয়াফ ও ফয়েয গ্রহণ জায়েয কেন? সুতরাং বাহারুর রায়েকের বাহ্যিক ভাষ্য আপনাদেরও অনুকূল নয়।

আরও একটি মজার কথা হলো- হিফজুল ঈমান' গ্রন্থের উপরোক্ত ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে, কবরসমূহ থেকে ফয়েয পাওয়া যায় এবং ফয়েয লাভের জন্য ওখানে যাওয়া, তওয়াফ করা, কবরের উপর কপাল রাখা জায়েয। অথচ তক্‌বিয়াতুল ঈমানে ওগুলোকে শির্‌ক বলা হয়েছে। শামী, তুশেখ ও অন্যান্য কিতাবের যেসব ইবারত বিরোধিতাকারীরা উত্থাপন করেছে, ওসবের উত্তর ১নং আপত্তির উত্তরে দেয়া হয়েছে যে ওসব ইবারতে সুন্নাত হওয়াটাকেই অস্বীকার করা হয়েছে, জায়েয হওয়াটাকে নয়। তুশেখ গ্রন্থে উল্লেখিত لَيْسَ بِشَيْئٍ এর অর্থ হারাম নয়। এর ভাবার্থ হচ্ছে এটা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত নয়, কেবল জায়েয ও মুস্তাহাব মাত্র এবং একে ওয়াজিব বা সুন্নাত মনে করাটা ভুল। যেসব ফকীহ্‌গণ একে বিদ্‌আত বলেছেন, তাঁরা বিদ্‌আতে সুন্নাত বা বিদ্‌আতে মুস্তাহাবই বলেছেন, বিদ্‌আতে মাকরূহ বলেননি। কেননা বিনা দলীলে মাকরূহ প্রমাণিত হয় না। মৌলভী ইসহাক ছাহেব হলেন দেওবন্দীদের নেতা, তাই তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আর তিনি যে বিধানটা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা মাকরূহ,সেটা শুদ্ধ নয়। অন্যথায় কুরআনকে পারায় পারায় বিভক্ত করণ, হরকত দেওয়া এবং বুখারী শরীফও মাকরূহ হয়ে যাবে, কেননা এগুলো সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত নয়। দুরুল মুখতারে صلوة العيدين مطلب فى تكبير التشريق অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَوُقُوْفِ النَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ غَيْرِهَا تَشْبِيْهًا بِالْوَاقِفِيْنَ لَيْسَ بِشَيْئٍ.

(আরাফাতের দিন আরাফাতের ময়দানে অবস্থান না করে অন্যত্র অবস্থানকারীকে অবস্থানকারীদের মত তুলনা করাটা অনর্থক।) এর প্রেক্ষাপটে শামীতে উল্লেখিত আছে-

وَهُوَ نَكِرَةٌ فِىْ مَوْضِعِ النَّفِىِّ فَتَعُمُّ أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ مِنْ فَرْضٍ وَوَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ فَبَقِيَتِ الْاِبَاحَةُ قِيْلَ يُسْتَحَبُّ.

এখানে না বলার ক্ষেত্রটা অনির্দিষ্ট। সুতরাং ফরয ওয়াজিব ও মুস্তাহাবকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে মুবাহটা বাকী রয়েছে,কেউ কেউ মুস্তাহাব বাকী থাকার কথাও বলেছেন। প্রখ্যাত ফিকহ শাস্ত্রের কিতাব হিদায়ার টীকায় لَيْسَ بِشَيْئٍ প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে।

اَىْ لَيْسَ بِشَيْئٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الثَّوَابُ وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الْاِبَاحَةِ.

অর্থাৎ শব্দটা ছওয়াবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এর দ্বারা মুবাহ প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত ইবারত থেকে বোঝা গেল যে, لَيْسَ بِشَيْئٍ শব্দটা মুবাহের অর্থেও

ব্যবহৃত হয়।

৪ নং আপত্তি- আযান হলো নামাযের অবগতির জন্য। কিন্তু দাফনের সময় কোন নামাযটা হচ্ছে, যার অবগতির জন্য আযানের প্রয়োজন? সুতরাং এ আযানটা অনর্থক, তাই জায়েয নয়।

উত্তর- আযান শুধু নামাযের অবগতির জন্য মনে করাটা ভুল ধারণা। কত জায়গায় আযান দিতে হয়, তা আমি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। নবজাত শিশুর কানে যে আযান দেওয়া হয়, ওটা কোন্ নামাযের জন্য? হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে রমযান মাসে শেষ রাত্রে দু'বার আযান দেয়া হতো- একটি সাহরীর জন্য, অপরটি ফজর নামাযের জন্য।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্য- কাথিয়া ওয়ার্ডে ফজরের নামাযের পর মুসাফাহা করার প্রচলন আছে এবং ইউ,পি,তে ঈদের নামাযের পর কোলাকুলি করার রেওয়াজ আছে। এক ভদ্রলোক আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, মুসাফাহা কোলাকুলিতো প্রথম সাক্ষাতেই হওয়া চাই। নামাযের পরতো মানুষ চলে যাচ্ছে। তখন মুসাফাহা বা কোলাকুলি কেন? তাই এ মুসাফাহা বা কোলাকুলি বিদ্‌আত তথা হারাম হবে না কেন? আমি বললাম, কোলাকুলি হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে প্রমাণিত আছে যেমন মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল আদবে المصافحة والمعانقة নামে একটি অধ্যায় আছে। ওখানে বর্ণিত আছে যে হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেছ (রাঃ) এর সাথে কোলাকুলি করেছেন। হাদীছের বক্তব্য থেকে প্রতিভাত হয় যে, এ কোলাকুলিটা আনন্দেরই ছিল। ঈদের দিনটাও আনন্দের দিন,সেজন্য আনন্দ প্রকাশার্থে কোলাকুলি করে থাকে। অধিকন্তু দুর্‌রুল মুখতারে পঞ্চম খণ্ড الكراهية অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

اَىْ كَمَا تَجُوْزُ الْمُصَافَحَةُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَوْلُهُمْ اِنَّهُ بِدْعَةٌ اَىْ مُبَاحَةٌ حَسَنَةٌ كَمَا اَفَادَهُ النَّوَوِىُّ فِىْ اَذْكَارِهِ.

অর্থাৎ মুসাফাহা জায়েয যদিওবা আসর নামাযের পরেও হয়। ফকীহ্‌গণ আসরের নামাযের পর মুসাফাহাকে যে বিদ্‌আত বলেছেন, তা বিদ্‌আতে মুবাহ-হাসনা। যেমন ইমাম নববী (রহঃ) স্বীয় আযকারে বর্ণনা করেছেন।

এর প্রেক্ষাপটে ফত্‌ওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে-

اِعْلَمْ اَنَّ الْمُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ وَاَمَّا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنَ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَلَا اَصْلَ لَهُ فِى الشَّرْعِ [illegible] عَلٰى هٰذَا الْوَجْهِ وَلٰكِنْ لَابَاسَ بِهِ وَتَقْيِيْدُهُ بِمَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ عَلٰى عَادَةٍ. كَانَتْ فِىْ زَمَنِهِ وَاِلَّا

فَعَقِبَ الصَّلٰوةِ كُلِّهَا كَذَالِكَ .

প্রত্যেক সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা মুস্তাহাব এবং ফজরের পরে মুসফাহা করার যে রেওয়াজ রয়েছে, শরীয়তে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এতে কোন ক্ষতিও নেই, আর ফজর ও আসরের শর্তারোপ, কেবল মানুষের অভ্যাসের কারণেই করা হয়েছে। অথচ প্রত্যেক নামাযের পর মুসাফাহার একই হুকুম।

এর থেকে বোঝা গেল মুসাফাহা যে কোন সময় জায়েয আছে। কিন্তু এ উত্তরে তিনি পুরাপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না এবং বলতে চাইলেন যে, মুসাফাহা কোলাকুলি প্রথম সাক্ষাতের সময় হওয়া উচিত। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রথম সাক্ষাত কাকে বলে? এর উত্তরে তিনি বললেন, অদৃশ্য হওয়ার পর পুনরায় মিলনকে প্রথম সাক্ষাত বলা হয়। তখন আমি বললাম, অদৃশ্য হওয়ার দু'টি রূপ আছে, একটি হচ্ছে শারীরিক অদৃশ্য হওয়া, অপরটি হচ্ছে মানসিকভাবে অদৃশ্য হওয়া। যেমন নামাযের সময় যদিওবা বাহ্যিকভাবে সমস্ত মুক্তাদী ও ইমাম একই জায়গায় আছে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে একে অপর থেকে অদৃশ্য ছিল, কারণ কেউ কারো সাথে কথা বলতে পারে না, না পারে একে অপরের সাহায্য করতে। বরং তাদেরকে দুনিয়া থেকে অদৃশ্য বলা যায়। তাদের জন্য খানাপিনা, চলাফেরা সমস্ত দুনিয়াবী কাজ হারাম এবং اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ (নামায হচ্ছে মুমিনদের জন্য মিরাজতুল্য) এ দৃশ্যটা প্রকাশ পায়; দুনিয়ার সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন এবং সবাই আল্লাহর প্রতি মনোযাগী। যখন সালাম ফেরালেন, তখন আবার দুনিয়াতে এসে গেলেন, এবং দুনিয়াবী যাবতীয় কাজ হালাল হয়ে গেল। এ সময় অদৃশ্য হওয়ার পর পুনঃ মিলনই বোঝা গেল। তাই মুসাফাহা সুন্নাত। তিনি বললেন, আপনিতো এটা যুক্তি দ্বারা বোঝালেন, কিন্তু শরীয়ততো এ সময়টাকে সাক্ষাতের সময় বলে নাই। আমি বললাম নিশ্চয়ই বলেছে। তা'নাহলে ওই সময় সালাম কাকে করা হয় এবং কেন করা হয়? ইমামকে সমস্ত মুক্তাদী ও ফিরিশ্তাদেরকে সালাম করার নিয়ত করা চাই। আর একাকী নামাযের বেলায় কেবল ফিরিশ্তাদেরকে সালাম করার নিয়ত করতে হবে। সালাম সাক্ষাতের সময় বা বিদায়ের সময় করা হয়। বলুন এখানে সালাম কেন? এ লোকগুলো কোথায় থেকে আস্ছে বা কোথায় যাচ্ছে? কৈ, কেউতো চলে যাচ্ছে না কারণ এক্ষুনি মুনাজাত হবে, ওজীফা পাঠ করবে এবং অনেকেই ইশরাকের নামায পড়েই উঠবেন। বোঝা গেল যে, উর্ধজগত পরিভ্রমণ করে এসে সালাম করছে। সুতরাং এর্পর মুসাফাহা করলেন, তাতে ক্ষতি কি? তিনি বললেন, তাহলে প্রত্যেক নামাযের পর করা চাই। আমি বললাম, হ্যাঁ, প্রত্যেক নামাযের পরে করলেও তাতে কোন নিষেধ নেই। খোদার শোকর তার মনঃপুত হয়েছে। আযানের মাস্আলাটাও তদ্রূপ।

বুযুর্গানে কিরামের উরস প্রসঙ্গে আলোচনা

দু'অধ্যায়ে বিন্যস্ত এ আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে উরসের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

(উরসের প্রমাণসমূহ)

উরসের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'শাদী'। এ জন্যই বর-কনেকে আরবী ভাষায় উরস বলা হয়। বুযুর্গানে দ্বীনের মৃত্যু দিবসকে এ জন্যই উসর বলা হয় যে, মিশকাত শরীফে اثبات عذاب القبر শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যখন মুনকার-নকির মইয়তের পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তখন তাকে বলেন-

نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ الَّتِىْ لَا يُوْقِظُهُ اِلَّااَحَبُّ اَهْلِهٖ اِلَيْهِ

আপনি সেই কনের মত শুয়ে পড়ুন, যাকে ওর প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ উঠাতে পারে না। তাই মুনকার নকির ফিরিশ্তাদ্বয় যেহেতু ওই দিনকে উরুস বলেছেন, সেহেতু উরস বলা হয়। অথবা এজন্য যে, ওই দিন জামালে মুস্তাফা (দঃ) দেখার দিন। মুনকার নকির হুযূরকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, ওনার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? তিনিই তো সৃষ্টিজগতের দুলহা, সারা জগত তাঁরই ছোঁয়াছের প্রতিফলন। সেই মাহবুবে খোদার সাক্ষাতের দিন নিশ্চয় উরসের দিন। এজন্য এদিনকে উরস বলা হয়। বাস্তব অর্থে প্রতি বছর ওফাত দিবসে কবর যিয়ারত করা, কুরআনখানি ও সদ্কা ইত্যাদির ছওয়াব পৌঁছানোকে উরস বলা হয়। উরসের উৎস হাদীছে পাক ও ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তি থেকে প্রমাণিত আছে। ফত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ড زيارت القبور শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

رَوٰى اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْتِىْ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ بِاُحُدٍ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ .

ইবনে আবি শাইবা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হুযূর আলাইহিস সালাম প্রতি বছর উহুদ যুদ্ধের শহীদদের কবরে তশরীফ নিয়ে যেতেন। তফ্সীরে কবীর ও তফ্সীরে দুর্রে মনসুরে উল্লেখিত আছে-

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ كَانَ يَاْتِىْ قُبُوْرَ

الشُّهَدَاءِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْاَرْبَعَةُ هٰكَذَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে প্রমাণিত আছে যে তিনি প্রতি বছর শহীদদের কবরে তশ্‌রীফ নিয়ে যেতেন এবং ওদেরকে সালাম দিতেন। চার খলিফাগণও অনুরূপ করতেন।

শাহ আবদুল আযীয ছাহেব ফত্‌ওয়ায়ে আযীযিয়ার ৪৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন-

دوم آنکه بیئت اجتماعیه مددماں کثیر جمع شوند وختم کلام الله فاتحه بر شیرنی وطعام نموده تقسیم درمیاں حاضراں کنند ایں قسم معمول در زمانئه پیغمبرخدا وخلفائے راشدین نه بود اگر کسے ایں طور کنند باك نیست بلکه فائده احیاء اموات را حاصل می شود.

দ্বিতীয়তঃ অনেক লোক একত্রিত হয় এবং খতমে কুরআন পড়া হয় আর খাদ্য দ্রব্য শিরনীর ফাতিহা দিয়ে সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ধরে,নর রীতি হুযূর আলাইহিস সালাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু কেউ যদি করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই বরং জীবিতগণ মৃতদের দ্বারা লাভবান হয়। "যুবদাতুন নসায়েহ ফি মসায়েলিয যবায়েহ" গ্রন্থে শাহ আবদুল আযীয ছাহেব (রহঃ) মৌলভী আবদুল হাকিম ছাহেব শিয়ালকোটির একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন-

ایں طعن مبنی است برجهل به احوال مطعون علیه زیراکه غیر از فرائض شرعیه مقرره راهیچ کس فرض نمی داندآرے تبرك بقبور صالحین وامداد ایشاں بایصال ثواب وتلاوت قرآن ودعائے خیر وتقسیم طعام وشیر ینی امر مستحن وخوب است باجماع علماء وتعیین روز عرس برائے آں است که آں روز ذکر انتقال ایشاں می باشد از دارالعمل بدارالثوب والاهر روزکه ایں عمل واقع

شود موجب فلاح ونجات است.

অর্থাৎ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণেই এ অপবাদ দেয়া হয়। কোন ব্যক্তিই শরীয়তের নির্ধারিত ফরযসমূহ ব্যতীত অন্য কিছুকে ফরয মনে করে না। তবে নেকবান্দাদের কবরসমূহ থেকে বরকত লওয়া এবং ঈসালে ছওয়াব, কুরআন তিলাওয়াত, শিরনী ও খাদ্যদ্রব্য বণ্টন দ্বারা ওদের সাহায্য করা উলামায়ে কিরামের মতে ভাল। উরসের দিন এজন্য নির্ধারিত করা হয় যে ওই দিন ওদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যথায় এ কাজ যে কোন দিনই করা হোক না কেন, উপকার রয়েছে। হযরত শেখ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী ১৮২ নং পত্রে মাওলানা জালাল উদ্দিনকে লিখেছেন-

اعراس پیراں برسنت پیراں بسماع وصفائی جاری دارند.

পীরগণের উরস ও তাঁদের তরিকা মতে কাওয়ালী পবিত্রতা সহকারে জারী রাখবেন।) মৌলভী রশীদ **আহমদ** ও **আশরফ** আলী ছাহেবানের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব স্বীয় রচিত 'ফয়সালা-এ-**হাপ্ত** মাসায়েল' পুস্তিকায় উরস জায়েয হওয়া সম্পর্কে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেন এবং স্বীয় আমলের কথা এভাবে বর্ণনা করেন-

فیقرکا مشرب اس امر میں یه ہے که ہر سال اپنے پیر ومرشدکی روح مبارك پر ایصال ثواب کرتاہوں اوّل قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ اگر وقت میں وسعت ہو تو مولود پڑھا جاتاہے- پھر ماحضر کھانا کھلایا جاتاہے اور اس کاثواب بخش دیاجاتاہے.

ফকীরের নিয়ম এ যে প্রতি বছর আমি আমার পীর মুর্শিদের পবিত্র আত্মার প্রতি ঈসালে ছওয়াব করে থাকি। প্রথমে কুরআনখানি হয়। এরপর যদি সময় থাকে মীলাদ শরীফের আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে খাবার পরিবেশন করা ও এর ছওয়াবও বখশিশ করে দেয়া হয়।" মৌলভী রশীদ আহমেদ ছাহেবও মূল উরসকে জায়েয মনে করেন। যেমন ফত্‌ওয়ায়ে রশিদীয়া প্রথম খণ্ড কিতাবুল বিদ্‌আতের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন- 'অনেক জিনিস প্রথমে মুবাহ ছিল কিন্তু পরে কোন এক সময় নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। উরস ও মিলাদ মাহফিলের বেলায়ও তাই হয়েছে। আরববাসী থেকে জানা যায় যে, মক্কা শরীফের লোকেরা হযরত সৈয়দ আহমদ বদ্দবী (রহঃ) এর উরস অনেক

ধুমধাম সহকারে পালন করে থাকে। বিশেষ করে মদীনা মনোয়ারার আলিমগণ হযরত আমীর হামযা (রাঃ) এর উরস করে থাকেন, যার পবিত্র মাযার উহুদ পাহাড়ে অবস্থিত। মোট কথা হলো, সারা দুনিয়ার মুসলমান, আলেম ও নেকবান্দাগণ বিশেষ করে মদীনাবাসী উরসের প্রতি আস্থাশীল এবং যেটাকে মুসলমানগণ ভাল মনে করে, ওটা আল্লাহর কাছেও ভাল বলে গণ্য।" বিবেকও বলে যে বুযুর্গানে কিরামের উরস ভাল কাজ। কেননা, প্রথমতঃ উরস হচ্ছে যিয়ারতে কবর ও সদ্‌কা খয়রাতের সমষ্টি এবং উভয়টা সুন্নাত। তাই দুই সুন্নাতের সমষ্টি (উরস) কিভাবে হারাম হতে পারে? মিশ্‌কাত শরীফে زيارت القبور শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান, 'আমি তোমাদেরকে যিয়ারতে কুবুর থেকে বারণ করেছিলাম الا فزوروها এখন থেকে নিশ্চয় যিয়ারত করবে।' এর দ্বারা প্রত্যেক প্রকারের কবর যিয়ারতের বৈধতা বোঝা গেল, হয় প্রতিদিন বা বছরের পরে অথবা একাকী বা সমবেতভাবে যিয়ারত করা যায়। তাই নিজের পক্ষ থেকে এব্যাপারে শর্তারোপ করে সমবেতভাবে ও বছরের পর নির্ধারিত দিনে যিয়ারত করাকে নিষেধ বলাটা বাতুলতা মাত্র। নির্ধারিতভাবে হোক বা অনির্ধারিতভাবে হোক প্রত্যেক প্রকারের যিয়ারত জায়েয। দ্বিতীয়তঃ উরসের তারিখ নির্ধারিত থাকলে, লোকেরা সহজে জমায়েত হতে পারে এবং লোকেরা একত্রিত হয়ে কুরআনখানি, কলেমা তৈয়্যবা, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করতে পারে এবং এতে অনেক বরকতের সমন্বয় ঘটে। তৃতীয়তঃ পীরের উরসের দিন মুরিদানেরা আপন পীর ভাইদের সাথে অনায়াসে সাক্ষাত করতে পারে এবং পরস্পরের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। চতুর্থতঃ এটা পীর অনুসন্ধান করার সুবর্ণ সুযোগ। কোন উরসে গিয়ে দেখবেন যে ওখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক বুযুর্গানেদ্বীন, উলামায়ে কিরাম ও সুফিয়ানে ইজাম সমবেত হয়েছেন। সবাইকে দেখে, যার প্রতি আকৃষ্ট হবেন তার কাছে বাইয়াত হবেন। হজ্ব ও মদীনা শরীফের যিয়ারতও নির্ধারিত তারিখে হয়ে থাকে। এতেও উপরোক্ত ফায়দাসমূহ নিহিত রয়েছে। আমি দেওবন্দী গুরুদের অনেক কবর দেখেছি, যেখানে নেই কোন সমাগম, নেই কোন ফাতিহাখানি বা ঈসালে ছওয়াব, না তাদের থেকে বা তারা কারো থেকে ফয়েয লাভ করে। এটা হচ্ছে ভাল কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পরিণামফল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উরস প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব

১নং আপত্তি- মৃত্যুর পর যাকে আপনারা ওলী মনে করেন এবং যার উরস করেন, সে যে ওলী তা আপনারা কিভাবে বুঝলেন? কারো মৃত্যুর বেলায় নিশ্চিত হওয়া যায় না যে, সে কি ঈমান নিয়ে মরলো, নাকি বেঈমান হয়ে মরলো। তাই কোন মৃত ব্যক্তির বেলায়ত প্রাপ্তি কিভাবে জানা যেতে পারে? উচ্চস্তরের অনেক নেকবান্দাও কাফির হয়ে মারা যায়।

উত্তর- যিন্দেগীর প্রকাশ্য আহকাম মৃত্যুর পর চালু হয়। যে যিন্দেগী অবস্থায় মুসলমান ছিল, মৃত্যুর পরও তাকে মুসলমান মনে করে তার নামায, কাফন দাফন এবং তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন ইত্যাদি করা হবে এবং যে যিন্দেগীতে কাফির ছিল, মৃত্যুর পর না হবে তার জানাযা, না হবে তার দাফন কাফন বা সম্পত্তি বণ্টন। শরীয়তের হুকুম বাহ্যিক আচরণের উপরই হয়ে থাকে। কেবল সম্ভাবনাময় কোন বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যিনি যিন্দেগীতে ওলী ছিলেন, তিনি মৃত্যুর পরও ওলী হিসেবে গণ্য হবেন। যদি কেবল সম্ভাবনাময় বিষয়ের উপর আহকাম চালু হয়, তাহলে কাফিরদের জানাযাও পড়ে নিন সম্ভবতঃ মুসলমান হয়ে মরতে পারে এবং মুসলমানের জানাযা না পড়ে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলুন, কারণ সম্ভবতঃ কাফির হয়ে মরতে পারে। অধিকন্তু মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল জানায়েয المشى بالجنازة শীর্ষক অধ্যায়ে মুসলিম ও বুখারী শরীফের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আলাইহিস সালামের সামনে দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে গেল এবং লোকেরা এর প্রশংসা করলেন। তিনি ফরমালেন وَجَبَتْ (অবধারিত হয়ে গেছে) এরপর অন্য আর একটি জানাযা নিয়ে গেল এবং লোকেরা এর সমালোচনা করলেন। তিনি (দঃ) বললেন وَجَبَتْ (অবধারিত হয়ে গেছে) হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন-কি অবধারিত হয়ে গেল? তিনি (দঃ) ফরমালেন প্রথমটার জন্য বেহেশ্‌ত এবং দ্বিতীয়টার জন্য দোযখ। এরপর বললেন- اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ (তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।) এর থেকে বোঝা গেল, সাধারণ মুসলমান যাকে ওলী মনে করেন, সে আল্লাহর কাছেও ওলী বলে গণ্য। মুসলমানের মুখ থেকে ওই কথাটিই বের হয়, যা আল্লাহর দরবারে আলোচিত হয়। অনুরূপ যেটা মুসলমানগণ হালাল ও ছওয়াবের কাজ মনে করে, আল্লাহর কাছেও সেটা হালাল ও ছওয়াবের কাজ হিসাবে গণ্য। কারণ মুসলমানগণ হলেন আল্লাহর সাক্ষী। হাদীছই এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন مَارَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ حَسَنٌ (যেটাকে মুমিনগণ ভাল জানে, ওটা আল্লাহর কাছেও ভাল বলে গণ্য)

কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ.

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ন্যায় পরায়ণ উম্মত হিসেবে গঠন করেছি, যাতে তোমরা জনগণের সাক্ষী হতে পার। মুসলমানগণ কিয়ামতেও সাক্ষী, দুনিয়াতেও সাক্ষী। আল্লাহ তা'আলা কুরআন করীমের সঠিকতা ও রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা প্রমাণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও অন্যান্য বুযুর্গানে কিরামের সাক্ষ্য পেশ করেছেন এবং বলেছেন- وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِهِ যখন নেক্কার মুমিনদের সাক্ষ্য দ্বারা নাবুয়ত প্রমাণ করা যায়, তখন অনায়াসে বেলায়তও প্রমাণিত হতে পারে। এবং ওই সাক্ষ্য দ্বারা যখন কুরআনের সঠিকতা প্রমাণিত হতে পারে, তখন শরয়ী মাসায়েল কেন প্রমাণিত হতে পারবে না?

বিঃ দ্রঃ- এ প্রশ্নটা মক্কা মুকাররমায় হেরম শরীফের নজদী ইমাম করেছিল। এক সমাবেশে আমি এ জবাবটা দিয়েছিলাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন যে এ কথাটা সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; ওনারা যার সম্পর্কে যে রকম সাক্ষ্য দিবেন, সে রকম হয়ে যাবে আর ওখানে اَنْتُمْ (তোমরা) বলেছেন। আমরা ওই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত নই। কারণ ওই সময় আমরা মওজুদ ছিলাম না। এর উত্তরে আমি বলেছি যে, মিশ্কাত শরীফেই সে একই জায়গায় বর্ণিত আছে وَفِى رِوَايَةٍ اَلْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَآءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ (অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীতে মুসলমানগণ আল্লাহর সাক্ষী) এখানে اَنْتُمْ শব্দ নেই। অধিকন্তু কুরআন শরীফে সমস্ত আহকাম সম্বোধন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ (নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ইত্যাদি।) তাহলে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় আমরা যেহেতু ছিলাম না, তাই আমরা এসব আহকাম থেকে মুক্ত, এসব আহকাম কেবল সাহাবায়ে কিরামের জন্যই ছিল। এটা নিছক ভুল ধারণা। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মুসলামান কুরআন হাদীছের সম্বোধন শব্দসমূহের আওতার অন্তর্ভুক্ত। খোদার শুকর, এ বক্তব্যের ফলে ইমাম ছাহেবের রাগ এসেছে কিন্তু জবাব আসেনি।

২নং আপত্তি- হাদীছ শরীফে আছে لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا (আমার কবরকে ঈদে পরিণত কর না) এর থেকে বোঝা গেল কবরের কাছে গণজমায়েত করা, মেলা বসানো নিষেধ। কেননা ঈদের ভাবার্থ হচ্ছে মেলা এবং উরসে গণজমায়েত হয় ও মেলাও বসে। তাই এটা হারাম।

উত্তরঃ ঈদ মানে গণজমায়েত আর হাদীছের অর্থ- 'আমার কবরে জমায়েত হইও না, একলা আসিও"- এ আজগুবী অর্থ কোত্থেকে আবিষ্কার করলো? ঈদের দিন আনন্দ প্রকাশ করা হয়, ঘরবাড়ী সাজানো হয় এবং খেলাধূলাও হয়ে থাকে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আমার পবিত্র কবরে আসতে চাইলে, আদব সহকারে এসো। এখানে এসে হৈ-হল্লা, খেল তামাসা কর না। যদি কবরে জমায়েত হওয়া নিষেধ হয়, তাহলে আজকাল মদীনা মনোয়ারার প্রতি দলে দলে লোক ধাবিত কেন? اَللّٰهُمَّ اُرْزُقْنَا। পাঁচটি ওয়াক্ত নামাযের পর জনগণ একত্রিত হয়ে সালাম কেন পেশ করে? হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব "ফয়ছালা এ-হাপ্ত মাসায়ালা" গ্রন্থে উরস শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন لَاتَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا এর সঠিক অর্থ হচ্ছে কবরে মেলা বসানো, আনন্দ উল্লাস করা ও সাজসজ্জা ও ধুমধামের আয়োজন করা নিষেধ। কিন্তু (উক্ত হাদীছের) অর্থ এ নয় যে কবরে জমায়েত হওয়া নিষেধ। অন্যথায় মদীনা শরীফে রওযা পাক যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে দলে দলে লোক যাওয়া নিষেধ হতো। এটা ভুল ধারণা। সুতরাং হক কথা হলো একাকী হোক বা দলবদ্ধভাবে হোক, উভয় ভাবে কবর যিয়ারত জায়েয। অথবা হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা আমার কবরে ঘন ঘন আসা যাওয়া কর, ঈদের মত পূর্ণ বছর অতিবাহিত করে এসো না।

৩নং আপত্তি- প্রায় উরসসমূহে নারী পুরুষের অবাধ সমাগম, নাচ গান কাওয়ালী হয়ে থাকে। মোট কথা বুযুর্গানে কিরামের উরস হচ্ছে নানা হারাম কার্যের সমাহার এজন্য এটা হারাম।

উত্তর- এর মোটামুটি উত্তর হচ্ছে কোন সুন্নাত বা জায়েয কাজে হারাম বিষয়ের সংমিশ্রণের ফলে মূল হালাল কাজটা হারাম হয়ে যায় না। বরং হালাল হালালই থাকে আর হারাম হারামই। ফতওয়ায়ে শামীর 'যিয়ারতে কুবুর' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَلَا تُتْرَكُ لِمَا يَحْصُلُ عِنْدَهَا مِنْ مُنْكِرَاتٍ وَمُفَاسِدَ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَغَيْرِهَا لِاَنَّ الْقُرُبَاتِ لَاتُتْرَكُ لِمِثْلِ ذَالِكَ بَلْ عَلَى الْاِنْسَانِ فِعْلُهَا وَاِنْكَارُ الْبِدَعِ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ مَامَرَّ مِنْ عَدَمِ تَرْكِ اِتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَاِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَائِحَاتٌ.

অর্থাৎ এজন্য কবর যিয়ারত ছেড়ে দিবেন না যে, ওখানে নাজায়েয কাজ হয়।

যেমন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, কারণ ওই রকম নাজায়েয কাজের দরুণ মুস্তাহাব ত্যাগ করতে হয় না। বরং যিয়ারত করা এবং বিদ্আত প্রতিরোধ করা জনগণের কর্তব্য। ইতিপূর্বে উল্লেখিত সেই মাসয়ালাটি "জানাযার সাথে যাওয়াটা ছেড়ে দিও না যদিওবা এর সাথে বিলাপকারী থাকে" এর সমর্থন করে।

মক্কা বিজয়ের আগে কাবা শরীফে ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ে মূর্তি ছিল। কিন্তু মূর্তির কারণে মুসলমানেরাতো তওয়াফ ছেড়ে দেননি আর উমরাহও বাদ দেননি। তবে যখন আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন, তখন মূর্তিগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। আজকাল বাজারে, ট্রেনে, বিভিন্ন দুনিয়াবী জনসভায় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ হয়ে থাকে। এমনকি হাজীদের জাহাজে, অনেক সময় তওয়াফ করতে মিনা-মুযদালাফায় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য কেউ মূল বিষয়কে নিষেধ করে না। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও অনেক সময় অনেক হারাম কাজ ঘটে যায়। কিন্তু এ কারণে মাদ্রাসা হারাম হয় না। অনুরূপ উরসে মহিলাদের যাওয়া এবং নাচ-গান করা হারাম। কিন্তু এর কারণে মূল উরস হারাম হবে কেন? বরং ওখানে গিয়ে ওই সমস্ত নাজায়েয কাজ প্রতিরোধ কর এবং জনগণকে বোঝাও। দেখুন, জুদ ইবনে কায়েস নামক এক মুনাফিক আরয করেছিল- আমাকে তবুক যুদ্ধে শরীক করবেন না, কারণ রোম ও সিরিয়ার মহিলারা খুবই সুন্দর আর আমি হলাম নারীদের পাগল। তাই আমাকে ফিত্নায় ফেলবেন না। কিন্তু কুরআন করীম এ অজুহাতকে খণ্ডন করেছেন-

اَلاَ فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ

(সাবধান! ওরাই ফিত্নাতে পড়ে আছে। জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছে।) এ অজুহাতকে আল্লাহ তা'আলা কুফরী এবং জাহান্নামের সহায়ক বলেছেন। (তফসীরে রূহুল বয়ান ও তফসীর কবীর দ্রষ্টব্য) একই ধরনের আপত্তি কেবল বাধা দিবার জন্য আজকাল দেওবন্দীরা করে থাকে।

আকজাল বিবাহ শাদীতে অনেক হারাম কাজ হচ্ছে, যার ফলে মুসলমানেরা অধপতনে যাচ্ছে এবং গুনাহের ভাগীও হচ্ছে। কিন্তু এসমস্ত হারাম কাজের কারণে বিবাহকে হারাম বলে কেউ বন্ধ করে দেয়নি।

আজকাল যে কাওয়ালী সাধারণভাবে প্রচলিত, যেখানে অশ্লীল বিষয়ের গান পরিবেশন করা হয় এবং যেখানে পাপীতাপী, বড় ছোট সবাই জমায়েত হয় আর গানের তালে তালে নৃত্য করা হয়, এটা নিশ্চয়ই হারাম। কিন্তু যদি কোন জায়গায় এ ব্যাপারে পালনীয় সমস্ত শর্তাদি পালন পূর্বক কাওয়ালী হয় এবং কাওয়ালী পরিবেশনকারী আর

www.AmarIslam.com

শ্রোতাগণ যদি উপযোগী হয়, তাহলে একে হারাম বলতে পারেন না। বড় বড় অনেক সুফিয়ানে কিরাম উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সঠিক কাওয়ালী হালাল এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য হারাম বলেছেন। এর উৎস হলো সেই হাদীছটি, যেটা মিশ্কাত শরীফের কিতাবুল মনাকেব مناقب عمر (মনাকেবে উমর) শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে হুযূর আলাইহিস সালামের সামনে জনৈকা বাঁদী দপ্ বাজাচ্ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তশরীফ আনলেন, সে কিন্তু দপ্ বাজাতে ছিল; হযরত উছমান (রাঃ) তশরীফ আনলেন, তখনও সে দপ্ বাজাচ্ছিল। কিন্তু যখন হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) তাশরীফ আনলেন, তখন দপ্‌কে নিজের গায়ের নীচে দিয়ে বসে গেল। তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- হে উমর, তোমাকে শয়তানও ভয় করে। এখন প্রশ্ন হলো দপ্-বাজানো শয়তানী কাজ ছিল কিনা। যদি শয়তানী কাজই ছিল, তাহলে কি শয়তান হুযূর আলাইহিস সালাম, হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) ও হযরত উছমান গণী (রাঃ)কে ভয় করলো না? আর এতে স্বয়ং হুযূর আলাইহিস সালাম এবং ওই সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম কেন অংশ গ্রহণ করলেন? আর যদি শয়তানী কাজ না হতো, তাহলে হুযূর আলাইহিস সালামের এ ধরনের বলার কি অর্থ হতে পারে? এর উত্তর সেটাই হবে যে, হযরত ফারুকে আযম আসার আগে এ কাজটা শয়তানী ছিল না, তাই হচ্ছিল এবং হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) আসার সাথে সাথেই এটা শয়তানী হয়ে গেছে এবং সাথে সাথে বন্ধও হয়ে গেছে। এজন্য সুফিয়ানে কিরাম কাওয়ালীর জন্য ছয়টি শর্তারোপ করেছেন। ওগুলোর একটি হচ্ছে মজলিসে যেন কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি না থাকে। অন্যথায় শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটবে। যেমন খাবার মজলিসে যদি কোন ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না পড়ে খাওয়া শুরু করে, তাহলে শয়তানও এতে শরীক হয়ে যায়। এর দ্বারা এটা বোঝা যায় না যে হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এর মর্যাদা কিছু কম। বরং সাহাবায়ে কিরামের এক এক জন এক এক দিকে মর্যাদাবান। কারো কাছে আনুগত্যের প্রাধান্য এবং কারো কাছে ভালবাসার প্রাধান্য রয়েছে। এজন্য তাদের প্রভাবও ভিন্নতর ছিল। যদি কোন গাউছ বা কুতুব বিসমিল্লাহ না বলে খেতে আরম্ভ করে, এতে শয়তান শরীক হয়ে যায়। এর জন্য গাউছের দোষারোপ করা হয় না।

ফত্ওয়ায়ে শামীর পঞ্চম খণ্ড কিতাবুল কারাহিয়াতের اللبس। পরিচ্ছেদের একটু আগে বর্ণিত আছে-

اَلَةُ اللَّهْوِ لَيْسَتْ بِحُرْمَةٍ لِعَيْنِهَا بَلْ لِقَصْدِ اللَّهْوِ مِنْهَا اَلاَ تَرٰى
اَنَّ ضَرْبَ تِلْكَ الْاٰلَةِ بِعَيْنِهَا اُحِلَّ تَارَةً وَّحُرِّمَ اُخْرٰى وَفِيْهِ دَلِيْلٌ

www.AmarIslam.com

لِسَادَاتِنَا الصُّوفِيَةِ الَّذِيْنَ يَقْصُدُوْنَ بِسَمَاعِهَا اُمُوْرًا هُمْ اَعْلَمُ بِهَا فَلَا يُبَادِرُ الْمُعْتَرِضُ بِالْاِنْكَارِ كَىْ لَا يَحْرُمُ بَرْكَتَهُمْ فَاِنَّهُمْ السَّادَةُ الْاَخْيَارُ.

তাফ্সীরাতে আহমদীয়ায় ২১ পারার সূরা লুকমানের আয়াতে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ কাউয়ালীর অনেক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে এটাই বলেছেন যে উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যই কাওয়ালী হালাল আর অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এটা হারাম। এরপর বলেছেন-

وَبِهِ نَاخُذُ لِاَنَّا شَاهَدْنَا اَنَّهُ نَشَآءُ مِنْ قَوْمٍ كَانُوْا عَارِفِيْنَ وَمُحِبِّيْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَانُوْا مَعْذُوْرِيْنَ لِغَلْبَةِ الْحَالِ وَيَسْتَكْثِرُوْنَ السِّمَاعَ لِلْغِنَاءِ وَكَانُوْا يَحْسَبُوْنَ ذَالِكَ عِبَادَةً" اَعْظَمَ وَجِهَادًا اَكْبَرَ فَيَحِلُّ لَهُمْ خَاصَةً انتهى مُلَخَّصًا.

হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব ফয়সালা-এ-হাপ্ত মাসায়েলা' গ্রন্থে উরসের আলোচনায় কাউয়ালী প্রসংগে বলেছেন- মুহাক্কিকদের অভিমত হচ্ছে যদি জায়েযের শর্তসমূহ পাওয়া যায় এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ দূরীভূত করা হয় তাহলে জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়। মৌলভী রশীদ আহমদ ফত্ওয়ায়ে রশিদীয়ার كتاب الخطر والاباحت এর ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে বাদ্যযন্ত্রবিহীন রাগ (গান) শুনা জায়েয। যদি গায়ক উচ্ছৃঙ্খল না হয় এবং রাগের বিষয়বস্তু শরীয়তবিরোধী না হয়, তাহলে সংগীতের মত হলেও কোন ক্ষতি নাই। সারকথা হলো কউয়ালী উপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য শর্তসাপেক্ষ জায়েয এবং শর্তহীনভাবে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য হারাম। আল্লামা শামী (রহঃ) ফত্ওয়ায়ে শামীর কিতাবুল কিরাহিয়ায় কাউয়ালীর জন্য ছয়টি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। এ শর্তগুলো হচ্ছে- (১) মজলিসে অপ্রাপ্ত বয়স্ক দাঁড়ী বিহীন কোন ছেলে না থাকা (২) সমবেত সবাই উপযুক্ত হওয়া এবং অনুপযুক্ত কেউ না থাকা (৩) কাউয়ালের নিয়ত খাঁটি হওয়া এবং উপার্জনের উদ্দেশ্য না থাকা। (৪) শ্রোতাগণ খাবার ও স্বাদ গ্রহণের নিয়তে জমায়েত না হওয়া (৫) বিনা আত্মহারায় না দাঁড়ানো এবং (৬) গানগুলো শরিয়ত বিরোধী না হওয়া। কাউয়ালী শুনার উপযুক্ত হলো সেই, যাকে আত্মহারা অবস্থায় তলোয়ারের আঘাত করলেও কিছু বলতে পারে না। কতেক সুফিয়ানে কিরাম বলেন, যাকে সাত দিন পর্যন্ত খাবার দেয়া হলো না। এরপর একদিকে গান অন্যদিকে খাবার রাখা হলে, সে যদি খাবারের দিকে খেয়াল না করে গানের প্রতি

আকৃষ্ট থাকে, সেই কাউয়ালী শুনার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আমার এ আলোচনার উদ্দেশ্য এ নয় যে, আজকাল প্রচলিত সাধারণ কাউয়ালীকে হালাল বলা বা সাধারণ লোকদেরকে কাউয়ালী শুনার প্রতি আকৃষ্ট করা। আমি বিরুদ্ধবাদীদের অনেককে কেবল কাউয়ালীর কারণে সুফিয়ানে কিরামকে গালি দিতে শুনেছি। তারা কাউয়ালীকে যেনার মত হারাম বলেছে। এ জন্য আরয করতে বাধ্য হলাম যে, ইচ্ছা না হলে কাউয়ালী না শুনুন, কিন্তু ওই সমস্ত ওলীউল্লাহ যাদের দ্বারা সেমা প্রমাণিত, তাদেরকে দোষারোপ করনা। কাউয়ালী হচ্ছে এক প্রকার ব্যথার অষুধ। তাই যার ব্যথা আছে, সে সেবন করবে এবং যার ব্যথা নাই সে সেবন করবে না। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ) বলেন كه نه ايں كار مى كنم ونه انكار مى كنم (আমি এ কাজ করিও না এবং অস্বীকারও করি না) আমি অনেক লোককে বলতে শুনেছি- " হাদীছ শরীফে যেহেতু গানের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে, সেহেতু এর বিপরীত খাজা আজমীরী ও ইমাম গাযযালীর কথার কোন মূল্য নেই; এরা সব ফাসিক ছিল" মা'য়াজ্জাল্লাহ, এসমস্ত কথায় আমি খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম। তাই এ সংক্ষিপ্ত মাসআলাটা বর্ণনা করলাম।

৪নং আপত্তি- যদি এ কায়দাটা সঠিক হয় যে হালাল কাজে হারামের সংমিশ্রণের ফলে হালাল কাজ হারাম হয় না, তাহলে তাযিয়া (হাসান হুসাইনের কৃত্রিম কবর নিয়ে শোভাযাত্রা) মূর্তি পূজারীদের মেলা , খেল তামাশা, সিনেমা - থিয়েটার ইত্যাদি সব জায়েয হবে, কারণ ওসবের মধ্যে কিছু না কিছু জায়েয কাজও হয়ে থাকে। ওসবের বেলায়ও তাহলে বলুন, এসব জামায়েত হারাম নয় বরং এগুলোতে যা মন্দ কাজ আছে, ওগুলো হারাম এবং যে সব জায়েয কাজ আছে ওগুলো হালাল। কিন্তু ফকীহগণ বলেন- যে বৌ-ভাতের অনুষ্ঠানে নাচ-গান হয়, সেখানে যাওয়া নিষেধ। অথচ দাওয়াত গ্রহন করা সুন্নাত কিন্ত হারাম কাজের সংমিশ্রণের ফলে হারাম হয়ে গেছে। উরসের বেলায়ও তাই হয়েছে। বিরোধিতাকারীদের এটাই হচ্ছে সর্ব শেষ আপত্তি।

উত্তর- একটি হচ্ছে হালালের সাথে হারাম কাজ মিলিত হওয়া আর একটি হচ্ছে হালালের সাথে হারাম সংমিশ্রিত হওয়া যেখানে হারাম কাজ হালালের অংশ হয়ে যায় এবং একে বাদ দিয়ে সে কাজটা হয় না এবং হলেও ওই নামে হয় না। এমতাবস্থায় হারাম কাজ হালালকেও হারামে পরিণত করে। আর যদি হারাম কাজ ওই রকম অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিণত না হয়, বরং কোন কোন সময় মিলিত হয় আবার কোন সময় হয় না, তাহলে এ ধরনের হারাম কাজ মূল হালাল কাজকে হারাম করতে পারেনা। যেমন, পেশাব কাপড়ে লাগলো এবং পানিতে পড়লো। কাপড়ের অংশে পরিণত হলোনা কিন্তু পানির অংশে পরিণত হয়ে গেল আর শরীয়তের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন

হয়ে গেলো। বিবাহ শাদীতে, ভ্রমণে, বাজারে ও অন্যান্য ব্যাপারে হারাম কাজের অনুপ্রবেশ ঘটে কিন্তু ওসবের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় না অর্থাৎ ওগুলোকে বাদ দিলে কোন কিছু আসে যায় না। তাযিয়া মিছিলে নাজায়েয কাজের সংমিশ্রণ এমনভাবে হয়েছে যেগুলোকে বাদ দিয়ে তাযিয়া মিছিল হতেই পারে না। আর হলেও ওটাকে তাযিয়া মিছিল বলা হবে না। অবশ্য যদি কেউ মহান কারবালার নক্শা এঁকে ঘরে রেখে দিল, এবং একে মাটিতে দাফনও করলো না আর কোন হারাম কাজের সংমিশ্রণও হতে দিল না, তাহলে জায়েয আছে। কেননা নিষ্প্রাণ বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরী করা মুবাহ। খোদার শুকর, নাচ-গান ইত্যাদি উরসের অংশে পরিণত হয়নি। এসব হারাম কাজ থেকে মুক্ত অনেক উরস হয়ে থাকে এবং ওগুলোকে উরসই বলা হয়। যেমন সেরহিন্দ শরীফে সম্পূর্ণ হারাম কাজ থেকে মুক্ত অবস্থায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ) এর উরস হয়ে থাকে। লোকেরা সাধারণভাবে হযরত আমিনা খাতুন (রাঃ), সৈয়্যদেনা আবদুল্লাহ ও ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর উরস করে থাকে এবং ওখানে কেবল ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং খাবার, শিরনী ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। আর প্রত্যেক দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত নয়। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদের দাওয়াত, কুপ্রথা অনুসারে ধনীদেরকে মইয়তের উত্তরসূরীর দাওয়াত, যার কাছে কেবল হারাম সম্পদই আছে, তার দাওয়াত কবুল করা নাজায়েয। অনুরূপ বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে যদি ঠিক খাবার ঘরে নাচ-গান হয়, সেই দাওয়াত কবুল করা নিষেধ। কিন্তু কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে এ ফত্ওয়া প্রযোজ্য নয়। কারণ দাওয়াতটা হারাম কাজের সংমিশ্রণের ফলে সুন্নাত হতে পারে নি। কিন্তু কবর যিয়ারত যেহেতু যে কোন অবস্থায় সুন্নাত, তাই এটা হারাম হতে পারে না। যেমন যে কোন অবস্থায় দাফন কার্যে শরীক হওয়া সুন্নাত। ওখানে হারাম কার্যাদি হলে এর দ্বারা সুন্নাত হারাম হবে না। এটা খুবই সুক্ষ্ম পার্থক্য, স্মরণ রাখা উচিত।

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

বুযুর্গানে কিরামের উরস ও কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয এবং ছওয়াবের কাজ। দেওবন্দী ও অন্যান্যরা একেও হারাম বলে। এ জন্য এ আলোচনাটাকেও দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এর প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উরস বা যিয়ারত উপলক্ষে সফরের প্রমাণ

মকসুদ অনুযায়ী সফরের হুকুম বর্তায়। অর্থাৎ হারাম কাজের জন্য সফর করা হারাম, জায়েয কাজের জন্য জায়েয, সুন্নাত কাজের জন্য সুন্নাত এবং ফরয কাজের জন্য ফরয। যেমন ফরয হজ্বের জন্য সফর করাও ফরয। মাঝে মধ্যে জিহাদ ও বাণিজ্যের জন্য সফর করা সুন্নাত, কেননা এ কাজ সুন্নাত। হুযুর আলাইহিস সালামের রওযা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ওয়াজিব, কেননা, এ যিয়ারত ওয়াজিব। বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাত, আত্মীয়-স্বজনের বিবাহ শাদী খতনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যোগদান, এবং চিকিৎসার জন্য সফর করা জায়েয, কেননা এগুলো হলো জায়েয কাজ। চুরি-ডাকাতির জন্য সফর করা হারাম কেননা এ কাজগুলো হারাম। মোট কথা হলো, সফরের হুকুমটা জানতে হলে, প্রথমে এর মকসুদটা জেনে নিতে হবে। মূলতঃ কবর যিয়ারত হচ্ছে সুন্নাত। সুতরাং কবর যিয়ারতের জন্য সফর করাটাও সুন্নাত বলে বিবেচ্য হবে। কুরআন করীমে অনেক ধরনের সফর প্রমাণিত আছে-

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ.

(যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ থেকে মুহাজির হয়ে বের হলো এবং (পথে) তার মৃত্যু ঘটলো, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে গেল।) হিজরত উপলক্ষে সফর প্রমাণিত হলো।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ.

(যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে। আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের। এ আয়াতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সফর প্রমাণিত হলো।)

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا.

(স্মরণ করুন, যখন মুসা (আঃ) নিজের খাদিমকে বললেন- আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবো না, যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছবো, যেথায় দু'টি সমুদ্র মিলিত হয়েছে।) হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ) এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তথায় গিয়েছিলেন। এতে মাশায়েখের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে সফর প্রমাণিত হলো।

يَا بُنَيَّ اذْ هَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ.

(হে আমার পুত্রগণ, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না।) হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর অন্যান্য সন্তানদেরকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সন্ধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতএব প্রিয়জনের সন্ধানে সফর করা প্রমাণিত হলো। হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছেন-

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَالْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاتِ بَصِيْرًا.

(আমার এ কোর্তাটা নিয়ে যাও; আমার আব্বার মুখের উপর রাখিও; তাঁর চোখ খুলে যাবে।) চিকিৎসার জন্য সফর প্রমাণিত হলো।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ.

(অতঃপর যখন তারা সবাই হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি স্বীয় মা-বাপকে নিজের পার্শ্বে বৈঠক দিলেন।) ছেলে মেয়েদের সাথে দেখা করার জন্য সফর প্রমাণিত হলো। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলেরা বাপের কাছে আরয করলেন-

فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ.

(আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে দিন। আমরা খাদ্যশস্য নিয়ে আসবো এবং তাকে নিশ্চয় হিফাজত করবো।) উপার্জনের জন্য সফর প্রমাণিত হলো।

হযরত মুসা (আঃ) কে নির্দেশ দেয়া হলোঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى.

(ফিরাউনের কাছে যাও, কারণ সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।) তবলীগের জন্য সফর প্রমাণিত হলো। মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল ইল্‌মে বর্ণিত আছে:

مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হলো সে আল্লাহর পথে রয়েছে।) আর একটি হাদীছে বর্ণিত আছে

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّيْنِ

(জ্ঞান অর্জন কর, যদি চীনেও যেতে হয়।)

প্রসিদ্ধ ফার্সী পুস্তিকা করীমাতে আছে-

طلب کردن علم شد برتوفرض

دگرواجب است از پیش قطع ارض.

(জ্ঞান অনুসন্ধান করা তোমার জন্য ফরয। এর জন্য সফরেরও প্রয়োজন আছে।) জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য সফর প্রমাণিত হলো। প্রখ্যাত ফার্সী কাব্যগ্রন্থ গুলিস্তায় উল্লেখিত আছে-

بروااندر جہاں تفرج کن - پیش ازاں روز کزجہاں بروی.

(মৃত্যুর আগে পৃথিবীটা একবার পরিভ্রমণ করে দেখ।) ভ্রমণের জন্য সফর প্রমাণিত হলো।

কুরআন করীমে বর্ণিত আছে-

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

(তাঁদেকে বলুন, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং কাফিরদের কি পরিণাম হয়েছে, তা দেখ।) যেসব দেশে খোদায়ী গজব নাযিল হয়েছে, ওগুলো দেখে সতর্ক হওয়ার জন্য সফর প্রমাণিত হলো।

যখন এত রকম সফর প্রমাণিত হলো, তাহলে আওলিয়া কিরামের মাযার যিয়ারত উপলক্ষে সফর এমনিই প্রমাণিত বলে ধরে নেয়া যায়। আওলিয়া কিরাম হলেন, রূহানী ডাক্তার এবং ওনাদের ফয়েযও ভিন্ন ভিন্ন। ওনাদের মাযারে গেলে খোদার শান চোখের সামনে ভেসে উঠে। খোদা প্রাপ্তগণ মৃত্যুর পরও দুনিয়াতে বিরাজ করেন, এর দ্বারা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর ওনাদের মাযারসমূহে দুআ সহসা কবুল হয়। ফত্‌ওয়ায়ে শামী প্রথম খণ্ড 'যিয়ারতে কুবুর' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَهَلْ تُنْدَبُ الرِّحْلَةُ لَهَا كَمَا اعْتِيْدَ مِنَ الرِّحْلَةِ اِلٰى زِيَارَةِ خَلِيْلِ الرَّحْمٰنِ وَزِيَارَةِ السَّيِّدِ الْبَدْوِىِّ لَمْ اَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهٖ مِنْ اَئِمَّتِنَا وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ قِيَاسًا عَلٰى مَنْعِ الرِّحْلَةِ بِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلٰثِ وَرَدَّهُ الْغَزَالِىُّ بِوُضُوْحِ الْفَرْقِ.

(কবর যিয়ারত উপলক্ষে সফর করা মুস্তাহাব। যেমন আজকাল হযরত খলিলুর রহমন ও হযরত ছৈয়দ বদ্দবী (রহঃ) এর মাযার যিয়ারতের জন্য সফর করা হয়। আমি এ ক্ষেত্রে আমাদের ইমামদের কারো ব্যাখ্যা দেখিনি। তবে শাফেঈ মাযহাবের কয়েকজন আলিম 'তিন মসজিদ ভিন্ন সফর নিষেধ'- এ হাদীছের উপর অনুমান করে নিষেধ বলেছেন। কিন্তু ইমাম গাযযালী (রহঃ) এ নিষেধাজ্ঞাকে খণ্ডন করেছেন এবং পার্থক্যটা বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন।) একই জায়গায় শামীতে আরও উল্লেখিত আছে-

وَاَمَّا الْاَوْلِيَاءُ فَاِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُوْنَ فِى الْقُرْبِ اِلَى اللّٰهِ وَنَفْعِ الزَّائِرِيْنَ بِحَسْبِ مَعَارِفِهِمْ وَاَسْرَارِهِمْ.

(কিন্তু আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভে ও যিয়ারতকারীদের ফায়দা পৌঁছানোর বেলায় নিজেদের প্রসিদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তি অনুসারে ভিন্নতর।)

ফত্ওয়ায়ে শামীর ভূমিকায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর ফযীলত বর্ণনা প্রসংগে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর এ উক্তিটা উল্লেখ করা হয়েছে।

اِنِّىْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَجِئُ اِلَى قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضْتُ لِىْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَاَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا.

আমি ইমাম আবু হানীফা থেকে বরকত হাসিল করি এবং তাঁর মাযারে আসি। আমার কোন সমস্যা দেখা দিলে, প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়ি। অতঃপর তাঁর মাযারে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তখন সহসা আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল-কবর যিয়ারতের জন্য সফর, কেননা ইমাম শাফেঈ (রহঃ) নিজের জন্ম ভূমি ফিলিস্তিন থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সুদূর বাগদাদ শরীফ আসতেন, কবরবাসীদের থেকে বরকত গ্রহণ, ওনাদের মাযারের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং কবরবাসীকে অভাব পূর্ণ করার মাধ্যম মনে করা। অধিকন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লামের রওযা পাক যিয়ারতের জন্য সফর করা আবশ্যক। ফত্ওয়ায়ে রশিদীয়ার প্রথম খণ্ড كتاب الخطر والاباحت এর ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে বুযুর্গানে কিরামের যিয়ারতের জন্য সফর করা প্রসংগে উলামায়ে আহলে সুন্নাতের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ জায়েয বলেন এবং কেউ কেউ নাজায়েয বলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের আলিমগণ হচ্ছেন আহলে সুন্নাতের অনুসারী। বিতর্কিত মাসআলা নিয়ে বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। আর আমাদের মত ইমামের অনুসারীদের

পক্ষ থেকে সমাধান দেওয়াও অসম্ভব-রশীদ আহমদ।

এখন আর উরস উপলক্ষে সফর করতে কাউকে নিষেধ করার কোন অধিকার দেওবন্দীদের নেই। কেননা মৌলভী রশীদ বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন এবং এর কোন সিদ্ধান্তও দেননি। বিবেকও বলে যে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর জায়েয হওয়া চাই। কেননা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে সফর হালাল বা হারাম হওয়াটা এর মকসুদ থেকেই বোঝা যায়। এ সফরের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবর যিয়ারত যা নিষেধ নয়, কেননা যিয়ারতে কবর সাধারণভাবেই অনুমোদিত اَلَا فَزُوْرُوْهَا। তাহলে সফর কেন হারাম হবে? অধিকন্তু দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজ কারবারের জন্য সফর করা হয়। এটাও একটি দ্বীনি কাজের জন্য সফর হেতু হারাম কেন হবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

উরস উপলক্ষে সফর প্রসংগে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও এর জবাব

১নং আপত্তিঃ মিশ্কাত শরীফের المساجد। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلٰثِ مَسٰجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا.

(তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন দিকে সফর করা যাবে না। এ তিন মসজিদগুলো হলো বায়তুল্লাহ, বায়তুল মুকাদ্দিস ও আমার এ মসজিদ।) এ হাদীছ থেকে বোঝা গেল যে এ তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সফর করা জায়েয নাই এবং কবর যিয়ারতের সফর এ তিনটির বাইরে বিধায় নাজায়েয।

উত্তরঃ এ হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে এ তিন মসজিদে নামাযের ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়। যেমন মসজিদে বায়তুল্লাহে এক নেকীর ছওয়াব অন্যান্য জায়গার এক লাখের সমান এবং বায়তুল মুকাদ্দিস ও মদীনা পাকের মসজিদে এক নেকীর ছওয়াব পঞ্চাশ হাজারের সমান। সুতরাং এসব মসজিদসমূহে এনিয়তে দূর থেকে সফর করে আসা কল্যাণকর ও জায়েয। কিন্তু অন্য কোন মসজিদের দিকে একই নিয়তে সফর করা অনর্থক ও নাজায়েয। কারণ উপরোক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত বাকী সব মসজিদে ছওয়াব একই বরাবর। দিল্লীর জামে মসজিদে জুমায়াতুল বেদা (রমজানের শেষ জুমা) পড়ার জন্য অনেক লোক দূর দূরান্তর থেকে সফর করে আসে এবং মনে করে যে ওখানে ছওয়াব বেশী হয়। আসলে এটা না জায়েয, কারণ উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা এবং বেশী ছওয়াবের প্রত্যাশা করা নিষেধ প্রমাণিত

হয়েছে। যদি হাদীছের বিশ্লেষণ এরকম করা না হয়, তাহলে আমি প্রথম অধ্যায়ে যে সব সফর কুরআন থেকে প্রমাণ করেছি, সবই হারাম গণ্য হবে এবং আজকাল ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ও দুনিয়াবী অনেক কাজের জন্য যত রকম সফর করা হয়, সবই হারাম বিবেচিত হবে। মিশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আশ্‌আতুল লুমআতে" এ হাদীছ প্রসংগে লিখেছেন-

وبعضے از علماء گفته اند كه سخن در مساجد است يعنى در مسجدے ديگر جزايں مساجد سفر جائز نه باشد واما مواضع ديگر جز مساجد خارج از مفهوم اين كلام است.

(অর্থাৎ কতেক আলিম বলেন যে, এখানে মসজিদসমূহের বেলায় কথা হয়েছে অর্থাৎ ওই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা জায়েয নাই। মসজিদ ভিন্ন অন্যান্য জায়গা এ বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।) মিশ্‌কাত শরীফের অপর ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরকাতে এ হাদীছ প্রসংগে বর্ণিত আছে-

فِى شَرْحِ الْمُسْلِمِ لِلنَّوَوِىِّ قَالَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ يُحَرَّمُ شَدُّ الرِّحَالِ اِلَى غَيْرِ الثَّلٰثَةِ وَهُوَ غَلَطٌ وَفِى الْاَحْيَاءِ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اِلَى الْاِسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الرِّحْلَةِ لِزِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ وَقُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَمَا تَبَيَّنَ لِىْ اَنَّ الْاَمْرَ لَيْسَ كَذَالِكَ بَلِ الزِّيَارَةُ مَامُوْرٌ بِهَا لِخَبَرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا اِنَّمَا وَرَدَ نَهْيًا عَنِ الشَّدِّ بِغَيْرِ الثَّلٰثَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَمَاثُلِهَا وَاَمَّا الْمَشَاهِدُ فَلَا تُسَاوِىْ بَلْ بَرْكَةُ زِيَارَتِهَا عَلٰى قَدْرِ دَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ اللّٰهِ هَلْ يَمْنَعُ ذَالِكَ الْقَائِلُ عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ بِقُبُوْرِ الْاَنْبِيَاءِ كَابْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَيَحْيٰى وَالْمَنْعُ مِنْ ذَالِكَ فِىْ غَايَةِ الْاِحَالَةِ وَالْاَوْلِيَاءُ فِىْ مَعْنَاهُمْ فَلَا يَبْعُدُ اَنْ يَكُوْنَ ذَالِكَ مِنْ اَغْرَاضِ الرِّحْلَةِ كَمَا اَنَّ زِيَارَةَ الْعُلَمَاءِ فِى الْحَيٰوةِ.

ইমাম নববী (রহঃ) এর শরহে মুসলিমে বর্ণিত আছে-ইমাম আবু মুহাম্মদ বলেছেন যে, ওই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে সফর করা হারাম। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। ইহয়ায়ে উলমে উল্লেখিত আছে "কতেক আলিম বরকতময় স্থানসমূহ ও

উলামায়ে কিরামের মাযারে যিয়ারত উপলক্ষে সফর করাকে নিষেধ বলে। কিন্তু আমি যা বিশ্লেষণ করে পেয়েছি, তা এরকম নয় বরং কবর যিয়ারতের নির্দেশ আছে যেমন হাদীছে আছে اَلَا فَزُوْرُوْهَا (এখন থেকে যিয়ারত কর) ওই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করার থেকে নিষেধ এজন্য করা হয়েছে যে বাকী সব মসজিদ ফযীলতের দিক দিয়ে একই বরাবর। কিন্তু বরকতময় স্থানসমূহ একই বরাবর নয় বরং মর্তবা অনুযায়ী ওগুলোর বরকত ভিন্ন ভিন্ন। এসব নিষেধকারীরা কি নবীদের মাযার,যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত মুসা (আঃ) হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) প্রমুখের মাযার যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করতে পারবে কি? নিশ্চয়ই না, কারণ এটা অসম্ভব। আর আল্লাহর ওলীগণের বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য। সুতরাং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে যদি ওনাদের সেখানে সফর করে যাওয়া হয়, যেমনি উলামায়ে কিরামের জীবদ্দশায় তাঁদের কাছে যাওয়া যায়, কি অসুবিধা আছে?) মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল জিহাদে জিহাদের ফযীলত প্রসংগে বর্ণিত আছে-

لَاتَرْكَبِ الْبَحْرَ اِلَّا حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْغَازِيًا فَاِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا اَوْتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا.

(হাজী গাযী ও উমরাকারী ব্যতীত অন্য কেউ সমুদ্র পথে সফর করিও না। কারণ সমুদ্রের নিচে আগুন বা আগুনের নিচে সমুদ্র আছে।) তাহলে কি এ তিন ধরনের লোক ব্যতীত অন্যদের জন্য সমুদ্র পথে সফর করা হারাম? মোট কথা হলো হাদীছের ভাবার্থ হচ্ছে তা-ই, যা আমি বর্ণনা করেছি। অন্যথায় পার্থিব জীবন যাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

২নং আপত্তি- আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তার রহমতও সব জায়গায় রয়েছে। দাতা হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সর্বত্র মওজুদ। তা সত্ত্বেও কোন্ জিনিসটা তালাশ করার জন্য আওলিয়া কিরামের মাযারে সফর করে যাওয়া হয়?

উত্তর- আওলিয়া কিরাম হচ্ছেন আল্লাহর রহমতের দরজা সমূহ। এ দরজাসমূহ দিয়েই রহমত প্রবাহিত হয়। রেলগাড়ী এর সারা লাইন দিয়ে যাতায়ত করে। কিন্তু একে ধরতে হলে স্টেশনে যেতে হয়। যদি অন্যত্র লাইনের পার্শ্বে দাড়িয়ে থাকেন, রেল নিশ্চয়ই আপনার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে সত্য, কিন্তু আপনি ধরতে পারবেন না। আজকাল দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে, চাকুরী, ব্যবসা ও অন্যান্য উপলক্ষে সফর কেন করেন? আল্লাহতো রিযিকদাতা এবং তিনি সব জায়গায় রিযিক দেন। ডাক্তারের কাছে রোগী কেন সফর করে আসে? আল্লাহ্‌ই তো আরোগ্যদানকারী এবং তিনিতো সর্বত্র আছেন। আবহাওয়া পরিবর্তন করার জন্য দার্জিলিং ও কাশ্মীর ভ্রমণ করা হয় কেন জানেন, ওখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। আর আওলিয়া কিরামের স্থান সমূহের আবহাওয়া ঈমানের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে হযরত

খিজির (আঃ) এর কাছে কেন পাঠিয়েছিলেন? ওগুলো সব কিছুতো এখান থেকেই দিতে পারতেন। কুরআন করীমে আছে هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ (তথায় হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। বোঝা গেল যে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম হযরত মরিয়মের কাছে দাঁড়িয়ে সন্তানের জন্য দুআ করেছেন অর্থাৎ ওলীর কাছে গিয়ে দুআ করা মানে দুআ কবুল হওয়া। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আওলিয়া কিরামের মাযার সমূহের কাছে দুআ বেশী কবুল হয়।

৩নং আপত্তি- যেই গাছের নিচে বায়তুর রিজওয়ান (আনুগত্যের শপথ) হয়েছিল, লোকেরা ওই জায়গাটাকে যিয়ারতগাহ্ পরিণত করেছিল। হযরত উমর (রা:) এ জন্যে ওই গাছটাকে কাটায়ে ফেললেন। তাই আওলিয়া কিরামের কবর সমূহকে যিয়ারতগাহে পরিণত করাটা হযরত উমর(রা:) এর আমলের বিপরীত।

উত্তর- এটা নিছক ভুল ধারণা। হযরত উমর(রা:) ওই গাছটা কখনো কাটাননি। বরং সেই মূল বৃক্ষটা অলৌকিকভাবে মানুষের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লোকেরা ধোঁকায় পড়ে অন্য আর একটি বৃক্ষের যিয়ারত শুরু করে দিয়েছিল। এ ধোঁকা থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি সেই গাছটাকে কাটায়ে ফেলেন। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) যদি পবিত্র বস্তুর যিয়ারতবিরোধী হতেন, তাহলে হুযূর আলাইহিস সালামের চুল মুবারক, তোহবন্দ শরীফ, রওযা পাক সবইতো তাঁর সামনে যিয়ারতগাহে পরিণত হয়েছিল। এগুলোকে কেন রেহাই দিলেন? মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুল ইমারত بيان بيت الرضوان অধ্যায়ে এবং বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড غزوه الحديبيه অধ্যায়ে হযরত ইবনে মুসাইয়ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

كَانَ اَبِىْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِىْ قَابِلِ حَاجِّيْنَ فَخَفِىَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا.

অর্থাৎ আমার পিতাও ওনাদের সাথে ছিলেন, যাঁরা বৃক্ষের নিচে হুযূর আলাইহিস সালামের কাছে বায়আত করেছিলেন। তিনি বলেছেন পরবর্তী বছরে যখন আমরা হজ্বে গিয়েছিলাম, তখন ওই জায়গাটা আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا.

অতপর যখন আমরা পরবর্তী বছর গেলাম, তখন জায়গাটা ভুলে গিয়েছিলাম এবং খুঁজে পাইনি।

এরপর এটা কিভাবে বলতে পারে যে, হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) আসল গাছটি কাটায়ে ফেলেছেন।

www.AmarIslam.com

কবরে আহাদনামা লিখা ও পবিত্র বস্তু রাখা প্রসঙ্গে আলোচনা

এখানে দু'টি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে- একটি হচ্ছে কবরে শাজরা, কাবা শরীফের গিলাফ, ও অন্যান্য পবিত্র বস্তু রাখা, অপরটি হচ্ছে মৃতব্যক্তির কাফন বা কাফনের উপর অঙ্গুলি বা মাটি বা অন্য কিছু দিয়ে আহাদ নামা বা কলেমা তৈয়্যবা লিখা। এ দু'টি কাজ জায়েয এবং বিশুদ্ধ হাদীছ ও ফকীহগণের উক্তি থেকে প্রমাণিত আছে। কিন্তু বিরোধিতাকারীরা তা স্বীকার করে না। তাই এ আলোচনাটা দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এ সবের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে আপত্তিসমূহের উত্তর দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র বস্তু রাখা ও আহাদনামা লিখার প্রমাণ

কবরে বুযুর্গানেদীনের পবিত্র বস্তু, কাবা শরীফের গিলাফ, শাজরা বা আহাদনামা রাখা মৃতব্যক্তি মাগফিরাতের সহায়ক। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান। وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ (তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর।) হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন-

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا.

আমার এ জামাটি নিয়ে গিয়ে আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখিও, তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন।) বোঝা গেল যে বুযুর্গানে কিরামের পোশাক আরোগ্য দান করেন। উল্লেখ্য যে ওটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জামা ছিল। তাই আশা করা যায় বুযুর্গদের নামের বরকতে মৃত ব্যক্তির জ্ঞান খোলে এবং উত্তর সমূহ স্মরণ আসে।

মিশ্‌কাত শরীফের غسل الموت শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত উম্মে আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- যখন আমরা যয়নব বিনতে রসূল আলাইহিস সালামের গোসলের কাজ শেষ করলাম, তখন নবী করীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে খবর দিলাম। তিনি (দঃ) আমাদেরকে তাঁর তোহবন্দ শরীফ প্রদান করলেন এবং বললেন একে তোমরা কাফনের ভিতরে মইয়তের গায়ে জড়িয়ে দিবে। এর প্রেক্ষাপটে 'লুমআত' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

هٰذَالْحَدِيْثُ اَصْلٌ فِى التَّبَرُّكِ بِاٰثَارِ الصّٰلِحِيْنَ وَلِبَاسِهِمْ كَمَا

www.AmarIslam.com

يَفْعَلُهُ بَعْضُ مُرِيْدِى الْمَشَائِخِ مِنْ لُبْسِ اَقْمُصِهِمْ فِى الْقَبْرِ.

নেক বান্দাদের বস্তু এবং কাপড়সমূহ থেকে বরকত গ্রহণের উৎস হচ্ছে এ হাদীছ। যেমন মশায়েখের কতেক মুরিদ্দকে কবরে মশায়েখের জামা পড়িয়ে দেয়া হয়। একই হাদীছ প্রসঙ্গে "আশআতুল লুমআত" শরীফে বর্ণিত আছে-

دریں جااستحباب تبرك است بلباس صلحین وآثار ایشاں بعد ازموت در قبرچنانچه قبل از موت نیز ہمچنیں بوده.

এর থেকে প্রমাণিত হলো যে নেক বান্দাদের পোশাক এবং তাঁদের পবিত্র বস্তুসমূহ দ্বারা মৃত্যুর পর কবরের মধ্যেও বরকত গ্রহণ করা মুস্তাহাব, যেমন মৃত্যুর আগে মুস্তাহাব ছিল"। শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী তাঁর রচিত আখবারুল আখয়ারে স্বীয় সম্মানিত পিতা হযরত সাইফুদ্দিন কাদেরী (কুঃ সিঃ) এর জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-

چوں وقت رحلت قریب ترآمد فرمودند که بعض ابیات وکلمات که مناسب معني عفو ومغفرت باشد در کاغذے نبویسی وباکفن ہمراه کنی.

(যখন তাঁর ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি বলেন- কেউ ওই শে'র ও বাক্যগুলো, যেগুলো ক্ষমা ও মাগফিরাতের সহায়ক, কোন কাগজে লিখে আমার কাফনের মধ্যে রেখে দিবে।) শাহ আবুদল আযীয ছাহেব (কুঃ সিঃ) স্বীয় ফাত্ওয়ার কিতাবে বলেছেন-

شجره درقبر نہادن معمول بزرگان است لیکن ایں را دوطریق است اول اینکه برسینه مرده درون کفن یا بالائے کفن گذارندایں طریق رافقہاء منع می کنند وطریق دوم ایں است که جانب سرمرده اندرون قبر طاقچه بگزارند ودراں کاغذ شجره رانہند.

কবরে শাজরা রাখাটা বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসৃত নীতি। তবে এটা রাখার দু'টি

পদ্ধতি আছে- একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির বুকের উপর কাফনের নিচে বা উপরে রাখা। একে ফকীহগণ নিষেধ বলেন। অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে কবরে একটি তাক করে ওখানে শাজরার কাগজ রাখা। মিশ্‌কাত শরীফের غسل الميت শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হুযূর আলাইহিস সালাম আবুদল্লাহ ইবনে উববীর কবরে তশরীফ নিয়ে যান। যে মুহূর্তে তাকে কবরে রাখা হচ্ছিল, তিনি (দঃ) তাকে বের করালেন, তার মুখে থুথু ফেললেন এবং নিজের পবিত্র জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ড কিতাবুল জনায়েয শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এক দিন হুযূর আলাইহিস সালাম তোহবন্দ শরীফ গায়ে দিয়ে বাইরে তশরীফ আনলেন। কোন এক জন সাহাবী হুযূর আলাইহিস সালাম থেকে সেই তোহবন্দ শরীফটা চেয়ে নিয়ে নিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে বললেন-ওই সময় হুযূর আলাইহিস সালামের তোহবন্দটার প্রয়োজন ছিল কিন্তু কোন প্রার্থীকে বিমুখ করা তাঁর স্বভাব নয়। আপনি কেন চেয়ে নিলেন? উত্তরে তিনি (সাহাবী) বললেন-

وَاللّٰهِ مَاسَئَلْتُهُ لِاَلْبَسَهَا اِنَّمَا سَئَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفْنِى قَالَ سَهَلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

খোদার কসম, আমি এটা পরিধানের জন্য লই নাই। আমিতো এ জন্যেই নিয়েছি যে, এটা আমার কাফন হবে। হযরত সাহল (রাঃ) বলেছেন যে ওটা ঠিকই তার কাফন হয়েছিল। হযরত আবু নয়ীম (রাঃ) 'মাআরিফাতুস সাহাবা' গ্রন্থে এবং হযরত দায়লমী (রাঃ) তাঁর 'মসনদুল ফিরদাউসে' হযরত হাসান আবুদল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে সৈয়্যদুনা হযরত আলী (রাঃ) এর মাতা ছাহেবানী ফাতিমা বিনতে আসাদকে হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় জামা দিয়ে কাফন দিয়েছেন এবং কিছু সময় ওর কবরে নিজেই শুয়ে থাকেন। অতপরঃ ওকে দাফন করেন।, সাহাবায়ে কিরাম এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি ফরমান-

اِنِّى اَلْبَسْتُهَا لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَاضْطَجَعْتُ مَعَهَا فِىْ قَبْرِهَا لِاُخَفِّفَ عَنْهَا ضَغْطَةَ الْقَبْرِ.

জামা এ জন্য পরায়েছি যে যেন সে বেহেশতের পোশাক পায় এবং তার কবরে এ জন্য শুয়েছি যে যেন কবরের সংকীর্ণতা দুরীভূত হয়। হযরত ইবনে আবদুল বির 'কিতাবুল ইস্তেয়ান ফি মাআরিফাতিল আসহাব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা:) মৃত্যু সায়াহ্নে ওসীয়ত করেছিলেন- আমাকে হুযুর আলাইহিস

সালাম তার একটি জামা দান করেছেন। ওটাকে আমি এ সময়ের জন্য রেখে দিয়েছি। এ পবিত্র জামাটা আমার কাফনের নিচে রেখে দিবে।

وَخُذْ ذَالِكَ الشَّعْرَ وَالْاَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِىْ فَمِىْ وَعَلٰى عَيْنَىَّ وَمَوَاضِعِ السُّجُوْدِ مِنِّىْ.

এই পবিত্র চুল ও নখগুলো নাও। এগুলোকে আমার মুখে, চোখের উপর এবং আমার সিজ্‌দার অঙ্গ সমূহে রাখবে।

হযরত হাকিম (রহ:) 'মুসতদারক' গ্রন্থে হযরত হামিদ ইবনে আবদুর রহমান রওয়াসী (রহ:) থেকে উদ্ধৃতি করেছেন যে হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে কিছু মেশক ছিল। তিনি ওসীয়ত করেছেন 'আমাকে এর থেকে সুগন্ধি দিবে' এবং বলেছেন 'এটা হুযূর আলাইহিস সালামের মেশকের অবশিষ্টাংশ'। এগুলো ছাড়া আরও প্রমাণ দেয়া যায়। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি। যদি কেউ আরো বিস্তারিত ভাবে জানতে চান, তাহলে আলা হযরতের 'আল হরফুল হাসন' কিতাবটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

মইয়তের কপালে বা কাফনের উপরে আহাদ নামা বা কলেমা তৈয়্যবা লিখা এবং অনুরূপ আহাদ নামা কবরে রাখা জায়েয। এটা আঙ্গুল দিয়ে বা অন্য কিছু দিয়ে লিখা জায়েয আছে। ইমাম তিরমীযী হাকিম মুহাম্মদ ইবনে আলী 'নওয়াদেরুল উসুলে' বর্ণনা করেন যে হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান-

مَنْ كَتَبَ هٰذَا الدُّعَاءَ وَجَعَلَهُ بَيْنَ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَكَفْنِهٖ فِىْ رُقْعَةٍ لَمْ يَنَلْهُ عَذَابُ الْقَبْرِ وَلَا يَرٰى مُنْكَرًا وَّنَكِيْرًا.

যে কেউ এ দুআটা কোন কাগজে লিখে মৃত ব্যক্তির বুক ও কাফনের মাঝখানে রাখলে ওর কবর আযাব হবে না এবং সে মুনকার নকিরকে দেখবে না। ফাত্‌ওয়ায়ে কুব্‌রা লিল মক্কীতে এ হাদীছ উদ্ধৃতি করে বলা হয়েছে-

اَنَّ هٰذَا الدُّعَاءَ لَهُ اَصْلٌ وَاَنَّ الْفَقِيْهَ ابْنَ عَجِيْلٍ كَانَ يَاْمُرُبِهٖ ثُمَّ اَفْتٰى بِجَوَازِ كِتَابَتِهٖ قِيَاسًا عَلٰى كِتَابَةِ اللّٰهِ فِىْ نَعَمِ الزَّكٰوةِ.

(এ হাদীছটা) এ দুআর উৎস এবং ফকীহ ইবনে আজিল এর নির্দেশ দিতেন এবং যাকাতের উটসমূহের গায়ে যে 'আল্লাহ' লিখা হয়, এর উপর অনুমান করে এ দুআ লিখা জায়েয বলে ফাত্‌ওয়া দিতেন। সেই দুআটা হচ্ছে-

لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ. لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ.

আল হরফুল হাসনে তিরমীযী থেকে উদ্ধৃতি করে বলা হয়েছে যে হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে কেউ যদি এ আহাদ নামা পাঠ করে, তাহলে ফিরিশ্‌তা সেটা সীল করে কিয়ামতের জন্য রেখে দেবে। যখন বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন ফিরিশ্‌তা সেই চিরকুট নিয়ে ডাক দিবে অমুক আহাদ ওয়ালা কোথায়? অতঃপর এ আহাদনামা তাকে দেয়া হবে। ইমাম তিরমীযী বলেন-

وَعَنْ طَاؤُسٍ اَنَّهٗ اَمَرَ بِهٰذِهِ الْكَلِمَاتِ فَكُتِبَ فِىْ كَفْنِهٖ.

হযরত তাউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হুকুম দিয়েছেন, তাই তাঁর কাফনে কলেমাসমূহ লিখা হয়েছে। কিতাবুল ইসতিহসানে উল্লেখিত আছে-

ذَكَرَالْاِمَامُ الصَّفَّارُ لَوْ كُتِبَ عَلٰى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ اَوْ عَلٰى عِمَامَتِهٖ اَوْكَفْنِهٖ وَعَهْدِ نَامَهْ يُرْجٰى اَنْ يَّغْفِرَاللّٰهُ تَعَالٰى لِلْمَيِّتِ وَيَجْعَلَهٗ اٰمِنًا مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

ইমাম সফ্‌ফার (রহঃ) বলেন যদি মইয়তের কপালে বা পাগড়ীতে বা কাফনের উপর আহাদ নামা লিখা হয়, তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ মইয়তের মাগফিরাত এবং কবর আযাব থেকে রেহাই দেবেন। দুর্‌রুল মুখতারের প্রথম খণ্ড الشهيد অধ্যায়ের একটু আগে উল্লেখিত আছে-

كُتِبَ عَلٰى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ اَوْ عِمَامَتِهٖ اَوْكَفْنِهٖ عَهْدِنَامَهْ يُرْجٰى اَنْ يَّغْفِرَاللّٰهُ لِلْمَيِّتِ.

মইয়তের কপালে বা পাগড়ীতে বা কাফনের উপর আহাদ নামা লিখা হলে আশা করা যায় যে আল্লাহ একে ক্ষমা করবেন।

দুর্‌রুল মুখতারে এ জায়গায় একটি ঘটনার উল্লেখ আছে- জনৈক ব্যক্তি ওসীয়ত করেছিলেন যে তার বুকে বা কপালে যেন বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহীম লিখে দেয়া হয়। সুতরাং তাই করা হয়েছিল। একজন স্বপ্নে ওকে কি অবস্থায় আছে জিজ্ঞাসা

করেছিল। এর উত্তরে সে বলে যে দাফনের পর তার কাছে আযাবের ফিরিশ্‌তা এসেছিল কিন্তু বিস্‌মিল্লাহ লিখা দেখে বলেছে, তুমি আল্লাহর আযাব থেকে বেঁচে গেছ। ফাত্‌ওয়ায়ে বযাযিয়ার কিতাবুল জনাযাতের একটু আগে উল্লেখিত আছে-

وَذَكَرَ الْاِمَامُ الصَّفَّارُ لَوْ كَتَبَ عَلٰى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ اَوْ عَلٰى عِمَامَتِهٖ اَوْ كَفَنِهٖ عَهْدَنَامَه يُرْجٰى اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْمَيِّتِ وَيَجْعَلَهُ اٰمِنًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ نُصَيْرٌ هٰذِهٖ رِوَايَةٌ فِىْ تَجْوِيْزِ ذَالِكَ وَقَدْ رُوِىَ اَنَّهُ كَانَ مَكْتُوْبًا عَلٰى اَفْخَاذِ اَفْرَاسٍ فِىْ اَصْطَبْلِ الْفَارُوْقِ حُبِسَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

ইমাম সাফফার (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, যদি কপালে বা পাগড়ী বা কাফনের উপরে আহাদ নামা লিখা হয়, তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ ওকে ক্ষমা করবেন এবং কবর আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। ইমাম নসীর (রাঃ) বলেছেন, এ বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে এ ধরনের লিখাটা জায়েয আছে এবং বর্ণিত আছে যে হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এর ঘোড়াশালের ঘোড়াগুলোর উরুতে حُبِسَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ লিখা ছিল। এ ছাড়া ফকীহগণের আরও অনেক রিওয়ায়েত পেশ করা যায়। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট মনে করলাম। অতিরিক্ত বিশ্লেষণের জন্য আল-হরফুল হাসান বা ফাত্‌ওয়ায়ে রজভীয়া শরীফ অধ্যয়ন করুন।

বিবেকও বলে যে, কয়েকটি কারণে আহাদ নামা ইত্যাদি লিখা বা কবরে রাখা জয়েয হওয়া চাই। প্রথমতঃ কবরের উপরে সবুজ ঘাস ও ফুলের তাসবীহের বদৌলতে যদি মইয়তের উপকার হতে পারে, তাহলে কবরের ভিতরে লিখিত তাসবীহ ইত্যাদির ফায়দা কেন পৌঁছবে না? দ্বিতীয়তঃ কবরের বাহির থেকে মইয়তের তল্‌কীন করার অর্থাৎ যাতে পরীক্ষাতে কামিয়াব হতে পারে, সে জন্য মইয়তের কানে আল্লাহর নাম পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ আছে। তাহলে এটাকেও এক প্রকার তল্‌কীন বলা যায়। কারণ আল্লাহর নাম লিখিত দেখলে মইয়তের কাছে মুনকার নকিরের প্রশ্নের উত্তর স্মরণ হতে পারে। হাদীছ শরীফে لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ বাক্য দ্বারা অনির্দিষ্ট তল্‌কীনকে বোঝানো হয়েছে। তাই লিখিত বা মৌখিক সব রকমের তল্‌কীন জায়েয আছে। তৃতীয়তঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামের বরকতে মুসীবত দূরীভূত হয়, জ্বলন্ত অগ্নি নিভে যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত আত্মা সান্ত্বনা লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান আল্লাহর اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ যিকিরের ফলে আত্মার শান্তি লাভ হয়। তফসীরে নিশাপুরী ও রূহুল বয়ানে সূরা কাহাফের আয়াত مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ এর

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবং তফসীরে সাবীতে একই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে আসহাবে কাহাফের নাম অনেক কাজে উপকার আসে। যেমন হারানো জিনিস তালাশ করা, যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাবার সময়, আগুন নিভানোর জন্য একটি কাগজে লিখে আগুনে নিক্ষেপ করুন, শিশু কান্নাকাটি করলে লিখে দোলনায় শিশুর মাথার নিচে রেখে দিবেন, ভাল ফলনের জন্য কোন কাগজ লিখে ক্ষেতের মাঝখানে লাঠিতে টাঙিয়ে দিবেন। জ্বর, মাথা ব্যথার জন্যও উপকারী, বিচারকের সামনে যাবার সময় লিখে ডান উরুতে বাঁধবেন, মালের হিফাজতের জন্য, সামুদ্রিক যাত্রার সময়, এবং খুনখারাবী থেকে রক্ষা পাবার জন্যও খুবই উপকারী (আল হরফুল হাসান, তফসীরে খাজায়েনুল ইরফান ও জুমুল দ্রষ্টব্য) হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে আসহাবে কাহাফ সংখ্যায় ছিলেন সাত জন ইয়ামলিখা, কমছিলিনা, মছলিনা মারনুস, বরনুস শাজনুশ ও মরতুশ। (রূহুল বয়ান সূরা কাহাফের আয়াত, مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। মুহাদ্দেছীনে কিরাম কোন কোন সময় বিশুদ্ধ সনদ উদ্ধৃতি করে বলেন لَوْ قُرِءَتْ هٰذِهِ الْاِسْنَادُ عَلٰى مَجْنُوْنٍ لَبَرَءَ مِنْ جُنَّتِهٖ. (যদি এ সনদ কোন পাগলের জন্য পাঠ করা হয়, তাহলে সে ভাল হয়ে যাবে।) সনদের মধ্যে বুযুর্গানে দীন ও হাদীছ বর্ণনা কারীদের নামইতো আছে। আসহাবে বদরের নামের উপর ওজীফা পাঠ করা হয়। এ সব বুযুর্গানে কিরামের মুবারক নাম কেবল জীবিতদের জন্য উপকারী, এবং মৃতদের জন্য নয় এ রকম কখনও হতে পারে না। নিশ্চয়ই মৃতব্যক্তিদেরও উপকার হবে। তাই মইয়তের জন্য কাফন ইত্যাদিতে নিশ্চয় যেন আহাদ নামা লিখা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহাদ নামা লিখা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত আপত্তিসমূহ উত্থাপন করা হয়।

১নং আপত্তি- সেই পুরানো বুলি অর্থাৎ আহাদ নামা লিখা বিদ্‌আত। সুতরাং হারাম।

উত্তর- ইতিপূর্বে উল্লেখিত আমার বক্তব্য থেকে জানা যায় যে এটা বিদ্‌আত নয়, এর উৎস প্রমাণিত আছে। আর যদি বিদ্‌আতই হয়ে থাকে, সব বিদ্‌আত হারাম নয়। 'বিদ্‌আত' শীর্ষক আলোচনা দেখুন।

২নং আপত্তি- আহাদ নামাকে তল্‌কীন মনে করাটা ভুল। কেননা মৃত ব্যক্তি যদি নিরক্ষর হয়, প্রশ্ন করার সময় লিখিত বিষয় কিভাবে বুঝবে?

উত্তরঃ মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই লিখা পড়তে পারবে। এ জগতেই অজ্ঞ থাকতে

পারে, ওখানে কোন অজ্ঞতা নাই। হাদীছ শরীফে আছে যে বেহেশতবাসীর ভাষা হবে আরবী। (ফাত্ওয়ায়ে শামীর কিতাবুল কারাহাত দেখুন) অথচ পৃথিবীতে অনেক বেহেশ্তবাসী আরবী সম্পর্কে অজ্ঞ। অনুরূপ প্রত্যেক মইয়েতের কাছে ফিরিশতাদ্বয় আরবীতে প্রশ্ন করেন এবং প্রত্যেকে আরবী বুঝতে পারে। আল্লাহ তাআলা মীছাকের দিন সবার থেকে আরবীতে শপথ নিয়ে ছিলেন। তাহলে কি মৃত্যুর পর মইয়তকে কোন মাদ্রাসায় আরবী শিক্ষা দেয়া হয়? কখনই না, বরং এমনিতে জেনে যাবে। কিয়ামতের দিন সকলের হাতে লিখিত আমলনামা দেয়া হবে এবং অজ্ঞ জ্ঞানী সবাই পড়বে। এর থেকে বোঝা গেল মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই আরবী বুঝে এবং আরবী লিখাও পড়তে পারে। সুতরাং এ লিখাটা অর্থাৎ আহাদ নামাটা ওর জন্য উপকারীই হবে।

৩নং আপত্তি- আল্লামা শামী (রহঃ) ফাত্ওয়ায়ে শামী প্রথম খণ্ড التشهد। অধ্যায়ের একটু আগে কাফনের উপর লিখাকে নিষেধ করেছেন। অনুরূপ শাহ আবদুল আযীয ছাহেব ফাত্ওয়ায়ে আযীযিতে তা নিষেধ করেছেন। কেননা লাশ যখন ফোলে ফেটে যাবে, তখন এর গলিত পুঁজ ও রক্তে এ লিখাগুলো কলুষিত হবে, যা অবমাননাকর। সুতরাং এটা নাজায়েয। (বিরোধিতাকারীগণ সাধারণতঃ এ আপত্তিটা বেশী করে থাকে।)

উত্তর- এর কয়েকটি জবাব আছে। প্রথমতঃ দলীলটা তাদের দাবী অনুযায়ী হয়নি। তাদের দাবী হচ্ছে কবরে লিখিত কোন কিছু রাখা নাজায়েয। কিন্তু এ দলীল থেকে বোঝা যায় যে, কালি বা মাটি দ্বারা লিখে কাফনের উপর রাখা নিষেধ কিন্তু যদি আঙ্গুল দ্বারা মইয়তের কপালে বা বুকের উপর কিছু লিখে দেয়া হয় বা কবরের মধ্যে একটি তাকে আহাদনামা রাখা হয়, তাহলে জায়েয আছে; এতে লিখার অবমাননার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এ আপত্তি তাদের সহায়ক নয়, দ্বিতীয়তঃ আল্লামা শামী (রহঃ) সকল প্রকার লিখা নিষেধ করেননি। একই জায়গায় তিনি বলেছেনঃ-

نَعَمْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَشِّيْنَ عَنْ فَوَائِدِ الشَّرْجِى اَنَّ مِمَّا يُكْتَبُ عَلٰى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مِدَادٍ بِالْاَصْبَعِ الْمُسَبِّحَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَعَلَى الصَّدْرِ لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَذَالِكَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ التَّكْفِيْنِ.

(কতেক মুহাককিক আলিম প্রসিদ্ধ 'ফওয়ায়েদুশ শরজী' গ্রন্থ থেকে বর্ণনা

করেছেন যে মইয়তের কপালে কালিবিহীন আঙ্গুল দ্বারা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। লিখা যাবে এবং বুকের উপর لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। লিখা যাবে এবং এ লিখাটা যেন গোসলের পর কাফনের আগে হয়।) এর থেকে বোঝা গেল যে লিখাটা সাধারণভাবে নিষেধ করেননি। তৃতীয়তঃ আল্লামা শামী (রহঃ) ফাত্ওয়ায়ে বযাযিয়ার ফাত্ওয়ার বরাত দিয়ে জায়েয বলেছেন। এর থেকে বোঝা গেল- হানাফী মাযহাবের প্রধান আলিমগণ জায়েযের সমর্থক। কিন্তু আল্লামা ইবনে হাজর হারাম হওয়ার ফাত্ওয়া দিয়েছেন আর তিনি হলেন শাফেঈ মযহাবের অনুসারী। তাহলে কি হানাফীদের নির্দেশের পরিপন্থী শাফেঈদের ফাত্ওয়ার অনুসরণ করা ঠিক হবে? কখনই না। অধিকন্তু হারামের ফাত্ওয়াটা হচ্ছে কেবল শেখ ইবনে হাজরের নিজস্ব উক্তি, কারো থেকে সংকলন করেননি। চতুর্থতঃ লাশ ফোলে ফেটে যাওয়াটা অবশ্যম্ভাবী নয়। কারণ অনেক লাশ ফোলেও না, ফেটেও না। তাই কেবল অবমাননার ধারণার বশবর্তী হয়ে মৃত ব্যক্তিকে উপকার থেকে বঞ্চিত করার কি যুক্তি থাকতে পারে? পঞ্চমতঃ আমি আগের অধ্যায়ে সাহাবায়ে কিরামের আমলের কথা উল্লেখ করেছি যে তাঁরা নিজেদের কাফনসমূহে হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র বস্তু রাখার জন্য ওসীয়ত করেছেন। স্বয়ং হুযূর আলাইহিস সালাম স্বীয় তাহবন্দ শরীফ তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত যয়নব (রাঃ) এর কাফনের মধ্যে রাখিয়েছেন। হযরত তাউস নিজের কাফনের উপর দুআর বাক্যসমূহ লিখার জন্য ওসীয়ত করেছেন। বলুন ওগুলোতে কি পুঁজ রক্ত লেগে যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না? বা ওগুলো কি পবিত্র ছিল না? ষষ্ঠতঃ শরীয়তের বিধান হচ্ছে পবিত্র বস্তুসমূহ নাপাক জায়গায় ফেলা হারাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে পাক জায়গায় রাখে তাহলে কেবল সম্ভাবনা জনিত কারণে ওটা নাজায়েয হবে না। এর অনেক দলীল রয়েছে। যমযম কূপের পানি খুবই পবিত্র। এর দ্বারা প্রস্রাব ধৌত করা হারাম। কিন্তু পান করা জায়েয। কুরআন শরীফের আয়াত লিখে ধুয়ে পানি পান করা মুবাহ। হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা জায়েয ও হালাল। অথচ এগুলো পেটে পৌঁছে মুত্রস্থলীতে যায় এবং ওখান থেকে প্রস্রাব হয়ে বের হয়। প্রথম অধ্যায়ে আমি উদ্ধৃত করেছি যে হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এর ঘোড়াশালার ঘোড়ার উরুতে লিখা ছিল جُبِسَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ। অথচ ওই লেখায় প্রস্রাবের ছিটকা পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী আর ঘোড়া নাপাক জায়গায় লুটে পড়ে। কিন্তু এর প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। এ দলীল থেকে ইমাম নাসীর (রহঃ) ও ইমাম সফ্ফার (রহঃ) (উভয়ই হানাফী মযহাবের বিশিষ্ট ইমাম) এ লিখাকে জায়েয বলেন। শেখ ইবনে হাজর (রহঃ) যে বলেন ফারুকে আযমের ঘোড়াগুলোতে এ লিখাটা চিহ্নিত করার জন্যই ছিল, সুতরাং এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে

যাবে। তা হতে পারে না। কেননা উদ্দেশ্য যেটাই হোক না কেন, অক্ষর গুলোতো ঠিকই রয়েছে। আর নিয়তের পার্থক্যের ফলে অক্ষরগুলোর হুকুমের কোন পরিবর্তন হয় না। মোট কথা হলো এ আপত্তিটা নিছক ভিত্তিহীন। হাদীছ শরীফ, সাহাবা কিরামের আমল, ইমামগণের উক্তিসমূহের মুকাবিলায় কোন গাইর-মুজতাহিদ শাফেঈ মযহাবের ইমামের কেবল কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন হানাফী ইমামের উক্তি বা সুস্পষ্ট হাদীছ এর নিষেধাজ্ঞায় পেশ করলে গ্রহণযোগ্য হতো। কিন্তু তা কখনও পারবে না। সপ্তমতঃ উলামায়ে কিরামের উক্তি থেকে মুস্তাহাব বা জায়েয প্রমাণিত হতে পারে কিন্তু মকরূহ প্রমাণের জন্য সুনির্দিষ্ট দলীলের প্রয়োজন আছে। যেমন আমি প্রথমে প্রমাণ করেছি। সুতরাং উপরোক্ত উক্তিসমূহের মধ্যে মুস্তাহাব সম্পর্কিত বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য এবং মকরূহ সম্পর্কিত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় কেননা এর কোন সুনির্দিষ্ট দলীল নাই।

৪নং আপত্তি- আহাদনামা বা শাজরা কবরে রাখাটা অপব্যয়, কেননা ওখানে রাখার ফলে কারো কাজে আসবে না এবং অনর্থক নষ্ট হয়ে যাবে। তাই এটা অপব্যয় হেতু হারাম।

উত্তরঃ যেহেতু এর দ্বারা মইয়তের অনেক উপকার হয় এবং কাজে আসে, সেহেতু এটা অনর্থক নয়, অপব্যয়ও নয়।

৫নং আপত্তি- হুযূর আলাইহিস সালাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিককে তার মৃত্যুর পর স্বীয় জামা মুবারক পরায়েছেন এবং ওর মুখে নিজের পবিত্র থুথু ফেলেছেন। কিন্তু এতে কোন উপকার হলো না। বোঝা গেল আহাদনামা ইত্যাদি বৃথা মাত্র। আরও জানা গেল যে হুযুরের কাছে ইলমে গায়ব নাই। অন্যথায় তিনি স্বীয় থুথু ও জামা দিতেন না। এটাও বোঝা গেছে যে নবীর শরীরের অংশ দোযখে যেতে পারে, কেননা, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হলো দোযখী এবং ওর মুখে যেহেতু হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র থুথু ফেলা হয়েছে, সেহেতু থুথুও ওখানে পৌঁছেছে।

উত্তর- এ ঘটনার দ্বারাতো কবরের পবিত্র বস্তু রাখাটাই প্রমাণিত হলো। কেননা হুযূর আলাইহিস সালাম মুনাফিককে নিজের জামা উদ্দেশ্যে পরায়ে ছিলেন। তবে এটা জানা ছিল যে ঈমানহীনদের বেলায় পবিত্র বস্তু উপকারী নয়। আমরাও তাই বলি যে মুমিন মইয়তের জন্য পবিত্র বস্তু উপকারী কিন্তু কাফিরের জন্য নয়। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর মুনাফিক হওয়াটা হুযূর আলাইহিস সালামের জানা ছিল। তাঁর বলার ফলেইতো আমরা জানতে পেরেছি। এটাও জানা ছিল যে ঈমানহীনদের বেলায় পবিত্র বস্তু সমূহ কোন উপকারী নয়। কেননা এটা আকায়েদের মাসআলা, যার জ্ঞান নবী করীম (দঃ) এর নিশ্চয় আছে। যদি একজন কৃষক অনুর্বর ও উর্বর ভূমি চিনতে পারে, নবীজী কেন

ঈমানের যমীন অর্থাৎ মানুষের মনের কথা জানবেন না? তিনটি কারণে তিনি ওকে পবিত্র বস্তু দিয়েছেন- এক, ওর ছেলে একনিষ্ঠ মুমিন ছিলেন। হয়তো উনার সান্ত্বনার জন্য করা হয়েছিল। দুই, সে একবার হযরত আববাস (রাঃ)কে তার কাপড় পরায়েছিল। তিনি (দঃ) তাঁর চাচার প্রতি ওর ইহসানটা না থাকাটাই চেয়েছেন। তিন, তিনি রহমতে আলম হওয়াটাই প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ আমিতো প্রত্যেকের প্রতি করুণা করতে প্রস্তুত, গ্রহণ করুক বা না করুক। বৃষ্টি সব যমীনের উপর বর্ষিত হয় কিন্তু নালা নর্দমা ও খিলজমি এর থেকে কোন উপকৃত হয় না। নবীর শরীরের অংশ কোন অবস্থায় দোযখে যেতে পারে না। ফিরিশ্‌তা ওই থুথু ওর মুখে প্রবিষ্ট হতে দেননি বরং বের করে ফেলছে। কেনআন ইবনে নুহ মানুষের আকৃতিতে দোযখে যায়নি অর্থাৎ সেই বীর্য যখন অন্য আকার ধারণ করলো, তখনই দোযখে গেল। অন্যথায় হযরত তালহা যখন হুযূর আলাইহিস সালামের শিঙ্গারের রক্ত পান করেছিলেন, তখন তিনি (দঃ) বলেছিলেন 'তোমার উপর দোযখের আগুন হারাম।'

উচ্চস্বরে যিক্‌রের বর্ণনা

পাঞ্জাব ও অন্যান্য জায়গায় ফজর ও ইশার নামাযের পর উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পড়ার রেওয়াজ আছে। বিরোধিতাকারীগণ একে হারাম বলে এবং নানা রকম ফন্দি ফিকিরের মাধ্যমে একে প্রতিরোধ করতে চায়। যেমন তারা বলে উচ্চ স্বরে যিক্‌র করা বিদ্‌আত, হানাফী নীতির বরখেলাপ এবং এর ফলে নামাযরত মুসল্লী নামাযে ভুল করে; তাই এটা হারাম। কিন্তু আমাদের অভিমত হলো উচ্চস্বরে যিক্‌র করা জায়েয বরং কতেক জায়গায় আবশ্যক। অতএব অন্যান্য আলোচনার মত এটাকেও দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এর প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উচ্চস্বরে যিক্‌র করার প্রমাণঃ

উচ্চস্বরে যিক্‌র করা জায়েয। কুরআন, হাদীছ ও উলামায়ে কিরামের উক্তি দ্বারা এটা প্রমাণিত। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا.

(আল্লাহর যিক্‌র এমনভাবে কর, যেমনভাবে তোমাদের বাপদাদাদের যিক্‌র কর বরং তদপেক্ষা বেশী।) মক্কার কাফিরগণ হজ্ব সমাপণান্তে একত্রিত হয়ে নিজ নিজ বংশের গুণকীর্তন ও পূর্বপুরুষদের শৌর্য বীর্য-বর্ণনা করতো। আল্লাহ তা'লা একে নিষেধ করেছেন এবং এরস্থলে তাঁর যিক্‌র করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটা উচ্চ স্বরেই হয়ে থাকবে। এ জন্যে উচ্চস্বরে তালবিয়া অর্থাৎ লাববাইকা পাঠ সুন্নাত, বিশেষ করে বিভিন্ন কাফেলা একত্রিত হবার সময়। আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ ফরমান-

وَاِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

(যখন কুরআন শরীফ পাঠ করা হবে, তখন মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং নিশ্চুপ থাকুন।)

বোঝা গেল যে, উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয। নীরবের যিক্‌র নয়, উচ্চস্বরের যিক্‌রই শোনা যায় (তাফ্‌সীরে কবীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। মিশ্‌কাত শরীফের الذكر بعد الصلوة অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلٰوتِهٖ يَقُوْلُ بِصَوْتِهٖ الْاَعْلٰى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ.

হুযূর আলাইহিস সালাম যখন নামায থেকে সালাম ফিরাতেন, তখন উচ্চস্বরে لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ বলতেন। মিশ্‌কাত শরীফে সেই জায়গায় আরও উল্লেখিত আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ اِنْقِضَاءَ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে- আমি তকবীরের আওয়াজ থেকে হুযূর আলাইহিস সালামের নামায সমাপ্তি বুঝতে পারতাম। অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কম বয়সের কারণে মাঝে মধ্যে জামাতে হাজির হতেন না। এ জন্য তিনি বলেন নামাযের পর মুসল্লীরা এত উচ্চস্বরে তক্‌বীর বলতেন যে, আমরা ঘরের লোকেরা বুঝতে পারতাম যে নামায শেষ হয়েছে। প্রসিদ্ধ 'লুমআত' গ্রন্থে এ হাদীছের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে-

اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَمْ يَحْضُرِ الْجَمَاعَةَ, لِاَنَّهٗ كَانَ صَغِيْرًا مِّمَّنْ لَايُوَاظِبُ عَلٰى ذَالِكَ.

হযরত ইবনে আবাবাস ছোট ছিলেন। এ জন্যে নিয়মিতভাবে জামাতে হাজির হতেন না। মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ড اَلذِّكْرُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ শীর্ষক অধ্যায়ে সেই ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

اِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ وَكَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ ফরয সমূহ থেকে ফারেগ হওয়ার পর উচ্চস্বরে যিক্‌র করা হুযূর আলাইহিস সালামের যুগে প্রচলিত ছিল। মিশ্‌কাত শরীফে ذكر الله عزوجل শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاءٍ

ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ.

যে ব্যক্তি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি আর যে ব্যক্তি সমাবেশে আমার যিক্‌র করে, আমিও তাকে এর থেকে ভাল সমাবেশে (অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের সমাবেশে) স্মরণ করি। জামে সগীরে উল্লেখিত আছে-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثِرُوْا فِى الْجَنَازَةِ قَوْلَ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

হযরত আনস থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- জানাযায় لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বেশী করে বলুন। এর থেকে বোঝা যায় যে, জানাযা নিয়ে যাবার সময় কলেমা তৈয়্যবা বা অন্য কোন যিক্‌র উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে সব রকমের জায়েয আছে।

মৌলভী রশীদ আহমদের হাদীছের উস্তাদ শেখ মুহাম্মদ থানবী রচিত 'দলায়েলুল আযকার' (দিল্লী থেকে প্রকাশিত) পুস্তিকার ৭৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ مَعَ الصَّحَابَةِ بِالْاَذْكَارِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّسْبِيْحِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ.

হুযূর আলাইহিস সালাম নামাজের পর সাহাবায়ে কিরামের সাথে উচ্চ স্বরে তসবীহ তাহ্‌লীল পড়তেন। তাফসীর রূহুল বয়ানে চতুর্থ পারার আয়াত رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ এর ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছে-

اَلذِّكْرُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ جَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ رِيَاءٍ لِيَغْتَنِمَ النَّاسُ بِاِظْهَارِ الدِّيْنِ وَوُصُوْلِ بَرَكَةِ الذِّكْرِ اِلَى السَّامِعِيْنَ فِى الدُّوْرِ وَالْبُيُوْتِ وَيُوَافِقُ الذَّاكِرَ مَنْ سَمِعَ صَوْتَهٗ وَيَشْهَدُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهٗ

উচ্চ স্বরে যিক্‌র করা জায়েয বরং মুস্তাহাব, যদি কপটতা না থাকে এবং দ্বীনের প্রচারই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যিক্‌রের বরকত ঘরে অবস্থানরত শ্রোতাদের কাছেও পৌছবে এবং যিনি আওয়াজ শুনে যিক্‌রে মশগুল হবেন, (তিনিও বরকতের ভাগী হবেন) এবং কিয়ামতের দিন আর্দ্র-শুষ্ক সব কিছু যিক্‌রকারীর ঈমানের সাক্ষ্য দিবে।

এর থেকে বুঝা গেল উচ্চস্বরে যিক্‌রে দ্বীনের অনেক ফায়দা আছে। তাফসীরে খাযেন ও রূহুল বয়ানে ষষ্ঠ পারার আয়াত وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে একটি রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে। রিওয়ায়েতটা হচ্ছে হুযূর আলাইহিস সালাম সৈয়্যদুনা আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কে বললেন আজকের রাত্রে আমি তোমার কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছি। তোমাকেতো সুমধুর দাউদী কণ্ঠ দান করা হয়েছে। তখন হযরত আবু মুসা আশ'আরী বলেন-

فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَسْمَعُ لَحَبَّرْتُهٗ تَحْبِيْرًا- اَلتَّحْبِيْرُ حُسْنُ الصَّوْتِ.

খোদার কসম, যদি আমি জানতাম যে আমার কুরআন তিলাওয়াত সাহেবে কুরআন (দঃ) শুনছেন, তাহলে আমি আরও আওয়াজ সুন্দর করে তিলাওয়াত করতাম।

এ হাদীছ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। একটি হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম উচ্চস্বরে যিক্‌র করতেন যার আওয়াজ বাহিরে শোনা যেত। অপরটি হচ্ছে কুরআন তিলাওয়াত আল্লারই এবাদত এবং ইবাদতরত অবস্থায় হুযূর আলাইহিস সালামকে সন্তুষ্ট করা সাহাবায়ে কিরামের একান্ত আকাঙ্খা ছিল। আরব্য কবি কি সুন্দর বলেছেন-

حَمَامَةَ جَرْعَى حَوْمَةِ الْجَنْدَلِ اسْجَعِى
فَاَنْتِ بِمَرْاٰى مِنْ سُوَادٍ وَمَسْمَعِى.

(বিয়াবনের কবুতর মনের আনন্দে উচ্চস্বরে গান করছে আর তুমি সোয়াদ পাহাড়ের চূড়া থেকে ওকে দেখছ আর তার গান শুনছ।)

মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুস সালাত শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- এক রাত্রে হুযূর আলাইহিস সালাম তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কিরাম রাত্রে কে কি করছেন দেখার জন্য বের হলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) কে খুব নিম্নস্বরে এবং হযরত উমর(রাঃ) কে খুবই উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখলেন। সকালে তাঁদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে হযরত সিদ্দীকে আকবর আরয করলেন-

اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ.

'হে আল্লাহর হাবীব (দঃ), যাকে শোনানো আমার অভিপ্রায় ছিল, তাকে অর্থাৎ আল্লাহকে শুনিয়েছি।' হযরত উমর ফারুক(রাঃ) আরয করলেন -
اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ ঘুমন্তদেরকে জাগাতে ছিলাম এবং

শয়তানকে তাড়াতে ছিলাম।' সুবহানাল্লাহ! উভয়ের উত্তর মনঃপুত হলো, কারো প্রতি তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি বরং হযরত সিদ্দীক আকবরকে বললেন, 'তুমি আওয়াজ আরও একটু বড় করবে' এবং হযরত উমর ফারুককে বললেন 'তুমি আওয়াজ' একটু ছোট করবে'।

মিশ্কাত শরীফে' কিতাবুল আসমায়ে তা'আলায় 'হযরত বরিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- একবার আমি হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে ইশার নামাযের সময় মস্জিদে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম এক ব্যক্তি খুবই উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করছেন। আমি হুযূর আলাইহিস সালামের কাছে আরয করলাম 'হে আল্লাহর হাবীব, এটা ভণ্ডামি মাত্র'। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيْبٌ (নয়, সে তওবাকারী মুমিন।) ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবুল কারাহিয়ার চর্তুথ অধ্যায়ে الصلوة والتسبيح وقرءة القران শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

قَاضٍ عِنْدَهُ جَمْعٌ عَظِيْمٌ يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ جُمْلَةً لاَبَأْسَ بِهِ.

কোন কাযীর দরবারে যদি বড় জমায়েত হয় এবং সবাই মিলে যদি দরূদ পড়ে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। একই জায়গায় আলমগীরীতে আরও উল্লেখিত আছে-

اَلاَفْضَلُ فِىْ قِرَأَةِ الْقُرْاٰنِ خَارِجَ الصَّلٰوةِ الْجَهْرُ.

নামায ছাড়া অন্যান্য সময় উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা ভাল। উক্ত ফাত্ওয়ার কিতাবে একই জায়গায় আরও বর্ণিত আছে-

اَمَّا التَّسْبِيْحُ وَالتَّهْلِيْلُ لاَبَأْسَ بِذَالِكَ وَاِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ.

অর্থাৎ' সুবহানাল্লা' বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই, যদিওবা উচ্চস্বরে বলা হয়। ফাত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ডে احكام المسجد এর বর্ণনার সাথে বর্ণিত আছে-

اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلٰى اِسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسَاجِدِ اِلاَّ اَنْ يُّشَوِّشَ جَهْرُهُمْ عَلٰى نَائِمٍ اَوْمُصَلٍّ اَوْ قَارِئٍ.

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে, মসজিদ সমূহে সমবেতভাবে উচ্চস্বরে যিক্র করা মুস্তাহাব। তবে তাদের উচ্চস্বরের জন্য যেন কোন বিশ্রামকারী বা নামাযী বা তিলাওয়াতকারীর অসুবিধা না হয়। শামীতে

একই জায়গায় আরও উল্লেখিত আছে-

فَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِنَّ الْجَهْرَ اَفْضَلُ لِاَنَّهُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَ لِتَعَدِّىْ فَائِدَتِهِ اِلَي السَّامِعِيْنَ وَيُوْقِظُ قَلْبَ الْغَافِلِيْنَ فَيَجْمَعُ هَمَّهُ اِلَى الذِّكْرِ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ اِلَيْهِ وَيَطْرُدُ النَّوْمَ وَيَزِيْدُ النَّشَاطَ.

কতেক উলামা বলেন- উচ্চস্বরে যিক্র করা আফযল। কেননা এতে শ্রম বেশী এবং যারা শুনেন, তাদের কাছেও এর ফায়দা পৌঁছে থাকে। এটা অমনোযোগীদের আত্মাকে জাগ্রত করে, তাদের ধ্যান ধারণা ও শ্রবণ শক্তিকে খোদার যিক্রের দিকে আকর্ষণ করে, তন্দ্রা দূরীভূত হয় এবং আনন্দ বৃদ্ধি পায়।

দুর্রুল মুখতারে সালাতুল ঈদাইন অধ্যায়ে تكبير تشريق শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَلاَ يَمْنَعُ الْعَامَّةَ مِنَ التَّكْبِيْرِ فِى الْاَسْوَاقِ فِى الْاَيَّامِ الْعَشْرِ وَبِهِ نَاْخُذُ.

ঈদুল আযহা- এর প্রথম দশ দিন সাধারণ মুসলমানদেরকে বাজারে নারায়ে তকবীর দেওয়া থেকে বাধা দিও না। আমরা তা পছন্দ করি। সম্ভবতঃ তখনকার যুগে সাধারণ লোকেরা ঈদের সময় বাজারে নারায়ে তকবীর দিতেন। যদিও বা এটা বিদ্আত কিন্তু বলেছেন, 'এ ব্যাপারে বাধা দিও না।' এ ইবারতের প্রেক্ষাপটে শামীতে উল্লেখিত আছে-

قِيْلَ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ يَنْبَغِىْ لِاَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهَا اَنْ يُكَبِّرُوْا اَيَّامَ الْعَشْرِ فِى الْاَسْوَاقِ وَالْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْجَعْفَرٍ وَالَّذِىْ عِنْدِىْ اَنَّهُ لاَيَنْبَغِىْ اَنْ تَمْنَعَ الْعَامَّةَ عَنْهُ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهِمْ فِى الْخَيْرِ وَبِهِ نَاْخُذُ فَاَفَادَ اَنَّ فِعْلَهُ اَوْلٰى

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কুফাবাসী ও অন্যান্য এলাকার লোকেরা যিলহজ্ব মাসের দশ দিন পর্যন্ত বাজার ও মসজিদ সমূহে যে তকবীর বলে, তা মুস্তাহাব কি না। তিনি বলেছেন হ্যাঁ। ইমাম আবু জাফর (কুঃ সিঃ) তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে সাধারণ লোকদেরকে এ তকবীর বলা থেকে বাধা দেয়া

উচিত নয়। কেননা ওরা এমনিতে ভাল কাজের প্রতি কম আগ্রহী। এ অভিমতটা আমরা গ্রহণ করি। এর থেকে বোঝা গেল বাজারের তকবীর মুস্তাহাব।

ইমাম নববী (রহঃ) রচিত 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থে اَلصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

يُسْتَحَبُّ لِقَارِئِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ فِىْ مَعْنَاهُ اِذَا ذَكَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرْفَعَ صَوْتَهُ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيْمِ بِهِ وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ اَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلٰى اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُرْفَعَ صَوْتَهُ بِالصَّلٰوةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّلْبِيَةِ.

অর্থাৎ হাদীছ শরীফ ইত্যাদি অধ্যয়নকারীদের উচিত যে যখন হুযূর আলাইহিস সালামের আলোচনা হয়, তখন যেন উচ্চস্বরে সালাত ও সালাম পাঠ করে। আমাদের উলামায়ে কিরাম তলবিয়া অর্থাৎ লাব্বাইকা বলার সময় উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পড়ার কথা বলেছেন।

এগুলো ছাড়া আরও অনেক হাদীছ ও ফকীহগণের উক্তি উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু বক্তব্য সংক্ষেপ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট মনে করলাম।খোদার শুকরিয়া যে বিরুদ্ধবাদীদের অগ্রদূত মৌলভী রশীদ আহমদ ছাহেবও এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত। যেমন ফাত্ওয়ায়ে রশিদিয়ার তৃতীয় খণ্ড كتاب الخطر والاباحة এর ১০৪ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্ন উত্তর আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে "যিক্র দুআ ও দরূদ উচ্চস্বরে-বেশী বা কম উচ্চস্বরে হোক, পাঠ করা জায়েয আছে কিনা ? উত্তর- যে সমস্ত জায়গায় উচ্চস্বরে যিক্র করার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে, সে সব ব্যতীত উচ্চস্বরে যিক্র করা ইমাম আবু হানীফার মতে মাক্রূহ। কিন্তু সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) ও অন্যান্য ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণের মতে জায়েয। আমাদের গুরুজনদের কাছে সাহেবাইনের মতামতই গ্রহণীয়।" مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری অর্থাৎ লক্ষ প্রমাণাদির থেকে তোমার সাক্ষ্যই অধিক গুরুত্ব পূর্ণ।

এখন আর কোন দেওবন্দী ওহাবীর অধিকার নেই যে কোন সুন্নী মুসলমানকে উচ্চস্বরে যিক্র করা থেকে বাধা দেয়। কেননা বিনা মাকরূহে এর জায়েয হওয়া সর্ম্পকে চূড়ান্ত স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। বিবেকও বলে যে কয়েকটি কারণে উচ্চস্বরে যিক্র করা

জায়েয। প্রথমতঃ শরীয়তে আছে যে শ্রম অনুপাতে ছওয়াব পাওয়া যায়। এ জন্য ঠাণ্ডায় ওযু করা, অন্ধকার রাতে মসজিদে জামাত পড়ার জন্য আসা এবং দূর থেকে মসজিদে আসার জন্য অতিরিক্ত ছওয়াব রয়েছে। (মিশ্কাত শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থ দেখুন) মনে মনে যিক্রের থেকে উচ্চস্বরে যিক্রের মধ্যে কষ্ট বেশী। তাই এটা আফযল। **দ্বিতীয়তঃ** মিশ্কাত শরীফের কিতাবুল আযানে বর্ণিত আছে যে যতদূর মুয়াযযিনের আওয়াজ পৌঁছবে, ওই পর্যন্ত সমস্ত গাছ-পালা, ঘাস, জ্বীন ও ইনসান কিয়ামতের দিন ওনার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে। তাই উচ্চস্বরে যিক্রের দ্বারা এ ফায়দাটা পাবার আশা করা যায়। তৃতীয়তঃ মনে মনে যিক্রের ফায়দা কেবল যিক্রকারীই পেয়ে থাকে কিন্তু উচ্চস্বরে যিক্রের ফায়দা যিক্রকারী নিজেও পেয়ে থাকে যেমন শব্দ ইত্যাদির ধাক্কায় আত্মা জাগ্রত হয় এবং শ্রোতারাও উপকৃত হয়, যেমন যিকরের আওয়াজ শুনে ওরাও যিক্র করতে পারে। আর যিক্র না করলেও শোনার ছওয়াবতো পাবে। নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল।

চতুর্থতঃ মিশ্কাত শরীফের الاذان অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে আযানের আওয়াজের দ্বারা শয়তান পালিয়ে যায়। একটু আগে উল্লেখিত হয়েছে যে হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) হুযূর আলাইহিস সালামের প্রশ্নের উত্তরে আরয করেছিলেন اَطْرُدُ الشَّيْطَانَ (শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম)।এতে বোঝা যায় , আযান ছাড়া অন্যান্য যিক্রেও শয়তান পালিয়ে যায়। তাই উচ্চস্বরে যিক্রের দ্বারা শয়তান থেকেও রেহাই পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ উচ্চস্বরে যিক্রের ফলে ঘুম , তন্দ্রা ও অলসতা দূরীভূত হয়। আর মনে মনে যিক্রের ফলে অনেক সময় ঘুম এসে যায়। কিন্তু আমার এ সমস্ত বক্তব্য কেবল ওই অবস্থায় ফলপ্রসূ হবে , যদি লোক দেখানো অভিপ্রায়ে না হয়। আর যদি লোক দেখানোর নিয়ত হয় , তাহলে যিক্র কেন , এ রকম মুরাকাবা করা ও নামায পড়াও গুনাহ হবে।

নক্শবন্দীয়া তরীকার মশায়েখে কিরাম নীরবে যিক্র করার প্রতি আগ্রহী। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে-

دل میں ہو یاد تیری گوشئہ تنہائی ہو۔
پھرتوخلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔

অর্থাৎ মনে মনে তোমার স্মরণে এক কিনারায় একাকী বসে আছি। কিন্তু তুমি এ একাকীত্বের মধ্যেও অদ্ভুত মাহফিলের আয়োজন করেছ।)

অন্যান্য সিলসিলার বুযুর্গানে কিরাম উচ্চস্বরে যিক্রের সর্মথক। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে-

سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں .

انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو .

(অর্থাৎ সারা বিশ্বে আমরা ছড়িয়ে আছি কিন্তু অন্তরের চোখে তোমাকে দেখছি। জামায়েতের মধ্যে আছি কিন্তু একাকীত্বের স্বাদ পাচ্ছি) উভয় পক্ষ খোদার প্রিয়। নক্‌শবন্দীগণ নির্জনতায় সমাবেশ করেন আর অন্যান্যগণ সমাবেশের মধ্যে একাকীত্ব প্রকাশ করেন। كُلًّا وَّعَدَاللّٰهُ الْحُسْنٰى (আল্লাহ তাআলা সবাইর কাছে বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) কিন্তু তাঁদের এ পার্থক্য হালাল-হারাম নিয়ে নয়,নিজ নিজ তরীকাগত। কেউ কারো দোষারোপ করেন না। আমার এ পূর্ণ আলোচনাটা ওই সমস্ত দেওবন্দী ও অন্যান্য বাতিল পন্থীদের জন্য লিখা করা হয়েছে, যারা উচ্চস্বরে যিক্‌র করাকে হারাম বলে ফাত্‌ওয়া দেয়। আফসোস মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর (রহঃ) সেই বাণী- 'আমি একাজটা নিজে করি না, আবার অস্বীকারও করি না' বিসর্জিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উচ্চস্বরে যিক্‌র করা প্রসঙ্গে আপত্তি সমূহের জবাব।

ভিন্নমতাবলম্বীগণ এ বিষয়ে প্রমাণিক ও যৌক্তিক-এ দু'ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। আমি প্রথমে তাদের প্রমাণিক আপত্তিসমূহের জবাব দিচ্ছি।

১নং আপত্তি- কালামে পাকে বর্ণিত আছে

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِفْيَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

(তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় নীরবে স্মরণ কর।) এ আয়াত থেকে বোঝা গেল খোদার যিক্‌র মনে মনে হওয়া উচিৎ, উচ্চস্বরে নিষেধ।

উত্তরঃ এর কয়েকটি জবাব আছে। প্রথমতঃ এ আয়াতে নামাযরত অবস্থায় যিক্‌রের কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ অনুচ্চস্বরে পঠিত নামায সমূহে কির'আত বা মুক্তাদীদের তাশাহুদ ইত্যাদি মনে মনে পড়া অথবা ইমাম ছাহেব কর্তৃক প্রয়োজনের অতিরিক্ত আওয়াজ বের না করা। যেমন তফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত আছে-

فَمَنْ اَمَّ فِىْ صَلٰوةِ الْجَهْرِ يَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ لَّا يَجْهَرَ جَهْرًا شَدِيْدًا بَلْ يَقْتَصِرُ عَلٰى قَدْرِمَا يَسْمَعُهٗ مَنْ خَلْفَهٗ قَالَ فِى الْكَشْفِ لَايَجْهَرُ فَوْقَ حَاجَةِ النَّاسِ وَالْاَفَهُوَ مُسِىْءٌ.

যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে পঠিত নামাযে ইমামতি করে, সে যেন অতি উচ্চস্বরে কির্‌আত (সূরা) না পড়ে। বরং পিছনের লোকেরা শুনতে পারে মত পড়লেই যথেষ্ট। কাশ্‌ফ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন চীৎকার না করে, অন্যথায়, গুনাহগার হবে। তফ্‌সীরে কবীরে এ আয়াত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

وَالْمُرَادُ مِنْهُ اَنْ يَقَعَ ذَالِكَ الذِّكْرُ بِحَيْثُ يَكُوْنُ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَجْهَرْ.

অর্থাৎ এর ভাবার্থ হলো সরব ও নীরবের মাঝামাঝি আল্লাহর যিক্‌র করা উচিৎ। তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِىْ بِالذِّكْرِ الْقُرْاٰنَ فِى الصَّلٰوةِ يُرِيْدُ اِقْرَءْ سِرًّا فِىْ نَفْسِكَ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতে যিক্‌র বলতে নামাযে কুরআন তিলাওয়াতকে বোঝানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মনে মনে কিরআত পড়ুন। স্বয়ং কুরআন করীম অন্যত্র এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন-

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا.

(নামায অতি উচ্চস্বরেও পড়ো না, আবার অতিশয় নিম্নস্বরেও পড়ো না। এ দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।) আমি এ গ্রন্থের পেশ কালামে উল্লেখ করেছি, কুরআনের সাহায্যে কুরআনের তাফসীরের স্থান সর্বউর্ধ্বে। দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে যিক্‌র যেন কেবল মৌখিক না হয় বরং কথার সাথে কলবও যেন জড়িত থাকে। তা না হ'লে যিক্‌র নিষ্ফল। তফ্‌সীরে খাযেনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ فِى النَّفْسِ اَنْ يَّسْتَحْضِرَ فِىْ قَلْبِهٖ عَظَمَةَ الْمَذْكُوْرِ جَلَّ جَلَالُهٗ.

বলা হয়েছে যে, মনে মনে যিক্‌র করার অর্থ হচ্ছে অন্তরে খোদায়ে কুদ্দুসের

মহত্ব বিরাজমান থাকা। একই তফসীরে আরও উল্লেখিত আছে-

وَاِذَا كَانَ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ عَارِيًا عَنْ ذِكْرِ الْقَلْبِ كَانَ عَدِيْمَ الْفَائِدَةِ لِاَنَّ فَائِدَةَ الذِّكْرِ حُضُوْرُ الْقَلْبِ وَاسْتِشْعَارُهٗ عَظْمَةَ الْمَذْكُوْرِ جَلَّ جَلَالُهٗ.

অর্থাৎ যদি মৌখিক যিক্র আত্মিক যিক্র থেকে উদাসীন হয়, তাহলে এর কোন মূল্য নেই। কেননা যিক্রের ফযীলত হচ্ছে আত্মাকে হাযির করা ও খোদার মহত্বকে অন্তরে স্থান দেয়া। অথবা এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে কোন কোন সময় আত্মিক যিক্র উচ্চস্বরের যিক্র থেকে উত্তম। অর্থাৎ আয়াতের আদেশটা হচ্ছে امر استحبابى পছন্দমূলক আদেশ আর পছন্দটাও সব সময় এবং সব দিক দিয়ে নয় বরং কেবল কতেক অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ জন্য এ আয়াতটা সেই আয়াত وَاِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ. (যখন কুরআন তিলওয়াত হয়, তখন মনোযোগ সহকারে শোন) এর পরে বর্ণিত হয়েছে । এ আয়াত দু'টা একত্রিত করলে বোঝা যায় যে, যিক্রে ইলাহী কোন সময় উচ্চস্বরে এবং কোন সময় নিম্নস্বরে করা চাই। যখন উচ্চস্বরে যিক্র হয় তখন নিশ্চুপভাবে শুনুন আর যখন নীরবে হয়, তখন এতে মনোনিবেশ করুন। উচ্চস্বরে যিক্রে যদি লৌকিকতার ভয় থাকে, তাহলে নীরবে করা উত্তম। আর যদি এ উদ্দেশ্যে হয় যে শয়তান দমন হবে, কলব সজাগ হবে, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হবে এবং সমস্ত বস্তু কিয়ামতের দিন যিক্র কারীর ঈমানের সাক্ষ্য দিবে, তখন উচ্চস্বরে যিক্র করা উত্তম।

তফসীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে আরও উল্লেখ আছে-

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ وَهُوَالذِّكْرُ بِالْكَلَامِ الْخَفِىِّ فَاِنَّ الْاَخْفَاءَ اَدْخَلُ فِى الْاِخْلَاصِ وَاَقْرَبُ مِنَ الْاِجَابَةِ وَهٰذَا الذِّكْرُ يَعُمُّ الْاَذْكَارَ كُلَّهَا مِنَ الْقِرَأةِ وَالدُّعَاءِ وَغَيْرِهَا.

(অর্থাৎ এর দ্বারা নীরবে যিক্র করাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা নীরবের মধ্যে আন্তরিকতা এবং কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এবং এ যিক্র সবরকমের যিক্র তিলাওয়াত, ও দুআকে অন্তর্ভুক্ত করে।) এ আয়াত প্রসঙ্গে রূহুল বয়ানে আরও উল্লেখিত আছে-

بِاَنَّ الْاِخْفَاءَ اَفْضَلُ حَيْثُ خَافَ الرِّيَاءَ اَوْتَاَذَّى الْمُصَلُّوْنَ اَوِ

النَّائِمُوْنَ وَالْجَهْرُ اَفْضَلُ فِىْ غَيْرِ ذَالِكَ لِاَنَّ الْعَمَلَ فِيْهِ اَكْثَرُ وَلِاَنَّ فَائِدَتَهٗ تَتَعَدّٰى اِلَى السَّامِعِيْنَ وَلِاَنَّهٗ يُوْقِظُ قَلْبَ الذَّاكِرِ وَيُجْمَعُ هَمَّهٗ وَيَصْرِفُ سَمْعَهٗ اِلَيْهِ.

যেখানে লৌকিকতার ভয় থাকে বা নামাযীদের ও বিশ্রামকারীদের অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে নীরবে যিক্র করা শ্রেয়। এ গুলো ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় উচ্চস্বরে যিক্র করা উত্তম। কেননা এতে আমল বেশী এবং এর উপকার শ্রোতারাও ভোগ করে। আর এ জন্য যে উচ্চস্বরে যিক্র, যিক্রকারীর কলব জাগ্রত করে, চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করে এবং অন্যান্যদেরকে সজাগ করে।

২নং আপত্তি- আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

(বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।) এর থেকেও প্রমাণিত হলো যে উচ্চস্বরে যিক্র আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

উত্তরঃ এ আয়াতেরও কয়েক রকম ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথমতঃ এ আয়াতে খোদার প্রত্যেক যিক্রের কথা নয়, কেবল দুআর কথা উল্লেখিত আছে এবং বাস্তবিকই দুআ গোপনে করাই উত্তম, যাতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। তাফ্সীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে-

اَىْ مُتَضَرِّعِيْنَ مُتَذَلِّلِيْنَ مُخْفِيْنَ الدُّعَاءَ لِيَكُوْنَ اَقْرَبَ اِلَى الْاِجَابَةِ لِكَوْنِ الْاِخْفَاءِ دَلِيْلَ الْاِخْلَاصِ وَالْاِحْتِرَازِ عَنِ الرِّيَاءِ.

অর্থাৎ কান্নাকাটি ও বিনীত সহকারে গোপনে প্রার্থনা কর, যাতে কবুল হয়। কেননা গোপনে দুআ করাটা হচ্ছে আন্তরিকতা ও কপটতাহীনতার প্রমাণ। একই আয়াতের প্রেক্ষাপটে তফ্সীরে খাযেনে বর্ণিত আছে-

وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهٖ حَقِيْقَةُ الدُّعَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّ الدُّعَاءَ هُوَ السُّوَالُ وَالطَّلَبُ وَهُوَ نَوْعٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ.

কারো কারো মতে এর দ্বারা মূলতঃ দুআকেই বোঝানো হয়েছে। এবং এটাই সঠিক, কেননা প্রার্থনা ও কামনা হচ্ছে দুআ এবং এটা এক প্রকার ইবাদত। এ আয়াত

প্রসঙ্গে তফ্সীরে খাযেনে আরও উল্লেখিত আছে-

وَالْاَدَبُ فِى الدُّعَاءِ اَنْ يَّكُوْنَ خَفِيًّا لِهٰذِهِ الْاٰيَةِ قَالَ الْحَسَنُ بَيْنَ دَعْوَةِ السِّرِّ وَدَعْوَةِ الْعَلَانِيَةِ سَبْعُوْنَ ضِعْفًا.

দুআর নিয়ম হচ্ছে গোপনে করা। এ আয়াতের আলোকে হযরত হাসন (রঃ) বলেন, গোপনে একটি দুআ প্রকাশ্যে সত্তর দুআর সমতুল্য। অথবা এ আয়াতের ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে যে কোন কোন অবস্থায় গোপনে যিক্র করা ভাল। অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতে। اُدْعُوْا শব্দ দ্বারা যিক্রে ইলাহীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ নির্দেশটা হচ্ছে পছন্দমাফিক, তাও আবার কতেক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এ প্রসঙ্গে তফ্সীরে খাযেনে আরও বর্ণিত আছে-

فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّ اِخْفَاءَ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ اَفْضَلُ مِنْ اِظْهَارِهَا لِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلِكَوْنِهَا اَبْعَدَ مِنَ الرِّيَاءِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّ اِظْهَارَهَا اَفْضَلُ لِيَقْتَدِىَ بِهِ الْغَيْرُ فَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهٖ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّ اِظْهَارَ الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوْضَةِ اَفْضَلُ مِنْ اَخْفَائِهَا.

এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে কতেক তফসীরকারক ইবাদত সমূহ প্রকাশ্যে করার চেয়ে গোপনে করাকে ভাল বলেছেন। কেননা এতে রিয়ার সম্ভাবনা নেই। এবং কেউ কেউ বলেন প্রকাশ্যে করাটা উত্তম যাতে একে অনুসরণ করে অন্যান্যরা ইবাদত করে। আবার কেউ কেউ বলেন ফরয ইবাদতসমূহ গোপনে করার চেয়ে প্রকাশ্যে করাটা ভাল।

৩নং আপত্তি ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

(হে মাহবুব, আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আমিতো নিকটেই। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে, আমি তার আহবানে সাড়া দেই।) এ আয়াতে করীমা থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকটেই আছেন, আমাদের মনের চিন্তাধারা ও অনুচ্চ কথাবার্তা শোনেন। তাই উচ্চস্বরে আহবান করাটা অনর্থক।

উত্তর- এ আয়াতে করীমায় ওসব লোকদের ধারণাকে বাতিল বলা হয়েছে, যারা মনে করে যে আল্লাহ আমাদের থেকে অনেক দূরে এবং উচ্চস্বরে যিক্র না করলে তিনি শুনতে পান না। এটা নিছক অজ্ঞতা মাত্র। উচ্চস্বরে যিক্র করা হয় অমনোযোগী আত্মাকে মনোযোগী করার জন্য। তফ্সীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে-

وَسَبَبُ نُزُوْلِهٖ مَارُوِىَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَرِيْبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيْهِ اَمْ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيْهِ فَقَالَ تَعَالٰى.

(এ আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছে জনৈক বেদুঈন হুযুর আলাইহিস সালামের সমীপে আরয করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি নিকটে যেন তাঁর কাছে মুনাজাত করা যায়, নাকি দূরে যে তাঁকে ডাকতে হবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি ইরশাদ ফরমান) এর থেকে বোঝা গেল যে আল্লাহকে দূরে মনে করে ডাকা পাপ। আর এক রিওয়ায়েত মতে এ আয়াতটি খাইবর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে যখন সাহাবায়ে কিরাম নারায়ে তকবীর দিতে চেয়েছিলেন। হুযুর আলাইহিস সালামের ইচ্ছা ছিল যে ওখানে গোপনে প্রবেশ করা, যাতে কাফিরগণ টের না পায়। যেমন তফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখিত আছে-

قَالَ اَبُوْمُوْسَى الْاَشْعَرِىُّ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى خَيْبَرَ اَشْرَفَ النَّاسُ عَلٰى وَادٍ فَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ لَاتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَاغَائِبًا.

যখন হুযুর আলাইহিস সালাম খাইবরের পথে ধাবিত হলেন, সাথীরা একটি উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করে উচ্চস্বরে নারায়ে তকবীর দিলেন, তখন হুযুর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- নিজেদের প্রতি একটু সহানুভূতি কর। তোমরাতো কোন বধির বা দূরের কাউকে ডাকছ না। রূহুল বয়ানে আরও বর্ণিত আছে-

هٰذَا بِاِعْتِبَارِ الْمَشَارِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْاَلْيَقُ بِحَالِ اَهْلِ الْغَفْلَاتِ الْجَهْرُ بِقَلْعِ الْخَوَاطِرِ.

অর্থাৎ এটা অবস্থা ও স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। খারাপ চিন্তাধারাকে দূরীভূত

করার জন্য অমনোযোগী লোকেদের অবস্থানুযায়ী উচ্চস্বরে যিক্‌র করা যায়।

৪নং আপত্তি ঃ মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল আস্‌মা ثواب التسبيح والتحميد অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ بِالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَاَيُّهَاالنَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا،بَصِيْرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِىْ تَدْعُوْنَهُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهٖ.

(যখন উচ্চস্বরে তকবীর দিতে লাগলেন, তখন হুযূর আলাইহিস সালাম ইরশাদ ফরমান- হে লোক সকল, নিজেদের জানের প্রতি সহানুভূতি কর। তোমরাতো কোন বধির বা দূরবর্তী কাউকে ডাকছ না তোমরাতো শ্রবণকারী ও অবলোকনকারীকে ডাকছ, আর তিনিতো তোমাদের নিকটেই আছেন এবং যাকে তোমরা ডাকছ, তিনিতো তোমাদের সওয়ারীর ঘাড়ের থেকেও নিকটতর) বোঝা গেল, উচ্চস্বরে যিক্‌র নিষেধ এবং এ ব্যাপারে হুযূর আলাইহিস সালাম অসন্তুষ্ট।

উত্তর ঃ এর জবাব ২নং আপত্তির উত্তরে দেয়া হয়েছে। এ হাদীছটি এক যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে বর্ণিত হয়েছে। ওই সময় মুসলিম সৈনিকদের প্রয়োজন ছিল সংগোপনে খাইবরে প্রবেশ করা, যাতে খাইবরের কাফিরেরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে না পারে। কিন্তু কতেক লোকের উচ্চস্বরে তকবীর বলাটা অবস্থানুকূল্যে ছিল না, তাই বারণ করা হয়েছে। এ হাদীছের শুরু এভাবে ছিল-

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ وَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُوْنَ.

(আমরা হুযূর আলাইহিস সালামের সাথে সফরে ছিলাম। তখন লোকেরা উচ্চস্বরে তকবীর বলছিল) অথ বা মুসলমানদের আসানীর জন্য পরামর্শ স্বরূপ এ রকম বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা সফরের কষ্ট ভোগ করছ ; এর উপর আবার শ্লোগান দেয়ার কষ্টটাও করছ। এর কী প্রয়োজন আছে ? লুমআত গ্রন্থে এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

فِيْهِ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْمَنْعَ مِنَ الْجَهْرِ لِلتَّيْسِيْرِ وَالْاِرْفَاقِ لَا لِكَوْنِ الْجَهْرِ غَيْرَ مَشْرُوْعٍ.

এ হাদীছে ওই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে উচ্চস্বরের এ নিষেধাজ্ঞা কেবল আসানীর জন্য করা হয়েছে ; উচ্চস্বর নিষিদ্ধ বলে নয়। আশআতুল লুমআতে এ হাদীছ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

دریں اشارت است کہ منع از جہر برائے آسانی ونرمی است نہ از جہت نامشروعیت ذکر جہروحق آنست ذکرجہر مشروع است بے شبہ مگر بعارض ایں رادر رسالہ اور اواثبات نمودیم-

এ হাদীছে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে উচ্চস্বরের বেলায় নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন সহজ ও আসানীর জন্য করা হয়েছে ; উচ্চস্বরে যিক্‌র নিষিদ্ধ বলে নয়। এবং হক কথা হলো যে উচ্চস্বরে যিক্‌র নিঃসন্দেহে বৈধ , যদি অন্য কোন কারণ না থাকে। আমি এর প্রমাণ 'রিসালায়ে আওরায়ে' দিয়েছি।

৫ নং আপত্তি ঃ হিদায়া শরীফের প্রথম খণ্ড تكبيرات التشريق শীর্ষক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত আছে-

وَاَخَذَ بِقَوْلِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَخْذًا بِالْاَقَلِّ لِاَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيْرِ بِدْعَةٌ.

(কুরবানীর ঈদে তকবীর বলার ক্ষেত্রে) ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) সৈয়্যদুনা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর উক্তিকে গ্রহণ করেছেন কম সময় হওয়ার কারণে। কেননা উচ্চস্বরে তকবীর বলা বিদ্‌আত আর বিদ্‌আত কম হওয়াই ভাল। ইমাম আবু হানীফা(রাঃ)এর মতে যিলহজ্জমাসের নয় তারিখের ফজর থেকে দশ তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাজের পর তকবীরে তশরীক বলা চাই। সাহেবাইনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) মতে নয় তারিখের ফজর থেকে তের তারিখের আসর পর্যন্ত তকবীর বলা চাই। ইমাম আবু হানীফা সাহেবের বক্তব্য হলো উচ্চস্বরে যিক্‌র করা বিদ্‌আত। সেই হিদায়ার সেই পরিচ্ছেদে আরও উল্লেখিত আছে-

وَلِاَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيْرِ خِلَافُ السُّنَّةِ وَالشَّرْعُ وَرَدَبِهٖ عِنْدَ اِسْتِجْمَاعِ هٰذِهِ الشَّرَائِطِ.

এ জন্যে যে, উচ্চস্বরে তকবীর বলা সুন্নাতের খেলাপ এবং এ সমস্ত শর্তাবলী

একত্রিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই এ হুকুম দেয়া হয়েছে।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) ও সাহেবাইনের মধ্যে মতভেদের কারণ হচ্ছে তকবীরে তশরীক ওয়াজিব হওয়া নিয়ে, বৈধতা নিয়ে নয়। অর্থাৎ ইমাম সাহেব (রাঃ) বলেন কেবল দু'দিন আর সাহেবাইন বলেন পাঁচ দিন। ইমাম সাহেব একে বিদ্‌আত বা সুন্নাতের খেলাফ বলে ওয়াজিব হওয়াটাকে অস্বীকার করেছেন। আমি এ আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অধ্যায়ে ফাত্‌ওয়ায়ে শামীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি যে স্বয়ং ইমাম সাহেব (রাঃ) কুফা বাসীদেরকে বাজারসমূহে নারায়ে তকবীর বলার অনুমতি দিয়েছেন। বলুন, এ বিদ্‌আতের অনুমতি কেন দিলেন? ফাত্‌ওয়ায়ে শামীর صلوة العيدين অধ্যায়ে عيد الفطر শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَالْخِلَافُ فِى الْاَفْضَلِيَّةِ اَمَّا الْكِرَاهَةُ فَمُنْتَفِيَةٌ عَنِ الطَّرْفَيْنِ.

অর্থাৎ মতপার্থক্যটা হচ্ছে কেবল আফযল হওয়া নিয়ে; কেউ মাকরূহ বলার পক্ষপাতি নন। একই জায়গায় শামীতে আরও বর্ণিত আছে-

اَلتَّكْبِيْرُ بِالْجَهْرِ فِىْ غَيْرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَا يَسَنَّ اِلَّا بِاِزَاءِ الْعَدُوِّ اَوِاللُّصُوْصِ وَقَاصَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمُ الْحَرِيْقَ وَالْمَخَاوِفَ كُلَّهَا زَادَ الْقُهُسْتَانِىْ اَوْعَلَا شَرَفًا.

আইয়ামে তশরীক ব্যতীত অন্যান্য সময় উচ্চস্বরে তকবীর বলা সুন্নাত নয়। অবশ্য দুশমন, বা চোরের মুকাবিলায় এবং এর উপর কিয়াস করে কতেক লোক অগ্নিকাণ্ডে ও অপরাপর সমস্ত ভয়াবহ অবস্থায় তকবীর বলতে বলেছেন। ইমাম কুহ্‌সেতানী (রহঃ) উচ্চ জায়গায় আরোহণ করার সময়ও তকবীর বলতে বলেছেন।

দুর্রুল মুখতারে العيدين শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَهٰذَا لِلْخَوَاصِ اَمَّاالْعَوَامُ فَلَا يُمْنَعُوْنَ عَنْ تَكْبِيْرٍ وَلَا تَنَفُّلٍ اَصْلًا.

এ হুকুমটা হচ্ছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। সাধারণ লোকদেরকে তকবীর ও নফল থেকে বাধা দিও না।

একই অধ্যায়ে শামীতে বর্ণিত আছে -

لَافِى الْبَيْتِ اَىْ لَا يُسَنُّ وَاِلَّافَهُوَ ذِكْرٌ مَشْرُوْعٌ

অর্থাৎ এটা প্রমাণিত হলো যে হিদায়া গ্রন্থের এ সমস্ত আলোচনা সুন্নাত হওয়া নিয়ে, জায়েয হওয়া নিয়ে নয়। অধিকন্তু তকবীর তশরীকের ক্ষেত্রে সাহেবাইনের উক্তি

অনুযায়ী ফত্‌ওয়া দেয়া হয়েছে। আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে মওলবী রশীদ আহমদ সাহেবের ফাত্‌ওয়া হচ্ছে উচ্চস্বরে যিক্‌র জায়েয। আর যদি উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছসমূহের এরূপ ব্যাখ্যা করা না হয়, তাহলে এগুলো তাদেরও বিপরীত হবে। কেননা তারাও কতেক যিক্‌র উচ্চস্বরে করে থাকে। যেমন আযান, কুরবানী ঈদের সময় তকবীরে তশরীক, হজ্বের সময় তলবিয়া (লাব্বাইকা), সভার সময় নারায়ে তকবীর ও অমুখ সাহেব জিন্দাবাদ ইত্যাদি বলা। কারণ উপরোক্ত দলীল সমূহতো উচ্চস্বরে যিক্‌রকে সাধারণভাবে নিষেধ করে, আর একক হাদীছ দ্বারা কুরআনের আয়াতে শর্তারোপ করা জায়েয নেই। সুতরাং এটা বলার কোন অবকাশ নেই যে এ সমস্ত জায়গায় উচ্চস্বরে যিক্‌র করার কথা যেহেতু হাদীছ শরীফে উল্লেখিত আছে, তাই জায়েয। হাদীছের দ্বারা কুরআনের আয়াতের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করা জায়েয নেই।

৬নং আপত্তিঃ ফাত্‌ওয়ায়ে বযাযিয়ার ৩৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

عَنْ فَتَاوٰى الْقَاضِىْ اَنَّهٗ حَرَامٌ لِمَا صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ اَخْرَجَ جَمَاعَةً عَنِ الْمَسْجِدِ يُهَلِّلُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهْرًا وَقَالَ لَهُمْ مَا اَرَاكُمْ اِلَّا مُبْتَدِعِيْنَ.

ফাত্‌ওয়ায়ে কাযী খাঁ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে উচ্চস্বরে যিক্‌র করা হারাম। কেননা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ থেকে বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি একদল লোককে মসজিদ থেকে কেবল এজন্যই বের করে দিয়েছেন, তারা উচ্চস্বরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও হুযূর (দঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করছিল এবং বলেছেন আমি তোমাদেরকে বিদ্‌আতী মনে করি।) দেখুন, সদলবলে উচ্চস্বরে যিক্‌র করা ও দরূদ শরীফ পড়া হারাম এবং হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) ওই সমস্ত যিক্‌রকারী ও দরূদ পাঠকারীগণকে বিদ্‌আতী বলেছেন বরং তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস। আজকাল উচ্চস্বরে যিক্‌র করতে অনিচ্ছুকদেরকে ওহাবী বলা হয়। এটা কালের বিবর্তনের ফল ঈমান কুফরী হয়ে গেছে আর কুফরী ঈমান (রাহে সুন্নাত)।

উত্তরঃ এর দু'টি উত্তর আছে- ইলযামী ও হাকীকী। ইলযামী উত্তর হলো তাহলে আপনারাও বিদ্‌আতী ও হারামের অনুসারী হয়ে গেছেন। কেননা আপনাদের দ্বীনি ও রাজনৈতিক সভা হয়ে থাকে এবং বক্তৃতার সময় নারায়ে তক্‌বীর ও অমুক সাহেব জিন্দাবাদ বলে থাকেন আর এ সব সভা রাতদিন মসজিদ সমূহে হয়ে থাকে। কৈ আপনারাতো এসব উচ্চস্বরে যিক্‌রের বেলায় না ফাত্‌ওয়া দেন, না ওদেরকে বাধা দেন?

শুধু উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পড়াটা হারাম, অথচ আপনাদের সভা সমিতির শ্লোগান ইত্যাদি জায়েয।

হাকীকী উত্তরটা হলো বিরোধিতাকারীরা ফত্ওয়ায়ে বযাযিয়া ও শামীর যেই অংশটুকু তাদের সমর্থনে উদ্ধৃত করেছে, আর যেই অংশটুকু বাদ দিয়েছে, যদি তা না করে সম্পূর্ণ ইবারতটা উদ্ধৃত করতো, তাহলে এর উত্তর ওই কিতাবদ্বয়েই পাওয়া যেত। দেখুন একই জায়গায় শামীতে উল্লেখিত আছে-

وَاَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِزٌ كَمَا فِىْ اَذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَالْجُمْعَةِ وَالْحَجِّ وَقَدْ حُرِّرَتِ الْمَسْئَلَةُ فِى الْخَيْرِيَةِ وَحُمِلَ مَافِىْ فَتَاوٰى الْقَاضِىْ عَلٰى جَهْرِ الْمُضِرِّ.

উচ্চস্বরে যিক্‌র করা জায়েয, যেমন আযান, জুমার খুতবা ও হজ্বে হয়ে থাকে। এবং এ মাসআলাটা ফাত্ওয়ায়ে খাইরিয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ফাত্ওয়ায়ে কাজী খাঁয় যেটা বলা হয়েছে, সেটার দ্বারা ক্ষতিকর উচ্চস্বরকে বোঝানো হয়েছে।)

প্রমাণিত হলো যে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) ওই সমস্ত লোকদেরকে বিদ্আতী বলেছেন, যারা অন্যান্য লোকদের প্রথম জামাতের নামায পড়ার সময় উচ্চস্বরে যিক্‌র করতো। যার ফলে নামাযের ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো বা অন্য কোন ধর্মীয় ক্ষতি ছিল। মোট কথা হলো ক্ষতিকর যিক্‌র নিষিদ্ধ। এবার ফাত্ওয়ায়ে বযাযিয়াটাও একটু দেখুন। এখানে হযরত ইবনে মসউদের হাদীছটা উদ্ধৃত করে উত্থাপিত একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে- যদি আপনারা বলেন যে ফাত্ওয়ায়েতো আছে উচ্চস্বরে যিক্‌র থেকে কাউকে বাধা দিও না, যদিওবা তা মসজিদে করা হয়, যাতে কুরআনের সেই আয়াতের বিপরীত হয়ে না যায়-

مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ الخ.

(যে কেউ আল্লাহর মসজিদ সমূহে তাঁর যিক্‌র করতে বাধা প্রদান করে ও ওদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয়, তার অপেক্ষা বড় জালিম কে হতে পারে?) অথচ হযরত ইবনে মসউদের আমল আপনাদের এ ফাত্ওয়ার বিপরীত। এর উত্তরে যা বলা হয়েছে, তাতে এও রয়েছে-

اَلْاِخْرَاجُ عَنِ الْمَسْجِدِ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ لِاعْتِقَادِهِمُ الْعِبَادَةَ فِيْهِ وَلِيُعَلِّمَ النَّاسَ بِاَنَّهٗ بِدْعَةٌ وَالْفِعْلُ جَائِزٌ وَالْجَائِزُ يَجُوْزُ اَنْ

www.AmarIslam.com

يَكُوْنَ غَيْرَ جَائِزٍ لِغَرَضٍ يَلْحَقُهٗ.

তাঁর পক্ষে ওদেরকে মসজিদ থেকে বের করা ন্যায়সঙ্গতঃ ছিল এজন্য যে ও সব লোকের আকীদা হলো- এ উচ্চস্বরটাও ইবাদত এবং লোকদেরকে এটা জানানো যে এ আকীদাটা বিদ্আত। জায়েয কাজ কোন কোন সময় বৈপত্তিক কারণে নাজায়েয হয়ে যায়। এই ফত্ওয়ার সেই একই জায়গায় সুস্পষ্ট উল্লেখিত আছে-

وَاَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِزٌ كَمَا فِى الْاَذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَالْحَجِّ.

(উচ্চস্বরে যিক্‌র জায়েয আছে যেমন আযান, খুতবা ও হজ্জে করা হয়।)

যুক্তি গত আপত্তি সমূহঃ বিরোধিতাকারীগণ কেবল তিনটি যুক্তিগত আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন। প্রথমটা হচ্ছে খোদা আমাদের সন্নিকটেই আছেন। তাহলে জোরে চিৎকার করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? এর উত্তর ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে যে, উচ্চস্বরে করাটা আল্লাহকে শোনানোর জন্য নয় বরং অন্যান্য উপকারের জন্য করা হয়, যেমন আযান ইত্যাদি উচ্চস্বরে দেয়া হয়। দ্বিতীয়টা হচ্ছে এ দরূদ শরীফটা হাদীছ থেকে প্রমাণিত নেই তাই নাজায়েয। এর উত্তরও এ কিতাবের অন্যত্র দেয়া হয়েছে যে অষুধ, খাদ্য ও দুআর ক্ষেত্রে অবিকল অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই বরং যেটা নাজায়েযের পর্যায় পড়বে না, সেটা জায়েয।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বিশেষ করে কোন্ দরূদ শরীফ আফযল, তা জানতে চাইলে, আমার কিতাব 'শানে হাবীবুর রহমান' দেখুন। তৃতীয়টা হচ্ছে নামাযের পর উচ্চস্বরে যে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তাতে নামাযীদের অসুবিধা হয়, নামায ভুলে যায়। তাই উচ্চস্বরে দরূদ পড়া নাজায়েয।

উত্তরঃ এর কয়েকটি উত্তর দেখা যায়। **প্রথমতঃ** এ আপত্তিটা বক্তব্য অনুযায়ী হয়নি। কেননা আপনারা বলেন যে, উচ্চস্বরে যিক্‌র করা একেবারে নিষেধ। কিন্তু আপনাদের এ আপত্তি থেকে প্রতিভাত হয় যে এর দ্বারা যদি কোন নামাযীর অসুবিধা হয় তাহলে নাজায়েয, অন্যথায় জায়েয। তাহলে যখন নামাযরত কেউ না থাকে, তখন জ ায়েয হওয়া চাই।

দ্বিতীয়তঃ পাঞ্জাবে দেখা যায় যে ফজর নামাযের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং ইশার নামাযের সময় সুন্নাত ও বিতর পড়ার পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা হয় এবং ওই সময় সব লোক নামায থেকে ফারেগ হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ আমি এ আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে এ ধরনের হাদীছ সমূহ উপস্থাপন করেছি যে হুযূর আলাইহিস সালাম ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাহাবায়ে কিরাম নামাযের পর উচ্চস্বরে যিক্‌র করতেন। অধিকন্তু এখনও অনেক মসজিদকে হিফজখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেখানে ছাত্ররা জোহর ও ইশার নামাযের পর জোরগলায় কুরআন মুখস্থ করে। কোন কোন সময় ইশার নামাযের পর মসজিদে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যেখানে নারায়ে তকবীর দেয়া হয় ও বক্তৃতা করা হয়। কুরবানী ঈদের সময় ফরয নামাযের জামাত শেষ হবার সাথে সাথে উপস্থিত সকলে উচ্চস্বরে তিনবার তক্‌বীরে তশরীক বলে। বলুন, এ সব যিক্‌রের ফলে নামাযীর ধ্যান ভঙ্গ হয় কিনা? এবং এটা জায়েয কি নিষেধ? ফকীহগণ যে বলেন উচ্চস্বরে যিক্‌র দ্বারা নামাযীদের অসুবিধা হেতু নিষেধ এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। যখন জমাতের সময় লোকেরা নামাযে মশগুল, তখন যদি উচ্চস্বরে যিক্‌র করা হয়, তা নিশ্চয় নিষেধ হবে। কিন্তু নামায হয়ে গেলে পর যিক্‌র বা তিলাওয়াত করা জায়েয। কিন্তু কোন ব্যক্তি জামাত শেষ হবার পরে এসে নামায পড়ার বাহানায় সবাইকে যদি নিশ্চুপ করানোর উদ্দেশ্যে বলে-হে নামাযী ভাইসব, হে কুরআন তিলাওয়াত কারীগণ, হে যিক্‌রকারীগণ, হে বক্তাগণ আপনারা সবাই নীরব হোন, আমাকে নামায পড়তে হবে; এ ধরনের কথার প্রতি কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজন নেই।

জেনে রাখা দরকার যে মসজিদ সমূহে প্রথম জামাতের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে শরীয়তের অনেক মাসায়েল রয়েছে। মক্কা শরীফে কেবল প্রথম জামাতের সময় তওয়াফ বন্ধ থাকে। জামাত শেষ হবার সাথে সাথে তওয়াফ শুরু হয়ে যায়। তওয়াফের সময় দুআর শোরগোল এ রকম হয়ে থাকে যে কানফাটা আওয়াজও শোনা যায় না। বলুন ওখানে এ উচ্চস্বরে যিক্‌রের কি হুকুম হতে পারে? নামাযীদের অসুবিধার কারণে কি তওয়াফ বন্ধ করাবে?

আওলিয়া কিরামের নামে পশুপালন

নিয়মিতভাবে গেয়ারবী শরীফ ও মীলাদ শরীফ পালনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এ উদ্দেশ্যে কিছু দিন আগে থেকেই ছাগল, মোরগ ইত্যাদি পালন করে এবং এগুলোকে হৃষ্টপুষ্ট করে। ফাতিহার তারিখে এ গুলোকে আল্লাহর নামে যবেহ করে খাবার তৈরী করে ফাতিহা দেয়া হয় এবং গরীব ও নেকবান্দাদেরকে খাওয়ানো হয়। যেহেতু পশুটা সেই উদ্দেশ্যে পালন করা হয়েছে, সেহেতু গেয়ারবী শরীফের ছাগল, গাউছে পাকের গরু ইত্যাদি বলে দেয়া হয়। শরীয়ত মতে এটা হালাল যেমন ওলীমার পশু। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীগণ এ কাজকে হারাম, মাংসকে মৃতপশুর মাংসতুল্য এবং এ কাজ যিনি করেন, তাঁকে ধর্মদ্রোহী ও মুশরিক বলে। তাই এ আলোচনাকেও দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এর বৈধতার প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

এর বৈধতার প্রমাণ

মুসলমান বা আহলে কিতাব যে হালাল পশু আল্লাহর নামে যবেহ করে, তা হালাল এবং মুশরিক বা মুরতেদ যে হালাল পশু যবেহ করে, তা মৃততুল্য অর্থাৎ হারাম। অনুরূপ যদি কোন মুসলমান ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ না বলে বা খোদা ভিন্ন অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করে, (যেমন বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর বলার পরিবর্তে এয়া গাউছ বলে যবেহ করে) তাহলে হারাম হবে। লক্ষ্যণীয় যে এ হালাল হারামটা সাব্যস্ত হচ্ছে যবেহকারী অনুসারে, মালিক অনুসারে নয়। যদি কোন মুসলমানের পশু কোন মুশরিক যবেহ করে দিল, তাহলে মৃত সদৃশ বা নাপাক হয়ে গেল। আর যদি কোন মুশরিক দেবতার নামে কোন পশু পালন করলো কিন্তু কোন মুসলিম একে 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর' বলে যবেহ করে দিল, তাহলে সেই পশুর মাংস হালাল হবে। এখানেও যবেহ করার সময় নাম নেওয়াটাই বিবেচ্য; আগে পিছের কথা ধর্তব্য নয়। পশু দেবতার নামে পালন করা হয়েছিল কিন্তু যবেহ করা হয়েছে খোদার নামে, হালাল হবে। আর পশুটা কুরবানীর জন্য রাখা হয়েছিল কিন্তু যবেহ করার সময় অন্য নাম নেওয়া হলো, সেটা মৃত সদৃশ অর্থাৎ হারাম হবে। কুরআন করীম তাই ইরশাদ করেছেন- وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ (সে পশু হারাম, যেটাকে খোদা ভিন্ন অন্য নামে ডাকা হয়।) এখানে ডাকা শব্দের দ্বারা যবেহ করার সময় ডাকাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন তফসীরে আহমদীতে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে –

اَیْ رُفِعَ الصَّوْتُ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهٖ كَقَوْلِهِمْ بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى عِنْدَ ذَبْحِهٖ.

(ওই পশুর বেলায় গায়রুল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, যেমন কাফিরগন যবেহ করার সময় লাত ও উযযার (দেবতা) নাম নিত। (তফসীরে জালালাইনে এ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে- بِاَنْ ذُبِحَ عَلٰى اِسْمِ غَيْرِهٖ (এ রকমই, যেমন খোদা ভিন্ন অন্য নামে যবেহ করা হয়।) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরে খাযেনে বর্ণিত আছে-

يَعْنِىْ مَاذُكِرَ عَلٰى ذَبْحِهٖ غَيْرُ اِسْمِ اللّٰهِ وَذَالِكَ اَنَّ الْعَرَبَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَذْكُرُوْنَ اَسْمَاءَ اَصْنَامِهِمْ عِنْدَ الذَّبْحِ فَحَرَّمَ اللّٰهُ ذَالِكَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وَبِقَوْلِهٖ وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ সে পশু হারাম, যেটার যবেহের সময় খোদা ভিন্ন অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে এবং এটা এ জন্য যে আইয়ামে জাহিলিয়াতে আরববাসীরা যবেহ করার সময় মূর্তিদের নাম নিত। তাই আল্লাহ তা'আলা ওটাকে এ আয়াত ও وَلَا تَاكُلُوْا আয়াত দ্বারা হারাম বলেছেন।

তফসীরে কবীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ عِنْدَ الذَّبْحِ بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَحَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذَالِكَ.

আরবের অধিবাসীগণ যবেহ করার সময় বলতো- বিসমে লাত ওয়াল উযযা (লাত উযযার নামে)। সুতরাং আল্লাহু তা'আলা ওটাকে হারাম বলেছেন-

তাফসীরাতে আহমদীয়ায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছে-

مَعْنَاهُ مَاذُبِحَ بِهٖ لِاسْمِ غَيْرِاللّٰهِ مِثْلُ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى وَاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ.

এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ওটাকে খোদা ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলোকে দেবতার নামে যবেহ করা হত।

এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে তফসীরে মাদারেকে বলা হয়েছে-

اَىْ ذُبِحَ لِلْاَصْنَامِ فَذُكِرَ عَلَيْهِ غَيْرُ اسْمِ اللّٰهِ اَىْ رُفِعَ بِهٖ

الصَّوْتُ لِلصَّنَمِ وَذَالِكَ قَوْلُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى.

অর্থাৎ দেবতাদের জন্য যে পশু যবেহ করা হয়, সেটা হারাম। সুতরাং ওটার উপর গায়রুল্লাহর নাম নেয়া মানে দেবতাকে ডাকা হয়েছে। এটা ছিল জাহেলিয়াত যুগের লোকদের কথা- 'বিসমে লাতে ওয়াল উয্যা'।

তাফসীরে লবাবুত তাবিলে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

يَعْنِىْ مَا ذُبِحَ لِلْاَصْنَامِ وَالطَّوَاغِيْتِ وَاَصْلُ الْاِهْلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ وَذَالِكَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ اَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِ اٰلِهَتِهِمْ اِذَا ذَبَحُوْهَا.

অর্থাৎ যা দেবতা ও উপাস্যদের জন্য যবেহ করা হয়েছে এবং ডাকার মূল হচ্ছে আওয়াজ করা। ওরা (জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা) যবেহ করার সময় তাদের দেবতাদের নাম উল্লেখ করে ডাক দিত। তফসীরে হুসাইনিতে এ আয়াতের বিশ্লেষণে বর্ণিত আছে-

وآنچه آواز برآورده شود بغیرالله از برائے غیر خدا
براں در وقت ذبح آں یعنی بنام بتاں بکشند

যবেহ করার সময় গায়রুল্লাহর নাম ডাকা হয়েছিল অর্থাৎ দেবতাদের নামে ডাক দেয়া হয়েছিল।

উপরোক্ত তফসীর সমূহের ইবারত থেকে বোঝা গেল যে, উক্ত আয়াতে مَا اُهِلَّ (মা উহিল্লা) দ্বারা যবেহ করার সময় খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং পশুর জীবিতাবস্থায় কারো প্রতি উৎসর্গ করাটা এখানে ধর্তব্য নয়। এবার ফকীহগণের উক্তিসমূহ পেশ করছি। তফসীরাতে আহমদীয়ায় আয়াত وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে-

وَمِنْ هٰهُنَا عُلِمَ اَنَّ الْبَقَرَةَ الْمَنْذُوْرَةَ لِلْاَوْلِيَاءِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِىْ زَمَانِنَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لِاَنَّهٗ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ غَيْرِاللّٰهِ وَقْتَ الذَّبْحِ وَاِنْ كَانُوْا يَنْذُرُوْنَهَا.

এ থেকে বোঝা গেল- যে গাভী আল্লাহর ওলীদের নামে মানত করা হয়েছে যেমন

আমাদের যুগে প্রচলিত আছে, তা হালাল, পবিত্র। কেননা এটা যবেহ করার সময় গায়রুল্লাহর নাম নেয়া হয়নি যদিওবা এটা মানতকৃত। এ ইবারতে গেয়ারবী শরীফের নামে পশু পালন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট রায় পাওয়া গেল। এ কিতাবের লিখক মৌলানা আহমদ জিয়ুন (রহঃ) এক জন বড় বুযুর্গ, যিনি আরব আযমের উলামায়ে কিরামের উস্তাদ। দেওবন্দীরাও তাঁকে মান্য করে। ফাত্ওয়ায়ে শামীর الذبح। শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

إِعْلَمْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ عِنْدَ إِبْتِدَاءِ الذَّبْحِ.

(জেনে রাখা দরকার যে হালাল-হারামটা যবেহ করার সময় নিয়তের উপর নির্ভরশীল।) সুস্পষ্ট বোঝা গেল যে, যবেহ করার আগের নিয়ত বা নাম মোটেই বিবেচ্য নয়। ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরি الذبح। শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

مُسْلِمٌ ذَبَحَ شَاةَ الْمَجُوسِى لِبَيْتِ نَارِهِمْ أَوْ بِكَافِرٍ لِآلِهَتِهِمْ تُؤْكَلُ لِأَنَّهُ سَمَّى اللّٰهَ تَعَالٰى وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ كَذَا فِى التَّتَارِ خَانِيَةِ نَاقِلاً عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوٰى.

কোন মুসলমান, অগ্নি উপাসকের সেই গাভী, যেটা ওদের অগ্নি পূজার জন্য ছিল বা কাফিরের যেটা ওদের দেবতার নামে ছিল, যবেহ করলো, ওটা হালাল হবে। কেননা সেই মুসলমান আল্লাহর নাম নিয়েছে। অবশ্য মুসলমানদের জন্য এ ধরনের কাজ মাকরূহ। ফাত্ওয়ায়ে তাতার খানীতে জামেউল ফাত্ওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। দেখুন উক্ত পশুপালনকারী কাফির এবং যবেহটাও করানো হয়েছে দেবতা বা অগ্নি পূজার নিয়তে। মালিকের পালন ও যবেহ করানো উভয়টা অবৈধ। কিন্তু যেহেতু যবেহের সময় সেই মুসলমান আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করেছে, সেহেতু পশুটা হালাল। বলুন, গেয়ারবী শরীফ বা মীলাদ শরীফের গরু সেই মূর্তি পূজারীর, গরু থেকেও কি নিকৃষ্ট? ওটা হালাল হলে এটা কিভাবে হারাম হতে পারে? খোদার শুকর, নিখুঁতভাবে প্রমাণিত হলো যে গেয়ারবী শরীফ ইত্যাদির গরু ছাগল হালাল এবং এটা ছওয়াবের কাজ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আওলিয়া কিরামের নামে পালিত পশু সম্পর্কিত আপত্তিসমূহ ও এর জবাব

১নং আপত্তিঃ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ এ আয়াতে أُهِلَّ শব্দটি إِهْلَالٌ থেকে গঠন করা হয়েছে এবং এর আভিধানিক অর্থ যবেহ করার সময় ডাকা নয় বরং যে কোন সময় ডাকা। সুতরাং যে পশুকে জীবিতাবস্থায় বা যবেহ করার সময় খোদা ভিন্ন অন্য কারো নামে সম্বোধন করা হয়, সে পশু মৃত তুল্য তথা হারাম। তাই গাউছে পাকের নামে পালিত গরু বা শেখ সদ্দুকীর নামে পালিত গাভী যদিওবা খোদার নামে যবেহ করা হয়, হারাম হবে।

(এ আপত্তিটা মূলতঃ হযরত শাহ আবদুল আযীযের (কুঃ সিঃ)। তিনি এ মাস্আলায় মারাত্মক ভুল করেছেন।)

উত্তরঃ إِهْلَالٌ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে যে কোন সময় ডাকা। কিন্তু প্রচলিত অর্থ হচ্ছে-যবেহ করার সময় ডাকা। এ আয়াতে প্রচলিত অর্থ বোঝানো হয়েছে। صَلٰوةٌ এর শাব্দিক অর্থ-যে কোন দুআ কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ হলো নামায। أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ। (নামায কায়েম কর) বলতে ফরয নামায বোঝাবে, সাধারণ দুআ নয়। তফসীরে কবীরে এ আয়াতে ব্যবহৃত مَا أُهِلَّ এর প্রেক্ষিতে বর্ণিত আছে-

اَلْاِهْلَالُ رَفْعُ الصَّوْتِ هٰذَا مَعْنَى الْاِهْلَالِ فِى اللُّغَةِ ثُمَّ قِيْلَ لِلْمُحْرِمِ.

إِهْلَالٌ এর অর্থ হচ্ছে আওয়াজ বড় করা (ডাকা)। এটা হচ্ছে শাব্দিক অর্থ। অতঃপর মোহরমকে বলা হয়েছে ....!) অনুরূপ বয়যাবী শরীফের হাশিয়ায় (শিহাব লিখিত) একই আয়াতে مَا أُهِلَّ এর, প্রেক্ষিতে উল্লেখিত আছে-

أَىْ رُفِعَ بِهِ الصَّوْتُ الخ هٰذَا أَصْلُهُ ثُمَّ جُعِلَ عِبَارَةً عَمَّا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ সেটাকে ডাকা হয়েছিল- এটা হলো إِهْلَالٌ এর শাব্দিক অর্থ। অতঃপর أُهِلَّ শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে সেই পশু যেটা খোদা ভিন্ন অন্য নামে যবেহ করা হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি এখানে اِهْلاَلٌ এর শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে এতে কয়েকটি বৈপরীত্যের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রথমতঃ এ ব্যাখ্যা তাফ্সীরকারকদের সর্বসম্মত অভিমত ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তিসমূহের বিপরীত হবে। তাফ্সীরকারকদের অভিমত আমি প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। এখন সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যদের বক্তব্য নিরীক্ষণ করুন। তাফসীরে দুর্রে মন্সুরে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে-

اَخْرَجَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَا اُهِلَّ الاية قَالَ ذُبِحَ وَاَخْرَجَ اِبْنِ جَرِيْرٍعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا اُهِلَّ يَعْنِىْ مَااُهِلَّ لِلطَّوَاغِيْتِ وَاَخْرَجَ اِبْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَا اُهِلَّ قَالَ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِاللّٰهِ وَاَخْرَجَ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ وَمَا اُهِلَّ يَقُوْلُ مَاذُكِرَ عَلَيْهِ اِسْمُ غَيْرِاللّٰهِ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে মুনযার হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে وَمَااُهِلَّ الاية এর অর্থ করেছেন -'যা যবেহ করা হয়েছে এবং হযরত ইবনে জরির হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে وَمَا اُهِلَّ এর অর্থ করেছেন "যা উপাস্যদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।" হযরত আবি হাতেম হযরত মুজাহিদ এর বরাত দিয়ে مَااُهِلَّ এর অর্থ করেছেন- যেটা খোদা ভিন্ন অন্য নামে যবেহ করা হয় এবং হযরত আবি হাতেম (রাঃ) হযরত আবি আলিয়া এর বরাত দিয়ে এর অর্থ করেছেন- ওটার উপর খোদা ভিন্ন অন্য যেই নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তফসীরে মুজহেরীতে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে উল্লেখিত আছে।

قَالَ الرَّبِيْعُ اِبْنُ اَنَسٍ يَعْنِىْ مَاذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهٖ اِسْمُ غَيْرِاللّٰهِ.

রবী ইবনে আনস (রাঃ) বলেছেন যবেহ করার সময় খোদা ভিন্ন যে নাম উল্লেখিত হয়েছে। উপরোক্ত ইবারত থেকে বোঝা গেল যে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের ভাবার্থ হলো খোদা ভিন্ন অন্য নামে যবেহ করা।

দ্বিতীয়তঃ তাদের নির্বাচিত এ অর্থ স্বয়ং কুরআন করীমেরও বিপরীত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান।

وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلاَ سَائِبَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلاَحَامٍ وَّلٰكِنَّ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ.

বহীরা, (উপর্যুপরি দশ শাবক প্রসবকারী যে পশু দেবতার নামে উৎসর্গ করা হতো) সাইবা, (যে পশু দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো) ওসীলা (উপর্যুপরী মাদী বাচ্চা প্রসবকারী যে উষ্ট্রী দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো) ও হাম (প্রজনন কাজে নিয়োজিত অধিক বয়স্ক যে উষ্ট্র দেবতার নামে ছেড়ে দেয়া হতো) আল্লাহ স্থির করেননি; কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এ চার পশু (বহীরা, সাইবা ইত্যাদি) হলো ওইগুলো, যেগুলোকে আরবের কাফিরগণ দেবতার নামে ছেড়ে দিত এবং ওগুলোকে হারাম মনে করতো। কুরআন করীম এ হারাম মনে করাটাকে অগ্রাহ্য করেছেন। অথচ জীবিতাবস্থায় এগুলোর উপর দেবতার নাম নেয়া হয়েছিল। তবুও ওগুলোকে যবেহ করে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

(আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যা দান করেছেন, তা খাও এবং শয়তানের অনুসরণ করো না) তফসীরে ফতহুল বয়ানে مَاجَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবং মুসলিম শরীফের শরাহ নব্বীর الصفة التى يعرف بها فى الدنيا اهل الجنة শীর্ষক অধ্যায়ের ৩৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

اَلْمُرَادُ اِنْكَارُ مَا حَرَّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ مِنَ السَّائِبَةِ وَالْبَحِيْرَةِ وَالْحَامِ وَاِنَّهَا لَمْ تَصِرْحَرَامًا بِتَحْرِيْمِهٖ.

অর্থাৎ এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওসব পশু হারাম সাব্যস্ত হওয়াকে অস্বীকার করা, যেগুলোকে কাফিরগণ হারাম মনে করতো, যেমন বহীরা ইত্যাদি। এসব পশু ওরা হারাম বললেও হারাম হবে না।

এর থেকে বোঝা গেল হিন্দুরা যে ষাড় দেবতার নামে ছেড়ে দেয়, তা হারাম হবে না। যদি কোন মুসলমান বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে, তাহলে হালাল হবে। অবশ্য অন্যজনের মালিকানাধীন হওয়ার কারণে এ রকম করা নিষেধ। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ ফরমান-

وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّيَطْعَمُهَا اِلاَّ مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ.

(কাফিরগণ তাদের ধারণা মতে বলে যে এ সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ।

আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত অন্য কেউ এগুলো খেতে পারবে না) আরও ইরশাদ ফরমান-

وَقَالُوْا مَا فِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا.

(অর্থাৎ কাফিরগণ বলে, এসব গবাদি পশুর গর্ভে যেসব বাচ্চা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের মহিলাদের জন্য হারাম।) এগুলো হচ্ছে সেইসব শস্যক্ষেতসমূহ এবং পশুগুলো, যা দেবতাদের নামে উৎসর্গ করা হতো এবং কাফিরগণ এসবের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতো। কুরআন করীম এ নিষেধাজ্ঞাকে নাকচ করে দিয়েছেন। তাহলে যখন দেবতার নামে উৎসর্গকৃত পশু হারাম হলো না, আল্লাহর ওলীদের ফাতিহার উদ্দেশ্যে পালিত পশু কেন হারাম হবে?

তৃতীয়তঃ اُهِلَّ শব্দের এ অর্থ ফকীহগণের বিশ্লেষণেরও বিপরীত। আমি এ আলোচনার প্রথম অধ্যায়ে ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরীর ইবারত উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে কোন মুশরিক বা অগ্নি পূজারী দেবতা বা অগ্নি পূজার নামে উৎসর্গকৃত পশু কোন মুসলিম কর্তৃক যবেহ করালো এবং সেই মুসলমান বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করলো, তাহলে সেটা হালাল। অনুরূপ তফসীরাতে আহমদীয়ার একটি ইবারতও উল্লেখ করেছি, যেথায় বর্ণিত আছে যে আল্লাহর ওলীগণের নামে মানতকৃত পালিত পশু হালাল।

চতুর্থতঃ এ অর্থ আকল বা যুক্তিরও বিপরীত। কেননা, যদি اُهِلَّ এর শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা হয় (অর্থাৎ কোন পশুর বেলায় এর জীবিতাবস্থায় বা যবেহ করার সময় খোদা ভিন্ন অন্য নাম নেয়া হলে সেটা হারাম হয়ে যায়) তাহলে পশু ভিন্ন অন্যান্য জিনিসও গায়রুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততার দ্বারা হারাম হওয়া চাই, কারণ কুরআন শরীফে আছে (وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ)(প্রত্যেক কিছু যাকে গায়রুল্লাহর (খোদা ভিন্ন অন্য নাম) নামে ডাকা হবে) এখানে مَا শব্দে পশুর কোন শর্তারোপ নাই। আর সান্নিধ্যের নিয়তে ডাকা হোক বা অন্য কোন নিয়তে যে কোন অবস্থায় হারাম হওয়া চাই। তাহলে যায়েদের গরু, উমরের মহিষ, নিশানের আম, বকরের বাগানের ফুল, উম্মে সাঈদের কূপ, অমুকের মসজিদ, আমার ঘর, দেওবন্দীদের মাদ্রাসা, ইমাম বুখারীর কিতাব ইত্যাদি সম্বন্ধ পদ নাজায়েয হয়ে গেছে এবং ওসবের ব্যবহার হারাম হয়ে গেল। আর বুখারী, তিরমিযীতো খাঁটি শিরক হয়ে গেল। কেন না এগুলোকে বুখারী ও তিরমিযীর সাথে অর্থাৎ গায়রুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জনাব কোন মহিলা যতদিন পর্যন্ত কেবল আল্লাহর বান্দা হিসেবে থাকে, ততদিন সে সবার জন্য হারাম। কিন্তু যখন ওর বেলায় খোদা ভিন্ন অন্য নাম প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ অমুকের স্ত্রী বলা হয়, তখন সে অমুকের জন্য হালাল হয়ে গেল। কোন কোন সময় গায়রুল্লাহর সম্পৃক্ততার ফলে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পায়। হায়দরাবাদে হুযূর গাউছে পাক (রাঃ) এর হাতের লিখা একটি কুরআন শরীফ ছিল। বৃটিশ সরকার দু'লাখ টাকা দিয়ে খরিদ করতে চেয়েছিল কিন্তু দেয়া হয়নি। আমীর আবদুর রহমান খানের ব্যবহৃত গালিচা জনৈক আমেরিকাবাসী পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিল। পুরানো টিকেটও মূল্যবান হয়ে থাকে (সরকার আলিপুরী) মোট কথা, اُهِلَّ শব্দের এ ধরনের অর্থ কুরআন, হাদীছ ও যুক্তির বিপরীত।

পঞ্চমতঃ যদি কেউ কোন পশু দেবতার নামে পালন করলো, পরবর্তীতে সে মুসলমান হয়ে গেল এবং খালেস নিয়তে সেটাকে যবেহ করলো, তাহলে এটা সর্ব সম্মতিক্রমে হালাল। অথচ এটাও اُهِلَّ এর অন্তর্ভুক্ত হলো। কারণ একবারও যদি গায়রুল্লাহর নাম নেয়া হয়, তাহলে مَا اُهِلَّ এর পর্যায়ে পড়ে যায়। তাই মানতেই হবে যে যবেহ করার সময় যে নাম নেয়া হয় সেটাই ধর্তব্য; আগের কথা নয়। যদি কেউ গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করলো অতঃপর মাংসের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম নিল, সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ যদি জীবিতবাস্থায় ডাকাটা গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে যে ব্যক্তি কোন পশুকে জীবিতাবস্থায় গায়রুল্লাহর নামে আখ্যায়িত করে পরবর্তীতে তওবা করে আল্লাহর নামে যবেহ করলো, সেটাও হারাম হতো।

ষষ্ঠতঃ যদি اُهِلَّ শব্দের শাব্দিক অর্থইবা গ্রহণ করা হয়, তবুও بِهٖ শব্দের দ্বারা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন بِهٖ এর بِ অর্থ হবে فِىْ এর মত আর مُضَاف পদটা উহ্য ধরে নিতে হবে অর্থাৎ فِىْ ذَبْحِهٖ হবে। তা নাহলে بِهٖ শব্দের কি তাৎপর্য হতে পারে? এটা না থাকলেওতো অর্থের বেলায় কোন অসুবিধা হয় না যেমন সুলাইমান জুমল مَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তা-ই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখানেও একই অর্থ প্রকাশ পেল অর্থাৎ যে পশু যবেহ করার সময় গায়রুল্লাহর নাম নেয়া হয়, সেটা হারাম। যে কোন অবস্থায় তাদের সেই অর্থ অগ্রাহ্য।

২য় আপত্তিঃ ফিক্‌হ শাস্ত্রের একটি মাসআলা হচ্ছে- যে পশুকে বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা হয় কিন্তু যবহের উদ্দেশ্যে যদি গায়রুল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশী হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হারাম। অনুরূপ গেয়ারবী শরীফ পালনকারীদের নিয়ত হয়ে থাকে গাউছে পাককে সন্তুষ্টকরণ। তাই তাদের যবেহের মধ্যেও গায়রুল্লাহর সান্নিধ্য প্রকাশ পায়। অতএব যদিওবা বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা হলো, কিন্তু উপরোক্ত কায়দা অনুসারে হারাম হয়ে গেল। (এ কায়দার বিশ্লেষণ ৩নং আপত্তির উত্তরে দেয়া হয়েছে।

উত্তরঃ যবেহ চার প্রকার। প্রথমতঃ কেবল রক্তপাতের উদ্দেশ্যে যবেহ করা এবং মাংসটা আনুষঙ্গিক মাত্র। আর এ রক্তপাতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যেমন কুরবানী, হাদি, আকীকা ও মানতের পশু। এ যবেহটা হচ্ছে ইবাদত এবং এ সবের জন্য সময় ও স্থানের শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন কুরবানী নির্দিষ্ট তারিখে করাটাই ইবাদত, এর আগে পিছে নয়; হাদিটা (হজ্বের কুরবাণী) হেরম শরীফে করাটা ইবাদত, অন্যত্র নয়। দ্বিতীয়তঃ ছুরি ধার আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য যবেহ করাটা ইবাদতও নয় আবার গুনাহও নয়। যদি বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে, তাহলে পশুটা হালাল হবে, অন্যথায় হারাম। তৃতীয়তঃ মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যে যবেহ করা। যেমন বিবাহ, ওলিমা ইত্যাদি উপলক্ষে বা মাংস বিক্রি করার জন্য যবেহ করা। অনুরূপ বুযর্গানে কিরামের ফাতিহা উপলক্ষে যবেহটা হয়ে থাকে মাংসের জন্য। অর্থাৎ মাংসটা মূল উদ্দেশ্য। এখানেও যদি বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা হয়, তাহলে হালাল, অন্যথায় হারাম। চুতর্থতঃ খোদা ভিন্ন অন্যকে রাজি করানোর আশায় কেবল রক্তপাত করার নিয়তে যবেহ করা এবং মাংস খাওয়ার কোন উদ্দেশ্য থাকে না। যেমন হিন্দুরা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু বলি দিয়ে থাকে এবং এ ক্ষেত্রে কেবল রক্তপাতের মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করাটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এ ধরনের পশু বিস্‌মিল্লাহ বলে যবেহ করলেও হারাম। তবে শর্ত হলো বলীর নিয়ত যবেহকারীর হলে, যবেহ কর্তার (মালিক) নয়। আপত্তিতে উত্থাপিত ফিক্‌হের সেই মাসআলায় এটাই বোঝানো হয়েছে। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান- وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (ওই পশু যেটা দেবতার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হবে, সেটা হারাম। আল্লামা সুলাইমান জুমুল এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন-

اَىْ مَا قُصِدَ بِذَبْحِهِ النُّصُبُ وَلَمْ يُذْكَرُ اِسْمُهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ بَلْ قُصِدَ تَعْظِيْمُهَا بِذَبْحِهِ فَعَلَى بِمَعْنَى اللَّامِ فَلَيْسَ هٰذَا مُكَرَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ اِذْ ذَاكَ فِيْمَا ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهِ اِسْمُ الصَّنَمِ وَهٰذَا فِيْمَا قُصِدَ بِذَبْحِهِ تَعْظِيْمُ الصَّنَمِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ.

অর্থাৎ ওই পশুও হারাম যেটার যবেহ দ্বারা দেবতা তুষ্ট করাই মকসুদ যদিওবা ওটা যবেহের সময় দেবতার নাম নেয়া হয়নি কিন্তু দেবতার সম্মানের জন্য করা হয়েছে। আয়াতে عَلٰى ব্যবহৃত হয়েছে لام এর অর্থে। সুতরাং এ আয়াত আগের আয়াতের

পুনরাবৃত্তি নয়। কেননা ওই আয়াতে مَا اُهِلَّ দ্বারা ওটাই বোঝানো হয়েছে যেটার উপর দেবতাদের নাম নেয়া হবে আর এ আয়াত দ্বারা সেই পশুকে বোঝানো হয়েছে, যার যবেহ দ্বারা দেবতার নাম না নিয়ে কেবল সম্মান করাই উদ্দেশ্য।

সুবহানাল্লাহ! কি উত্তম ব্যাখ্যা দিয়েছেন- যেটা দেবতার নামে যবেহ করা হয় সেটা مَا اُهِلَّ এর অর্ভুক্ত এবং যেটার যবেহ দ্বারা গায়রুল্লাহর সম্মান করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সেটা مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ এর অন্তর্ভুক্ত।কতেক ফকীহ উভয় ধরনের যবেহকে مَا اُهِلَّ দ্বারা প্রমাণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের ব্যাখ্যা হলো مَا ذُبِحَ لِتَعْظِيْمِ غَيْرِ اللّٰهِ যেটা গায়রুল্লাহর সম্মানার্থে যবেহ করা হয়েছে। দুর্রুল মুখতারেও তা-ই বর্ণিত আছে। মোট কথা হলো পশু হারাম হওয়ার পিছনে দুটি কারণ রয়েছে- এক যবেহ করার সময় গায়রুল্লাহর নাম নেয়া, দুই, গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য পশুর রক্তপাত করা। উভয়ক্ষেত্রেই মূলতঃ মাংস উদ্দেশ্য নয়; গায়রুল্লাহর সান্নিধ্যই কাম্য। একেই ফকীহগণ হারাম বলেন। কিন্তু গেয়ারবী ও ফাতিহার পশু উপরে উল্লেখিত তৃতীয় প্রকারের যবেহেরই অন্তর্ভুক্ত, চতুর্থ প্রকারের নয়। কেননা গেয়ারবী শরীফ উদ্‌যাপনকারীদের উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে পশুর মাংসের খাবার তৈরী করার পর ফাতিহা দিয়ে ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করা। সুতরাং এখানে মাংসই আসল উদ্দেশ্য। তাই হারাম হতে পারে না। এ পার্থক্যটা স্মরণ রাখা দরকার। কতেক দেওবন্দী বলে যে, গেয়ারবী শরীফ উদ্‌যাপনকারীদের উদ্দেশ্য মাংস নয় কেননা এটা লক্ষ্য করা গেছে যে ওদেরকে ওদের মনোনীত পশুর পরিবর্তে যদি ফাতিহার জন্য অতিরিক্ত মাংস বা অন্য পশুর প্রস্তাব দেয়া হয়, এতে ওরা রাজি নয়। সত্যেই যদি মাংস তাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এই ধরনের প্রস্তাবে নিশ্চয়ই রাজি হবার কথা। তাই বোঝা গেল যে গাউছে পাকের নামে রক্তপাত করাটাই মূল উদ্দেশ্য। আসলে এটা ভুল ধারণা। নিয়তকারী কোন্ ধরনের নিয়ত করেছে একমাত্র সেই জানতে পারে। প্রমাণ ছাড়া মুসলমানের উপর খারাপ ধারণা পোষণ করা হারাম।

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ আর পশু পরিবর্তনের বেলায় অনীহা প্রকাশ করার কারণ হচ্ছে সম্মান বোধ। তাঁদের ধারণা হলো যেটাকে তারা যত্ন করে মোটা সোটা করেছে, সেটার সাথে অন্য কোনটার তুলনা হয় না। কেউ কেউ ওলিমার জন্য পশু পালন করে। তারাও এর পরিবর্তে অন্য মাংস গ্রহণ করা পছন্দ করে না কতেক লোক ফাতিহার জন্য নতুন বাসন ব্যবহার করে এবং ওগুলোর বাদলাবদলী পছন্দ করে না। আবার অনেকেই মনে করে-যে পশুর দ্বারা ফাতিহার নিয়ত করা হয়, সেটা বদলানো জায়েয নয়। যেমন কুরবাণীর পশু। অবশ্য এ রকম ধারণা ভুল। কিন্তু ভুল ধারণার জন্য যবেহকৃত পশু

হারাম হতে পারে না। সম্মান ও বলীদান এক কথা নয়। সারকথা হলো, যবেহ দ্বারা যদি গায়রুল্লাহকে রাজি করানো মকসুদ হয়ে থাকে, তাহলে হারাম আর যদি দাওয়াত বা ফাতিহার জন্য যবেহ করা হয় এবং ফাতিহা ও দাওয়াত কাউকে রাজি করানোর জন্য হয়, তাহলে হালাল। কোন আল্লাহর বান্দাকে রাজি করানোর অর্থ ওর ইবাদত নয়।

৩নং আপত্তিঃ দুররুল মুখতার ও আলমগীরীর الذبح। শীর্ষক অধ্যায়ে এবং ইমাম নববীর শরহে মুসলিমে বর্ণিত আছে-

ذُبِحَ لِقُدُوْمِ الْاَمِيْرِ وَنَحْوِهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ يُحَرَّمُ لِاَنَّهُ اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَوْذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.

বাদশা বা কোন বড় লোকের আগমন উপলক্ষে পশু যবেহ করা হারাম যদিওবা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। কেননা ওটার ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।

এর থেকে বোঝা গেল, কারো রেজামন্দির জন্য পশু যবেহ করা হারাম যদিওবা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়। সুতরাং গেয়ারবীর পশু যে কোন অবস্থায় হারাম,কারণ এটা গাউছে পাকের রেজামন্দির জন্যই করা হয়। তাই আল্লাহর নামে যবেহ করলেও হারাম।

উত্তরঃ এর পরিপূর্ণ উত্তর ২নং আপত্তির উত্তরে দেয়া হয়েছে যে বাদশাহ বা অন্য কারো নামে বলীদানের নিয়তে যদি যবেহ করা হয়, তাহলে সেই পশু হারাম। আর বলীদানের অর্থ হচ্ছে রক্তপাতের দ্বারা ওকে রাজিকরানোই প্রধান উদ্দেশ্য, মাংস আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু বাদশাহ ও অন্যান্যদের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা হলে সেটা হালাল যদিওবা দাওয়াতের দ্বারা বাদশাহ বা অন্যান্যদের সন্তুষ্টি অভিপ্রায় হয়ে থাকে। দুররুল মুখতারের কিতাবুল যবায়েহের সেই একই জায়াগায় বর্ণিত আছে-

وَلَوْلِلضَّيْفِ لَايُحَرَّمُ لِاَنَّهُ سُنَّةُ الْخَلِيْلِ وَاِكْرَامُ الضَّيْفِ اِكْرَامُ اللّٰهِ وَالْفَارِقُ اِنَّهُ اِنْ قَدَّمَهَا لِيَاكُلَ مِنْهَا كَانَ الذَّبْحُ لِلّٰهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلضَّيْفِ اَوْلِلْوَلِيْمَةِ اَوْ لِلرِّبْحِ وَاِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا لِيَاكُلَ مِنْهَا بَلْ يَدْ فَعُهَا لِغَيْرِهِ كَانَ لِتَعْظِيْمِ غَيْرِاللّٰهِ فَتُحَرَّمُ.

যবেহটা যদি মেহমানের জন্য হয়, তাহলে হারাম নয়। কেননা এটা হযরত খলিলুল্লাহর তরীকা আর মেহমানের সম্মান মানে আল্লাহরই সম্মান। পার্থক্যের কারণটা হলো-যদি এর মাংস মেহমানের সামনে রাখা হয় খাবার জন্য তাহলে যবেহটা হবে

আল্লাহর জন্য এবং মাংসটা হবে মেহমানের জন্য অথবা মেহমানের সাম্নে রাখা হলো না, অর্থাৎ খেতে দিল না বরং এমনি কাউকে দিয়ে দিল তাহলে এ সম্মানটা গায়রুল্লাহর জন্য হলো সুতরাং এটা হারাম।

এতে পরিস্কার বোঝা গেল-মাংস উদ্দেশ্য হওয়ার দ্বারা ইবাদত ও গাইর ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায় একই জায়গায় দুররুল মুখতারে আরও বর্ণিত আছে-

وَفِىْ صَيْدِ الْمُنْيَةِ اِنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَكْفُرُ لِاَنَّا لَانُسِئَ الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ اَنَّهُ يَتَقَرَّبُ اِلَى الْاٰدَمِىِّ بِهٰذَا النَّحْرِ.

(এ রকম করা মাকরূহ। এর দ্বারা যবেহকারী কাফির হবে না। কেননা আমরা মুসলমানের প্রতি বদগুমান করি না যে, সে ওই যবেহর দ্বারা কোন ব্যক্তির ইবাদত করে।) প্রতীয়মান হলো যে মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা অপরাধ। উক্ত দুররুল মুখতারের টীকায় এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তা যথেষ্ট মনে করি। তফসীরে রূহুল বয়ানে ষষ্ঠ পারার আয়াত وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

مَايُذْبَحُ عِنْدَ اِسْتِقْبَالِ السُّلْطٰنِ تَقَرُّبًا اِلَيْهِ اَفْتٰى اَهْلَ الْبَخَارٰى بِتَحْرِيْمِهٖ وَقَالَ الرَّافِعِىُّ هٰذَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِاَنَّهُمْ اِنَّمَا يَذْبَحُوْنَهُ اِسْتِبْشَارًا بِقُدُوْمِهٖ فَهُوَ كَذَبْحِ الْعَقِيْقَةِ لو لادَةِ الْمَوْلُوْدِ مِثْلَ هٰذَا لَايُوْجِبُ التَّحْرِيْمَ كَذَا فِىْ شَرْحِ الْمَشَارِقِ.

অর্থাৎ যে পশু বাদশাহের আগমন উপলক্ষে তার সান্নিধ্য লাভের জন্য যবেহ করা হয়, আহলে বুখরা এর হারাম হওয়ার ফাত্ওয়া দিয়েছেন কিন্তু ইমাম রাফেঈ বলেছেন সে পশু হারাম হবে না, কেননা ওই সমস্ত লোকেরা বাদশাহের আগমনে খুশীতে যবেহ করে। যেমন শিশুর আকীকা, জন্মের খুশীতে ও এ রকম অন্যান্য কাজে যবেহকৃত পশু হারাম হয় না। অনুরূপ শরহে মশারেকেও বর্ণিত আছে।

বোঝা গেল যে ওই সময় এটা সম্ভবতঃ প্রচলন ছিল যে বাদশার আগমনে ঘরে ঘরে পশু যবেহ করা হতো। আজকাল অবশ্য এ প্রথা নেই। তাই যেটা বাদশার ইবাদতের নিয়তে যবেহ করে সেটা হারাম এবং যেটা খুশী প্রকাশ করার জন্য জনগণকে দাওয়াতের নিয়তে যবেহ করে, সেটা হালাল। ফাত্ওয়ার এ পার্থক্যটা হলো

যুগের প্রচলিত প্রথার কারণে। কিন্তু গিয়ারবী শরীফের পশু যবেহের সাথে বাদশার আগমন উপলক্ষে পশু যবেহের কোন সাদৃশ্য নেই।

৪নং আপত্তিঃ গেয়ারবী শরীফের নিয়তে গরু-ছাগল পালনকারী হচ্ছে ধর্মদ্রোহী। কেননা গায়রুল্লাহর নামে মানত করা কুফরী আর কাফির ও ধর্মদ্রোহীর যবেহকৃত পশু হারাম। সুতরাং গেয়ারবী শরীফের অনুসারীদের যবেহকৃত পশু হারাম। শামীর দ্বিতীয় খণ্ড কিতাবুস সাওমের نذر الاموات শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে-

وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوْقِ لَايَجُوْزُ لِاَنَّهٗ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَاتَكُوْنُ لِمَخْلُوْقٍ ۔

মাখলুকের নামে মানত জায়েয নেই। কেননা এটা ইবাদত আর ইবাদত মাখলুকের জন্য হয় না।

উত্তরঃ এর বিস্তারিত উত্তর আমি এর আগে দিয়েছি যে এ মানত শরীয়তের পরিভাষায় ব্যবহৃত মানত নয়; এটা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত মানত অর্থাৎ হাদীয়া, নযরানা বা মানত আল্লাহর নামে এবং এটা হচ্ছে উপলক্ষ। এতে কোনটাই শিরক নয়। শিক্ষককে বলা হয়- এ টাকা আপনার নযরানা অর্থাৎ হাদিয়া।

বুযুর্গানে কিরামের হাত-পা চুমু দেয়া ও পবিত্র বস্তুর সম্মান করা

আল্লাহর ওলীগণের হাত-পা চুমু দেয়া, তাদের পবিত্র বস্তু, চুল, পোশাক পরিচ্ছেদ ইত্যাদির সম্মান করা ও চুমু দেয়া মুস্তহাব। বিভিন্ন হাদীছ ও সাহাবায়ে কিরামের আমল থেকে এ সবের প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু কতেক লোক এ গুলোকে অস্বীকার করে। তাই এই আলোচনাকেও আমি দু'টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে এর প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের উত্তর দিয়েছি।

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র বস্তুকে চুমু দেয়ার প্রমাণ

পবিত্র বস্তুকে চুমু দেয়া জায়েয। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ ۔

অর্থাৎ ওহে বনী ঈসরাইল বায়তুল মুকাদ্দিসের দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। এবং বল-আমাদের গুনাহ মাফ করা হোক। এ আয়াত থেকে অবগত হওয়া গেল যে আম্বিয়া কিরামের আরামগাহ বায়তুল মুকাদ্দিসকে সম্মান করানো হলো অর্থাৎ বনী ঈসরাইলকে ওখানে নতশিরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা এটাও বোঝা গেল যে পবিত্র স্থান সমূহে তওবা তাড়াতাড়ি কবুল হয়। মিশ্‌কাত শরীফের المصافحة و المعانقة অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

وَعَنْ زِرَاعٍ وَكَانَ فِىْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهٗ ۔

হযরত যেরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যিনি আবদুল কায়সের প্রতিনিধিভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন- যখন আমরা মদীনা মনোয়ারায় আসলাম তখন আমরা নিজ নিজ বাহন থেকে তাড়াতাড়ি অবতরণ করতে লাগলাম। অতঃপর আমরা হুযূর আলাইহিস সালামের পবিত্র হাত-পায় চুমু দিয়েছিলাম। মিশকাত শরীফের الكبائر وعلامات النفاق শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত ছিফওয়ান ইবনে আস্‌সাল, থেকে বর্ণিত আছে فَتَقَبَّلَ يَدَيْهِ وَرِجْلَهٗ (অতঃপর হুযূর আলাইহিস সালামের হাত-পায় চুমু দেন)

মিশ্‌কাত শরীফে مايقال عند من حضرت الموت শীর্ষক অধ্যায়ে তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ ابْنَ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ.

অর্থাৎ হুযূর আলাইহিস সালাম হযরত উছমান ইবনে মযউনকে মৃতবস্থায় চুমু দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ শিফা শরীফে উল্লেখিত আছে-

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِىْ يَجْلِسُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَضَعُهَا عَلٰى وَجْهِهٖ.

যে মিম্বরে দাঁড়িয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খুৎবা দিতেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর সেটাতে হাত লাগিয়ে মুখে মাখতেন (চুমু দিতেন) আল্লামা ইব্‌নে হাজরের রচিত শরহে বুখারীর ষষ্ঠ পারার ১১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

اِسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشْرُوْعِيَّةِ تَقْبِيْلِ الْاَرْكَانِ جَوَازَ تَقْبِيْلِ كُلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعَظْمَةَ مِنْ اٰدَمِىٍّ وَغَيْرِهٖ نُقِلَ عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ اَنَّهٗ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيْلِ مِنْبَرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَقْبِيْلِ قَبْرِهٖ قَالَ فَلَمْ يَرَبِهٖ بَاْسًا وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ اَبِى الصَّيْفِ الْيَمَانِىْ اَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ تَقْبِيْلِ الْمُصْحَفِ وَاَجْزَاءِ الْحَدِيْثِ وَقُبُوْرِ الصّٰلِحِيْنَ مُلَخَّصًا.

অর্থাৎ কাবা শরীফের স্তম্ভগুলোর চুম্বন থেকে কতেক উলামায়ে কিরাম বুযুর্গানে দ্বীন ও অন্যান্যদের পবিত্র বস্তুসমূহ চুম্বনের বৈধতা প্রমাণ করেন। ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে তার কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল-হুযূর আলাইহিস সালামের মিম্বর বা পবিত্র কবর মুবারকে চুমু দেয়াটা কেমন? তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন, কোন ক্ষতি নেই। মক্কা শরীফের শাফেঈ উলামায়ে কিরামের অন্যতম হযরত ইবনে আবিস সিন্‌ফ ইয়ামানী থেকে বর্ণিত আছে-কুরআন করীম ও হাদীছ শরীফের পাতাসমূহ এবং বুযুর্গানে দ্বীনের কবরসমূহ চুমু দেয়া জায়েয।

প্রখ্যাত 'তুশেখ' গ্রন্থে আল্লামা জালাল উদ্দিন সয়ুতী (কুঃ) বলেছেন-

اِسْتَنْبَطَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ مِنْ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ تَقْبِيْلَ قُبُوْرِ الصّٰلِحِيْنَ.

হাজর আসওয়াদের চুম্বন থেকে কতেক আরেফীন বুযুর্গানে কিরামের মাযারে চুমু দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করেছেন।

উপরোক্ত হাদীছে, মুহাদ্দিছীন ও উলামায়ে কিরামের ইবারত থেকে প্রমাণিত হলো যে বুযুর্গানে দ্বীনের হাত, পা, ওনাদের পোশাক, জুতা, চুল মোট কথা সব কিছু পবিত্র বস্তু; অনুরূপ কাবা শরীফ, কুরআন শরীফ ও হাদীছ শরীফের পাতা সমূহের উপর চুম্বন জায়েয ও বরকতময়। এমনকি বুযুর্গানে দ্বীনের চুল, পোশাক ও অন্যান্য পবিত্র বস্তুর সম্মান করা এবং যুদ্ধকালীন ও অন্যান্য মুসিবতের সময় এগুলো থেকে সাহায্য লাভ করা কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত আছে। কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ.

(বনী ইসরাঈলীদেরকে তাদের নবী বলেছেন, তালুতের বাদশাহীর নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের কাছে সেই তাবুত (সিন্দুক) আস্‌বে যেথায় তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং হযরত মুসা ও হযরত হারুনের পবিত্র বস্তু সমূহ থাকবে; ফিরিশতাগণ এটা বহন করে আনবে।) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরে খাযেন, রূহুল বয়ান, মদারেক, জালালাইন ও অন্যান্য তফসীরে লিখা হয়েছে যে তাবুত হচ্ছে সীসা ও কাঠের তৈরী সিন্দুক, যেখানে নবীগণের ফটো (এ সব ফটো কোন মানুষের তৈরী ছিল না বরং কুদরতী ছিল) ওনাদের আবাসসমূহের নকশা, হযরত মুসা (আঃ) এর লাঠি, তাঁর কাপড়, জুতা এবং হযরত হারুন (আঃ) এর লাঠি, টুপি ইত্যাদি ছিল। বনী ইসরাঈলগণ যখন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, তখন বরকতের জন্য ওটাকে সামনে রাখতো এবং যখন খোদার কাছে দুআ করতো, তখন ওটাকে সামনে রেখেই প্রার্থনা করতো। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে বুযুর্গানে দ্বীনের পবিত্র বস্তু থেকে ফয়েয গ্রহণ এবং ওগুলোকে সম্মান করা নবীগণেরই অনুসৃত পথ। তফসীরে খাযেন, মদারেক, রূহুল বয়ান ও কবীরে বার পারার সূরা ইউসুফের আয়াত فلما ذهبوا به এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) হযরত ইউসুফ (আঃ)কে তার ভাইদের সাথে পাঠালেন, তখন ওর গলায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কোর্তাকে তাবিজ বানিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে নিরাপদে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত

www.AmarIslam.com

পানি আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যমযম কূপের পানির সম্মান এ জন্যেই করা হয় যে এটা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর পবিত্র পায়ের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে। মকামে ইব্রাহীমের পাথর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সান্নিধ্যের ফলে এর ইয্যত এতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে যে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমান- وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى. (তোমরা ইব্রাহীম (আঃ) এর দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।) অর্থাৎ সবার মস্তক ওই দিকে নত কর। মক্কা শরীফকে যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) সাথে সম্পর্কিত করা হলো, তখন আল্লাহ্ তাআলা এর নামের কসম করে ইরশাদ ফরমান-

لَاأُقْسِمُ بِهٰذَاالْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ.

(শপথ করছি এ শহরের (মক্কা শরীফের) আর তুমি এ শহরের অধিবাসী) অন্যত্র বলেছেন وَهٰذَاالْبَلَدِ الْأَمِيْنِ (এবং এ নিরাপদ শহরের (মক্কা) শপথ)। হযরত আয়ুব (আঃ) প্রসঙ্গে ইরশাদ ফরমান-

أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ.

(তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিকে আঘাত কর। এ-তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।) অর্থাৎ হযরত আয়ুব (আঃ) এর পায়ের আঘাতে যে পানি বের হলো, সেটা রোগ নিরাময়ের সহায়ক হলো। এতে বোঝা গেল নবীদের পা ধোয়া পানি মর্যাদাবান ও রোগ নিরাময়ের সহায়ক। মিশ্কাত শরীফের শুরুতে কিতাবুল লেবাসে বর্ণিত আছে যে হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কাছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) আচকান শরীফ ছিল এবং মদীনা শরীফে কারো রোগ হলে, তিনি ওটা ধুয়ে তাকে সেই পানি পান করাতেন। সেই মিশ্কাত শরীফের কিতাবুল আত্আমার الاشربة। শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একদা হযরত কব্শা (রাঃ) এর বাসায় তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ওর মোশকে মুখ মুবারক লাগিয়ে পানি পান করেন। তিনি (কব্শা) মোশকের মুখটা বরকতের জন্য কেটে রেখে দিয়েছিলেন। একই মিশ্কাতের কিতাবুস সালাতের المساجد। অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে একদল লোক হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরয করেন- আমাদের দেশে ইহুদীদের একটি উপসনালয় আছে; আমরা একে ভেঙ্গে মসজিদ করার ইচ্ছে পোষণ করি। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একটি থালায় পানি নিয়ে ওখানে কুলি করেন এবং বলেন ওই উপাসনালয়কে ভেঙ্গে ফেল। অতঃপর এ পানি

www.AmarIslam.com

ওখানে ছিটিয়ে দাও। তারপর মসজিদ তৈরী কর। এতে বোঝা গেল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) পবিত্র থুথু কুফরীর অপবিত্রতা দূরীভূত করেন। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রঃ) স্বীয় টুপীতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর একটি চুল মুবারক রাখতেন এবং যুদ্ধের সময় ওই টুপী নিশ্চয় তার মাথায় থাকতো। মিশ্কাত শরীফে السترة। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওযু ফরমালেন, তখন হযরত বিলাল (রাঃ) হুযূরের ব্যবহৃত ওযুর পানি নিয়ে নিলেন। লোকেরা হযরত বিলালের দিকে দৌড়ে গেলেন এবং যিনি ওই পানিতে হাত ভিজাতে পারলেন, তিনি সে হাত নিজ মুখে মালিশ করে নিলেন। আর যিনি পেলেন না, তিনি অন্যজনের হাতের আদ্রতা নিজ মুখে বুলিয়ে নিলেন। এ সব হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যবহৃত বস্তুসমূহ থেকে বরকত লাভ করা সাহাবা কিরামের সুন্নাত। এবার ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবুল কারাহিয়া ملاقات الملوك শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

اِنْ قَبَّلَ يَدَ عَالِمٍ اَوْ سُلْطٰنٍ عَادِلٍ بِعِلْمِه وَعَدْلِه لَابَأْسَ بِه.

যদি আলিম বা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের হাতে চুমু দেয়া হয় ওদের ইলম ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে, তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই। একই গ্রন্থে কিতাবুল কারাহিয়াতে زيارة القبور অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

لَابَأْسَ بِتَقْبِيْلِ قَبْرِ وَالِدَيْهِ كَذَا فِى الْغَرَائِبِ.

নিজের মা-বাপের কবরে চুমু দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই যেমন গরায়েবে বর্ণিত হয়েছে। সেই আলমগীরীর কিতাবুল কারাহিয়াতের ملاقات الملوك অধ্যায়ে আরও লিপিবদ্ধ আছে-

اِنَّ التَّقْبِيْلَ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ قُبْلَةُ الرَّحْمَةِ كَقُبْلَةِ الْوَالِدِ وَلَدَهٗ وَقُبْلَةُ التَّحِيَّةِ كَقُبْلَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَقُبْلَةُ الشَّفَقَةِ كَقُبْلَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ وَقُبْلَةُ الْمَوَدَّةِ كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ اَخَاهُ وَقُبْلَةُ الشَّهْوَةِ كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهٗ وَزَادَ بَعْضُهُمْ قُبْلَةَ الدِّيَانَةِ وَهِىَ قُبْلَةُ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ.

চুম্বন পাঁচ প্রকার-আশীর্বাদসূচক চুম্বন, যেমন বাবা ছেলেকে চুমু দেয়; সাক্ষাৎকারের চুম্বন, যেমন কতেক মুসলমান কতেক মুসলমানকে চুমু দেয়; স্নেহের চুম্বন, যেমন ছেলে মা-বাপকে দেয়; বন্ধুত্বের চুম্বন, যেমন এক বন্ধু অপর বন্ধুকে চুমু

www.AmarIslam.com

দেয়; কামভাবের চুম্বন, যেমন স্বামী স্ত্রীকে দেয়। কেউ কেউ ধার্মিকতার চুম্বন অর্থাৎ হাজর আসওয়াদের চুম্বনকে এর সাথে যোগ করেছেন।

দুর্রুল মুখতারের পঞ্চম খণ্ড কিতাবুল কারাহিয়াতের শেষ অধ্যায় الاستبراء এর মুসাফাহা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيْلِ يَدِ الْعَالِمِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ আলিম ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের হাতে চুমু দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। এ জায়গায় ফাত্ওয়ায়ে শামীতে হাকিমের একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছে, যার শেষাংশে বর্ণিত আছে-

قَالَ ثُمَّ اَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ.

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তিকে অনুমতি দিয়েছেন। তাই সে তাঁর মস্তক ও পা মুবারক চুম দিলেন। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান যদি আমি কাউকে সিজ্দার হুকুম দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম স্বামীকে সিজ্দা করতে। দুর্রুল মুখতারে সেই জায়গায় আলমগীরীর মত পাঁচ প্রকার চুম্বনের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে নিম্ন লিখিত বক্তব্যটুকু বর্ধিত করেছেন-

قُبْلَةَ الدِّيَانَةِ لِلْحَجَرِ الْاَسْوَدِ وَتَقْبِيْلَ عَتَبَةِ الْكَعْبَةِ وَتَقْبِيْلَ الْمُصْحَفِ قِيْلَ بِدْعَةٌ لٰكِنْ رُوِىَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَاْخُذُ الْمُصْحَفَ كُلَّ غَدَاةٍ وَيُقَبِّلَهُ وَاَمَّا تَقْبِيْلُ الْخُبْزِ فَجَوَّزَ الشَّافِعِيَّةُ اَنَّهُ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ وَقِيْلَ حَسَنَةٌ مُلَخَّصًا.

অর্থাৎ দ্বীনদারীর এক প্রকার চুম্বন রয়েছে, সেটা হচ্ছে হাজর আসওয়াদে চুম্বন ও কাবা শরীফের চৌকাঠে চুম্বন। কুরআন পাককে চুমু দেয়াটা কতেক লোক বিদ্আত বলেছেন। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিদিন সকালে কুরআনে পাক হাতে নিয়ে চুমু খেতেন এবং রুটি চুমু দেয়াকে শাফেঈ মযহাবের লোকেরা জায়েয বলেছেন। কেননা এটা বিদ্আতে জায়েয। অনেকে এটাকে বিদ্আতে হাসনা বলেছেন। অধিকন্তু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (তোমরা মকামে ইব্রাহীমকে

নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর) মকামে ইব্রাহীম ওই পাথরকে বলা হয় যেটার উপর দাঁড়িয়ে হযরত খলীল (আঃ) কাবা শরীফ তৈরী করেছেন। তার পবিত্র কদমের বরকতে সেই পাথরের এ মর্যাদা লাভ হলো- সারা দুনিয়ার হাজীরা ওই দিকে মাথানত করে। এ সব ইবারত থেকে প্রতীয়মান হলো- চুম্বন কয়েক প্রকারের আছে এবং পবিত্র বস্তুকে চুমু দেয়াটা দ্বীনদারীর আলামত। এ পর্যন্ত সমর্থনকারীদের উক্তি সমূহ উল্লেখিত হলো। এবার বিরোধিতাকারীদের নেতা জনাব মওলবী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী কি বলেন, দেখুন। তিনি তার রচিত ফাত্ওয়ায়ে রশীদিয়ার প্রথম খণ্ড كتاب الخطر والاباحه এর ৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন- দ্বীনদার ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো জায়েয এবং এ রকম ব্যক্তির পায়ে চুমু দেয়াও জায়েয, যা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।" ইতি রশীদ আহমদ। এ প্রসঙ্গে আরও অনেক হাদীছ ও ফকীহ্ ইবারত পেশ করা যায়। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট মনে করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের উত্তর

বুজুর্গানে কিরামের হাত-পা চুম্বন ও পবিত্র বস্তুর তাযীম প্রসঙ্গে বিরোধিতাকারীগণ নিম্নবর্ণিত আপত্তিগুলো উত্থাপন করে থাকে। ইন্শাআল্লাহ, এ আপত্তিগুলো ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু বলার নেই।

১নং আপত্তিঃ ফকীহগণ বলেন যে, উলামায়ে কিরামের সামনে মাটি চুমু দেয়া, এমন কি মাথানত করে সম্মান করা হারাম, কেননা এটা রুকুর অনুরূপ এবং তাযিমী সিজ্দা যেমন হারাম হয়ে গেছে তদ্রূপ তাযিমী রুকুও হারাম হয়ে গেছে। আর যখন কারো পা চুমুর জন্য ওর পায়ে মুখ রাখলেন, তা তো রুকু কেন, সিজ্দা হয়ে গেল। সুতরাং এটা হারাম। দুর্রুল মুখতার কিতাবুল কারাহিয়াতের الاستبراء শীর্ষক অধ্যায়ের মুসাফাহা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

وَتَقْبِيْلُ الْاَرْضِ بَيْنَ يَدَى الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ فَحَرَامٌ لِاَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الْوَثَنِ.

(উলামায়ে কিরাম ও বড় বড় বুযুর্গানে কিরামের সামনে মাটি চুম্বন হারাম কেননা এটা মূর্তিপূজার সমতুল্য।) এর প্রেক্ষাপটে ফাত্ওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত আছে-

اَلْاِيْمَاءُ فِى السَّلَامِ اِلٰى قَرِيْبِ الرُّكُوْعِ كَالسُّجُوْدِ وَفِى الْمُحِيْطِ اَنَّهُ يَكْرَهُ الْاِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَلٰى اِطْلَاقِ

السُّجُوْدِ عَلٰى هٰذَا التَّقْبِيْلِ.

সালাম দেয়ার সময় রূকুর কাছাকাছি নত হওয়া সিজদা করার মত এবং 'মূহীত' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে, বাদশাহ ও অন্যান্যদের সামনে মাথানত করা মাকরূহ এবং ফকীহগণের সুস্পষ্ট অভিমত হলো- ঐ ধরনের চুম্বনকে সিজ্দাই বলা যায়।

উপরোক্ত ইবারত থেকে প্রতীয়মান হয় যে কোন মানুষের সামনে মাথানত করা বা সিজ্দা করা শির্ক। তাই কারো পা-চুম্বনও শির্ক। হযরত মুজাদ্দিদে আল্ফে ছানী (রহঃ)কে দরবারে আকবরীতে তলব করা হয়েছিল এবং দরবারে প্রবেশ করার দরজা ছোট আকারের করা হয়েছিল, যাতে এ কৌশলে আকবরের সামনে তাঁর মাথানত হয়। কিন্তু যখন তিনি ওখানে তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় প্রথমে পা প্রবেশ করান, যাতে মাথানত করতে না হয়। (সাধারণ দেওবন্দী ওহাবীরা এ আপত্তিটা বেশীর ভাগ উত্থাপন করে এবং এটাই তাদের প্রধান আপত্তি)

উত্তরঃ আমি প্রথমে সিজ্দার সংজ্ঞা, অতঃপর এর আহকাম বর্ণনা করবো। এর পর বর্ণনা করবো কারো সামনে মাথানত করলে এর কি হুকুম। এতটুকু জানতে পারলে, এ আপত্তিটার নিষ্পত্তি অনায়াসে হয়ে যাবে। শরীয়তের পরিভাষায় সিজ্দা হচ্ছে সাত অঙ্গ অর্থাৎ দু'হাতের তালু, দু'জানু, দু'হাত, নাক ও কপাল মাটিতে রাখা এবং এতে সিজদার নিয়তও হওয়া চাই। ফিকাহ শাস্ত্রের প্রায় গ্রন্থে কিতাবুস সালাতের সিজ্দা শীর্ষক আলোচনায় দেখতে পাবেন যে, যদি কেউ সিজ্দার নিয়ত বিহীন উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে, সেটা 'সিজদা' হবে না। যেমন কতক লোক অসুখ ও শীতের কারণে হাত পা চারটি গুটিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। সিজদা দু'রকম- সিজদায়ে তাহিয়্যাত ও সিজ্দায়ে ইবাদত। সিজ্দায়ে তাহিয়্যা হচ্ছে, যেটা কারো সাক্ষাতে করা হয় এবং সিজ্দায়ে ইবাদত হচ্ছে, যেট খোদাকে বা কাউকে খোদা জ্ঞান করে করা হয়। সিজ্দায়ে ইবাদত গায়রুল্লাহকে করা শির্ক। কোন নবীর ধর্মে এটা জায়েয ছিল না। কেননা প্রত্যেক নবী একেশ্বরবাদের প্রচার করেছেন; কেউ শির্কের প্রসার ঘটাননি। কিন্তু সিজ্দায়ে তাহিয়্যা হযরত আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগের আগ পর্যন্ত জায়েয ছিল। ফিরিশতাগণ হযরত আদম (আঃ)কে সিজ্দা করেছেন। হযরত ইয়াকুম (আঃ) ও হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভায়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ)কে সিজ্দা করেছেন। তাফসীরে রূহুল বয়ানে ১২ পারায় সূরা হাজর আয়াত وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবু আলিয়া (রাঃ) থেকে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে শয়তান তওবা করতে চেয়েছিল। তখন হযরত নূহ

(আঃ)কে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্দেশ দেয়া হয়েছিল- 'শয়তানকে বল, আদমের কবরকে সিজ্দা করার জন্য।' তখন শয়তান বললো- যখন আমি আদমকে জীবিতাবস্থায় সিজ্দা করিনি এখন আর কবরকে কি সিজ্দা করবো। অতঃপর ইসলাম সেই সিজ্দায়ে তাহিয়্যাকে হারাম করেছেন। অতএব, কোন মুসলমান যদি কোন ব্যক্তিকে সিজ্দায়ে তাহিয়্যা করে, তাহলে সে গুনাহগার, অপরাধী ও হারামকারী বলে গণ্য হবে, কিন্তু মুশরিক বা কাফির বলা যাবে না। আপত্তিকারী দুর্বল মুখতারের যেই ইবারত উদ্ধৃত করেছে, সেই একই জায়গায় বর্ণিত আছে-

اِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّعْظِيْمِ كَفَرَ وَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَاوَصَارَ اٰثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ.

(যদি এ মাটি চুম্বনটা ইবাদত বা সম্মানের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী আর যদি অভিবাদনের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে কুফরী নয়। তবে কবীরা গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে।) এ ইবারতটা ফাতওয়ায়ে শামীতে আরও পরিস্ফুটন করা হয়েছে। এখন বলা বাকী রইলো মাথা নত করার প্রসঙ্গটা। এটা দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ তাযীমের জন্য মাথা নত করা যেমন, মাথা নত করে সালাম করা বা সম্মানিত ব্যক্তির সামনে মাটি চুম্বন করা। এক্ষেত্রে যদি রূকু সম মাথা নত করা হয় তাহলে হারাম। ফকীহগণ এ ধরনের মাথা নত করাকে নিষেধ বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ মাথা নত করা অন্য কাজের জন্য, তবে কাজটা সম্মানের জন্য হয়ে থাকে। যেমন কোন বুযুর্গের জুতা যথাস্থানে রাখা, পায়ে চুমু দেয়া। এখানে যদিওবা মাথা নত হয় কিন্তু তা হচ্ছে জুতা সোজা করা বা পায়ে চুমু দেয়ার জন্য এবং সেই কাজটা বুযুর্গের তাযীমের জন্য করা হয়, তাহলে তা জায়েয। যদি এ ধরনের প্রতিবিধান করা না হয়, তাহলে ইতিপূর্বে আমার উল্লেখিত হাদীছসমূহ ও ফকীহ ইবারত সমূহের কি ভাবার্থ হবে? অধিকন্তু এ আপত্তিটা দেওবন্দীদেরও বিপরীত, কারণ তাদের নেতা মৌলভী রশীদ আহমদ সাহেবও পায়ে চুমু দেয়াকে জায়েয বলেছেন। দরবারে আকবরীতে হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের আচরণটা ছিল তাঁর চূড়ান্ত তাকওয়ারই প্রতিফলন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে আকবর বাদশাহের সামনে মাথা নত করার জন্য এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিল। আর তিনি জানতেন যে দরবারে আকবরীতে বাদশাহ আকবরকে সিজ্দা করা হতো। এ জন্যে তিনি মাথা নীচু করে প্রবেশ করেননি। অন্যথায় তিনি যদি মাথা নীচু করে প্রবেশ করতেন, তাতে তাঁর প্রতি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যেত না। কারণ তাঁর ওই মাথা নীচু করার উদ্দেশ্য আকবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

বোঝাতো না।

২নং আপত্তিঃ হাদীছ শরীফে আছে যে, হযরত উমর (রাঃ) হাজর আসওয়াদকে চুমু দিয়ে বলেছিলেন-

إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا إِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَبَّلْتُكَ

ওহে হাজর আসওয়াদ, আমি ভালমতে জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র, না উপকার, না ক্ষতি করতে পার। যদি আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না। এর থেকে বোঝা গেল হযরত ফারুকে আযমের (রাঃ) কাছে হাজর আসওয়াদকে চুমু দেয়াটা অপছন্দ ছিল। কিন্তু যেহেতু সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, সেহেতু বাধ্য হয়ে চুমু দিলেন। কিন্তু পবিত্র বস্তুর ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সুস্পষ্ট দলীল নেই, তাই চুম্বন না দেয়াটাই উচিৎ।

উত্তরঃ মৌলানা আবদুল হাই সাহেব হেদায়ার মুকাদ্দমাতে হাজর আসওয়াদ প্রসঙ্গে হাদীছটি উদ্ধৃত করে বলেন- হযরত হাকিম থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফারুকে আযম (রাঃ)কে জবাব দিয়েছিলেন- ওহে আমীরুল মুমিনীন, হাজর আসওয়াদ কল্যাণ করতে পারে আবার ক্ষতিও করতে পারে। আহা! আপনি যদি কুরআন শরীফের সেই আয়াতের ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দিতেন-

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.

যখন মিছাকের দিন (রূহের জগতে প্রতিজ্ঞার দিন) আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা নিয়েছিলেন, তখন সেই ওয়াদানামা একটি পাতায় লিখে এই হাজরে আসওয়াদে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন এই পাথর আগমন করবে। এর চোখ, জিহবা ও ঠোঁট হবে এবং মুমিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। সুতরাং এটা আল্লাহর আমানতদার এবং মুসলমানদের সাক্ষী। তখন হযরত ফারুক (রাঃ) ফরমান, ওহে আলী, যেখানে তুমি থাকবে না, সেখানে আল্লাহ যেন আমাকে না রাখে। এবার বোঝা গেল যে, হাজর আসওয়াদ লাভ-ক্ষতি উভয় করতে পারে এবং এর প্রতি সম্মান মানে দ্বীনের প্রতি সম্মান। অধিকন্তু, হযরত ফারুক (রাঃ) কর্তৃক হাজর আসওয়াদের প্রতি এ ধরনের সম্বোধন এ জন্য ছিল না যে, তিনি সেই হাজর আসওয়াদকে চুমু দিতে নারাজ ছিলেন। তিনি ভালই জানতেন সুন্নাতের প্রতি অনীহা প্রকাশ কুফরী। তিনি কেবল এই জন্যই বলেছিলেন যে আরববাসীগণ প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিল। তারা যেন এ ধারণা না করে যে

ইসলাম কতেক মূর্তিকে হটিয়ে একটি পাথরের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করিয়েছে। এই বক্তব্য থেকে জনগণের জানা হয়ে গেল যে, ওটা ছিল পাথরকে পূজা করা। আর এটা হলো পাথরকে চুমু দেয়া। পূজা এক জিনিস এবং চুম্বন আর এক জিনিস। হযরত আলী (রাঃ) ও এ উদ্দেশ্যকে নাকচ করেননি বরং لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ এর দ্বারা শ্রোতাদের কাছে যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল, তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এর এ ধরনের বলার উদ্দেশ্য হলো এ পাথর মূলতঃ লাভ-ক্ষতির অধিকারী নন, যেমন আরববাসী মূর্তিদেরকে মনে করতো। আর এ ভাবার্থও নয় যে এ পাথরে লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই। তাহলে বোঝা যায় যে, হযরত ফারুকে আযমের বক্তব্যও জনগণকে বোঝানোর জন্য ছিল এবং হযরত আলী (রাঃ) এর উদ্দেশ্যও তা-ই ছিল। আমার এ বিবরণ থেকে রাফেজী ও ওহাবীদের আপত্তি হাওয়া হয়ে গেল।

কি আশ্চর্য! হযরত ফারুকে আযম এখানে হাজর আসওয়াদকে চুমু দিতে তোমাদের কথা মত অনিচ্ছুক। অথচ, তিনি নিজে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে আরয করেছিলেন-আমরা মকামে ইব্রাহীমকে নিজেদের ইবাদতগাহে পরিণত করতে পারতাম এবং এর সামনে সিজ্দা করতে ও নফল নামায পড়তে পারতাম। তাঁর এ আরযের পরিপ্রেক্ষিতে وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى এ আয়াত নাযিল হয়। মকামে ইব্রাহীমও একটি পাথর কিন্তু এর সামনে নফল নামায পড়া ও সিজ্দা করা তাঁর পছন্দ ছিল।

৩নং আপত্তিঃ কতেক লোক এ-ও বলে যে আজকাল যে সব পবিত্র বস্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বলে দাবী করা হয়, তা সঠিক, না বেঠিক বলা মুশকিল, কেননা এর সঠিক হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। তাই একে চুমু দেয়া বা সম্মান করা জায়েয নয়। হিন্দুস্থানের অনেক জায়গায় চুল মুবারক প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ওগুলো যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চুল, এর কোন নজির বা প্রমাণ নেই।

উত্তরঃ এ পবিত্র বস্তু প্রমাণের জন্য মুসলমানদের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র বস্তু বলে প্রসিদ্ধিই যথেষ্ট। এর প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত বা বুখারী শরীফের হাদীছের প্রয়োজন হয় না। এক এক জিনিসের প্রমাণ এক এক রকম। যেমন যেনা প্রমাণিত করার জন্য চার জন পরহিযগার মুসলমানের সাক্ষ্য প্রয়োজন। অন্যান্য আর্থিক লেনদেন প্রমাণের জন্য দু'জনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং রমযানের চাঁদের জন্য কেবল একজন মহিলার সংবাদই বিবেচিত। নিকাহ, বংশ

পরিচয়, স্মরণীয় ঘটনা, এবং বিভিন্ন সময়ের প্রমাণের জন্য কেবল প্রসিদ্ধি বা বিশেষ আলামতই যথেষ্ট। একজন বিদেশী পুরুষ কোন মহিলার সাথে স্বামী স্ত্রীর মত বসবাস করছে। আপনি এতটুকু লক্ষণ দেখে ওদের বিবাহের সাক্ষ্য দিতে পারেন। আমরা বলি আমি অমুকের ছেলে, অমুকের নাতী। এর কোন প্রমাণ কুরআন বা হাদীছে নেই, এমন কি আমাদের মায়ের বিবাহের সাক্ষীও মওজুদ নেই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এর যে প্রসিদ্ধি রয়েছে, তা-ই যথেষ্ট। অনুরূপ স্মরণীয় বিষয়ের প্রমাণের জন্য কেবল খ্যাতি থাকলেই হলো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

(এ সব লোকেরা কি পৃথিবী প্ররিভ্রমণ করে না, যাতে তারা, তাদের পূর্বসূরীদের কি পরিণাম হয়েছে, তা' দেখতে পায়।) এ আয়াতে মক্কার কাফিরদেরকে আগের দিনের কাফিরদের স্মৃতিচিহ্ন ও ওদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তু সমূহ দেখার জন্য আগ্রহান্বিত করা হয়েছে, যাতে তারা নাফরমানদের পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। এখন কথা হলো এটা কি ভাবে চিহ্নিত করা হলো যে, অমুক জায়গা অমুক সম্প্রদায় আবাদ করেছিল? কুরআন শরীফও এ ব্যাপারে নীরব। কেবল প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে তা মেনে নেয়া হয়েছে। তাই প্রতীয়মান হলো যে, কুরআন শরীফও সেই প্রসিদ্ধিকে মেনে নিয়েছেন। শেফা শরীফে বর্ণিত আছে-

وَمِنْ اِعْظَامِهٖ وَاِكْبَارِهٖ اِعْظَامُ جَمِيْعِ اَسْبَابِهٖ وَاِكْرَامُ مَشَاهِدِهٖ وَاَمْكِنَتِهٖ وَمَعَاهِدِهٖ وَمَالَمَسَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْ عُرِفَ بِهٖ

এটাও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) মান সম্মানের অন্তর্ভুক্ত যে হুযূরের আসবাব পত্র, তাঁর বাসস্থান সমূহ, তাঁর পবিত্র শরীরের সাথে যা স্পর্শিত হয়েছে এবং যেটা সম্পর্কে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) বলে খ্যাতি আছে, ও সবের যেন সম্মান করা হয়। শরহে শেফা শরীফে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উপরোক্ত ইবারতের প্রেক্ষাপটে বলেন-

اِنَّ الْمُرَادَ جَمِيْعَ مَانُسِبَ اِلَيْهِ وَيُعْرَفُ بِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

এর ভাবার্থ হচ্ছে, যে জিনিস হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) বলে দাবী করা হয় এবং প্রসিদ্ধি লাভ করে, সেটার সম্মান করা চাই। মৌলানা আবদুল হাকীম সাহেব লক্ষ্ণৌভী, স্বীয় রচিত কিতাব নুরুল ঈমানে শেফা শরীফের এ ইবারতটা উদ্ধৃত

করে وَيُعْرَفُ بِهٖ প্রসঙ্গে টীকা লিখেছেন-

اَىْ وَلَوْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ الْاِشْتِهَارِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوْتِ اَخْبَارٍ فِىْ اٰثَارِهٖ كَذَا قَالَ عَلِىُّ الْقَارِىْ.

(যদিওবা এ দাবীটা কেবল প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং হাদীছ দ্বারা এটা প্রমাণিত না হয়। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। তিনি তাঁর কিতাব مسلك متقسط এ একই বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন।) এ রকম উলামায়ে উম্মত আহকামে হজ্ব প্রসঙ্গে যে সব গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছেন, সে সব গ্রন্থে যিয়ারত কারীদের উপদেশ দেয়া হয়েছে হেরমাইন শরীফাইনের ও সব জায়গা যেন যিয়ারত করে, যে গুলোকে সাধারণ লোকেরা ইযযত-সম্মান করে। আশ্চর্যের বিষয়! ফকীহগণ ফযায়েলে আমালের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছকেও গ্রহণযোগ্য মনে করেন। আর এরা পবিত্র বস্তুর প্রমাণের জন্য বুখারী শরীফের হাদীছ দাবী করেন।

عاشقاں راچه کار باتحقیق – ہرکجا نام اوست قربانیم.

(অর্থাৎ প্রেমিকেরা এত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরওয়া করে না; যেখানেই আপন মাহবুবের নাম পাবে, সেখানে নিজকে উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করে না।)

একটি ঘটনাঃ আমি একবার ১২ই রবিউল আওয়াল শরীফে কাথিয়া ওয়ার্ডের নগীনা মসজিদে ওয়াজ করতে গিয়েছিলাম। ঐ দিন সেই মসজিদে হুযূর পাকের চুল মুবারক দেখানো হচ্ছিল। মুসলমানেরা যিয়ারত করতে ছিল ও দরূদ শরীফ পড়তে ছিল। কেউ কেউ কান্নাকাটিও করছিল। আবার কেউ মুনাজাতরত ছিল। মোট কথা একটা মনোরম পরিবেশ বিরাজমান ছিল। কিন্তু মসজিদের এক কোণায় এক ব্যক্তি মুখ বিকৃতি করে দাঁড়িয়েছিল, তার চেহারাটা যেন অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আমি তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব, আপনি এত মর্মাহত কেন? তিনি বললেন, মসজিদে শিরক হচ্ছে; এ চুল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) এর কোন প্রমাণ আছে কি? আর হুযূরের হলেও এ সম্মানের কি কোন প্রমাণ আছে? আমি এর জবাব দিলাম না। বরং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনার নাম কি? বললেন- আবদুর রহমান। বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলাম, বললেন- আবদুর রহীম। এবার আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি যে আবদুর রহীমের ছেলে, এর প্রমাণ কি? একেতঃ আপনার কাছে এর কোন সাক্ষী নেই আর থাকলেও তা বিবাহের আক্‌দের কিন্তু আপনি যে আপনার পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছেন, এর প্রমাণ কি? তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন-

জনাব, মুসলমানেরাতো বলে যে, আমি ওনার ছেলে আর মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য। তখন আমি বললাম জনাব, মুসলমানেরা বলে যে এটা হুযুর আলাইহিস সালামের পবিত্র চুল মোবারক, আর মুসলমানদের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এবার তিনি লজ্জিত হলেন এবং বললেন এটা অন্য কথা। জিজ্ঞাসা করলাম কোথাকার শিক্ষা প্রাপ্ত? বললেন- দেওবন্দের। বললাম- আর কি জিজ্ঞাস করবো, আপনিতো রেজিস্ট্রিকৃত। মৌলানা কুতুবউদ্দিন ব্রাক্ষাচারী (কুঃ)র কাছে এক দেওবন্দী বলেছিলেন- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে হুযূর বলা বিদ্‌আত, নাম নেয়াটাই উচিৎ। কেননা হুযূর বলাটা কোথাও প্রমাণিত নেই। তখন তিনি বলেছিলেন 'চুপ থাকো, বোকারাম'। ওনি বললেন, এটা কি ধরনের ব্যবহার? তিনি বললেন আপনাকে 'জনাব' বা 'আপনি' বলা বিদ্‌আত। কারণ এর কোন প্রমাণ নেই। আমার ধারণা হচ্ছে কিয়ামতের দিন দেওবন্দীদের খুবই খারাপ লাগবে, যখন হুযূরে পাক মকামে মাহমুদে তশরীফ রাখবেন এবং তাঁর শান সমগ্র জগতে প্রকাশ পাবে। হে আল্লাহ, আমাদেরকে নবীজীর শাফাআত দান করুন।

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.

অর্থাৎ আজই তাঁর (দঃ) আশ্রয় প্রার্থনা কর, তাঁর সাহায্য কামনা কর। কিন্তু কিয়ামতের দিন শত কান্নাকাটি করলেও কোন কাজ হবে না।

৪নং আপত্তিঃ নালাইন শরীফের (পাদুকাদ্বয়) নক্‌শা আসল নালাইন নয়। এটা হচ্ছে রংতুলি দ্বারা তৈরী ফটো। এটাকে কেন সম্মান করা হয়?

উত্তরঃ এটা আসল নালাইন শরীফের অনুকরণ এবং এর কাহিনী রয়েছে। কাহিনীরও সম্মান করা উচিৎ। লাহোরের ছাপানো কুরআন শরীফ, এর কাগজ কালি আসমান থেকে নাযিল হয়নি, আমাদেরই তৈরী। কিন্তু একে আবশ্য'ই তাযিম করতে হবে, কেননা এটা আসলের অনুলিপি। প্রত্যেক রবিউল আউয়াল মাসের প্রত্যেক সোমবার পবিত্র। কারণ এটা হলো আসলের অনুকরণ।

আবদুন নবী, আবদুর রাসুল নামকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা

আবদুন নবী, আবদুর রাসুল, আবদুল আলী ইত্যাদি নামকরণ জায়েয। অনুরূপ নিজেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বান্দা বলাও জায়েয। কুরআন হাদীছ ও ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তিতে এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু কতেক লোক ভিন্নমত পোষণ করে। তাই এ আলোচ্য বিষয়কেও দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এর প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

আবদুন নবী, আবদুর রাসুল নামকরণের বৈধতার প্রমাণ।

কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ.

(অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের উপযুক্ত বান্দা ও বাঁদীদেরও।) এ আয়াতের عِبَاد শব্দটাকে كُمْ এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে, যার অর্থ- তোমাদের বান্দাগণ। আর এক জায়গায় ইরশাদ ফরমান-

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

(অর্থাৎ- হে মাহবুব (দঃ) বলে দিন- ওহে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।) এ আয়াতে يٰعِبَادِىَ শব্দের দু'টি অর্থ প্রকাশ পায়। এক, আল্লাহ বলেন ওহে আমার বান্দাগণ; দুই, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আপনি বলে দিন ওহে আমার বান্দাগণ। এ দ্বিতীয় অর্থে রসুলুল্লাহর বান্দা বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের) গোলাম এবং উম্মত। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। আল্লামা রুমী মসনবী শরীফে বলেছেন-

بندہ خود خواند احمد در رشاد
جملہ عالم را بخواں قل یا عباد.

অর্থাৎ সমগ্র জগতবাসীকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বান্দা বলেছেন। কুরআন শরীফে দেখুন قُلْ يَاعِبَادِ (বলে দিন, ওগো আমার বান্দাগণ) বলা হয়েছে। হাজী ইমাদুল্লাহ সাহেবের রচিত নফহায়ে মক্কিয়ার অনুবাদ শমায়েমে ইমদাদিয়ার ১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে- ইবাদুল্লাহকে ইবাদুর রসুল বলা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ الاية এখানে عِبَادِىَ এর ى সর্বনাম দ্বারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে বোঝানো হয়েছে। মৌলভী আশরাফ আলী থানবী উক্ত আয়াতের অর্থ করেছেন- আপনি বলে দিন, ওহে আমার বান্দাগণ। ازالة الخفاء গ্রন্থে শাহ ওলী উল্লাহ সাহেব আল রেয়াজুন নফ্রা ইত্যাদি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে হযরত উমর (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন-

قَدْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهٗ وَخَادِمَهٗ

অর্থাৎ আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। তখন আমি তাঁর (দঃ) বান্দা ও খাদেম ছিলাম। মছনবী শরীফে সেই ঘটনাটা উদ্ধৃত করা হয়েছে। যখন হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) হযরত বিলালকে ক্রয় করে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে আনলেন তখন আরয করলেন-

گفت مادو بندگان کوئے تو

کرد مش آزاد ہم برروئے تو.

(আমরা দু'জন হলাম আপনার দরবারের বান্দা। আমি একে আপনার সামনে আযাদ করছি।) দুর্রুল মুখতারের ভূমিকায় লেখক স্বীয় জ্ঞান অর্জনের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন-

فَانِّىْ اَرْوِيْهِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخُ عَبْدُ النَّبِىِّ الْخَلِيْلِىْ.

(আমি এটা আমার শেখ আবদুন নবী খলীলী থেকে বর্ণনা করছি। এতে বোঝা গেল যে, দুর্রুল মোখতারের লেখকের উস্তাদের নাম আব্দুন নবী ছিল। মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর শোক গাথায় মৌলভী মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী লিখেছেন-

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں

عبد سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی.

এ শে'র এর ভাবার্থ হলো যে মৌলভী রশীদ আহমদের কালো বান্দাও দ্বিতীয় ইউসুফ দাবী করে। মোট কথা হলো, গায়রুল্লাহর বেলায় বান্দা শব্দের প্রয়োগ কুরআন, হাদীছ, ফকীহগণের উক্তিসমূহ ও বিরোধিতাকারীদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে প্রমাণিত। আরববাসীরা সাধারণভাবে বলে যে عَبْدِى حُرٌّ (আমার বান্দা আযাদ) জনৈক আরব্য কবি বলেছেন- ع- اَلْوَاهِبُ الْمِائَةِ الْهِجَانِ وَعَبْدِهَا

একটি মজার কথাঃ তাকবিয়াতুল ঈমানে আলী বখশ, পীর বখশ, গোলাম আলী, মাদার বখশ, আবদুন নবী ইত্যাদি নাম রাখাকে শির্ক বলা হয়েছে। কিন্তু তাযকিরাতুর রশীদের প্রথম খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় রশীদ আহমদ সাহেবের বংশগত শাজরায় এরূপ বর্ণিত আছে 'মৌলানা রশীদ আহমদ, ইবনে মৌলানা হেদায়েত আহমদ, ইবনে কাজী পীর বখশ, ইবনে গোলাম আলী আর মায়ের দিক থেকে বংশ পরিচয় এ ভাবে লিখা হয়েছে- রশীদ আহমদ ইবনে করিমুন নিসা, বিন্তে ফরিদ বখশ ইবনে গোলাম কাদির, ইবনে মোহাম্মদ সালেহ ইব্নে গোলাম মুহাম্মদ। বলুন দেওবন্দীরা, মৌলভী-রশীদ আহমদের পারিবারিক মুরুব্বীগণ মুশরিক মুরতেদ ছিল কিনা? যদি না বলেন, তাহলে কেন? আর যদি হ্যাঁ বলেন, তাহলে ধর্মদ্রোহীর বংশ বৈধ, না অবৈধ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্থাপিত আপত্তি সমূহ এবং এর জবাব।

১নং আপত্তিঃ 'আবদ' এর অর্থ হচ্ছে আবেদ-ইবাদতকারী। তাহলে আবদুন নবীর অর্থ হবে নবীর ইবাদতকারী এবং এ ধরনের অর্থবোধক নাম সুস্পষ্ট শির্ক। সুতরাং এ ধরনের নামকরণ নিষেধ।

উত্তরঃ আবদের অর্থ আবিদ (ইবাদতকারী)ও হতে পারে, আবার খাদিমও হতে পারে। যখন আব্দ শব্দটা আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করা হবে, তখন এর অর্থ হবে আবিদ ইবাদতকারী আর যখন গায়রুল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন এর অর্থ হবে খাদিম, গোলাম ইত্যাদি। সুতরাং আবদুন নবীর অর্থ হলো নবীর গোলাম। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল কারাহিয়াতে تسمية الاولاد শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَالتَّسْمِيَةُ بِاسْمٍ يُوْجَدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى جَائِزَةٌ كَالْعَلِىِّ وَالرَّشِيْدِ وَالْبَدِيْعِ لِاَنَّهٗ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْمُشْتَرِكَةِ وَيُرَادُ فِىْ حَقِّ الْعِبَادِ مَالَايُرَادُ فِىْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

অর্থাৎ যে নাম কুরআন শরীফে পাওয়া যায়, সে নামে নামকরণ জায়েয। যেমন আলী, রশীদ, বদি। কেননা ওগুলো সংযুক্ত নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং বান্দার জন্য এ গুলোর সেই অর্থই বোঝানো হবে, যা আল্লাহর জন্য বোঝানো হবে না।

এর থেকে বোঝা গেল যে আল্লাহর নামও আলী আবার হযরত আলী (রাঃ) এর নামও আলী। অনুরূপ খোদার নামও রশীদ, বদি ইত্যাদি। আবার বান্দার জন্যও এ নাম হতে পারে। তবে আল্লাহর জন্য এ সব শব্দের অর্থ এক রকম, আর বান্দার বেলায় অন্য রকম। তদ্রূপ 'আবদুল্লাহ' এর অর্থ আল্লাহর আবিদ ইবাদতকারী আর আবদুন নবীর অর্থ নবীর গোলাম। যদি এ ধরনের প্রতিবিধান করা না যায়, তাহলে কুরআনের আয়াত مِنْ عِبَادِكُمْ এর কি অর্থ করা যেতে পারে?

২নং আপত্তিঃ মিশকাত শরীফের الادب الاسلامی অধ্যায়ে এবং মুসলিম শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড كتاب الالفاظ من الادب বর্ণিত আছে-

لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِ ىْ وَاَمَتِىْ كُلُّكُمْ عَبِيْدَاللّٰهِ وَكُلَّ النِّسَاءِكُمْ اَمَاءُاللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ وَجَارِيَتِىْ.

তোমাদের মধ্যে কেউ عَبْدِىْ (আমার বান্দা) বলিও না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সমস্ত মহিলা আল্লাহর বাঁদী। কিন্তু 'আমার গোলাম' ও 'আমার চাকরাণী' বলতে পারেন।

এর থেকে প্রতীয়মান হলো যে, 'আবদ' শব্দটি গায়রুল্লাহর প্রতি ইঙ্গিত করা হাদীছের বিপরীত, তাই হারাম। 'আবদুন নবী' নামেও এ ইঙ্গিতটা রয়েছে, তাই নিষেধ।

উত্তরঃ এ নিষেধাজ্ঞাটা হচ্ছে মাকরূহ তনযিহি পর্যায়ের, অর্থাৎ আমার বান্দা বলা ঠিক নয়, বরং আমার গোলাম বলাই শ্রেয়। উক্ত হাদীছের প্রেক্ষাপটে নববী শরহে মুসলিমে বর্ণিত আছে-

فَاِنْ قِيْلَ قَدْ قَالَ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنَّ الْحَدِيْثَ الثَّانِى لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَاَنَّ النَّهْىَ فِى الْاَوَّلِ لِلْاَدَبِ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِ لَالِلتَّحْرِيْمِ.

যদি বলা হয় যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আলামাতে কিয়ামত প্রসঙ্গে বলেছেন- বাঁদী নিজের প্রভূকে জন্ম দিবে। (অর্থাৎ বান্দাকে প্রভু বলেছেন।) এর দু'রকম উত্তর রয়েছে-

এক, দ্বিতীয় হাদীছটি বৈধতা প্রকাশার্থে এবং প্রথম হাদীছের নিষেধাজ্ঞাটা হচ্ছে সম্মান সূচক এবং মাকরূহ তানযিহি, তাহরীমা নয়। সেই একই জায়গায় মুসলিম শরীফে আছে- لَايَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرَمُ فَاِنَّ الْكَرَمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ. একই জায়গায় এটাও উল্লেখিত আছে- لَا تُسَمُّوْا الْعِنَبَ الْكَرَمَ فَاِنَّ الْكَرَمَ الْمُسْلِمُ. অর্থাৎ আঙ্গুরকে করম বল না, কেননা করমতো মুসলমান। মিশ্কাত শরীফের কিতাবুল আদব শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَا تُكْنٰى اَبَا الْحَكَم. আল্লাহতো হুকুম এবং হুকুমের মালিক তিনি। তাহলে তোমার নাম আবুল হুকুম কেন? মিশ্কাত শরীফের সেই জায়গায় আরও আছে- لَاتُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيْحًا وَلَا اَفْلَحَ. নিজের গোলামের নাম এসার (প্রাচুর্য) রাবা (উপকার) নজিহ (ধৈর্যশীল) এবং আফলাহ (সাফল্য) রেখো না।

উপরোক্ত সমস্ত হাদীছে ওই সব নামের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হয়েছে, তা মাকরূহ তানযিহি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তা নাহলে কুরআন হাদীছের মধ্যে বিশেষ করে হাদীছ সমূহের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। দেখুন, রব খোদার নাম কিন্তু কুরআন করীমে বান্দাদেরকেও রব বলা হয়েছে, যেমন-

كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا-فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ

যদি কোন ব্যক্তি কাউকে নিজের মুরুব্বী বা রব বলে, তাহলে মুশরিক হবে না। তবে এর থেকে বিরত থাকতে পারলে ভাল। কারণ এ ধরনের নামকরণ আবশ্যক নয়। অবশ্য বর্তমান যুগের দেওবন্দীদেরকে চেতানোর জন্য যদি এ রকম নাম রাখা হয়, তাহলে ছওয়াবের ভাগী হবে, যেমন হিন্দুস্থানে গাভীর কুরবানী। আমি এর বিশ্লেষণে ফাতিহা শীর্ষক আলোচনায় বলেছি যে, যেই মুস্তাহাব কাজে দ্বীনের শত্রুরা বাধা দিতে চেষ্টা করে ওটা নিশ্চয়ই করা চাই।

ইস্কাত (নামায রোজার কাফ্ফারা) এর আলোচনা

এখানে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে- ইসকাতের অর্থ ইস্কাত করার সঠিক নিয়ম এবং এর প্রমাণ। যেহেতু কতেক লোক ইস্কাতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং নানা রকম আপত্তি উত্থাপন করে, সেহেতু এ আলোচনাকেও দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে আলোকপাত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

ইস্কাতের নিয়ম ও এর প্রমাণ

এ অধ্যায়ে ইস্কাতের অর্থ, এর সঠিক নিয়ম, এর উপকার এবং এর প্রমাণ- এ চারটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইস্কাতের শাব্দিক অর্থ হলো- ফেলে দেয়া। ফিক্হ শাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থ হলো মইয়তের জিম্মায় যে সব আহ্কামে শরীয়ত অনাদায়ী রয়ে যায় ওগুলো থেকে ওকে দায় মুক্ত করা। যেমন- وجيز الصراط গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

اسقاط آں چيزاست كه دور كرده شود از ذمه ميت به ايں قدر كه ميسر شود.

(মইয়তকে যতটুকু সম্ভব দায়মুক্ত করাকে ইসকাত বলা হয়।) ইসকাতের উপকার হলো- মুসলমানের জিম্মায় শরীয়তের অনেক আহকাম ইচ্ছাকৃত কারণে, অবহেলা জনিত বা ভুল বশতঃ থেকে যায়, যা সে স্বীয় জীবনে আদায় করতে পারেনি এবং মৃত্যুর পর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। তখনতো আর আদায় করার ক্ষমতা নেই এবং রেহাই পাবারও উপায় নেই। পবিত্র শরীয়ত এ অসহায় মৃত ব্যক্তির সাহায্যার্থে কিছু নিয়ম বর্ণনা করেছেন। যদি মৃত ব্যক্তির অলী সেই নিয়ম অনুসারে আমল করে, তাহলে মৃত বেচারা রেহাই পেতে পারে। এ নিয়মটার নাম ইসকাত। এটা আসলে মইয়তের জন্য এক প্রকার সাহায্য। দেওবন্দী ওহাবীরা যেভাবে জীবিত মুসলমানের শত্রু, তদ্রূপ মৃতদেরও শত্রু। তারা মইয়তের উপকার করা থেকে লোকদেরকে বাধা দেয়। মোট কথা মৃত্যুর পরও তাদের পিছু ছাড়ে না। ইসকাতের নিয়ত হচ্ছে- প্রথমে মৃত ব্যক্তির বয়স নির্ণয় করুন। অতঃপর এর থেকে মহিলার বেলায় নয় বছর এবং পুরুষের বেলায় বার বছর বাদ দিন। এখন যত বছর অবশিষ্ট আছে, এতে হিসাব করে

দেখুন কত দিন সে বেনামাযী বা বেরোযাদার ছিল। অথবা নামাযের উপযুক্ত হওয়ার পর কি পরিমাণ সে নামায পড়েনি এবং এর কাযা আদায় করেনি। এর একটা আনুমানিক হিসাব নির্ণয় করুন। সেই হিসাব অনুপাতে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য ১৭৫ টাকায় যতগুলো আট আনি হয়, সেই ওজনের গম দান করে দিন। অর্থাৎ ফিত্রার জন্য যে হার নির্ধারিত, নামায-রোযার ফিদ্য়ার জন্যও তা প্রযোজ্য। তাহলে এক দিনে ছয় নামাযের (পাঁচ ফরয, এক ওয়াজিব-বিতির) জন্য ফিদ্য়া আসে প্রায় বার সের গম, এক মাসের জন্য আসে প্রায় নয় মণ গম এবং বছরের জন্য আসে প্রায় ১০৮ মণ গম। যদি কারো জিম্মায় বিশ বছরের নামায অনাদায় থেকে যায়, তাহলে কয়েক হাজার মন গম খয়রাত করতে হবে। হয়ত কোন বড় ধনীর পক্ষে তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু গরীবের জন্য তা অসম্ভব। তাদের জন্য একটি উপায় হলো মইয়তের অলি সামর্থানুসারে গম বা এর সমমূল্য টাকা নিবে এবং কোন মিসকিনকে দিয়ে দিবে। সেই মিসকিন আবার অন্য মিসকিনকে বা স্বয়ং মালিককে দান করবে। সে পুনরায় সেই ফকীরকে সাদ্কা দিবে। প্রত্যেক বার সাদ্কায় এক মাসের নামাযের ফিদ্য়া আদায় হয়ে যাবে। এ ভাবে ১২ বার সদ্কা করলে, এক বছরের ফিদ্য়া আদায় হয়ে গেল। এ ভাবে কয়েকবার আদান প্রদান করলে সম্পূর্ণ ফিদ্য়া আদায় হয়ে যাবে। নামাযের ফিদ্য়া আদায় করার পর এভাবে রোযার ফিদ্য়া আদায় করুন। এতে আশা করা যায় দয়াময় আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন। এটাই হচ্ছে ইসকাতের সঠিক নিয়ম। পাঞ্জাবে সাধারণভাবে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে মসজিদ থেকে এক কপি কুরআন শরীফ সংগ্রহ করে এর উপর একটি টাকা রাখে এবং কয়েক জন লোক এতে হাত লাগায়। অতঃপর পুনরায় কুরআন শরীফটা মসজিদে ফেরত দেয়। এ রকম করার দ্বারা নামাযের ফিদ্য়া আদায় হবে না। কুরআন অমূল্যবান। যদি কুরআন শরীফের একটি কপি খয়রাত করে দেয়া হয়, তাহলে সব নামাযের ফিদ্য়া আদায় হয়ে গেল। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। কেননা এখানে তো কুরআনের কাগজ ও মুদ্রণ খরচটাই বিবেচ্য। যদি এ কপিটার দাম দুই টাকা হয়, তাহলে দু'টাকা দানেরই ছওয়াব পাবে। তা নাহলে ওই সমস্ত ধনীরা যাদের হাজার হাজার টাকা যাকাত ওয়াজিব হয়, তারা এত টাকা খরচ করতে যাবে কেন, কেবল একটি কুরআন শরীফ দান করে দিলেই হলো। মোট কথা হলো এ নিয়ম বিশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ এর দ্বারা ইস্কাতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তবে একে হারাম বলা যাবে না। কোন কিছুকে বিনা দলীলে কেবল নিজস্ব রায় দ্বারা হারাম বলা দেওবন্দী মহারথীদের কাজ।

বিঃদ্রঃ- আমি ফিদ্য়ার যে পরিমাণ বর্ণনা করেছি অর্থাৎ ছয় নামাযের জন্য বার সের গম, তা প্রত্যেক জায়গার জন্য প্রযোজ্য নয়। এক নামাযের ফিদ্য়া হচ্ছে ১৭৫

টাকা পরিমাণ আট আনি ওজনের গম। সেই অনুপাতে নিজ নিজ এলাকায় প্রচলিত পরিমাপ মুতাবিক আদায় করতে হবে।

ইস্‌কাতের প্রথম অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে হারাম থেকে রেহাই, ছওয়াব অর্জন বা শরীয়তের কোন প্রয়োজনীয় কাজ পূর্ণ করার জন্য শরয়ী হীলা জায়েযের প্রমাণ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামাযের ফিদ্‌য়া জিনিস দ্বারা আদায় হওয়ার প্রমাণ এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বয়ং ইস্‌কাতের প্রমাণ দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শরয়ী হীলা জায়েয প্রসঙ্গে

প্রয়োজনবোধে শরয়ী হীলা জায়েয। কুরআন করীম, সহীহ হাদীছ ও ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তিতে এর প্রমাণ রয়েছে। হযরত আয়ুব (আঃ) শপথ করেছিলেন যে তাঁর বিবিকে একশ দুর্রা মারবেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন-একটি ঝাড়ু নিয়ে ওকে মার এবং নিজের শপথ ভঙ্গ করো না। কুরআন শরীফ এ কাহিনীটা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ.

(তুমি নিজ হাতে ঝাড়ু নিয়ে ওকে মার এবং শপথ ভঙ্গ করো না।) হযরত ইউসুফ (আঃ) মনস্থ করেছিলেন যে তাঁর ছোট ভাই বিনামিনকে তাঁর কাছে রাখতে এবং রহস্যও যেন উৎঘাটিত না হয়। এ জন্য তিনি একটি হীলার আশ্রয় নিয়েছিলেন যার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা ইউসুফে করা হয়েছে। একবার হযরত সারা (রাঃ) কসম করেছিলেন যদি আমি সুযোগ পাই, হযরত হাজরার (রাঃ) কোন অঙ্গহানি ঘটাবো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি ওহী নাযিল হলো "তাদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ করে দাও।" হযরত সারা (রাঃ) বললেন 'আমি যে কসম করেছি।" তখন তাকে হযরত হাজেরা (রাঃ) এর কর্ণ ছেদন করার পরামর্শ দেয়া হলো।

মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল বুয়ুর এর الربوا। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হযরত বিলাল (রাঃ) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে ভাল খোরমা আনলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জানতে চাইলেন এগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছে। আরয করলেন 'আমার কাছে কিছু বাজে খোরমা ছিল, আমি এক

জনকে ওখান থেকে দু'সায়া (প্রায় আট কে,জি) দিয়ে এক সায়া ভাল খোরমা নিয়েছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমালেন- এটা সুদ হয়ে গেছে। আগামীতে বাজে খোরমাগুলো পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করবে এবং ওই পয়সা দিয়ে ভাল খোরমা ক্রয় করবে। দেখুন; এটা সুদ থেকে রেহাই পাবার একটি হীলা (পন্থা)। ফাত্‌ওয়ায়ে আলমগীরীতে হীলা সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করা হয়েছে, যার নাম দেয়া হয়েছে كتاب الحيل. অনুরূপ 'আল আশবাহ ওয়ান নজায়ের' কিতাবেও 'কিতাবুল হাইল' নামে একটি অধ্যায় রয়েছে। ফাত্‌ওয়ায়ে আলমগীরীর কিতাবুল হাইল অধ্যায়ে ও যাখীরা গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي مكروهة وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة والأصل في جواز هذا النوع من الحيل قول الله تعالى وخذ بيدك ضغثا وهذا تعليم المخرج لأيوب النبي وعامة المشايخ على أن حكمها ليس بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب.

যদি কারো হক আত্মসাৎ বা এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বা অবৈধভাবে ধোঁকা দেয়ার জন্য হীলা করা হয়, তা মাকরূহ হবে। আর যে হীলা হারাম থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বা হালালের উপর অটল থাকার জন্য করা হয়, তা ভাল। এ ধরনের হীলা জায়েয হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহর সেই বাণী خذ بيدك ضغثا (নিজের হাতে একটি ঝাড়ু নিয়ে ওকে মার) হযরত আয়ুব (আঃ)কে শপথ রক্ষার জন্য এ পরামর্শটা দেয়া হয়েছিল। অধিকাংশ মাশায়েখের অভিমত হচ্ছে এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়নি এবং এটাই সঠিক অভিমত।

اشباه شرح حموی এবং تاتارخانیه কিতাবদ্বয়ে হীলা সম্পর্কে খুবই সুন্দর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলা হয়েছে-

وعن ابن عباس انه قال وقعت وحشة بين هجرة وسارة

فَحَلَفَتْ سَارَةُ اِنْ ظَفِرَتْ بِهَا قَطَعَتْ عُضْوًا مِنْهَا فَاَرْسَلَ اللّٰهُ جِبْرِيْلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ هُمَا فَقَالَتْ سَارَتْ مَا حِيْلَةُ يَمِيْنِىْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يَاْمُرَ سَارَةَ اَنْ تَثْقُبَ اُذُنَىْ هَاجِرَةَ فَمِنْ ثَمَّ تُثْقَبُ الْاَذُنِ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত সারা (রাঃ) ও হযরত হাজেরা (রাঃ) এর মধ্যে কিছু একটা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। তখন হযরত সারা (রাঃ) কসম খেয়েছিল- "যদি আমার সুযোগ মিলে, তাহলে হাজেরার কোন অঙ্গ কেটে দেব।" আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর মারফৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে নির্দেশ দিলেন যেন ওদের পরস্পরের মধ্যে আপোষ করে দেন। হযরত সারা (রাঃ) আরয করলেন,তাহলে আমার কসমের কি সূরহা হবে? তখন হযরত ইব্রাহীমের উপর ওহী নাযিল হলো- হযরত সারা (রাঃ)কে নির্দেশ দাও যেন সে হযরত হাজেরার (রাঃ) কর্ণ ছেদন করে'। এ সময় থেকে মহিলাদের কান ছেদন শুরু হয়।

উপরোক্ত কুরআনী আয়াত, সহীহ হাদীছ ও ফকীহ ইবারত সমূহ থেকে শরয়ী হীলা জায়েয বোঝা গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রোযা নামাযের ফিদ্য়ার বর্ণনা

রোযার ফিদ্য়ার কথাতো কুরআন থেকেই প্রামাণিত আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ .

অর্থাৎ রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির ফিদ্য়া হচ্ছে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করা। এর থেকে বোঝা গেল অপারগ, বৃদ্ধ এবং মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগী যখন রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তখন প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার দেবে। নামায রোযার তুলনায় অগ্রগণ্য। এ জন্য রোযার হুকুমটা নামাযের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। যেমন তাফসীরাতে আহমদীয়া শরীফে আল্লামা মোল্লা আহমদ জিয়ুন

(কুঃ) বলেছেন-

وَالصَّلٰوةُ نَظِيْرُ الصَّوْمِ بَلْ اَهَمُّ مِنْهُ فَاَمَرْنَاهُ بِالْفِدْيَةِ اِحْتِيَاطًا وَرَجَوْنَا الْقَبُوْلَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَضْلًا .

(নামায রোযার মত বরং রোযা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমি এ ক্ষেত্রেও ফিদ্য়া দেয়ার জন্য সতর্কতা স্বরূপ নির্দেশ দিয়েছি এবং খোদার রহমতে কবুল হওয়ার আশা রাখি।) মেনার গ্রন্থে বর্ণিত আছে- وَوُجُوْبُ الْفِدْيَةِ فِى الصَّلٰوةِ لِلْاِحْتِيَاطِ . নামাযের জন্য ফিদ্য়া ওয়াজিব হওয়াটা হচ্ছে সতর্কতামূলক। প্রসিদ্ধ ফিক্‌হের কিতাব শরহে বেকায়ায় উল্লেখিত আছে-

وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلٰوةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ وَهُوَ الصَّحِيْحُ .

(প্রত্যেক নামাযের ফিদ্য়া হচ্ছে এক রোযার ফিদ্য়ার মত এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।) শরহে ইলিয়াসে বর্ণিত আছে-

وَيُعْتَبَرُ فِدْيَةُ كُلِّ صَلٰوةٍ فَائِتَةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ اَىْ كَفِدْيَةِ يَوْمٍ .

(প্রত্যেক অনাদায়ী নামাযের ফিদ্য়ার হার এক দিনের রোযার মত অর্থাৎ এক রোযার ফিদ্য়ার মত।) ফতহুল কদীর কিতাবে বর্ণিত আছে-

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَاَوْصٰى بِهِ اُطْعِمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ لِاَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْاَدَاءِ وَكَذٰلِكَ اِذَا اَوْصٰى بِالْاِطْعَامِ عَنِ الصَّلٰوةِ .

অর্থাৎ যেই ব্যক্তি রমযানের রোযা কাযা রেখে মারা গেল। যদি ওসীয়ত করে যায়, তাহলে তার পক্ষে তার ওলী (আপন জন) প্রতি দিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আধা সায়া (প্রায় দুই কেজি) গম বা এক সায়া খোরমা অথবা বার্লি প্রদান করবে, কেননা এখন সেই মৃত ব্যক্তি আদায় করা থেকে অপারগ হয়ে গেছে। নামাযের বেলায়ও অনুরূপ করবে, যদি সে কাযা নামাযের পরিবর্তে খাবার প্রদানের ওসীয়ত করে যায়। তাহতাবী আলা মরাকিল ফালাহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে-

اِعْلَمْ اَنَّهُ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِى الصَّوْمِ بِاِسْقَاطِهِ بِالْفِدْيَةِ

وَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشَائِخِ عَلٰى اَنَّ الصَّلٰوةَ كَالصَّوْمِ اِسْتِحْسَانًا
وَاِذَا عَلِمْتَ ذٰلِكَ تَعْلَمُ جَهْلَ مَنْ يَقُوْلُ اِنَّ اِسْقَاطَ الصَّلٰوةِ
لَا اَصْلَ لَهٗ اِذْ هٰذَا اِبْطَالٌ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَذْهَبِ.

উপরোক্ত ইবারত সমূহ থেকে বোঝা গেল যে নামায ও রোযার ফিদ্‌য়া দেয়া জায়েয এবং কবুল হওয়ার আশা করা যায়। বিভিন্ন হাদীছ শরীফেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন আল্লামা নাসায়ী (রঃ) স্বীয় সুনানে কুবরা ও আল্লামা আবদুর রাযযাক (রঃ) কিতাবুল ওসায়ায় সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-

لَا يُصَلِّيْ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ اَحَدٌ عَنْ اَحَدٍ وَلٰكِنْ يُطْعِمُ
عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

(কেউ কারো পক্ষে নামায পড়ো না, রোযা রেখো না। কিন্তু ওর পক্ষে প্রতি দিনের পরিবর্তে অর্ধ সায়া গম দান করে দেবে।) মিশকাত শরীফের কিতাবুস সাওমের القضاء শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ.

(যে ব্যক্তি মারা গেল এবং তার জিম্মায় রমযান মাসের রোযা অনাদায়ী রয়ে গেল, তাহলে তার পক্ষ থেকে প্রতি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার প্রদান করা চাই।) মোট কথা হলো নামায রোযার ফিদ্‌য়া জিনিসের দ্বারা আদায় করার কথা শরীয়তে বর্ণিত আছে। তাই একে অস্বীকার করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্‌কাতের প্রমাণ

ইস্‌কাতের নিয়ম আমি প্রথমে বর্ণনা করেছি। এর প্রমাণ প্রায় প্রত্যেক ফিক্‌হের কিতাবে রয়েছে। নুরুল ইজাহ গ্রন্থে ইস্‌কাত বিষয়ে একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ করা হয়েছে فَصْلٌ فِيْ اِسْقَاطِ الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ (নামায রোযার ইস্‌কাত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ) উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

وَلَا يَصِحُّ اَنْ يَصُوْمَ وَلَا اَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ وَاِنْ لَمْ يَفِ مَا اَوْصٰى
بِهٖ عَمَّا عَلَيْهِ يَدْفَعُ ذٰلِكَ الْمِقْدَارَ لِلْفَقِيْرِ فَيَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ
بِقَدْرِهٖ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيْرُ وَهٰكَذَا حَتّٰى يَسْقُطَ مَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ
مِنْ صِيَامٍ وَصَلٰوةٍ وَيَجُوْزُ اِعْطَاءُ فِدْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً
بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ.

(এর তরজুমা সেটাই যা আমি ইসকাতের নিয়ম প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি) দুর্‌রুল মুখতারের قَضَاءُ الْفَوَائِتِ অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

وَلَوْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا يَسْتَقْرِضُ وَارِثُهٗ نِصْفَ صَاعٍ مَثَلًا
وَيَدْفَعُهٗ لِفَقِيْرٍ ثُمَّ يَدْفَعُهُ الْفَقِيْرُ لِلْوَارِثِ ثُمَّ وَثُمَّ حَتّٰى يَتِمَّ.

(এর অর্থও ইসকাতের নিয়মে বর্ণিত হয়েছে) এর ইবারতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শামীতে আরও ব্যাপকভবে ইস্‌কাতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন উল্লেখিত আছে-

وَالْاَقْرَبُ اَنْ يُحْسَبَ مَا عَلَى الْمَيِّتِ وَيَسْتَقْرِضَ بِقَدْرِهٖ بِاَنْ
يُقَدِّرَ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ اَوْ سَنَةٍ اَوْ بِحَسَبِ مُدَّةِ عُمْرِهٖ بَعْدَ اِسْقَاطِ
اِثْنَيْ عَشَرَ سَنَةً لِلذَّكَرِ وَتِسْعِ سِنِيْنَ لِلْاُنْثٰى لِاَنَّهَا اَقَلُّ مُدَّةِ
بُلُوْغِهِمَا فَيَجِبُ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ نِصْفُ غِرَارَةِ فَتْحِ الْقَدِيْرِ
بِالْمُدِّ الدِّمَشْقِيِّ مِنْ زَمَانِنَا وَلِكُلِّ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ سِتُّ غَرَائِرَ
فَيَسْتَقْرِضُ قِيْمَتَهَا وَيَدْفَعُهَا لِلْفَقِيْرِ ثُمَّ يَسْتَوْهِبُهَا مِنْهُ
وَيَتَسَلَّمُهَا مِنْهُ لِتَتِمَّ الْهِبَةُ ثُمَّ يَدْفَعُهَا لِذٰلِكَ الْفَقِيْرِ اَوْ لِفَقِيْرٍ
اٰخَرَ وَهٰكَذَا فَيَسْقُطُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ بَعْدَ ذٰلِكَ يُعِيْدُ
الدَّوْرَ بِكَفَّارَةِ الصِّيَامِ ثُمَّ الْاُضْحِيَّةِ ثُمَّ الْاَيْمَانِ لٰكِنْ لَا يُدْفَعُ
كَفَّارَةُ الْاَيْمَانِ مِنْ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ بِخِلَافِ فِدْيَةِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّهٗ
يَجُوْزُ اِعْطَاءُ فِدْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ

অর্থাৎ এর সহজ নিয়ম হলো- মইয়তের জিম্মায় কি পরিমাণ নামায ও রোযা

ইত্যাদি রয়ে গেল, তা হিসাব করুন এবং সেই অনুপাতে কর্জ নিন। অর্থাৎ এক এক মাস অথবা এক এক বছরের অনুপাতে কর্জ নিন। মইয়তের পূর্ণ বয়সের একটা অনুমান করুন এবং সেই পূর্ণ বয়স থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত কমপক্ষে পুরুষের বেলায় বার বছর আর মহিলার ক্ষেত্রে নয় বছর বাদ দিন। অতঃপর হিসাব করুন। তখন প্রতি মাসের নামাযের ফিদ্‌য়া হবে অর্ধ অযারা (প্রায় ৯ মণ) এবং প্রত্যেক বছরের কাফ্‌ফারা হবে ছয় আরা। মৃত ব্যক্তির অলী ওই পরিমাণ সমতুল্য মুদ্রা কর্জ নিবে এবং ফকীরকে ইস্‌কাতের উদ্দেশ্যে দিবে। ফকীর পুনরায় ওকে ফেরৎ দিবে তখন অলী উক্ত হেবা গ্রহণ করে এর অধিকারী হবে। পুনরায় সেই মুদ্রা সেই ফকীরকে বা অন্য কাউকে ফিদ্‌য়া হিসেবে দিবে। এবং এভাবে বার বার করতে থাকবে। এতে প্রত্যেক বার এক বছরের কাফ্‌ফারা আদায় হবে। এর পর রোযা ও কুরবানীর কাফ্‌ফারার জন্য করা হবে। তবে কসমের কাফ্‌ফারার বেলায় নামাযের ফিদ্‌য়ার ব্যতিক্রম দশজন মিসকীন হওয়া প্রয়োজন অথচ কয়েক নামাযের ফিদ্‌য়া একজনকে দেয়া যায়।

এটা হুবহু সেই নিয়মই, যেটা আমি বর্ণনা করেছি। আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

اَرَادَ الْفِدْيَةَ عَنْ صَوْمِ اَبِيْهِ اَوْصَلٰوتِهٖ وَهُوَ فَقِيْرٌ يُّعْطِىْ مَنْوَيْنِ مِنَ الْحِنْطَةِ فَقِيْرًا ثُمَّ يَسْتَوْهِبُهٗ ثُمَّ يُعْطِيْهِ وَهٰكَذَا اِلٰى اَنْ يُّتِمَّ.

'মরাকিল ফালাহ শরহে নুরুল ইজাহ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে-

فَحِيْلَتُهٗ لِاِبْرَاءِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ عَنْ جَمِيْعِ مَا عَلَيْهِ اَنْ يَّدْفَعَ ذَالِكَ الْمِقْدَارَ الْيَسِيْرَ بَعْدَ تَقْدِيْرِهٖ بِشَيْئٍ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَلٰوةٍ اَوْ نَحْوِهٖ وَيُعْطِيْهِ لِلْفَقِيْرِ بِقَصْدِ اِسْقَاطِ يُرَدُّ عَنِ الْمَيِّتِ ثُمَّ بَعْدَ قَبْضِهٖ يَهَبُهُ الْفَقِيْرُ لِلْوَلِىِّ اَوْ لِلْاَجْنَبِىِّ وَيَقْبِضُهٗ ثُمَّ يُدْفَعُهٗ. اَلْمَوْهُوْبُ لَهٗ لِلْفَقِيْرِ بِجِهَةِ الْاِسْقَاطِ مُتَبَرِّعًا بِهٖ عَنِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يَهَبُهُ الْفَقِيْرُ لِلْوَلِىِّ-

(ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে, সেটাই এর তরজুমা) ফাত্‌ওয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত

আছে-

وَاِنْ لَّمْ يَتْرُكْ مَالًا يَسْتَقْرِضُ وَرَثَتُهٗ نِصْفَ صَاعٍ وَّيَدْفَعُ اِلٰى مِسْكِيْنٍ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ مِسْكِيْنٌ عَلٰى بَعْضِ وَرَثَتِهٖ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ حَتّٰى يَتِمَّ الْكُلُّ كَذَا فِى الْخُلَاصَةِ.

বাহারুর রায়েক শরহে কনযুদ দাকায়েক, জামেউর রমুয, মুতমেদুর যহিরা শরহে মুখতাসারুল কেফায়া, ফাত্‌ওয়ায়ে কাযী খান, ফরায়েদ, জওয়াহেরুল কাউলুল মুখতাসর ইত্যাদি ফিক্‌হের কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে মনে করে সে সবের ইবারত উদ্ধৃত করা হলো না। তবে বিবেকবানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এবার বিরোধিতাকারীদের অগ্রদূত মওলভী রশীদ আহমদ সাহেব গাঙ্গুহীর ফাত্‌ওয়াটিও দেখুন। তিনি ফাতওয়ায়ে রশীদিয়ার প্রথম খণ্ড কিতাবুল বিদ্‌আতের ১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন- উলামায়ে কিরাম গরীবের জন্য ইস্‌কাতের হীলাটা প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু আজকাল এ হীলা ধনীদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা নিয়ত সম্পর্কে অবগত। এ হীলা তাদের কোন কাজে আসবে না। গরীবের বেলায় সঠিক নিয়তে করা হলে উপকার হবে বলে আশা করা যায়, অন্যথায় বৃথা"

যদিওবা উপরোক্ত ইবারতে অনেক কুটিলতার আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু জায়েয মেনে নিয়েছেন। সুতরাং এখন আর কোন দেওবন্দীর পক্ষে ইস্‌কাতের উপর আপত্তি করার অধিকার রইলো না। গরীব হওয়ার শর্তটা মওলবী রশীদ আহমদ নিজ থেকে আরোপ করেছেন। আমি যে সমস্ত ফকীহগণের ইবারত উদ্ধৃত করেছি, ওখানে 'গরীব' এর শর্ত নেই। ধনী ব্যক্তিও যদি পূর্ণ ফিদ্‌য়া আদায় করে, তাহলে সমস্ত তরকা এতেই ব্যয় হয়ে যাবে। ওয়ারিছদের জন্য কিছুই থাকবে না। আর যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে যায় 'আমার পক্ষে ফিদ্‌য়া যেন দেয়া হয়' তথাপি এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদ ওসীয়তের ক্ষেত্রে খরচ করা জায়েয নেই। যদি এক তৃতীয়াংশ মালের দ্বারা নামাযের ফিদ্‌য়া আদায় না হয়, তাহলে হীলা করাতে কি অসুবিধা আছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইস্কাত প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ এবং এ সবের জবাব

এ বিষয়ে কাদিয়ানী ও দেওবন্দী জমাতের কিছু আপত্তি রয়েছে। তবে তারা কোন উল্লেখযোগ্য আপত্তি উত্থাপন করতে পারেনি। কেবল গলাবাজী করেছে মাত্র। তবুও সরল প্রাণ মুসলমানেরা যাতে সন্দিহান হয়ে না পড়ে সে জন্য ও সবের জবাব দিচ্ছি।

১নং আপত্তিঃ হীলা করা খোদা ও মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার মত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান- يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (এসব মুনাফিকগণ আল্লাহ ও মুমিনদেরকে ধোঁকা দিতে চাহে। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করছে না, তা তারা বুঝতে পারে না।) এটা কি ভাবে সম্ভব যে অল্প মালের বিনিময়ে সম্পূর্ণ জিন্দেগীর নামায মাফ হয়ে যাবে?

উত্তরঃ হীলাকে ধোঁকা বলা মূর্খতার পরিচায়ক। হীলার অর্থ হচ্ছে শরীয়তের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার জন্য শরয়ী তদবীর, যেরূপ উদ্ধৃত [illegible] (রিয়াজের আশায় মৃত্যুর বাহানা) বলে। শরয়ী হীলা তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা শিখিয়েছেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তালীম দিয়েছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা আমি প্রথম অধ্যায়ে করেছি। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কাউকে ধোঁকা দেয়ার জন্য হীলা করা গুণাহ। কিন্তু শরয়ী প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার জন্য বা হারাম থেকে বাঁচার জন্য তদবীর করা ছওয়াবের কাজ। কোন জায়গায় মসজিদ তৈরী হচ্ছে, টাকার বিশেষ প্রয়োজন; যাকাতের টাকা এ ক্ষেত্রে ব্যয় করা যাবে না। তবে কোন ফকীরকে যাকাতের টাকা দিন; সে এর অধিকারী হয়ে নিজের পক্ষ থেকে মসজিদের জন্য খরচ করলো; এতে কাউকে ধোঁকা দেয়া হলো না, কারো মালও আত্মসাৎ করা হলো না। কেবল শরয়ী প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা হলো। পাওয়ার হীলা করাটা খারাপ, কিন্তু দেওয়ার হীলা করাটা ভাল। এখানে গরীবদেরকে দেয়ার হীলা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার রহমতও হীলা দ্বারা প্রাপ্ত হয়। رحمت حق بہانہ می طلبد খোদার রহমত বাহানা চাহে, মূল্য চাহে না। আপত্তিতে উত্থাপিত আয়াত يُخٰدِعُوْنَ মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা

কলেমায়ে ঈমানীকে নিজেদের জন্য ঢাল বানিয়েছিল এবং অন্তরে কাফির ছিল। মুসলমানদের ভাল ও শরয়ী আমলসমূহের ক্ষেত্রে ওই ধরনের ধারণা করা মারাত্মক অপরাধ। ইস্কাতের মালের দ্বারা নামায মাফ হয় না। বরং মৃত ব্যক্তি জীবনকালে নামায পড়ার বেলায় অবহেলার কারণে যে অপরাধী হয়ে গেছে, তা এখন মৃত ব্যক্তির পক্ষে আদায় করা সম্ভব নয়। সে এখন অপরাধী। সেই অপরাধ মাফ করার জন্যই এ হীলা করা হয়। কেননা [illegible] মিশকাত শরীফে [illegible] শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, যার জুমার নামায কাযা হয়ে যাবে, সে যেন এক দিনার দান করে। এবং মিশকাত শরীফের [illegible] অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবকালীন সহবাস করে সে যেন এক দিনার বা অর্ধ দিনার দান করে দেয়। এই খয়রাত হচ্ছে সেই পাপেরই কাফ্ফারা, আর বদলা অসম্ভব হয়ে গেছে। যদি আমরা বলতাম যে মানুষ জীবিত অবস্থায় ভবিষ্যতের নামাযসমূহের জন্য ফিদ্য়া বাবত সম্পদ দান করুক এবং নামায না পড়ুক, তখন এটা বলা শোভা পেত যে মালের দ্বারা নামায মাফ করানো হয়েছে।

২নং আপত্তিঃ নামায-রোযা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত আর ফিদ্য়া হচ্ছে বস্তু বিশেষ। অথচ বস্তু শারীরিক ইবাদতের ফিদ্য়া কিছুতেই হতে পারে না। সুতরাং এ হীলা বাতুলতা মাত্র।

উত্তরঃ এ কিয়াসটা কুরআনী আয়াতের বিপরীত। যেমন কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান: وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (যারা এ রোযা রাখতে অক্ষম, তাদের জন্য এর পরিবর্তে ফিদ্য়া একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্যদান।) খোদার হুকুমের বিপরীত মনগড়া অনুমান করা শয়তানের কাজ। আল্লাহ শয়তানকে হুকুম করেছিলেন হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করার জন্য। কিন্তু শয়তান আল্লাহর হুকুমের বিপরীত নিজস্ব কিয়াস করেছিল। তাই মরদুদ হয়ে গেল। শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময় বস্তু হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। আমরা কারো দ্বারা কোন কাজ করালে এর পরিবর্তে বস্তু প্রদান করি। কোন কোন সময় জানের পরিবর্তেও বস্তু প্রদান করা হয়। শরীয়তে কোন কোন কাফফারা কিয়াসেরও বিপরীত হয়ে থাকে। কোন নামাযী প্রথম তাশাহুদ ভুলে গেলে, সে সিজ্দায়ে সুহু দেবে। কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে যিহার করলো (স্ত্রীকে মা-বোনের মত বললো) সে এর কাফ্ফারায় ষাটটি রোযা রাখবে। কোন হাজী ইহরাম অবস্থায় শিকার করলো, তিনি এর কাফ্ফারা স্বরূপ উক্ত শিকারের মূল্য খয়রাত করবেন, অথবা রোযা রাখবেন। এ সমস্ত কাফ্ফারা কিয়াসের বিপরীত। কিন্তু শরীয়ত যখন নির্ধারিত করেছে, তা মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।

৩ নং আপত্তি ঃ ইসকাতের দ্বারা মানুষ বেনামাযী হয়ে যাবে। কেননা যখন ওদের জানা হয়ে যাবে যে ওদের মৃত্যুর পর ওদের নামাযের ইস্‌কাত সম্ভব,তাহলে ওরা নামাযের কষ্ট স্বীকার করতে যাবে কেন? সুতরাং এ পন্থা বন্ধ হওয়া চাই।

উত্তর ঃ এ আপত্তিটা এ রকমই, যেমন আর্যরা ইসলাম সম্পর্কে আপত্তি করেছিল- যাকাতের মাসআলার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বেকার সৃষ্টির সহায়তা করে এবং তওবার মাসআলার দ্বারা মানুষ গুণাহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। কেননা যখন গরীবের জানা হয়ে যাবে যে বিনা কষ্টে যাকাতের মাল পাওয়া যাবে, তাহলে কষ্ট করতে যাবে কোন্ দুঃখে? অনুরূপ মানুষ যখন জেনে ফেললো যে তওবার দ্বারা গুণাহ্ মাফ হয়ে যায়, তাহলে বেশী করে গুণাহের কাজ করবে। ইস্‌কাত প্রসঙ্গে আপত্তিটাও অনুরূপ। যে ব্যক্তি ফিদ্‌য়ার বলে বলীয়ান হয়ে নামাযের প্রয়োজন বোধ করে না সে কাফির হিসাবে গণ্য। আর এ মাল হচ্ছে নামাযের ফিদ্‌য়া, কুফ্‌রীর নয়। আর যদি কোন ব্যক্তি কোন সঠিক মাসআলার ভ্রান্ত প্রয়োগ করে, এর জন্য প্রয়োগকারীই দায়ী, মাসআলা নয়। এ ইস্‌কাতের মাসআলাটি শত শত বছর থেকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এমন কোন মুসলমানতো পেলাম না, যিনি ইস্‌কাতের আশায় নামায থেকে উদাসীন হয়ে গেছে।

৪নং আপত্তিঃ বনী ইসরাঈলের কতেক লোক হীলা (ফন্দি) করে মাছ শিকার করেছিল, যার জন্য তাদের প্রতি খোদায়ী গযব নাযিল হয়েছিল এবং ওদেরকে বানরে পরিণত করা হয়েছিল- كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ বোঝা গেল যে হীলা বড় গুনাহের কাজ এবং খোদায়ী গযবের সহায়ক।

উত্তরঃ বনী ইসরাঈলের জন্য হীলা হারাম হওয়াটাও একটি আযাব ছিল, যেমন অনেক মাংস তাদের জন্য হারাম ছিল। আর উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য বৈধ হীলা সমূহ হালাল হওয়াটা খোদার রহমতই বলতে হয়। অধিকন্তু ওরা হারামকে হালাল করার জন্য হীলা করেছিল অর্থাৎ বুধবার ওদের জন্য মাছ শিকার হারাম ছিল। এ রকম হীলা এখনও নিষিদ্ধ।

৫নং আপত্তিঃ কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান- لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰى (মানুষ তাই পায়, যা সে করে।) অথচ ইস্‌কাত হচ্ছে মৃতব্যক্তি নামায পড়লো না আর ওর আওলাদ টাকা পয়সা খরচ করে ওকে গুনাহ থেকে মুক্ত করে দিল। এতে বোঝা যায়- এ হীলাটা কুরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

উত্তরঃ এর উত্তর 'ফাতিহা' শীর্ষক আলোচনায় দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের

কয়েকটি বিশ্লেষণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো উক্ত আয়াতে ل (লাম) দ্বারা স্বত্ব বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ মানুষ স্বীয় উপার্জনেরই স্বত্বাধিকারী,অপরের দান খয়রাত ওর আওতাধীন নয়। অপরের দানের আশায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা বোকামীরই নামান্তর।

بعدمرنےکے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے
فاتحہ کو قبر پھر کوئے ائے یا نہ ائے ۔

অর্থাৎ মরণের পর অপরের সাহায্যের আশা ত্যাগ করুন। তোমার কবরে ফাতিহা পাঠ করতে কেউ আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে।

অথবা, উল্লেখিত আয়াতটি শারীরিক ইবাদত প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কারো পক্ষে নামায আদায় করে বা রোযা রাখে তাতে ওর ফরজ নামায-রোযা আদায় হবে না। উক্ত আয়াতের এ ধরনের বিশ্লেষণ যদি করা না হয়, তাহলে এ আয়াতটি অনেক আয়াত ও হাদীছের বিপরীত সাব্যস্ত হবে। কুরআন করীম মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যেন মুমিনীন ও মা-বাপের জন্য দুআ করে। জানাযার নামাযও মৃত ব্যক্তি ও সমস্ত মুসলমানের জন্য দুআ স্বরূপ। বিভিন্ন হাদীছে মইয়তের পক্ষে দান খয়রাত করার নির্দেশ রয়েছে। এর পূর্ণ বিশ্লেষণ আমার ফাত্‌ওয়ার কিতাবে (ফাত্‌ওয়ায়ে নাঈমীয়া) দেখুন।

বিশেষ বক্তব্য- কোন কোন জায়গায় প্রচলিত আছে-যদি কোন মুসলমান জুমার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন মারা যায়, তাহলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ তাঁর কবরের পাড়ে হাফিজ নিয়োগ করে জুমাবার পর্যন্ত কুরআন খানির আয়োজন করে থাকে। কতেক দেওবন্দী একেও হারাম বলে। কিন্তু এ হারাম বলাটা সঠিক নয়। কবরের কাছে কুরআন খানি করার মধ্যে অনেক ছওয়াব নিহিত রয়েছে। এর মূল হচ্ছে মিশ্‌কাত শরীফের عذاب القبر শীর্ষক আলোচনার সেই হাদীছটি যখন মইয়তকে কবরে রাখা হয় وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحٰبُهُ اَتَاهُ مَلَكَانِ এবং লোকেরা দাফন করে ফিরে আসে, তখন মন্‌কির নকির নামে দু'ফিরিশতা প্রশ্ন করার জন্য আগমন করে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে দাফনকারীদের অবস্থানকালে কবরে প্রশ্ন করা হয় না। ফাত্‌ওয়ায়ে শামীর ১ম খণ্ড صلوة الجنائز শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-আট ধরনের লোকের কাছে কবরে প্রশ্ন করা হয় না। এরা হলেন- শহীদ, জিহাদের জন্য উদ্যোগী, প্লেগে মৃত্যুবরণকারী, প্লেগের সময় অন্য রোগে মৃত্যুবরণকারী (শর্ত থাকে যে উভয়ই ধৈর্যশীল হতে হবে)- সত্যবাদী অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, জুমার দিন বা রাতে মৃত্যুবরণকারী, প্রতি রাত সূরা মুলুক পাঠকারী,মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় প্রতিদিন সূরা ইখলাস

পাঠকারী (কেউ কেউ নবীকেও গণ্য করেছেন)। এ ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি জুমাবারে মারা যাবে, ওর থেকে কবরে সওয়াল হবে না। যদি কেউ, মনে করুন রোববারে মারা গেল এবং দাফনের পরে তথায় লোক জুমাবার আসা পর্যন্ত উপস্থিত রইলো, তাহলে লোকের উপস্থিতির কারণে কবর আযাব হলো না আর জুমাবার আগমনের ফলে কবর আযাব রহিত হয়ে গেল। এখন আর কিয়ামত পর্যন্ত কোন প্রশ্ন করা হবে না। আসলে এটা খোদায়ী আযাব থেকে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য একটি ভাল তদবীর। আল্লাহর রহমতে ওর মাগফিরাতের আশা করা যায়। আর তথায় বেকার বসে থাকার চেয়ে কুরআন তিলওয়াত করা ভাল, যার ফলে মৃত ব্যক্তিরও উপকার হলো, তিলাওয়াতকারীরও। ইমাম নববী (রহঃ) এর 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থের مايقول بعد الدفن শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

قال الشافعي ويستحب ان يقرءوا عنده شيئ من القرآن [illegible]

قالوا فان ختموا القرآن كله كان حسنا

অর্থাৎ কবরের কাছে কুরআন থেকে কিছু তিলওয়াত করা মুস্তাহাব এবং যদি পূর্ণ কুরআন শরীফ তিলওয়াত করা হয়, তাহলে খুবই ভাল।

আমি 'আযানে কবর' শীর্ষক বর্ণনায় আলোকপাত করেছি যে কবরের উপর যে সবুজ উদ্ভিদ জন্মায়, এর তাসবীহের বরকতে মৃত ব্যক্তির উপকার হয়। তাহলে লোকের কুরআন তিলওয়াত নিশ্চয়ই উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। তবে কবর যেন কোন সময় জনহীনভাবে না থাকে, যদিওবা লোক আশ পাশে অবস্থান করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ কোন কোন জায়গায় মুসলমানেরা রমযানের শেষ জুমার দিন যিন্দেগীর কাযা নামাযের মাগফিরাতের আশায় কিছু নফল নামায পড়ে থাকে। কেউ কেউ একে বিদআত ও হারাম বলে এবং জনগণকে এর থেকে বাধা দেয়। কুরআন করীম ফরমান-

ارءيت الذي ينهى عبدا اذا صلى

(তুমি কি ওকে দেখছ, যে বাধা দেয় বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে।) এতে বোঝা গেল কোন নামাযীকে নামায থেকে বাধা দেয়া জঘন্য অপরাধ। কাযায়ে ওমরীও নামায, তাই এর থেকে বাধা দেয়া কখনও জায়েয নয়। কাযায়ে ওমরীর প্রসঙ্গে তাফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা আনআমের আয়াত। ولتستبين سبيل المجرمين এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হয়েছে। হাদীছটি হচ্ছে-

ايما [illegible]

تركها فليصل يوم الجمعة بين الظهر والعصر اثنتى عشرة ركعة يقرأ [illegible] الاخلاص والمعوذتين [illegible]

مختصر الاحياء

(যে পুরুষ বা মহিলা অজ্ঞতার কারণে নামায পরিত্যাগ করেছে। পরে যদি তওবা করে এবং অনুতপ্ত হয়, অতঃপর জুমার দিন যুহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকআত নফল নামায পড়ে এবং প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস এক একবার পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের দিন ওর থেকে কোন হিসেব নেবে না। এ হাদীছটা 'মুখতাসারুল ইয়াহইয়া' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।)

সাহেবে রূহুল বয়ানের মতে এ হাদীছে বর্ণিত তওবা করা এবং অনুতপ্ত হওয়ার মমার্থ হলো নামায পরিত্যাগকারী লজ্জিত হয়ে নামাযের কাযা আদায় করা। কেননা একেই তওবা বলা হয়। অতঃপর কাযা করার ফলে যে গুণাহ করা হয়েছে, তা মাফ হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু ভাবার্থ এটা নয় যে কাযা নামায পড়ো না, কেবল এ নফল নামায পড়লেই সব আদায় হয়ে যাবে। রাফেজীরাওতো এ রকম বলেনা। ওদের মতে কয়েক দিনের কাযা নামায এক সময় পড়া জায়েয। কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে যে সারা বছর নামায পড়লো না, কেবল জুমুয়াতুল বিদায় বার রাকআত নফল পড়লেই সব মাফ হয়ে যাবে। ভাবার্থ ওটাই, যা সাহেবে রূহুল বয়ান বর্ণনা করেছেন। মুসলমানগণ সেই নিয়তেই পড়ে থাকে। যেমন মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল হজ্জের الوقوف بعرفه শীর্ষক অধ্যায়ে একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরাফাতের ময়দানে হাজীদের জন্য দুআয়ে মাগফিরাত করলেন। বারগাহে ইলাহী থেকে উত্তর আসলো। আমি অত্যাচারীগণ ব্যতীত সবাইকে মাফ করে দিলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পুনরায় মুযদালাফার ময়দানে দুআ করলেন। তখন অত্যাচারীদেরকেও মাফ করে দেয়া হলো। এ হাদীছের ভাবার্থ এ নয় যে কারো টাকা আত্মসাৎ করে নাও বা কাউকে হত্যা করে ফেল বা কারো জিনিস চুরি করে নিয়ে নাও। অতঃপর হজ্ব সমাপন করে আস্‌লে, সব মাফ হয়ে যাবে। কখনই তা হবে না বরং কর্জশোধ করার বেলায় যে ওয়াদাভঙ্গ ও দেরী ইত্যাদি হয়ে গেছে, তা মাফ করা হবে কিন্তু বান্দার হক যে কোন অবস্থাতেই আদায় করতে হবে। যদি কোন মুসলমান এ কাযায়ে ওমরী পড়া বা বুঝার মধ্যে কোন ভুল করে থাকে, তাহলে তাকে বুঝিয়ে দিন। কিন্তু নামায থেকে কেন বাধা দিবেন? আল্লাহ তাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করুক। যদি এ হাদীছ জয়ীফও হয়ে থাকে, তবুও ফযায়েলে আমালের বেলায় গ্রহণযোগ্য।

আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের বর্ণনা

এ বিষয়ে লিখার আমার পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু রমযান মাসের এক রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখলাম, কোন এক বুযুর্গ আমাকে বলছেন- আপনার কিতাবে বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় চুম্বনের মাসআলাটিও লিখুন যাতে কিতাবটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এ বিষয়টাকেও কিতাবের অন্তর্ভূক্ত করলাম। আল্লাহ্ কবুল করুন। আমীন!

দু' অধ্যায়ে বিভক্ত করে এ বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের আঙ্গুলী চুম্বনের প্রমাণ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

আঙ্গুলী চুম্বনের প্রমাণ

মুয়ায্যিন আযান দেয়ার সময় যখন 'আশহাদুআন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ' أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰه উচ্চারণ করে, তখন নিজের বৃদ্ধাঙ্গলীদ্বয় বা শাহাদতের আঙ্গুল চুম্বন করে চক্ষুদ্বয়ে লাগানো মুস্তাহাব এবং এতে দীন-দুনিয়া উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে। সাহাবায়ে কিরাম থেকে এটা প্রমাণিত আছে এবং অধিকাংশ মুসলমান একে মুস্তাহাব মনে করে পালন করেন। 'প্রসিদ্ধ সালাতে মস্‌উদী' কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড نماز শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-

رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ سَمِعَ اِسْمِى فِى الْاَذَانِ وَوَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلٰى عَيْنَيْهِ فَاَنَا طَالِبُهُ فِى صُفُوْفِ الْقِيٰمَةِ وَقَائِدُهُ اِلَى الْجَنَّةِ.

(হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি আযানে আমার নাম শুনে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চোখের উপর রাখে, আমি ওকে কিয়ামতের কাতার সমূহে খোঁজ করবো এবং নিজের পিছে পিছে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাব।)

তাফসীরে রূহুল বয়ানে ষষ্ঠ পারার সূরা মায়েদার আয়াত وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ الاية. এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَضَعَّفَ تَقْبِيْلُ ظُفْرِى اِبْهَامَيْهِ مَعَ مُسَبِّحَتَيْهِ وَالْمَسْحُ عَلٰى عَيْنَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهٖ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ لِاَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِى الْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ لٰكِنَّ الْمُحَدِّثِيْنَ اِتَّفَقُوْا عَلٰى اَنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهٖ فِى التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ.

("মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ' বলার সময় নিজের শাহাদতের আঙ্গুল সহ বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখে চুমু দেয়ার বিধানটা জঈফ রেওয়ায়েত সম্মত। কেননা এ বিধানটা মরফু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কিন্তু মুহাদ্দিছীনে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে আকর্ষণ সৃষ্টি ও ভীতি সঞ্চারের বেলায় জঈফ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা জায়েয।)

ফাত্ওয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ড الاذان শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

يُسْتَحَبُّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّتْ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظَفْرَى الْاِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُوْنُ قَائِدًا لَهٗ اِلَى الْجَنَّةِ كَذَا فِىْ كَنْزِ الْعِبَادِ قُهِسْتَانِىْ وَنَحْوُهٗ فِى الْفَتَاوٰى الصُّوْفِيَةِ وَفِىْ كِتٰبِ الْفِرْدَوْسِ مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فِى الْاَذَانِ اَنَا قَائِدُهٗ وَ مُدْخِلُهٗ فِىْ صُفُوْفِ الْجَنَّةِ وَتَمَامُهٗ فِىْ حَوَاشِى الْبَحْرِ لِلرَّمْلِىِّ.

(আযানের প্রথম শাহাদত বলার সময়- صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ) বলা মুস্তাহাব এবং দ্বিতীয় শাহাদত বলার সময়- قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (কুররাতু আইনী বেকা ইয়া রাসুলাল্লাহ) বলবেন। অতঃপর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ স্বীয় চোখদ্বয়ের উপর রাখবেন এবং বলবেন اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (আল্লাহুম্মা মত্তায়েনী বিসসময়ে ওয়াল বসরে) এর ফলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওকে নিজের পিছনে পিছনে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবেন। অনুরূপ কনযুল ইবাদ ও কুহস্তানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ফাত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়ায়ে সুফিয়াতেও তদ্রূপ উল্লেখিত আছে। কিতাবুল ফিরদাউসে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি আযানে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ' শুনে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ চুম্বন করে, আমি ওকে আমার পিছনে পিছনে বেহেশতে নিয়ে যাব এবং ওকে বেহেশতের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করবো। এর পরিপূর্ণ আলোচনা 'বাহারুর রায়েক' এর টীকায় বর্ণিত আছে।

উপরোক্ত ইবারতে ছয়টি কিতাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-শামী, কনযুল ইবাদ, ফাতওয়ায়ে সুফিয়া, কিতাবুল ফিরদাউস, কুহস্থানী এবং বাহারুর রায়েক এর টীকা। ওই সব কিতাবে একে মুস্তাহাব বলা হয়েছে।

المقاصد الحسنة নামক গ্রন্থে ইমাম সাখাবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন-

ذكره الديلمي في الفردوس من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال هذا وقبل باطن الانملتين السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت له شفاعتي ولم يصح

ইমাম দায়লমী (রহঃ) 'ফিরদাউস' কিতাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে মুয়াযযিনের কণ্ঠ থেকে যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রসুলুল্লাহ' শোনা গেল, তখন তিনি (রাঃ) তাই বললেন এবং স্বীয় শাহাদতের আঙ্গুলদ্বয়ের ভিতরের ভাগ চুমু দিলেন এবং চক্ষুদ্বয়ে লাগালেন। তা দেখে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান যে ব্যক্তি আমার এই প্রিয়জনের মত করবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অপরিহার্য।" এ হাদীছটি অবশ্য বিশুদ্ধ হাদীছের পর্যায়ভুক্ত নয়।

উক্ত মাকাসেদে হাসনা গ্রন্থে আবুল আব্বাসের (রহঃ) রচিত মুজেযাত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে-

عن الخضر عليه السلام انه قال من قال حين يسمع المؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة

عيني محمد ابن عبد الله ثم يقبل ابهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد ابدا.

[হযরত খিযির (আঃ) থেকে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের কণ্ঠে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ' শোনে যদি বলে- مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله (মারহাবা বে হাবীবী ওয়া কুররাতে আইনী মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ) অতঃপর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে লাগাবে, তাহলে ওর চোখ কখনও পীড়িত হবে না।) উক্ত গ্রন্থে আরোও বর্ণনা করা হয়েছে- হযরত মুহাম্মদ ইবনে বাবা নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে এক সময় জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। তখন তাঁর চোখে একটি পাথরের কনা পড়েছিল যা বের করতে পারেনি এবং খুবই ব্যথা অনুভব হচ্ছিল।

وانه لما سمع المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله قال ذالك فخرجت الحصاة من فوره.

যখন তিনি মুয়াযযিনের কণ্ঠে আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রসুলুল্লাহ শুনলেন, তখন তিনি উপরোক্ত দুআটি পাঠ করলেন এবং অনায়াসে চোখ থেকে পাথর বের হয়ে গেল। একই 'মকাসেদে হাসনা' গ্রন্থে হযরত শামস মুহাম্মদ ইবনে সালেহ মদনী থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি ইমাম আমজদ (মিসরের অধিবাসী পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত) কে বলতে শুনেছেন- যে ব্যক্তি আযানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নাম মুবারক শোনে স্বীয় শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী একত্রিত করে-

وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمد ابدا

উভয় আঙ্গুলকে চুম্বন করে চোখে লাগাবে, কখনও তার চক্ষু পীড়িত হবে না। ইরাক- আযমের কতেক মাশায়েখ বলেছেন যে, যিনি এ আমল করবেন, তাঁর চোখ রোগাক্রান্ত হবে না।

وقال لي كل منهما منذ فعلته لم ترمد عيني

কিতাব রচয়িতা বলেছেন- যখন থেকে আমি এ আমল করেছি আমার চক্ষু পীড়িত হয়নি।

কিছু অগ্রসর হয়ে উক্ত মকাসেদে হাসনা গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে-

وقال ابن صالح وانا منذ سمعته استعملته فلا ترمد

عَيْنِىْ وَاَرْجُوْا اَنَّ عَافِيَتَهُمَا تَدُوْمُ وَاِنِّىْ اَسْلَمُ مِنَ الْعَمٰى اِنْشَاءَ اللّٰهُ.

হযরত ইবনে সালেহ বলেছেন- যখন আমি এ ব্যাপারে জানলাম, তখন এর উপর আমল করলাম। এরপর থেকে আমার চোখ পীড়িত হয়নি। আমি আশা করি, ইনশা আল্লাহ এ আরাম সব সময় থাকবে এবং অন্ধত্ব থেকে মুক্ত থাক্‌বো। উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ইমাম হাসন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ" শোনে যদি বলে-

مَرْحَبًا بِحَبِيْبِىْ وَقُرَّةُ عَيْنِىْ مَحَمَّدُ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এবং নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন করে চোখে লাগাবে এবং বলবে- لَمْ يَعْمِ وَلَمْ يَرْمُدْ তাহলে কখনও সে অন্ধ হবে না এবং কখনও তার চক্ষু পীড়িত হবে না। মোট কথা হলো 'মকাসেদে হাসনা' গ্রন্থে অনেক ইমাম থেকে এ আমল প্রমাণিত করা হয়েছে। শরহে নেকায়ায় বর্ণিত আছে-

وَاعْلَمْ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اَنْ يُّقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرَّتْ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرَىْ اِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُوْنُ لَهُ قَائِدًا اِلَى الْجَنَّةِ كَذَا فِىْ كَنْزِالْعِبَادِ.

জানা দরকার যে মুস্তাহাব হচ্ছে যিনি দ্বিতীয় শাহাদতের প্রথম শব্দ শোনে বলবেন- صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলল্লাহ) এবং দ্বিতীয় শব্দ শোনে বলবেন قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (কুর্‌রাতু আইনী বেকা ইয়া রাসুলাল্লাহ) এবং নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের নখ চক্ষুদ্বয়ে রাখবেন, ওকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজের পিছনে পিছনে বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবেন। অনুরূপ কনযুল ইবাদেও বর্ণিত আছে।

মাওলানা জামাল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর মক্কী (কুঃ) স্বীয় ফাত্‌ওয়ার কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

تَقْبِيْلُ الْاِبْهَامَيْنِ وَوَضْعُ هُمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ اسْمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى الْاَذَانِ جَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ صَرَّحَ بِهٖ مَشَائِخُنَا.

আযানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুমু দেয়া এবং চোখে লাগানো জায়েয বরং মুস্তাহাব। আমাদের মাশায়েখে কিরাম এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা মুহাম্মদ তাহির (রাঃ) تكملة مجمع بحار الانوار গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীছকে 'বিশুদ্ধ নয়' মন্তব্য করে বলেন- وَرُوِىَ تَجْرِبَةُ ذَالِكَ عَنْ كَثِيْرِيْنَ (কিন্তু এ হাদীছ অনুযায়ী আমলের বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়।)

আরও অনেক ইবারত উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে এটুকুই যথেষ্ট মনে করলাম। হযরত সদরুল আফাযেল আমার মুর্শিদ ও উস্তাদ আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দীন সাহেব কিবলা মুরাদাবাদী বলেছেন, লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইনজিল' গ্রন্থের একটি অনেক পুরানো কপি পাওয়া গেছে, যেটার নাম 'ইনজিল বারনাবাস'। ইদানীং এটা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত এবং প্রত্যেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর অধিকাংশ বিধানাবলীর সাথে ইসলামের বিধানাবলীর মিল রয়েছে। এ গ্রন্থের এক জায়গায় লিখা হয়েছে যে হযরত আদম (আঃ) যখন রূহুল কুদ্দুস (নুরে মুস্তাফা) কে দেখার জন্য আরজু করলেন, তখন সেই নুর তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলের নখে চম্‌কানো হলো। তিনি মহব্বতের জোশে উক্ত নখদ্বয়ে চুমু দিলেন এবং চোখে লাগালেন। (রূহুল কুদ্দুসের অর্থ নুরে মুস্তাফা কেন করা হল; এর ব্যাখ্যা আমার কিতাব শানে হাবিবুর রহমানে দেখুন। ওখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ঈসা (আঃ) এর যুগে রূহুল কুদ্দুস নামেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মশহুর ছিলেন।) হানাফী আলিমগণ ছাড়াও শাফেঈ ও মালেকী মযহাবের আলিমগণও বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুম্বন মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে একমত। যেমন শাফেঈ মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব اعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين এর ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

ثُمَّ يُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُ هُمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِ وَلَمْ يَرْمُدْ اَبَدًا.

(অতঃপর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুমু দিয়ে চোখে লাগালে, কখনও অন্ধ হবে না এবং কখনও চক্ষু পীড়া হবে না।) মালেকী মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব-

كفاية الطالب الربانى لرسالة ابن ابى زيد القيروانى.

এর প্রথম খণ্ডের ১৬৯ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে অনেক কিছু বলার পর লিখেছেন-

ثُمَّ يُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُ هُمَا عَلٰى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمِ وَلَمْ يَرْمُدْ اَبَدًا.

(অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুমু দেবে এবং চোখে লাগাবে, তাহলে কখনও অন্ধ হবে না এবং কখনও চক্ষু পীড়া হবে না) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা শেখ আলী সাঈদী عدوى নামক কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন-

لَمْ يَتَبَيَّنْ مَوْضِعُ التَّقْبِيْلِ مِنَ الْاِبْهَامَيْنِ اِلَّا اَنَّهُ نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْمُفَسِّرِ نُوْرِ الدِّيْنِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ لَقِيْتُهُ وَقْتَ الْاَذَانِ فَلَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَبَّلَ اِبْهَامَيْ نَفْسِهِ وَمَسَحَ بِالظُّفْرَيْنِ اَجْفَانَ عَيْنَيْهِ مِنَ الْمَاٰقِ اِلَى نَاحِيَةِ الصُّدْغِ ثُمَّ فَعَلَ ذَالِكَ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ مَرَّةً مَرَّةً فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ كُنْتُ اَفْعَلُهُ ثُمَّ تَرَكْتُهُ فَمَرِضَتْ عَيْنَاىَ فَرَاَيْتُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا فَقَالَ لَا تَرَكْتَ مَسْحَ عَيْنَيْكَ عِنْدَ الْاَذَانِ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تَبْرَاَ عَيْنَاكَ فَعُدْ فِي الْمَسْحِ فَاسْتَيْقَظْتُ وَمَسَحْتُ فَبَرِئَتْ وَلَمْ يُعَاوِدْنِىْ مَرَضُهَا اِلَى الْاٰنَ.

গ্রন্থকার বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের সময়ের কথা উল্লেখ করেননি। অবশ্য শেখ আল্লামা মুফাস্সির নুরুদ্দীন খুরাসানী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কতেক লোককে আযানের সময় লক্ষ্য করেছেন যে যখন তারা মুয়াযযিনের মুখে আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ শুনলেন, তখন নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দিলেন এবং নখদ্বয়কে চোখের পলকে এবং চোখের কোণায় লাগালেন এবং কান পর্যন্ত বুলিয়ে নিলেন। প্রত্যেক শাহাদতের সময় এ রকম একবার একবার করলেন। আমি ওদের একজনকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন আমি বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুমু দিতাম কিন্তু মাঝখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তখন আমার চক্ষু রোগ হয়। এর মধ্যে এক রাত আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চোখে লাগানো কেন ছেড়ে দিয়েছ? যদি তুমি চাও, তোমার চোখ পুনরায় ভাল হোক, তাহলে তুমি পুনরায় বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চোখে লাগানো আরম্ভ কর'। ঘুম ভাঙ্গার পর আমি পুনরায় এ আমল শুরু করে দিলাম এবং আরোগ্য লাভ করলাম। আজ পর্যন্ত সেই রোগে আর আক্রান্ত হইনি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হলো যে, আযান ইত্যাদিতে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন

ও চোখে লাগানো মুস্তাহাব, হযরত আদম (আঃ) সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও ইমাম হাসন (রাঃ) এর সুন্নাত। ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ এটা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে একমত। শাফেঈ ও মালেকী মযহাবের ইমামগণ এটা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে রায় দিয়েছেন। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক মুসলমান একে মুস্তাহাব মনে করেছেন এবং করছেন। এ আমলে নিম্নবর্ণিত ফায়দা গুলো রয়েছেঃ

আমলকারীর চোখ রোগ থেকে মুক্ত থাকবে এবং ইনশা আল্লাহ কখনও অন্ধ হবে না, যে কোন চক্ষু রোগীর জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের আমলটি হচ্ছে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। এটা অনেকবার পরীক্ষিত হয়েছে। এর আমলকারী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শাফায়াত লাভ করবে এবং ওকে কিয়ামতের কাতার থেকে খুঁজে বের করে তাঁর (দঃ) পিছনে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবেন।

একে হারাম বলা মূর্খতার পরিচায়ক। যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ একে নিষেধ করা যাবে না। মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মুসলমানগণ মুস্তাহাব মনে করাটা যথেষ্ট। কিন্তু হারাম বা মকরূহ প্রমাণের জন্য নির্দিষ্ট দলীলের প্রয়োজন, যেমন আমি বিদ্আতের আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

বিঃ দ্রঃ- আযান সম্পর্কেতো সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত রিওয়ায়েত ও হাদীছ সমূহ মওজুদ আছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তকবীরও আযানের মত। হাদীছসমূহে তকবীরকে আযন বলা হয়েছে- দু'আযানের মাঝখানে নামায আছে অর্থাৎ আযান ও তকবীরের মধ্যবর্তী। সুতরাং তকবীরে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ' বলার সময়ও বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করা ফলপ্রসূ ও বরকতময়। আযান ও তকবীর ব্যতীতও যদি কেউ হুযূর(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় চুমু দেয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই বরং সদুদ্দেশ্যে হলে তাতে ছওয়াব রয়েছে। বিনা দলীলে কোন কিছু নিষেধ করা যায় না। যেভাবেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের তাযীম করা হবে, ছওয়াব রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব

১নং আপত্তিঃ বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন সম্পর্কে যে হাদীছসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, সবই জয়ীফ (দুর্বল) এবং জয়ীফ হাদীছ দ্বারা শরয়ী মাসআলা প্রমাণিত হয় না। দেখুন, মকাসেদে হাসনায় উল্লেখিত আছে- لَا يَصِحُّ فِي الْمَرْفُوْعِ مِنْ كُلِّ هٰذَا شَيْءٌ (ওই সমস্ত হাদীছসমূহের মধ্যে কোন মরফু-সহীহ হাদীছ পাওয়া যায়নি।)

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) মওজুয়াতে কবীরে এ সব হাদীছ প্রসঙ্গে বলেছেন-

كُلُّ مَا يُرْوٰى فِىْ هٰذَا فَلَا يَصِحُّ رَفْعُهٗ.

অর্থাৎ এ মাসআলার বেলায় যতগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, ওই গুলোর মধ্যে একটিও সহীহ হাদীছের পর্যায়ভুক্ত নয়। স্বয়ং আল্লামা শামী (রহঃ) সেই একই বহছের একই জায়গায় বলেছেন- لَمْ يَصِحَّ مِنَ الْمَرْفُوْعِ مِنْ هٰذَا شَيْئٌ.

(ওই গুলোর মধ্যে কোন মরফু সহীহ হাদীছ নেই) রূহুল বয়ানের রচয়িতাও ওই হাদীছগুলোকে বিশুদ্ধ বলতে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং ওই সব হাদীছ উপস্থাপন করাটাই অর্থহীন।

উত্তরঃ এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে প্রথমতঃ সবাই হাদীছে মরফু হওয়াটা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু হাদীছে মওকুফ সহীহ হওয়াটা বোঝা গেছে।

যেমন মোল্লা আলী কারী (রহঃ) মওজুয়াতে কবীরে উপরোক্ত ইবারতের পর বলেছেন-

قُلْتُ وَاِذَا ثَبَتَ رَفْعُهٗ اِلَى الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَيَكْفِىْ لِلْعَمَلِ بِهٖ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

আমার কথা হলো হাদীছটার সনদ যেহেতু হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) পর্যন্ত প্রসারিত, সেহেতু আমলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-তোমাদের জন্য আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণীয়। বোঝা গেল হাদীছে মওকুফ সহীহ ও আমলের জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ ওই সমস্ত উলামায়ে কিরাম বলেছেন- لَمْ يَصِحَّ অর্থাৎ এ হাদীছসমূহ মরফু হাদীছের মত বিশুদ্ধ নয় বা সহীহ নয় বলতে জয়ীফ বোঝায় না। কেননা সহীর পরে হাসন রয়েছে। সুতরাং এ হাদীছ হাসন হলেও চলে। তৃতীয়তঃ উসুলে হাদীছ ও উসুলে ফিকহের নীতি অনুসারে যদি কোন জয়ীফ হাদীছ কয়েক সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়, সেটা হাসন বলে গণ্য হয়, যেমন দুর্রুল মুখতারের প্রথম খণ্ড مستحبات الوضوء শীর্ষক অধ্যায়ে ওযুর বিভিন্ন অংশের দুআ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

وَقَدْ رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهٗ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ طُرُقٍ.

এ হাদীছটি ইবনে হাব্বান প্রমুখের কয়েকটি সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এর প্রেক্ষাপটে শামীতে বলা হয়েছে- اَىْ يَقْوٰى بَعْضُهَا بَعْضًا فَارْتَقٰى اِلٰى

مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ. অর্থাৎ কতেক সনদ কতেক সনদকে শক্তি জোগায়। তাই এ হাদীছ হাসনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে, এ হাদীছ বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। সুতরাং এটা হাসন হিসেবে গণ্য। চতুর্থতঃ, যদি এটা মেনেও নেয়া হয় যে এ হাদীছটি জয়ীফ, তথাপি ফযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীছ গ্রহণীয়। যেমন আল্লামা শামী দুর্রুল মুখতারের প্রথম খণ্ড আযান অধ্যায়ে আযানের স্থান সমূহের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন-

عَلٰى اَنَّهٗ فِىْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ كَمَا مَرَّ فِىْ اَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

ফযায়েলে আমালের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা জায়েয, এখানেও ওয়াজিব-হারামের মাসআলা নয়, কেবল আঙ্গুলী চুম্বনের ফযীলতের কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও জয়ীফ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা যায়। অধিকন্তু মুসলমানদের আমল জয়ীফ হাদীছকে মজবুত করে দেয়। যেমন ইমাম নববী (রহঃ) এর কিতাবুল আযকারে তলকীনে মইয়ত শীর্ষক আলোচনায় বর্ণিত আছে-

وَقَدْ رُوِيْنَا فِيْهِ حَدِيْثًا مِنْ حَدِيْثِ تَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ اِلٰى اِمَامَتِهٖ لَيْسَ بِالْقَائِمِ اِسْنَادُهٗ وَلٰكِنْ اعْتَضَدَ بِشَوَاهِدَ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الشَّامِ.

অর্থাৎ তলকীনে মইয়তের হাদীছ সনদের দিক দিয়ে জোরালো নয় কিন্তু শাম বাসীর আমল এবং অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে জোরালো হয়ে গেছে। বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনও মইয়তের আমলের মত। তাই এ হাদীছটা জোরালো হয়ে গেছে। এর থেকে আরও ব্যাপক বিশ্লেষণের জন্য নুরুল আনোয়ার, তওজীহ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পঞ্চমতঃ যদি এ সম্পর্কে কোন হাদীছও পাওয়া না যেত, তবুও উম্মতে মুস্তাফা কর্তৃক মুস্তাহাব মনে করাটাই যথেষ্ট ছিল। কেননা হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে-

مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ.

যে কাজটা মুসলমানগণ ভাল মনে করে, তা আল্লাহর কাছেও ভাল বলে বিবেচ্য। ষষ্ঠতঃ আঙ্গুলী চুম্বন হচ্ছে চক্ষুরোগ থেকে মুক্তি লাভের একটি আমল এবং আমলের বেলায় কেবল সূফিয়ানে কিরামের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। যেমন শাহ ওলী উল্লাহ সাহেব هوامعه গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন-

اجتهاد را [illegible] اعمال تصریفیه [illegible]

استخراج اطباء نسخجا قرابادین را

অর্থাৎঃ (সুফিয়ানে কিরামের আমলের বেলায় ইজতিহাদের পথ খোলা। যেমন ডাক্তারগণ চিকিৎসার ফর্মুলা আবিষ্কার করে থাকেন।) শাহ সাহেব স্বয়ং স্বীয় কিতাব القول الجميل এ জ্বীনকে দমন এবং জ্বীন থেকে হিফাজত থাকার অনেক আমল- তদবীরের কথা বর্ণনা করেছেন। উক্ত কিতাবে গর্ভবতী মহিলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে অমুক দুআ হরিণের চামড়ায় লিখে গলায় দিলে গর্ভপাত হবে না। পশমের রঙিন ডোরা (সুতা) দিয়ে মহিলার মাপ নিয়ে উক্ত সুতায় সাতটি গিরা দিয়ে মহিলার বাম উরুতে বাঁধলে প্রসব বেদনা লাঘব হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলুন, এসব আমলের ব্যাপারে কোন হাদীছটি উপস্থাপন করা যাবে? আল্লামা শামী (রহঃ)ও যাদু থেকে রক্ষা ও হারানো জিনিসের সন্ধানের জন্য ফাতওয়ায়ে শামীতে অনেক তরীকা বর্ণনা করেছেন। বলুন এসব কোন হাদীছ মতে? যেহেতু আমি প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করেছি যে এ আমলটা চক্ষু পীড়ার জন্য পরীক্ষিত, তাই একে কেন নিষেধ করা হবে? সপ্তমতঃ আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে শামী, শরহে নেকায়া, তফসীরে রূহুল বয়ান ইত্যাদি কিতাবে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনকে মুস্তাহাব বলেছেন। এ মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করেননি, কেবল এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত হাদীছ সমূহকে মরফু হাদীছ বলতে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং মুস্তাহাবের বিধানটা একেবারে সঠিক। কেননা মুস্তাহাবের বিধান হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল নয়। অষ্টমতঃ যদি মেনেও নেয়া হয় যে জয়ীফ হাদীছ দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত করা যায় না, তাহলে মকরুহ প্রমাণের জন্য কোন্ হাদীছটা রয়েছে, যেখানে উল্লেখিত আছে 'আঙ্গুলী চুম্বন মকরূহ' বা 'চুমু দিবে না' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইন্‌শা আল্লাহ মকরূহ প্রমাণের জন্য সহীহ হাদীছতো দূরের কথা জয়ীফ হাদীছও পাওয়া যাবে না। তাদের যাবতীয় গবেষণা ও প্রচেষ্টা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি শত্রুতা ছাড়া আর কিছু নয়। যাক আপত্তির নিষ্পত্তি হলো এবং হক প্রতিফলিত হলো।

২নং আপত্তিঃ হযরত আদম (আঃ) যদিওবা বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখে নুরে মোস্তাফা (দঃ) দেখে চুমু দিয়ে ছিলেন, তাহলে আপনারা কোন নূর দেখে চুমু দিচ্ছেন? তখন চুম্বনের কারণ ছিল; এখনতো তা নেই।

উত্তরঃ হযরত হাজেরা (রাঃ) যখন স্বীয় সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ)কে নিয়ে

মক্কা শরীফের জঙ্গলে বনবাসে আসলেন, তখন পানির সন্ধানে সাফা ও মরওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান আপনারা হজ্জের সময় ওখানে কেন দৌড়াদৌড়ি করেন? আর পানিরওবা কি প্রয়োজন? হযরত ইসমাইল (আঃ) কুরবানীর উদ্দেশ্যে যাবার সময় পথে তিন জায়গায় শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু আজকাল আপনারা হজ্জের সময় তথায় পাথর ছুঁড়ে মারেন কেন? কোন্ শয়তান এখন আপনাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এক বিশেষ প্রয়োজনে মক্কার কাফিরদেরকে দেখানোর জন্য তওয়াফের সময় রমল (বুক ফুলিয়ে হেলেদুলে চলা) করে স্বীয় শক্তি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এখন তওয়াফে কুদুমের সময় রমল কেন করেন? এখন কি কাফিরেরা তা দেখে? সাহেব, আম্বিয়ায়ে কিরামের কতেক আমল এমনভাবে কবুল হয়েছে যে এ সবের স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে, যদিওবা এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এটাও তদ্রূপ।

৩নং আপত্তিঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম নেয়ার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ চুম্বনের কি কারণ থাকতে পারে? নখের মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অন্য কিছু কেন চুম্বন করা হয় না? হাত, পা, কাপড় ইত্যাদিকেওতো চুমু দেয়া যায়।

উত্তরঃ যেহেতু রেওয়াতের মধ্যে নখের কথা রয়েছে, সেহেতু তা চুমু দেয়া হয়। সুস্পষ্ট দলীলের ক্ষেত্রে কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই। তবে এর রহস্য হচ্ছে তাফসীরে খাযেন, রূহুল বয়ান ইত্যাদিতে অষ্টম পারার সূরা আরাফের আয়াত بدت لهما سوآتهما এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে যে বেহেশ্তে হযরত আদম (আঃ) এর পোশাক ছিল নখ অর্থাৎ সমস্ত শরীরে নখ ছিল, যা খুবই সুন্দর ও মোলায়েম ছিল। খোদা যখন তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন, তখন সেই পোশাক খুলে নেয়া হয়। কিন্তু আঙ্গুলের মাথায় স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ রাখা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, আমাদের নখ হচ্ছে জান্নাতী পোশাক। তাই বেহেশত যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওসীলায় মিলবে, সেহেতু তাঁর পবিত্র নাম নেয়ার সময় বেহেশ্তী পোশাকেই (নখে) চুমু দেয়া হয়। যেমন কাবা শরীফের হাজর আস্ওয়াদ হচ্ছে জান্নাতী পাথর। একে চুমু দেয়া হয়। কাবা শরীফের অন্যান্য অংশকে চুমু দেয়া হয় না। কেননা তা হচ্ছে সেই জান্নাতী পাথরের স্মরণ, যা হযরত আদম (আঃ) এর জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করা হয়েছিল এবং হযরত নুহ (আঃ) এর তুফানের সময় উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। এ পাথর তারই স্মৃতি চিহ্ন। অনুরূপ নখও বেহেশ্তী পোশাকের স্মৃতি চিহ্ন।

জানাযার আগে উচ্চস্বরে কলেমা বা না'ত পাঠ করার বিবরণ

কোন কোন জায়গায় প্রচলন আছে যে, মইয়তকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় শব যাত্রীরা সমবেতভাবে কলেমা বা না'ত শরীফ পাঠ করেন। আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে, কেউ একেও নিষেধ করবে। কিন্তু পাঞ্জাবে এসে জান্‌তে পারলাম দেওবন্দীরা এটাকেও বিদ্‌আত ও হারাম বলে। এ রকম সুস্পষ্ট মাস্‌আলা প্রসঙ্গে কিছু লেখার খেয়াল ছিল না। কিন্তু কতেক বন্ধু-বান্ধব জোর দেয়ায় সংক্ষেপে কিছু লিখতে বাধ্য হলাম। অন্যান্য আলোচনার মত এ আলোচনাটাও দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে এর প্রমাণ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

জানাযার আগে কলেমা তৈয়্যবা বা না'তখানির প্রমাণ

জানাযার আগে নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে কলেমা তৈয়্যবা, তাসবীহ-তাহলীল বা দরূদ শরীফ অথবা না'ত শরীফ পাঠ করা জায়েয এবং মইয়ত ও সমবেত ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণকর। কুরআনী আয়াত, সহীহ, হাদীছ এবং ফকীহগণের বিভিন্ন উক্তিতে এর প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ.

(যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফ্‌সীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে-

اَىْ يَذْكُرُوْنَهُ دَائِمًا عَلَى الْحَالَاتِ كُلِّهَا قَائِمِيْنَ وَقَائِدِيْنَ وَمُضْطَجِعِيْنَ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ لَايَخْلُوْا عَنْ هٰذِهِ الْهَيْئَاتِ غَالِبًا

এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে যে কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সব সময় আল্লাহর যিক্‌র করা। কেননা মানুষ অধিকাংশ সময় এ তিন অবস্থা থেকে মুক্ত থাকে না।

তাফ্‌সীরে আবুস সউদে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে-

وَالْمُرَادُ تَعْمِيْمُ الذِّكْرِ لِلْاَوْقَاتِ وَتَخْصِيْصُ الْاَحْوَالِ الْمَذْكُوْرَةِ لَيْسَ لِتَخْصِيْصِ الذِّكْرِ بِهَا بَلْ لِاَنَّهَا الْاَحْوَالُ الْمَعْهُوْدَةُ الَّتِىْ

لَايَخْلُوْا عَنْهَا الْاِنْسَانُ.

(এর অর্থ প্রায় উপরোক্ত তাফ্‌সীরের মত) তাফ্‌সীরে কবীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছে-

اَلْمُرَادُ كَوْنُ الْاِنْسَانِ دَائِمَ الذِّكْرِ لِرَبِّهٖ فَاِنَّ الْاَحْوَالَ لَيْسَتْ اِلَّاهٰذِهِ الثَّلٰثَةَ ثُمَّ لَمَّا وَصَفَهُمْ بِكَوْنِهِمْ ذَاكِرِيْنَ فِيْهَا كَانَ ذَالِكَ دَلِيْلًا عَلٰى كَوْنِهِمْ مُوَاظِبِيْنَ عَلَى الذِّكْرِ غَيْرِ فَاتِرِيْنَ عَنْهُ.

(এর অর্থও উপরোক্ত তাফ্‌সীরের মত) আল্লামা ইব্‌নে আদী 'কামেল' গ্রন্থে এবং ইমাম যায়লয়ী (রহঃ)- نصب الراية لتخريج احاديث الهداية নামক কিতাবের ২৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْشِىْ خَلْفَ الْجَنَازَةِ اِلَّا قَوْلَ لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ مُبْدِيًا وَّرَاجِعًا.

এ হাদীছটা জয়ীফ হলেও ফজায়েলে আমালের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।। মিসরী ছাপা তাহযিরুল মুখতার আলা রদ্দুল মুখতার কিতাবের ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

وَلٰكِنْ قَدْ اعْتَادَ النَّاسُ كَثْرَةَ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعَ اَصْوَاتِهِمْ بِذَالِكَ وَهُمْ اِنْ مُنِعُوْا اَبَتْ نُفُوْسُهُمْ عَنِ السُّكُوْتِ وَالتَّفَكُّرِ فَيَقْعُوْنَ فِىْ كَلَامٍ دُنْيَوِىْ وَرُبَّمَا وَقَعُوْا فِىْ غِيْبَةٍ وَاِنْكَارِ الْمُنْكَرِ اِذَا قَضٰى اِلٰى مَا هُوَ اَعْظَمُ مُنْكَرًا كَانَ تَرْكُهُ اَحَبَّ لِاَنَّهُ اِرْتِكَابُ بِاَخَفِّ الْمُضَرَّتَيْنِ كَمَا هُوَالْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ.

উপরোক্ত আয়াত এবং এর তাফ্‌সীর সমূহ ও হাদীছ সমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল-সর্বাবস্থায় যিক্‌রে ইলাহীর অনুমতি রয়েছে এবং উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে যে কোনভাবে জায়েয। এখন কোন উপলক্ষে যিক্‌র নিষেধ করার জন্য অন্ততঃ পক্ষে প্রসিদ্ধ হাদীছের প্রয়োজন। কেননা একক হাদীছ বা মুজতাহিদের অনুমান দ্বারা

কুরআনের অনির্দিষ্ট হুকুমকে নির্দিষ্ট করা যায় না। ফকীহগণ জনাবত ও ঋতুস্রাবের সময়ও কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া সমস্ত যিকর জায়েয বলেছেন এবং কুরআনের আয়াত যদি তেলাওয়াতের নিয়ত ছাড়া পাঠ করা হয়, তাও জায়েয (ফিকহ শাস্ত্রের প্রায় কিতাব দ্রষ্টব্য) তাহলে মইয়তকে কবরস্থানে নিয়ে যাবার সময়টা একটি অবস্থা বিধায়, তখনও সব রকম যিকর জায়েয। কুরআন ইরশাদ ফরমান- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ। (জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণে চিত্ত প্রশান্ত হয়।) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রূহুল বয়ানের রচয়িতা বলেন-

فالمؤمنون يستانسون بالقرآن وذكر الله الذى هو الاسم الاعظم ويحبون استماعها والكفار يفرحون بالدنيا ويستبشرون بذكر غير الله.

মুসলমানগণ কুরআন পাঠ এবং যিক্‌রে ইলাহী (ইসমে আযম) দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে এবং শুনতে পছন্দ করে। আর কাফিরগণ দুনিয়াদারীতে তৃপ্ত এবং গায়রুল্লাহর প্রশংসায় আনন্দ লাভ করে।

এ আয়াত ও তাফ্‌সীরের ভাষ্য থেকে বোঝা গেল- আল্লাহর যিক্‌র মুসলমানের জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক কিন্তু কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক। খোদার শুকর, মইয়তও মুসলমান এবং সমস্ত শবযাত্রীরাও মুসলমান। সবাই এতে তৃপ্তি পাবে। অধিকন্তু ওই সময় আত্মীয় স্বজন থেকে চির বিদায়ের কারণে মইয়তের মন ভারাক্রান্ত থাকে। তখন এ ধরণের যিকরের দ্বারা পেরেশানী দূরীভূত হয়। লক্ষ্ণীয় যে এ আয়াতে মুতলক যিক্‌রের কথা বর্ণিত হয়েছে- উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে হোক। সুতরাং প্রত্যেক রকম যিক্‌র জায়েয প্রমাণিত হলো। কেবল নিজস্ব রায় দ্বারা এতে শর্তারোপ করা যাবে না। منتخب كنز العمال কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় হযরত আনস (রাঃ) এর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে-

اَكْثِرُوْا فِى الْجَنَازَةِ قَوْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

(জানাযায় বেশী করে কলেমা তৈয়্যবা পড়ুন) মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল দাওয়াতে 'যিকরুল্লাহ' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

ان لله ملئكة يطوفون فى الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ.

(আল্লাহর কিছু ফিরিশ্‌তা রাস্তায় টহল দেয় এবং আল্লাহর যিক্‌রকারীদেরকে অনুসন্ধান করে। যখন কোন জনগোষ্ঠিকে যিক্‌র করতে দেখে, তখন একে অপরকে ডাকডাকি করে বলে- নিজেদের উদ্দেশ্যের প্রতি আগোয়ান হও। অতঃপর, ওই সব যিক্‌রকারীদেরকে পালক দ্বারা আচ্ছাদিত করে নেয়।) সুতরাং মইয়তের লোকেরা যদি আল্লাহর যিক্‌র করতে করতে যায়, তাহলে টহলরত ফিরিশ্‌তাদের সাক্ষাত মিলবে। তখন সবাইকে পালক দ্বারা আচ্ছাদিত করে নিবে। মইয়তও ফিরিশ্‌তাদের পালকের ছায়ায় কবরস্থানে পৌঁছে যাবে। এ হাদীছেও উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে মতলক যিক্‌রের কথা বর্ণিত হয়েছে। মিশকাত শরীফের একই অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে-

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, যখন তোমরা বেহেশ্‌তের বাগান সমূহ অতিক্রম করবে, তখন ওখান থেকে কিছু খেয়ে নিও। সাহাবায়ে কিরাম আরয করুলেন, বেহেশ্‌তের বাগান কোথায়? ফরমালেন যিকরের মাহ্‌ফিল।

এতে প্রমাণিত হলো যে, মইয়তের সাথে যদি যিক্‌রে ইলাহী করতে করতে যাওয়া হয়, তাহলে মইয়ত বেহেশ্‌তের বাগানের মধ্যে দিয়ে কবরস্থানে যাবে। উল্লেখ্য যে এখানেও মতলক যিক্‌রের কথা বর্ণিত হয়েছে। মিশকাত শরীফের একই অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে-

اَلشَّيْطٰنُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ.

(শয়তান মানুষের আত্মার সাথে লেপ্‌টে থাকে। যখন মানুষ আল্লাহর যিক্‌র করে তখন সরে যায়।) বোঝা গেল- মইয়তকে নিয়ে যাবার সময় আল্লাহর যিক্‌র করা হলে মইয়ত শয়তান থেকে রেহাই পাবে। এখানেও উচ্চস্বর বা নিম্নস্বরের কোন শর্তারোপ করা হয়নি। এ পর্যন্ত জানাযার আগে উচ্চস্বরের যিক্‌রকে কুরআন হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হলো।

এবার বিভিন্ন ফকীহগণের মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যেথায় এর বিশ্লেষণ মিলে। প্রসিদ্ধ- حديقه نديه شرح محمديه কিতাবে ইমাম আবদুল গণী নাবলুসী (রহঃ) এ মাস্‌আলার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন- যেসব ফকীহ জানাযার সাথে উচ্চস্বরে যিক্‌র নিষেধ করেন, তা নিশ্চয় মাকরূহ তানযীহ বা মাকরূহ তাহরীমীর

ভিত্তিতেই করেন। অতঃপর তিনি বলেন-

لكن بعض المشائخ جوز والذكر الجهرى ورفع الصوت بالتعظيم قدام الجنازة وخلفها لتلقين الميت والاموات والاحياء وتنبيه الغفلة والظلمة وازالة صداء القلوب وقساوتها بحب الدنيا ورياستها.

(কিন্তু কতেক মাশায়েখ জানাযার আগে পিছে উচ্চস্বরে যিক্র করাকে জায়েয বলেছেন। যাতে এর দ্বারা মৃত ও জীবিতদের তলকীন হয়ে যায় এবং অলস ব্যক্তিদের অন্তর থেকে অলসতা ও পার্থিব মহব্বত দূরীভূত হয়।)

কুতুবে রব্বানী ইমাম শায়ারানী (রহঃ) বলেন-

وكان سيدى على الخواص رضى الله عنه يقول اذا علم من الماشين مع الجنازة انهم لا يتركون اللغو فى الجنازة ويشتغلون باحوال الدنيا فينبغى ان تأمرهم بقول لااله الا الله محمد رسول الله فان ذالك افضل من تركه ولا ينبغى للفقيه ان ينكر ذالك الابنض او اجماع فان للمسلمين الاذن العام من الشارع بقوله لااله الا الله محمد رسول الله كل وقت شاؤا ولله العجب من عمى قلب من ينكر مثل هذا.

(হযরত আলীউল খওয়াস (রাঃ) বলতেন- যখন দেখা গেল যে, শবযাত্রীরা বাজে কথাবার্তা ত্যাগ করে না এবং দুনিয়াবী ধ্যান ধারণায় ব্যস্ত থাকে, তখন ওদেরকে কলেমা পড়ার হুকুম দেয়া উচিৎ। কেননা এ কলেমা পড়া না পড়ার থেকে উত্তম এবং সুস্পষ্ট দলীল ও অধিকাংশ মুসলমানের অভিমত ব্যতীত ফকীহ আলিমদের কর্তৃক একে অস্বীকার করা অনুচিত। এ জন্যে শারেহ (আঃ) এর পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি কলেমা পড়ার সাধারণ অনুমতি রয়েছে- যে কোন সময় ইচ্ছা করলে পড়তে পারে। দারুণ আশ্চর্য লাগে ওই সব অন্ধদের মনমানসিকতায়, যারা একে অস্বীকার করে। (ইমাম শায়ারানী তাঁর অন্য আর এক কিতাব عهود المشائخ এ বর্ণনা করেন-

ولانمكن احدا من اخواننا ينكر شيئا ابتدعها المسلمون على جهة القربة وروٰه حسنا لاسيما ماكان متعلقا بالله ورسوله كقول الناس امام الجنازة لااله الا الله محمد رسول الله او قراءة احد القرآن امامها ونحو ذالك فمن حرم ذالك فهو قاصر عن فهم الشريعة.

আমি আমার ভাইদের মধ্যে কাউকে এমন কোন কিছুকে অস্বীকার করার সুযোগ দিব না, যেটা মুসলমানগণ ছওয়াব মনে করে আবিষ্কার করেছে এবং একে ভাল মনে করে, বিশেষ করে সে ধরনের কিছু, যেটা আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) সাথে সম্পর্কিত। যেমন জনগণ জানাযার আগে কলেমা পড়ে বা জানাযার আগে কুরআন পাঠ করে। যে ব্যক্তি একে হারাম বলে, সে শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি আরও বলেন-

وكلمة لااله الا الله محمد رسول الله اكبر الحسنات فكيف يمنع منها وتأمل احوال غالب الخلق الان فى الجنازة تجدهم مشغولين بحكايات الدنيا لم يعتبروا بالميت و قلبهم غافل عن جميع ماوقع له بل رأيت منهم من يضحك واذا تعارض عند نامثل ذالك وكون ذالك لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمنا ذكر الله عزوجل بل كل حديث لغو اولى من حديث ابناء الدنيا فى الجنازة فلوصاح كل من فى الجنازة لااله الا الله محمد رسول الله فلا اعتراض.

(কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদার রসুলুল্লাহ' সমস্ত নেকীর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নেকী। সুতরাং এর থেকে কিভাবে নিষেধ করা যেতে পারে। যদি আপনারা আজ কাল জনগণের অবস্থা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেন, তাহলে ওদেরকে জানাযার সাথে যাবার সময় পার্থিব গল্প গুজবে ব্যস্ত দেখবেন; তাদের মন মইয়ত থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং যা কিছু হয়েছে তা থেকে উদাসীন বরং অনেক লোককে আমি হাসিঠাট্টা করতে দেখেছি। যখন এ যুগে জনগণের এ অবস্থা, তখন প্রথম যুগে

মইয়তের সাথে উচ্চস্বরে কালেমা পড়া হতো না হেতু নাজায়েয বলে হুকুম দেয়া দুরস্ত নয়, বরং জায়েয হওয়ার হুকুম দেয়াটাই বাঞ্ছনীয়। এবং জানাযায় ঘরসংসারের কথাবার্তার চেয়ে অন্য কথা ভাল। তাই যদি সবাই জানাযায় উচ্চস্বরে কলেমা পড়ে, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।)

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে বোঝা গেল জানাযার সাথে যদি উচ্চস্বরে যিক্র করা হয়, তা জায়েয। বিশেষ করে বর্তমান যুগে সাধারণ লোকের যখন মইয়তের সাথে হাসিঠাট্টা করে ও দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে গমন করে, তখন তাদের সবাইকে যিক্রে ইলাহীতে নিয়োজিত করা অনেক ভাল; এটা দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে অনেক উত্তম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ মাস্আলা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ ও এসবের জবাব

এ প্রসঙ্গে বিরোধিতাকারীগণ নিম্নলিখিত আপত্তিসমূহ উত্থাপন করে থাকে। ইন্শাআল্লাহ্ এর থেকে আর বেশী কিছু তাদের বলার নেই।

১নং আপত্তিঃ জানাযার সাথে উচ্চস্বরে যিক্র করাকে ফকীহগণ নিষেধ করেন। যেমন ফত্ওয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম খণ্ড কিতাবুল জনায়েযে دفن الميت শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে-

وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقرءة القران فان اراد ان يذكر الله يذكره فى نفسه كذافى فتاوى قاضى خان.

(জানাযার সাথে গমনকারীদের নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব এবং উচ্চস্বরে যিকর করা ও কুরআন তেলায়াত করা মাকরূহ। যিনি আল্লাহর যিক্র করতে চান, যেন মনে মনে করে নেন।) ফত্ওয়ায়ে সিরাজিয়াতে حمل الجنازة শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

ويكره النياح والصوت خلف الجنازة وفى منزل الميت رفع الصوت بالذكر وقرءة القران وقولهم كل حى يموت ونحو ذالك خلف الجنازة بدعة.

(জানাযার পিছনে এবং মইয়তের ঘরে বিলাপ করা, শোরগোল করা এবং

উচ্চস্বরে যিক্র করা ও কুরআন পাঠ করা মাক্রূহ। এবং জানাযার পিছনে 'প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে' উচ্চারণ করে গমন করা বিদ্আত।

দুর্রুল মুখতারের প্রথম খণ্ড কিতাবুল জনায়েয دفن الميت শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

كَمَاكُرِهَ فِيْهَا رَفْعُ صَوْتٍ بِذِكْرٍ اَوْقِرَءَةٍ

(যেমন জানাযায় উচ্চস্বরে যিক্র করা বা কুরআন তেলওয়াত মাকরূহ।) এর প্রেক্ষাপটে শামীতে বর্ণিত আছে-

قُلْتُ وَاِذَا كَانَ هٰذَا فِى الدُّعَاءِ فَمَا ظَنُّكَ بِالْغِنَاءِ الْحَادِثِ فِىْ هٰذَ الزَّمَانِ.

যখন দুআর বেলায় এতটুকু কঠোরতা জ্ঞাপন করা হয়, তখন গানের কি অবস্থা হবে, যা বর্তমান যুগে সৃষ্টি হয়েছে। ইব্নে মনযর "আশ্রাফ" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন-

قَالَ قَيْسُ ابْنُ عُبَادَةَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُوْنَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلٰثٍ عِنْدَ الْقِتَالِ وَفِى الْجَنَازَةِ وَفِى الذِّكْرِ.

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম জিহাদ, জানাযা ও যিক্রের বেলায় উচ্চস্বর নাপছন্দ করতেন।

উপরোক্ত ফকীহ ইবারতসমূহ থেকে বোঝা গেল যে মইয়তের সাথে উচ্চস্বরে যিক্র করা নিষেধ। বিশেষ করে সেই গান, যাকে আজকাল না'ত খানি বলা হয়, খুবই দূষণীয় (বিরোধিতাকারীদের এটাই হচ্ছে চরম আপত্তি)।

উত্তরঃ ফকীহগণের উপরোক্ত ইবারতসমূহে কয়েক ধরনের বক্তব্য রয়েছে।

প্রথমতঃ তারা মইয়তের সাথে উচ্চস্বরে যে যিক্রকে মকরূহ লিখেছেন, সেটা কি মাকরূহ তানযীহ, নাকি তাহরীমি? (মাকরূহ তানযীহ জায়েযের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ওটা করা জায়েয তবে না করাটাই ভাল।)

দ্বিতীয়তঃ তাদের এ হুকুম সেই যুগের জন্য ছিল, নাকি প্রত্যেক যুগের জন্য?

তৃতীয়তঃ তারা যে কোন কথাবার্তা বলা নিষেধ বলেছেন, নাকি কেবল উচ্চস্বরে

যিক্‌র করা বা বিলাপ ইত্যাদি নিষেধ বলেছেন?

চতুর্থতঃ উচ্চস্বরে যিক্‌র প্রত্যেকের জন্য নিষেধ, নাকি বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য বলেছেন?

এ চারটি বিষয় চূড়ান্ত হলে, মাসআলা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আসলে, যে সব ফকীহ মইয়তের সাথে উচ্চস্বরে যিক্‌রকে মাকরূহ বলেছেন, তাতে তারা মাকরূহ তনযীহকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন আল্লামা শামীর উদ্ধৃত ইবারতের পরে বর্ণিত আছে-

قِيْلَ تَحْرِيْمًا وَقِيْلَ تَنْزِيْهًا كَمَا فِى الْبَحْرِ عَنِ الْغَايَتِ وَفِيْهِ عَنْهَا وَيَنْبَغِىْ لِمَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ اَنْ يُطِيْلَ الصُّمْتَ.

(জানাযার সাথে উচ্চস্বরে যিক্‌র করাটা কারো কারো পক্ষ থেকে মাকরূহ তাহরীমী বলা হয়েছে, আবার কারো কারো পক্ষ থেকে মাকরূহ তানযীহ বলা হয়েছে, যেমন বাহারুর রায়েকে গায়ত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেই বাহারুর রায়েকে গায়তের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে, নিশ্চুপ থাকাটাই তার জন্য ভাল।)

এতে বোঝা গেল নিশ্চুপ থাকাটাই ভাল এবং নিশ্চুপ না থাকা তথা উচ্চস্বরে যিক্‌র করা ভাল নয় তবে জায়েয। অধিকন্তু মাকরূহ তানযীহ এবং মাকরূহ তাহরীমীর বিবরণ স্বয়ং আল্লামা শামী (রহঃ) মাকরূহ সমূহের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন। শামীর প্রথম খণ্ড কিতাবুত তাহারতে মাকরূহের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন-

فَحِيْنَئِذٍ اِذَا ذُكِرَ وَامَكْرُوْهًا فَلَا بُدَّمِنَ النَّظْرِ فِىْ دَلِيْلِهِ فَاِنْ كَانَ نَهْيًا ظَنِيًّا يُحْكَمُ بِكَرَاهَةِ التَّحْرِيْمِ الْاَبْصَارِفِ النَّهْىِ عَنِ التَّحْرِيْمِ اِلَى النَّدْبِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنِ الدَّلِيْلُ نَهْيًا بَلْ كَانَ مُفِيْدًا لِلتَّرْكِ الْغَيْرِ الْجَازِمِ فَهِىَ تَنْزِيْهِيَّةٌ.

(যখন ফকীহগণ কোন কিছুকে মাকরূহ বলেন, তখন মাকরূহের দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। যদি এর দলীল সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অনুমান ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞার হয়, তাহলে মকরূহ তাহরীমী বলে ধরে নিতে হবে আর যদি নিষেধাজ্ঞার কোন দলীল না থাকে, কেবল নিষ্প্রয়োজন, 'না করাটাই ভাল' বলা হয়, তাহলে মাকরূহ তানযীহ মনে করতে হবে।)

এতে বোঝা গেল যদি ফকীহগণ মাকরূহের প্রমাণ স্বরূপ-শরয়ী নিষেধাজ্ঞা পেশ

করেন, তাহলে মাকরূহ তাহরীমী; অন্যথায় মাকরূহ তানযীহ। উল্লেখ্য যে, যে সব ফকীহ্ উচ্চস্বরে যিক্‌র নিষেধ বলেছেন, তারা নিষেধাজ্ঞার কোন হাদীছ বা আয়াত পেশ করেননি। আল্লামা শামী কেবল এ দলীলটা উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান- اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (আল্লাহ সীমা লঙ্ঘন কারীদেরকে পছন্দ করেন না।) এর ব্যাখ্যা করেছেন-

اَىِ الْجَاهِرِيْنَ بِالدُّعَاءِ অর্থাৎ উচ্চস্বরে প্রার্থনাকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার কোন সুস্পষ্ট হাদীছ পাওয়া যায়নি। সুতরাং, এটা মাকরূহ তানযীহ এবং মাকরূহ তানযীহ জায়েযই হয়ে থাকে। অধিকন্তু ইমাম শায়ারানী عهود مشائخ নামক কিতাবে জানাযার সাথে যিক্‌র করা প্রসঙ্গে বলেছেন وَقَدْ رَجَّحَ النَّوَوِىُّ اَنَّ الْكَلَامَ خِلَافُ الْاَوْلٰى (ইমাম নববী (রাঃ) জানাযার সাথে যাবার সময় কথা না বলাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন) شرح طريقه محمديه কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে- وَهُوَ يَكْرَهُ عَلٰى مَعْنٰى اَنَّهُ تَارِكُ الْاَوْلٰى.

(জানাযার সাথে উচ্চস্বরে যিক্‌র করা মাকরূহ অর্থাৎ ভাল নয়।) যে কোন অবস্থায় মানতেই হবে, যে সব ফকীহ্ মাক্‌রূহ বলছেন তারা মাকরূহ তান্‌যীহ বোঝাতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ এ নিষেধাজ্ঞা তৎকালীন যুগের জন্য ছিল। বর্তমান যুগে যেহেতু মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে, সেহেতু মাক্‌রূহের এ হুক্‌মটাও পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেননা তখনকার যুগে যাঁরা জানাযার সাথে যেতেন, তারা নিশ্চুপ থাকতেন, এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং মৃত ব্যক্তির শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন। শরীয়তের অভিপ্রায়ও তাই অর্থাৎ মইয়তের জুলুস থেকে মানুষ যেন শিক্ষা গ্রহণ করে। ছৈয়্যদেনা হযরত আলী (রাঃ) বলেন-

وَاِذَا حُمِلْتَ اِلَى الْقُبُوْرِ جَنَازَةً. فَاعْلَمْ بِاَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُوْلٌ.

অর্থাৎ যখন তুমি কবরস্থানে জানাযা নিয়ে যাও, তখন মনে করো, একদিন তোমাকেও এভাবে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেই অবস্থায় অন্য কোন কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা কথা বলার ফলে মন অন্যদিকে চলে যাবে। সুতরাং, ফকীহগণ তখন নিশ্চুপ থাকতে বলেছেন। ইমাম নববী (রহঃ) এর রচিত কিতাবুল আযকারের مايقول الماشى مع الجنازة অধ্যায়ে

উল্লেখিত আছে-

وَالْحِكْمَةُ فِيْهِ ظَاهِرَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ أَسْكَنُ لِخَاطِرِهِ وَاَجْمَعُ لِفِكْرِهِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَنَازَةِ وَهُوَ الْمَطْلُوْبُ فِيْ هٰذَا الْحَالِ.

মিশকাত دفن الميت শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে সাহাবায়ে কিরাম বলেন- আমরা কবরস্থানে মইয়ত দাফন করতে গেলাম। وَجَلَسْنَا مَعَهُ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِنَا الطَّيْرَ কবর তৈরি হতে দেরি ছিল। তাই আমরা এমনভাবে নিশ্চুপ বসে রইলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসেছে। (পাখি শিকারী যখন ফাঁদ পাতে, তখন একেবারে নিশ্চুপ বসে থাকে, যেন শব্দে পাখিটা উড়ে না যায়।) কিন্তু বর্তমান যুগে জানাযার সাথে গমনকারীরা দুনিয়াবী কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা ও মুসলমানদের গীবতে নিয়োজিত থাকে। যদি কবরস্থানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে পরস্পর খোশগল্পে মশগুল হয়ে যায়। তাই ওদেরকে খোদার যিক্‌রে মশগুল করতে পারলে, এসব বেহুদা কথাবার্তা থেকে অনেক ভাল হয়। অতএব বর্তমান যুগের মইয়তের সাথে গমনকারীর উচ্চস্বরে কলেমা ইত্যাদি পড়া মুস্তাহাব। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে হুকুমও পাল্টে যায়। যে মুফ্‌তী নিজের যুগের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর, সে অজ্ঞ। ইমাম শায়ারানী (রহঃ) স্বীয় কিতাব عهود مشائخ এ বলেছেন-

وَاِنَّمَا لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ وَالْقِرَأَةُ وَالذِّكْرُ اَمَامَ الْجَنَازَةِ فِيْ عَهْدِ السَّلَفِ لِاَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا مَاتَ لَهُمْ مَيِّتٌ اِشْتَرَكُوْا كُلُّهُمْ فِي الْحُزْنِ عَلَيْهِ حَتّٰى كَانَ لَا يُعْرَفُ قَرَابَةُ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِ فَكَانُوْا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى النُّطْقِ الْكَثِيْرِ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ بَلْ خَرِسَتْ اَلْسِنَتُهُمْ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ فَاِذَا وَجَدْنَا جَمَاعَةً بِهٰذِهِ الصِّفَةِ فَلْكَ يَاٰخِيْ عَلَيْنَا اَنْ لَا تَاْمُرْهُمْ بِقِرْءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ.

আগের যুগে জানাযার সাথে গমন করার সময় কথা বলা, কুরআন পাঠ ও যিক্‌র এ জন্য ছিল না যে যখন কেউ মারা যেত, তখন সবাই শোক প্রকাশ ও সমবেদনা জ্ঞাপন করতেন। এমন কি মইয়তের নিকট আত্মীয় ও অন্যান্যদের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো না। মৃত্যুর ধ্যানে সবাই এ রকম বিভোর হতো যে কথা বলার শক্তিও কারো থাকতো না। তাদের মুখ বাকহীন হয়ে যেত। যদি আজকাল আমরা সেই রকম

লোক পাই তাহলে ওদেরকে কুরআন পাঠ ও যিক্‌র করার নির্দেশ দেব না।

সুবহানাল্লা! কি সুন্দর রায় দিয়েছেন। বলুন, আজকাল কি মানুষের সেই মনমানসিকতা আছে? হযরত শেখ উছমান বুহাইরী (রহঃ) শরহে একনার হাশিয়া দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন-

(قَوْلُهُ وَكُرِهَ لَفْظٌ فِي الْجَنَازَةِ) قَوْلُهُ لَفْظٌ اَيْ رَفْعُ صَوْتٍ وَلَوْ بِقُرْاٰنٍ اَوْذِكْرٍ اَوْ صَلٰوةٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهٰذَا بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ فِي الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَاِلَّا فَالْاٰنَ لَا بَاْسَ بِذَالِكَ لِاَنَّهُ شِعَارُ الْمَيِّتِ لِاَنَّ تَرْكَهُ مُزْدَرِيَةٌ بِهِ وَلَوْ قِيْلَ بِوُجُوْبِهِ لَمْ يَبْعُدْ كَمَا نَقَلَهُ الْمُدَابِغِيُّ.

অর্থাৎ জানাযার সাথে যাওয়ার সময় শোরগোল করা মাকরূহ। এ শোরগোল কুরআনখানির ফলে হোক বা যিক্‌রের দ্বারা বা দরূদ পাঠের ফলে হোক। এ হুক্‌মটা প্রথম যুগের মুসলমানদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে এসব করলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা বর্তমান যুগে উচ্চস্বরে যিক্‌র করা মইয়তের প্রতি সম্মানের লক্ষণ এবং না করাটা হচ্ছে মইয়তের প্রতি অবজ্ঞাপোষণ। সুতরাং, যদি একে জরুরীও বলা হয়, তা বাড়াবাড়ি বলা যাবে না, যেমন আল্লামা মুদাবেগী (রহঃ) বলেছেন। ইমাম শায়ারানী (রহঃ) عهود مشائخ কিতাবে বলেছেন-

فَمِمَّا اَحْدَثَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَاسْتَحْسَنُوْهُ قَوْلُهُمْ اَمَامَ الْجَنَازَةِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَوْ وَسِيْلَتُنَا يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ نَحْوُ ذَالِكَ فَمِثْلُ هٰذَا لَا يَجِبُ اِنْكَارُهُ فِيْ هٰذَا الزَّمَانِ لِاَنَّهُمْ اِنْ لَمْ يَشْتَغِلُوْا بِذَالِكَ اِشْتَغَلُوْا بِحَدِيْثِ الدُّنْيَا وَذَالِكَ لِاَنَّ قَلْبَهُمْ فَارِغٌ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ بَلْ رَئَيْتُ بَعْضَهُمْ يَضْحَكُ اَمَامَ الْجَنَازَةِ وَيَمْزَحُ.

অর্থাৎ মুসলমানগণ যে কাজটা ভাল মনে করে আবিষ্কার করেছেন, সেটা হচ্ছে জানাযার আগে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বলা বা 'কিয়ামতের দিন খোদার সামনে আমাদের উসীলা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বা এ রকম অন্যান্য যিক্‌র করা। এ যুগে এর থেকে বারণ করা অনুচিত। কেননা এ যুগের লোকেরা যদি সেই যিক্‌রে নিয়োজিত না হয়, তাহলে দুনিয়াবী কথাবার্তায় মশগুল হয়ে

যাবে। কারণ তাদের মন মৃত্যু ভয় থেকে উদাসীন। বরং আমি কতেক লোককে জানাযার সাথে হাসিঠাট্টা করে যেতে দেখেছি।

ইমাম শায়রানী (রহঃ) তো তার যুগের কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আজকের যুগতো এর থেকেও খারাপ। আমি নিজেই দেখেছি যে, কোন এক জানাযায় কবর দিতে একটু দেরি হচ্ছিল। তখন উপস্থিত জনতা পৃথক পৃথক জটলা পাকিয়ে বসে এমনভাবে গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে পড়ে, মনে হচ্ছিল যেন বাজার বসেছে। কতেক লোক মাটিতে আঁক টেনে পাথর দ্বারা খেলতে বসেছিল। এ অবস্থা দেখে আমি সবাইকে একত্রিত করে ওয়াজ করতে শুরু করলাম। লোকদেরকে কাফন-দাফনের আহ্‌কাম বর্ণনা করলাম। ওসব থেকে এটা নিশ্চয়ই উত্তম ছিল।

একটি সূক্ষ্ম মন্তব্য ঃ বিরোধিতাকারীগণ জানাযার সাথে আল্লাহর যিক্‌রকেতো বিদ্‌আত ও হারাম বলে থাকে। কিন্তু কথা বলা, কোন মাসায়েল বর্ণনা করাকে কোন সময় শির্‌ক ও বিদ্‌আত বলে না এবং জনগণের মধ্যে পরস্পর হাসিঠাট্টা করাকে নিষেধও করে না এবং খারাপও বলে না। অথচ ফকীহগণ একেবারে নিশ্চুপ থাকার কথাই বলেছেন, যেমন উপরোক্ত আপত্তিতে উদ্ধৃত ইবারত সমূহ থেকে তাই বোঝা গেছে। গংগা উলটো দিকে কেন প্রবাহিত হচ্ছে? কালাম-সালাম, হাসি উপহাস, ওয়াজ ফাত্‌ওয়া সবই জায়েয; কেবল যিক্‌র ইলাহী বুঝি হারাম? হে আল্লাহ, তাদেরকে বোধশক্তি দিন।

বিঃদ্রঃ সম্ভবতঃ কেউ যদি বলে ইসলামী আহ্‌কামতো পরিবর্তন হয় না কিন্তু এখানে পরিবর্তন কেন? এর জবাব আমি প্রথমেই দিয়েছি যে, যেসব আহ্‌কাম কোন ইল্লতের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া হয়, ইল্লতের পরিবর্তনের সাথে সে সব আহ্‌কামও পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন প্রথম যুগে নামায পড়ান, কুরআন শিক্ষা ইত্যাদির জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম ছিল। কিন্তু এখন জায়েয। অনুরূপ আওলিয়া কিরামের কবরসমূহের উপর চাদর ছড়ানো বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে জায়েয। তদ্রূপ রমযান মাসে খত্‌মে কুরআনের পর দুআ প্রার্থনা করাকে জায়েয বলা হয়েছে। কুর্‌আন শরীফে আয়াত, রূকু সূরা সমূহের নাম প্রথম যুগে ছিল না। কিন্তু সাধারণ লোকের উপকারের কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে জায়েয বলা হয়েছে। ফত্‌ওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবুল কারাহিয়াত اداب المصحف শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে।

لَابَأْسَ لِكِتَابَةِ اَسَامِى السُّوَرِ وَعَدَّالْاٰىِ وَهُوَ وَاِنْ كَانَ اَحْدَاثًا فَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَكَمْ مِنْ شَيْئٍ كَانَ اَحْدَاثًا وَهُوَ حَسَنٌ وَكَمْ مِنْ شَيْئٍ يَّخْتَلِفُ بِاِخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ সূরাসমূহের নাম, আয়াত সমূহের সংখ্যা লেখার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই, যদিওবা এটা বিদ্‌আত কিন্তু বিদ্‌আতে হাসনাই বটে। এ রকম অনেক ভাল বিদ্‌আত প্রচলিত আছে। অনেক কিছু যুগ ও স্থান পরিবর্তনের ফলে পরিবতর্তিত হয়ে যায়। এর দীর্ঘ বিশ্লেষণ আমি প্রথম অধ্যায়ে করছি।

তৃতীয়তঃ কাথিয়াওয়ার্ড ও অন্যান্য স্থানে জানাযার আগে- এমন করুণ সুরে না'ত শরীফ পাঠ করা হয় যে শ্রোতাদের মন কেড়ে নেয়। এ রকম না'ত শরীফ পাঠ করে কোন জানাযা নিয়ে গেলে, ঘরের মধ্যে যারা থাকে, তারাও জানাযার নামাযের জন্য বের হয়ে আসে। ফলে না'তখানি দ্বারা মইয়তের প্রচার হলো। জনগণকে জানাযার নামায ও দাফনে শরীক করানোর জন্য প্রচার করা জায়েয। যেমন দুর্‌রুল মুখতারের دفن ميت শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে-

وَلَابَأْسَ بِنَقْلِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَبِالْاِعْلَامِ بِمَوْتِهِ وَبِارْثَائِهِ بِشِعْرٍ اَوْغَيْرِهِ.

মইয়তকে দাফন করার আগে স্থানন্তরিত করা, এর জানাযার প্রচার করা, মইয়তের শোকগাথা পদ্যে হোক বা অন্যভাবে পাঠ করা জায়েয। ফত্‌ওয়ায়ে শামীতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

اَىْ اِعْلَامُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا لِيَقْضُوْا حَقَّهُ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ اَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ فِى الْاَزِقَّةِ وَالْاَسْوَاقِ وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ لَايُكْرَهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَنْوِيَةٌ بِذِكْرِهِ.

অর্থাৎ একে অপরকে খবর দেয়া, যাতে লোকেরা মইয়তের হক আদায় করতে পারে, তা জায়েয। কতেক লোক অলি-গলি এবং বাজারে প্রচার করাকে মাকরূহ মনে করে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হলো- এ ধরনের প্রচার মাকরূহ নয়, যদি উক্ত প্রচারে মইয়তের অতিরিক্ত প্রশংসা করা না হয়।

যখন জানাযার প্রচারের উদ্দেশ্যে শোক-গাথা পাঠ বা মইয়তের নাম প্রচার করা জায়েয, তখন জানাযার প্রচারের নিয়তে নাত শরীফ বা কলেমা তৈয়্যবা উচ্চস্বরে পাঠ করা কেন হারাম হবে? এতে প্রচারও হচ্ছে, হুযূর আলাইহিস সালামের নাতও হচ্ছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফকীহগণ যা নিষেধ করেন, তা হচ্ছে বে-ফায়দা যিক্‌র। কিন্তু এতে যদি বিশেষ ফায়দা থাকে, তাহলে জায়েয। এ জন্য আল্লামা শামী সেই একই আলোচনায় 'তাতার খানিয়া' থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন-

وَاَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ فَيَحْتَمِلُ اَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّوْحُ اَوِالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَمَا افْتَتَحَ النَّاسُ الصَّلٰوةَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَوِالْاِفْرَاطُ فِى مَدْحِهٖ كَعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَا هُوَيُشْبِهُ الْمَحَالَ وَاَمَّا اَصْلُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فَغَيْرُمَكْرُوْهٍ.

কিন্তু মইয়তের পাশে উচ্চ আওয়াজ করা মানে হয়তো এর দ্বারা বিলাপ করাকে বোঝানো হয়েছে বা মইয়তের নামায হয়ে যাবার পর দুআ করাকে বোঝানো হয়েছে অথবা মইয়তের অতিরিক্ত প্রশংসা করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন জাহেলিয়াত যুগে এ ধরনের প্রচলন ছিল। কিন্তু মইয়তের প্রসংশা করা মাকরূহ নয়।

মোট কথা হলো বেফায়দা উচ্চ আওয়াজ করা নিষেধ। কিন্তু ফলপ্রসূ উচ্চ আওয়াজ বিনা মাকরূহে জায়েয। বর্তমান যুগে এতে অনেক উপকার রয়েছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থতঃ উচ্চস্বরে যিক্রের নিষেধাজ্ঞা বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; সাধারণ লোকেরা উচ্চ স্বরে যিক্র করলে তাদেরকে বারণ করা অনুচিত। ফকীহগণ বলেন, সাধারণ লোকদেরকে যিক্রে ইলাহী থেকে বাধা দিও না, কেন না তারা এমনিতে যিক্রে ইলাহীর ব্যাপারে অনাগ্রহী। এখন যে পরিমাণ যিক্র করতে চায়, করতে দাও। দুর্রুল মুখতারে صلوة العيدين অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَلَا يُكَبِّرَ فِى طَرِيْقِهَا وَلَا يَتَنَفَّلَ قَبْلَهَا مُطْلَقًا وَكَذَا لَا يَتَنَفَّلَ بَعْدَهَا فِى مُصَلَّاهَا فَاِنَّهُ مَكْرُوْهٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ.

(ঈদগাহের পথে তকবীর বলো না। ঈদের নামাযের আগে নফল নামায পড়ো না এবং ঈদের নামাযের পর ঈদগাহে নফল নামায পড়ো না। কেননা এটা অধিকাংশ ফকীহগণের মতে মাকরূহ।) পুনরায় বলেন-

هٰذَالِلْخَوَاصِ اَمَّا الْعَوَامُ فَلَا يُمْنَعُوْنَ مِنْ تَكْبِيْرٍ وَلَا تَنَفُّلٍ اَصْلًا لِقِلَّةِ رَغْبَتِهِمْ فِى الْخَيْرَاتِ.

(এ হুকুম বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য, সাধারণ লোকদেরকে এর থেকে নিষেধ করা যাবে না। তকবীর বলা এবং নফল ইবাদত কোনটার থেকে নয়। কেননা ভাল কাজে ওদের আকর্ষণ কম।)

এ প্রসঙ্গে ফত্ওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত আছে- اَىْ لَاسِرًّا وَلَاجَهْرًا فِى التَّكْبِيْرِ. অর্থাৎ ওদেরকে নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে তকবীর বলা থেকে বাধা দেবে না। অধিকন্তু আমি উচ্চস্বরে যিক্র শীর্ষক আলোচনায় ফত্ওয়ায়ে শামীর ঈদাইন অধ্যায়ের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছি যে, কোন এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এর কাছে জানতে চেয়েছিল- লোকেরা বাজার সমূহে যে উচ্চস্বরে তকবীর বলে, তাদেরকে

নিষেধ করা যাবে কিনা।

তিনি উত্তরে, 'না' বলেছিলেন। উপরোক্ত ইবারত সমূহ থেকে বোঝা গেল যে, কোন কোন অবস্থায় বিশেষ ব্যক্তিদেরকে কোন বিশেষ যিক্র থেকে বারণ করা হয়, কিন্তু সাধারণ লোকদেরকে নিষেধ করা হয়নি। এ জন্যেই ফকীহগণ 'জানাযার আগে উচ্চস্বরে যিক্র করো না' বলেছেন, কিন্তু 'যিক্রকারীদেরকে এর থেকে বাধা দাও' বলেননি।

এ জবাবের সারকথা হচ্ছে প্রথমতঃ এ নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ তান্যীহ হিসেবে করা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ, এ হুক্‌ম প্রথম যুগের জন্য ছিল। এখন সেই হুক্‌ম বদলে গেছে কারণ ইল্লত পরিবর্তিত হয়েছে। তৃতীয়তঃ যেহেতু এ যিক্র দ্বারা প্রচার হচ্ছে, তাই এটা উপকারী হেতু জায়েয। চতুর্থতঃ, এ হুক্‌ম বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য। সাধারণ লোকেরা যদি যিক্রে ইলাহী করে তাহলে তাদেরকে যেন বাধা দেয়া না হয়।

২নং আপত্তিঃ জানাযার আগে উচ্চস্বরে যিক্র করার মধ্যে হিন্দুদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা ওরা 'রাম রাম হরি রাম' বলে চিৎকার করে যায় এবং আপনারাও হৈ-হল্লা করে যান। কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য নাজায়েয। সুতরাং, এটাও নাজায়েয।

উত্তরঃ কাফিরগণ মূর্তিদের নাম নেয় আর আমরা খোদায়ে কুদ্দসের যিক্র করি। তাহলে সাদৃশ্য কোথায় রইলো? কাফিরগণ দেবতার নামে আর আমরা খোদার নামে পশু যবেহ করি। কাফিরগণ গংগানদী থেকে গংগার পানি আনে আর আমরা মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে যমযমের পানি আনি। এটাকে সাদৃশ্য বলা হয় না। যে সব কাজ কাফিরদের জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, এগুলোর সাথেই কেবল সাদৃশ্য নিষেধ, অন্যান্য বিষয়ে নয়। যদি কাফিরগণও তাদের জানাযার আগে কলেমা পাঠ করতে থাকে, আপনারাও সানন্দে পড়ুন। কেননা এটা ভাল কাজ আর ভাল কাজের সাদৃশ্য দূষণীয় হতে পারে না।

৩য় আপত্তিঃ রাস্তায় উচ্চস্বরে কলেমা তৈয়্যবা পড়া বেআদবী কেননা তথায় ময়লা আবর্জনা থাকে। সুতরাং, তা নিষেধ।

উত্তরঃ এ আপত্তিটা নিছক গলাবাজি বৈ কিছু নয়। ফকীহগণের অভিমত হলো, রাস্তা দিয়ে চলার সময় যিক্র জায়েয। তবে ময়লা আবর্জনা ফেলার নির্ধারিত জায়গায় উচ্চস্বরে যিক্র নিষেধ, যেমন পায়খানা, ময়লাখানা ইত্যাদি জায়গায়। ফত্ওয়ায়ে শামীতে قرأت عند الموت শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত আছে।

وَفِى الْقُنْيَةِ لَابَأْسَ بِالْقِرَأَةِ رَاكِبًا اَوْ مَاشِيًا اِذَا لَمْ يَكُنْ ذَالِكَ الْمَوْضِعُ مُعَدًّا لِلنَّجَاسَةِ

কোন কিছুতে আরোহণ করে বা পায়ে হেঁটে চলার সময় কুরআন তিলাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই, যদি ওই জায়গাটা ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য তৈরি করা না হয়।) কুরআন বগলে নিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করা জায়েয। কিন্তু পায়খানায় নিয়ে যাওয়া নিষেধ। আরও লক্ষ্যণীয় যে, কুরবানী ঈদের দিন নির্দেশ আছে যে, ঈদগাহে যাওয়ার সময় রাস্তায় যেন উচ্চস্বরে তকবীরে তশরীক বলা হয়। দুর্রুল মুখতারে- صلوة العيدين। অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- وَيُكَبِّرُ جَهْرًا اِتِّفَاقًا فِى الطَّرِيْقِ (রাস্তাতে যেন উচ্চস্বরে তকবীর বলা হয়) অথচ রাস্তায় ময়লা ইত্যাদি থাকে। ফকীহগণ আরও বলেন যে, স্নানাগারে তসবীহ তাহলীল উচ্চস্বরে পাঠ করা জায়েয। অথচ ওখানে প্রায় সময় ময়লা থাকে। ফত্ওয়ায়ে আলমগীরী কিতাবুল কারাহিয়াতের الصلوة। والتسبيح অধ্যায়ে, উমদাতুল আবরার, মজমাউল নাওয়াযেল, খানিয়া, সিরাজিয়া ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে-

وَاَمَّا التَّسْبِيْحُ وَ التَّهْلِيْلُ لَابَأْسَ بِذَالِكَ وَاِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ.

অর্থাৎ স্নানাগারে উচ্চস্বরেও তস্‌বীহ-তাহলীল পড়া জায়েয।

৪নং আপত্তিঃ জানাযার আগে উচ্চস্বরে যিক্‌রের দ্বারা ঘরের মহিলা ও শিশুরা ভয় পেয়ে যায়। কেননা এর দ্বারা ওদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, যার ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারেও তা নিষেধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উত্তরঃ কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান- اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অর্থাৎ আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা আত্মা শান্তি লাভ করে। মুসলমানেরাতো এর থেকে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেন। তবে হ্যাঁ, কাফিরগণ ভয় পেতে পারে। তাদের ভয় পাওয়া দরকার।তারাতো আযানকেও ভয় করে। তাই বলে কি আযান নিষেধ করে দিতে হবে? আর যদি কোন বিখ্যাত চিকিৎসক লিখে থাকেন যে কলেমা তৈয়বার আওয়াজ মহামারীর অন্যতম কারণ, তাহলে প্রমাণ পেশ করা হোক। অবশ্য সেই ডাক্তার নিশ্চয়ই মুসলমান ও প্রসিদ্ধ হতে হবে; কোন দেওবন্দী বা হাতুড়ে ডাক্তার হলে চলবে না। কারণ, মনগড়া কথার কোন মূল্য নেই। যা'হোক, প্রমাণিত হলো যে, মইয়তের আগে উচ্চস্বরে যিক্‌র করা অনেক উত্তম এবং বরকতময়। বিরোধীতাকারীদের কাছে ভুল ধারণা ব্যতীত অন্য কোন উল্লেখযোগ্য আপত্তি নেই।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذَالِكَ

পরিশিষ্ট

খোদার শুকর, যে সব মাসায়েল নিয়ে দেওবন্দীরা ভিন্নমত পোষণ করে, সে সবের মোটামুটি বিশ্লেষণ করা হলো। অবশ্য সে সব মাসায়েলের মধ্যে অনেক মাসায়েল এ রকমও আছে, যে গুলো ঈমানের জন্য হুমকী নয়, কেবল মুস্তাহাব বা মাকরূহ নিয়ে মতপার্থক্য। তবে এমন অনেক মাসায়েলও রয়েছে, যার জন্য আরব আযমের প্রখ্যাত উলামায়ে কিরাম দেওবন্দীদেরকে কাফির ফত্ওয়া দিয়েছেন এবং তাদের আকীদাকে ইসলামী আকীদার বিপরীত প্রমাণ করেছেন। মুসলমানদের অবগতির জন্য আমি তাদের বাতিল আকীদার একটি তালিকা নিম্নে পেশ করলাম। পাশাপাশি সঠিক ইসলামী আকীদাও তুলে ধরলাম। তাদের এ সব আকীদা তাদের প্রকাশিত কিতাব সমূহে মওজুদ আছে। কেউ ভুল প্রমাণ করতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ এ সব বাতিল আকীদাকে সাথে সাথে খণ্ডন করে দেয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এখানে তা করতে পারলাম না। ইন্‌শা আল্লাহ, আমি এ কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করবো; তখন ওসব আকীদার ব্যাপক বিশ্লেষণ করা হবে। তাই এখন কেবল আকীদাটা পেশ করলাম।

দেওবন্দী আকীদা	ইসলামী আকীদা
❖ ১) আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে। (মাসায়েলে ইম্‌কানে কিযব') মওলভী খলিল আহমদ সাহেব আম্বেঠী রচিত 'বারাহিনুল কাতিয়া' ও মওলবী মাহমুদুল হাসান সাহেব রচিত 'জাহদুল মকিল' দ্রষ্টব্য।	চুরি করা, যেনা করা ইত্যাদির মত মিথ্যা বলা দোষ। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দোষ থেকে পবিত্র। وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا. আল্লাহ থেকে অধিক সত্যবাদী কে আছে? (কুরআন) অধিকন্তু আল্লাহর গুণাবলী হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী, সম্ভাব্য নয়। সুতরাং আল্লাহর বেলায় "সম্ভব" বলাটা ধর্মহীনতার পরিচায়ক।

✪ ✪ ✪

দেওবন্দী আকীদা	ইসলামী আকীদা
❖ ২) আল্লাহর শান হচ্ছে-যখনই ইচ্ছে করে, অদৃশ্য জ্ঞান জেনে নেয়। কোন ওলী, নবী, জ্বীন, ভুত, ফিরিশ্‌তাকে আল্লাহ তা'য়ালা এ ক্ষমতা দেননি। (মওলভী ইসমাইল	আল্লাহ তা'আলা সবসময়ের জন্য অদৃশ্য জ্ঞানী। এ অদৃশ্য জ্ঞানটা হচ্ছে তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা অবশ্যম্ভাবী। যখন ইচ্ছা পোষণ করে, তখন জেনে নেয়- এর অর্থ

সাহেব দেহলবী রচিত 'তক্‌বিয়াতুল ঈমান।

হচ্ছে যখন তিনি ইচ্ছে করেন না, তখন এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন। এ ধরনের ধারণা কুফরী। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রিয় জনদেরকেও গায়বী ইলম দান করেছেন। (কুরআন করীম)

✪ ✪ ✪

❖ ৩। আল্লাহ তা'আলাকে স্থান, কাল, গঠন ও আকৃতি থেকে পবিত্র মনে করা বিদ্‌আত। মওলবী ইসমাইল রচিত 'ইজাউল হক' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

খোদায়ে কুদ্দুস স্থান, কাল, গঠনও আকৃতি থেকে পবিত্র। তিনি কোন জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট নন, তাঁর আয়ুষ্কাল বলতে কিছু নেই। তিনি কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা গঠিত নন। দেওবন্দীরাও বেমালুম একে কুফরী বলেছে। (ইলমুল কালামের কিতাব সমূহ দ্রষ্টব্য)

✪ ✪ ✪

❖ ৪। বান্দাদের কাজসমূহের বেলায় আল্লাহ তা'আলা আগে থেকে অবগত থাকেন না। বান্দা ভালমন্দ কাজ যখনই করে ফেলে, তখনই জানা হয়ে যায়। মওলবী রশিদ আহমদ সাহেবের শিষ্য মওলবী হোসাইন আলী সাহেব রচিত 'বুলগাতুল হয়রান' কিতাবের ৫৭ পৃষ্ঠায় إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُّبِيْنٍ. এ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ তাআলা সবসময়ের জন্য সব কিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত। তার জ্ঞান হচ্ছে অবশ্যম্ভাবী ও স্থায়ী। যে কোন কিছুর ক্ষেত্রে একমুহূর্তের জন্যও যদি তাকে অজ্ঞ মনে করা হয়, তা ধর্মদ্রোহিতার সামিল। (আকায়েদের কিতাব দ্রষ্টব্য) দেওবন্দীরা যেখানে খোদার গায়বী ইলমকে অস্বীকার করে, সেখানে হুযুর আলাইহিস সালামের ইলমে গায়বকে অস্বীকার করলে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

✪ ✪ ✪

❖ ৫। 'খাতিমুন নবীয়ীন' এর অর্থ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে শেষ

খাতিমুন নবীয়ীন এর অর্থ হচ্ছে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শেষ

নবী মনে করাটা ভুল। আসলে, এর অর্থ হচ্ছে তিনি (দঃ) আসল নবী এবং অন্যান্য নবীগণ হচ্ছেন আরেযী (মূল নবীর ভূমিকা অনুসরণকারী) নবী সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরে অন্য কোন নবী এসে গেলেও হুযুরের শেষ নবী হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব পড়বে না। (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী কাসেম রচিত "তাহযিরুন নাস" কিতাব দ্রষ্টব্য)

নবী। তার প্রকাশ্য যুগে বা পরে কোন আসলী, নকলী, অস্থায়ী ক্ষণস্থায়ী কোন রকমের নবীর আগমন একেবারে অসম্ভব। এ অর্থে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে এবং হাদীছেও এ অর্থ প্রকাশ পায়। যে এ অর্থের অস্বীকার করে, সে ধর্মদ্রোহী হিসেবে গণ্য যেমন কাদিয়ানী ও দেওবন্দীরা।

✪ ✪ ✪

❖ ৬। আমলসমূহের বেলায় বাহ্যতঃ উম্মত নবীর বরাবর হয়ে যায়। বরং অনেক সময় অতিক্রমও করে যায়। (তাহযিরুন নাস' দ্রষ্টব্য।

নবী ভিন্ন অন্য কেউ, তিনি ওলী হোক বা গাউছ বা সাহাবা, ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে নবীর বরাবর হতে পারে না। এমনকি, সাহাবী নয় এমন কেউ সাহাবীর বরাবর হতে পরেন না। সাহাবীর যৎসামান্য গম খয়রাত আমাদের শত শত মণ স্বর্ণ খয়রাত থেকেও অনেক উত্তম।

✪ ✪ ✪

❖ ৭। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তুলনা ও দৃষ্টান্ত সম্ভব। (মৌলভী ইসমাইল দেহলবী রচিত يكروزى গ্রন্থের ১৪৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাত তা' আলা অতুলনীয় সৃষ্টি কর্তা আর তার মাহবুব অতুলনীয় বান্দা। তিনি (দঃ) সমস্ত জগতের জন্য রহমত ও গুণাহগারদের সুপারিশকারী। এ সব গুণাবলীর জন্য তার তুলনা সত্ত্বাগতভাবে অসম্ভব। (মৌলানা ফজলুল হক খায়রাবাদী রচিত রেসালা امتناع النظير দেখুন)

✪ ✪ ✪

❖ ৮। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে ভাই বলা জায়েয, কেননা তিনিও

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে সাধারণ শব্দসমূহ দ্বারা ডাকা হারাম

মানুষ। (মৌলভী খলিল আহমদ সাহেব রচিত বারাহিনুল কাতিয়া ও মৌলভী ইসমাঈল সাহেব রচিত 'তক্‌বিয়াতুল ঈমান' দ্রষ্টব্য।

আর তা যদি অবজ্ঞার নিয়তে হয়, তাহলে কুফরী (আল-কুরআন)। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে ইয়া রাসুলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বলা প্রয়োজন।

نسبت خود بہ سگت کردم وبس منفعلم

زانکہ نسبت بہ سگ کوئے توشد بے ادبی است۔

অর্থাৎ নিজেকে আপনার কুকুরের সমতুল্য বলতে পারলে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু তা বলতেও বেআদবী মনে হয়।

✪ ✪ ✪

❖ ৯। শয়তান ও মৃত্যুর ফিরিশতার জ্ঞান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বেশী (মৌলভী খলিল আহমদ রচিত 'বারাহিনুল কাতিয়া')

যেই ব্যক্তি সৃষ্টিকুলের কাউকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বেশী জ্ঞানী মনে করে, সে কাফির (শেফা শরীফ দেখুন) খোদার সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সব চেয়ে বড় জ্ঞানী।

✪ ✪ ✪

❖ ১০। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জ্ঞান শিশু, পাগল ও পশুদের জ্ঞানের মত বা ওদের সমতুল্য (মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব রচিত 'হিফজুল ঈমান' দেখুন)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন পবিত্র বৈশিষ্ট্যকে সাধারণ জিনিসের সাথে তুলনা করা বা ওসবের বরা বর বলা সুস্পষ্ট মানহানিকর এবং এটা কুফরী।

✪ ✪ ✪

❖ ১১। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উর্দ্দু বলাটা দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে শিখেছেন (মৌলভী খলিল আহমদ সাহেবের "বারাহিনুল কাতিয়া")।

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)কে সমস্ত ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জ্ঞান হযরত আদম থেকে অনেক গুণ বেশী। তাই যারা বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ

ভাষা জ্ঞান অমুক মাদ্রাসা থেকে অর্জন করেছে, তারা ধর্মদ্রোহী।

✪ ✪ ✪

❖ ১২। প্রত্যেক ছোট বড় মখলুক (নবী ও গায়র নবী) আল্লাহর শান [শা]নের সামনে চামার থেকে নিকৃষ্ট ([মৌলভী ইসমাঈল রচিত "তাক্‌বিয়া[তু]ল ঈমান" দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا (আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান)। আরও ইরশাদ করেন اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (সম্মানতো আল্লাহর আর তার রাসুল ও মুমিনদের।) খোদার সামনে যে নবীকে নিকৃষ্ট মনে করে, সে নিজেই চামার থেকে নিকৃষ্ট।

✪ ✪ ✪

❖ ১৩। নামাযে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে স্মরণ করা, স্বীয় গরু [গ]াধার ধ্যানে মগ্ন থাকার চেয়েও [নি]কৃষ্ট। (মৌলভী ইসমাইল দেহলবী [র]চিত "সিরাতুল মুস্তাকীম" দ্রষ্টব্য)

যে নামাযে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠতার কথা মনে পড়বে না, সে নামাযই অগ্রাহ্য হবে। এ জন্য তাশাহুদে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে সালাম করা হয়। এ তাশাহুদ ছাড়া নামায হতে পারে না। (হাযির নাযির আলোচনা দেখুন।)

✪ ✪ ✪

❖ ১৪। আমি হুযূর আলাইহিস [স]ালামকে স্বপ্নে দেখলাম যে তিনি [আ]মাকে পুলসিরাতে নিয়ে গেলেন। [কি]ছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখলাম তিনি (দঃ) পড়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি [তা]কে (দঃ) ধরে ফেললাম। (মৌলবী [র]শিদ আহমদ ছাহেবের শিষ্য মৌলভী [হু]সাইন আলী রচিত

হুযূর আলাইহিস সালামের কতেক গোলাম পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুত বেগে চলে যাবে। আবার পুল সিরাতের উপর পিচ্ছিল খাওয়া অনেক লোক হুযূরের বদৌলতে রক্ষা পাবে। তিনি (দঃ) আল্লাহর দরবারে দুআ করবেন رَبِّ سَلِّمْ (আল-হাদীছ)। যে বলে আমি

بلغة الحيران গ্রন্থ দ্রষ্টব্য	হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে পুলসিরাতে পড়ে যাবার থেকে রক্ষা করেছি, সে বেঈমান।
✪	✪ ✪
❖ ১৫। মৌলবী আশরাফ আলী ছাহেব বৃদ্ধকালে তার অল্পবয়স্কা এক মহিলা মুরীদকে বিবাহ করেন। এ বিবাহের আগে তার কোন এক মুরীদ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে মৌলবী আশরাফ আলীর ঘরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) তশরীফ এনেছেন। এর তাবীর প্রসঙ্গে মৌলভী আশরাফ আলী সাহেব বলেন- কোন অল্পবয়স্কা মহিলা আমার হাতে আসবে। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর মাত্র। এ স্বপ্নে সেই ইঙ্গিতই রয়েছে যে আমি হলাম বৃদ্ধ এবং বিবি সাহেবা হচ্ছে বালিকা। (মৌলভী আশরাফ আলী রচিত রিসালাতুল ইমদাদ দ্রষ্টব্য)	হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত বিবি সাহেবান মুসলমানদের জন্য মায়ের মত (আল-কুরআন)। বিশেষ করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাতুল কুবরা (রাঃ) এর সেই উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যে, সারা বিশ্বের মায়েরা তার পবিত্র চরণে উৎসর্গীত। কোন মূর্খ ব্যক্তিও মা কে স্বপ্নে দেখে স্ত্রী হিসেবে তাবীর করবে না। তাই এটা হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) এর প্রতি অবমাননা কর বরং তার শানে সুস্পষ্ট বেআদবী বোঝা যায়। মাকে স্ত্রী হিসেবে তাবীর করার চেয়ে জঘন্য বেআদবী আর কি হতে পারে?

এ হলো দেওবন্দী আকীদার কিছু নমুনা। যদি তাদের সমস্ত আকীদা বর্ণনা করতে যাই, তাহলে এর জন্য বিরাট দফতরের প্রয়োজন হবে। আসল কথা হলো রাফেজীরা ও খারেজীরা কেবল সাহাবায়ে কিরাম বা আহলে বাইতে এজামের সমালোচনা করেছে। কিন্তু দেওবন্দীদের কলমের খোঁচা থেকে আল্লাহর জাতে পাক, রসুল করীম (দঃ), সাহাবায়ে কিরাম, হুযূরের পবিত্র স্ত্রীগণ কেউ রক্ষা পাননি; সবারই সমালোচনা করা হয়েছে। কেউ কোন ভদ্র লোককে যদি বলে যে, সে ওনার মাকে স্বপ্ন দেখেছে এবং স্ত্রী হিসেবে এর তাবীর করে, তখন সেই ভদ্র লোক কিছুতেই সহ্য করবেন না। কিন্তু আমরা আমাদের মা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এর বেলায় এ ধরনের উক্তি কিভাবে সহ্য করি! হাতে কলম ব্যতীত আর কিছু নেই, তাই এ কলমের সাহায্যে

মুসলমানেদেরকে সজাগ করে দিচ্ছি। যেন তাদের থেকে দূরে থাকেন বা তারা (দেওবন্দীরা) সে সব আকীদা থেকে যেন তওবা করে।

আমার প্রাণ প্রিয় ও স্নেহ ভাজন শাগরীদ মৌলবী সৈয়দ মাহমুদ শাহ খুবই আগ্রহ করেছিল, আমি যেন "ইমকানে কিযব" ও 'ইমকানে নযির" সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করি। কিন্তু নানা ব্যস্ততার কারণে কেবল দেওবন্দী আকীদার কিছু নমুনা পেশ করলাম। ইন্‌শা আল্লাহ, এ কিতাবের পরবর্তী খণ্ডে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তখন দেওবন্দীদের যুক্তি বিদ্যার দৌড় কতটুকু, তা জানা যাবে এবং মৌলভী হোসাইন আহমদ ছাহেব ও মৌলভী মরতুজা হোসেন ছাহেব যে সব বিশ্লেষণ দিয়েছেন, সে সবের অন্তঃসার শূন্যতাও প্রমাণিত হবে। আমাদের সুন্নীদের প্রতি অপবাদ দেয়া হয় যে আমরা পীর পূজারী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও নিজেদের পীরদেরকে খোদার মত মনে করি। তাই আমরা নাকি মুশরীক। আমি এখন দেখাচ্ছি স্বয়ং দেওবন্দীরা কতটুকু পীর পূজারী এবং পীরদেরকে কি করেন। মৌলভী মাহমুদুল হাসান ছাহেব স্বীয় শেখ মৌলভী রশীদ আহমদ ছাহেব গাঙ্গুহী সম্পর্কে রচিত শোক-গাথায় লিখেছেন-

تمہاری تربت انور کودے کرطورسے تشبیہ

کہوں ہوں بار بار أرِنِی مری دیکھی بہی ناداں۔

অর্থাৎ তোমার মাযারকে তুর পাহাড়ের সাথে তুলনা করা যায় আর আমি হযরত মুসা (আঃ) এর মত أَرِنِي বলে তোমার সাক্ষাৎ কামনা করছি। দেখুন, এখানে মৌলভী রশীদ আহমদের কবরকে তুর পাহাড় বলা হয়েছে আর মৌলভী মাহমুদুল হাসান হয়েছেন হযরত মুসা (আঃ) এর অভিনয়কারী। তাহলে নিশ্চয়ই মৌলভী রশীদ আহমদ ছাহেবকে খোদা কল্পনা করেছেন। একই শোক গাথায় আরও বলেছেন-

زباں پر اہل اہواکی ہے کیوں اعل ہبل شاید

اٹھا دنیاسے کوئی بانی اسلام کاثانی۔

অর্থাৎ যে মুহূর্তে প্রকৃতি পূজারীদের মুখে উলূ হুবল মূর্তির শ্লোগান, সে মহূর্তে ইসলামের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব হয়েছিল। এ পংক্তিতে মৌলবী রশীদ আহমদ ছাহেবকে ইসলামের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ আলাইহিস সালামের মত আর একজন বলেছেন। আরও বলেছেন-

وہ تھے صدیق اور فاروق پھر گھئے عجب کیاہے.

شہادت نے تہجد میں قدم بوسی کی گرٹھانی.

অর্থাৎ তাকে হয়ত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযমের মত বল্‌লেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখানে তাকে সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম বানিয়ে ছেড়েছেন। এরপর লিখেছেন-

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں.

عبیدسود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی.

অর্থাৎ একেই বলে স্বার্থকতা যে কালো বান্দাকে দ্বিতীয় ইউসুফের লকবে ভূষিত করা হয়েছে। এখানে মৌলবী রশীদ আহমদকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাথে তুলনা করেছেন। পাঠক বৃন্দ লক্ষ্য করুন, আল্লাহ থেকে শুরু করে ফারুকে আযম পর্যন্ত কোন পদমর্যাদা বাদ দেয়া হয়নি, যা মৌলভী রশীদ আহমদ ছাহেবকে দেয়া হয়নি। সম্পূর্ণ শোকগাথাটা দেখার মত বিষয়। উক্ত শোক গাথায় এ পংক্তিটাও স্থান পেয়েছে-

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا.

اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم.

অর্থাৎ ওহে ইব্‌নে মরিয়ম (হযরত ঈসা আঃ) আপনিতো কেবল মৃতকে জীবিত করেছেন কিন্তু আমার মুর্শেদ মৌলভী রশীদ আহমদ মৃতকে জীবিতও করেছেন এবং জীবিতকে মরতেও দেননি। এখানে মৌলবী রশীদ আহমদকে হযরত ঈসা (আঃ) থেকে আফজল বলেছেন।

মৌলভী আশরাফ আলী ছাহেবের এক শাগ্‌রীদ তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে আমি স্বপ্নে- لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ أَشْـرَفُ عَلِىْ رَسُـوْلُ اللّٰهِ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রসুলুল্লাহ) এ ধরনের কলেমা পড়তে দেখলাম। শুদ্ধভাবে পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মুখ থেকে এ রকমই বের হচ্ছিল। অতঃপর ঘুম ভেঙে যায়। এবং পুনরায় দরূদ শরীফ পড়লাম। তখনও মুখ থেকে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا أَشْرَفُ عَلِىْ

বের হয়েছে। অথচ আমি জাগ্রত কিন্তু মন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর উত্তরে

মৌলবী আশরাফ আলী ছাহেব লিখেছেন যে এ ঘটনার মধ্যে সান্ত্বনা রয়েছে। তুমি যে দিকে ধাবিত হও না কেন, তাতে সুন্নাতের অনুসরণই প্রকাশ পাবে ("রেসালাতুল এমদাদ" এর ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) মনোযোগ দেয়ার বিষয় যে আশরাফ আলী ছাহেবের কলেমা পড়ুন এবং তার নামে দরূদ পাঠ করুন। অতঃপর মুখের উপর অনিয়ন্ত্রণের অজুহাত পেশ করুন, তাতে সব জায়েয হয়ে যাবে। কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল এবং পরে বললো মুখ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এ বাহানা যথার্থ নয়; তালাক হয়ে যাবে। অথচ এ ক্ষেত্রে যথার্থ মনে করা হয়েছে এবং এতে পীরের অনুগত্য প্রকাশ পাওয়ায় সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।"তাজকেরাতুর রশীদ" গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে, হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর ভাবী তাঁর মেহমানদের জন্য খাবার তৈরী করছিল। তথায় রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন এবং ওকে বললেন, "তুমি সরে যাও, ইমদাদুল্লাহর মেহমানের খাবার তৈরী করার উপযুক্ততা তোমার নেই। তাঁর মেহমান হচ্ছে (দেওবন্দী) উলামায়ে কিরাম, আমি ওসব মেহমানদের খাদ্য রান্না করবো"(নিলর্জ্জ কোথাকার)

মৌলভী ইসমাইল ছাহেব দেহলবী "সিরাতুল মুস্তাকিম" এর শেষে স্বীয় মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ ছাহেবের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন- একদিন আল্লাহ তাআলা, ওর ডান হাত তাঁর খাস কুদরতী হাতের মধ্যে ধারণ করে খোদার কুদরতী কার্যাবলীর অনেক দুর্লভ জিনিস তার সামনে উপস্থাপন করেছেন অতঃপর বলেন 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সৈয়দ আহমদকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, – যে সব ব্যক্তি তোমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে, যদিওবা তারা লক্ষাধিক হোক না কেন, আমি প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করবো "একই সিরাতুল মুস্তাকিমে আওলিয়া কিরাম প্রসঙ্গে বলেছেন, আম্বিয়া কিরামের সাথে তাদের ওই রকম সম্পর্ক, যে রকম ছোট ভাইদের সাথে বড় ভাইদের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আউলিয়া কিরামের মধ্যেও নবুয়াতের বৈশিষ্ট্য মওজুদ রয়েছে। (মাআজাল্লা) বলুন আজ পর্যন্ত কোন মুরিদ স্বীয় পীরের এরকম প্রশংসা করেছে কি? কিন্তু এ সব মহারথীদের বেলায় শির্‌কের ফত্‌ওয়া বা কুফ্‌রীর অভিযোগ উত্থাপন করা হয় না এবং তাদেরকে পীর পূজারীও বলা হয় না।

যা কিছু আরয করা হয়েছে, তা দ্বারা নিজের জ্ঞান বা যোগ্যতা প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নয়। আর আমার জ্ঞান বা যোগ্যতাওবা কি আছে। যৎসামান্য যা কিছু লিখেছি, তা হচ্ছে আমার মুর্শেদ ও উস্তাদ মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দিন ছাহেব মুরাদাবাদী (রহঃ) এর সদ্‌কা। এ কিতাব লিখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানেরা যেন শত্রু মিত্র চিনতে পারে, অমূল্য ঈমান যেন ধর্মীয় ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এবং দুনিয়া

وہ تھے صدیق اور فاروق پھر گھئے عجب کیاہے۔

شہادت نے تہجد میں قدم بوسی کی گرٹھانی۔

অর্থাৎ তাকে হয়ত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযমের মত বললেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এখানে তাকে সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম বানিয়ে ছেড়েছেন। এরপর লিখেছেন-

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں۔

عبیدسود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی۔

অর্থাৎ একেই বলে স্বার্থকতা যে কালো বান্দাকে দ্বিতীয় ইউসুফের লকবে ভূষিত করা হয়েছে। এখানে মৌলবী রশীদ আহমদকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর সাথে তুলনা করেছেন। পাঠক বৃন্দ লক্ষ্য করুন, আল্লাহ থেকে শুরু করে ফারুকে আযম পর্যন্ত কোন পদমর্যাদা বাদ দেয়া হয়নি, যা মৌলভী রশীদ আহমদ ছাহেবকে দেয়া হয়নি। সম্পূর্ণ শোকগাথাটা দেখার মত বিষয়। উক্ত শোক গাথায় এ পংক্তিটাও স্থান পেয়েছে-

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا۔

اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔

অর্থাৎ ওহে ইব্‌নে মরিয়ম (হযরত ঈসা আঃ) আপনিতো কেবল মৃতকে জীবিত করেছেন কিন্তু আমার মুর্শেদ মৌলভী রশীদ আহমদ মৃতকে জীবিতও করেছেন এবং জীবিতকে মরতেও দেননি। এখানে মৌলবী রশীদ আহমদকে হযরত ঈসা (আঃ) থেকে আফজল বলেছেন।

মৌলভী আশরাফ আলী ছাহেবের এক শাগ্‌রীদ তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে আমি স্বপ্নে- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْرَفْ عَلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আশরাফ আলী রসুলুল্লাহ) এ ধরনের কলেমা পড়তে দেখলাম। শুদ্ধভাবে পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মুখ থেকে এ রকমই বের হচ্ছিল। অতঃপর ঘুম ভেঙে যায়। এবং পুনরায় দরূদ শরীফ পড়লাম। তখনও মুখ থেকে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا اَشْرَفْ عَلِىْ

বের হয়েছে। অথচ আমি জাগ্রত কিন্তু মন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর উত্তরে

মৌলবী আশরাফ আলী ছাহেব লিখেছেন যে এ ঘটনার মধ্যে সান্ত্বনা রয়েছে। তুমি যে দিকে ধাবিত হও না কেন, তাতে সুন্নাতের অনুসরণই প্রকাশ পাবে ("রেসালাতুল এমদাদ" এর ৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) মনোযোগ দেয়ার বিষয় যে আশরাফ আলী ছাহেবের কলেমা পড়ুন এবং তার নামে দরূদ পাঠ করুন। অতঃপর মুখের উপর অনিয়ন্ত্রণের অজুহাত পেশ করুন, তাতে সব জায়েয হয়ে যাবে। কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল এবং পরে বললো মুখ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এ বাহানা যথার্থ নয়; তালাক হয়ে যাবে। অথচ এ ক্ষেত্রে যথার্থ মনে করা হয়েছে এবং এতে পীরের অনুগত্য প্রকাশ পাওয়ায় সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।"তাজকেরাতুর রশীদ" গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে, হাজী ইমদাদুল্লাহ ছাহেব স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর ভাবী তাঁর মেহমানদের জন্য খাবার তৈরী করছিল। তথায় রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন এবং ওকে বললেন, "তুমি সরে যাও, ইমদাদুল্লাহর মেহমানের খাবার তৈরী করার উপযুক্ততা তোমার নেই। তাঁর মেহমান হচ্ছে (দেওবন্দী) উলামায়ে কিরাম, আমি ওসব মেহমানদের খাদ্য রান্না করবো"(নিলর্জ্জ কোথাকার)

মৌলভী ইসমাইল ছাহেব দেহলবী "সিরাতুল মুস্তাকিম" এর শেষে স্বীয় মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ ছাহেবের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন- একদিন আল্লাহ তাআলা, ওর ডান হাত তাঁর খাস কুদরতী হাতের মধ্যে ধারণ করে খোদার কুদরতী কার্যাবলীর অনেক দুর্লভ জিনিস তার সামনে উপস্থাপন করেছেন অতঃপর বলেন 'আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সৈয়দ আহমদকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, – যে সব ব্যক্তি তোমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে, যদিওবা তারা লক্ষাধিক হোক না কেন, আমি প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করবো "একই সিরাতুল মুস্তাকিমে আওলিয়া কিরাম প্রসঙ্গে বলেছেন, আম্বিয়া কিরামের সাথে তাদের ওই রকম সম্পর্ক, যে রকম ছোট ভাইদের সাথে বড় ভাইদের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা আউলিয়া কিরামের মধ্যেও নবুয়াতের বৈশিষ্ট্য মওজুদ রয়েছে। (মাআজাল্লা) বলুন আজ পর্যন্ত কোন মুরিদ স্বীয় পীরের এরকম প্রশংসা করেছে কি? কিন্তু এ সব মহারথীদের বেলায় শির্‌কের ফত্‌ওয়া বা কুফ্‌রীর অভিযোগ উত্থাপন করা হয় না এবং তাদেরকে পীর পূজারীও বলা হয় না।

যা কিছু আরয করা হয়েছে, তা দ্বারা নিজের জ্ঞান বা যোগ্যতা প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নয়। আর আমার জ্ঞান বা যোগ্যতাওবা কি আছে। যৎসামান্য যা কিছু লিখেছি, তা হচ্ছে আমার মুর্শেদ ও উস্তাদ মাওলানা সৈয়দ নঈম উদ্দিন ছাহেব মুরাদাবাদী (রহঃ) এর সদ্‌কা। এ কিতাব লিখার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানেরা যেন শত্রু মিত্র চিনতে পারে, অমূল্য ঈমান যেন ধর্মীয় ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে এবং দুনিয়া

থেকে যাতে ঈমান সালামতে যেতে পারে। কেউ এর দ্বারা উপকৃত হলে, এ অধমের জন্য যেন দুআ করেন। খোদা! ইসলামকে উজ্জীবিত করুন, মুসলমানদেরকে সৎপথে অটল রাখুন এবং অধমের এ সামান্য শ্রম গ্রহণ করুন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।

অধম আহমদ ইয়ার খান আশরাফী, উজানবী, বদাউনী,
শিক্ষক, মাদ্রাসা-এ-খুদ্দামুর রসুল, গুজরাট।

এ কিতাবটি লিখার কাজ সমাপ্ত করার পর হুযূর আমীরে মিল্লাত, কিব্‌লায়ে আলম, মুহাদ্দেছ আলীপুরী (দামত জিল্লেহুম) এর এক মূল্যবান চিঠি হস্তগত হয়। উক্ত চিঠিতে তিনি এক ঈমান উদ্দীপক খুবই সূক্ষ্ম জ্ঞানর্গব উক্তি করেছেন এবং তা কিতাবে উল্লেখ করার জন্য বলেছেন। অতএব, তা আমি গর্বসহকারে পাঠকদের সমীপে পেশ করছি। তিনি লিখেছেন, যারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে নিজেদের মত মানুষ বলে, তারা ঈমানী নুর থেকে বঞ্চিত। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শান বর্ণনাতীত। যেখানে কোন জিনিস সে জাতে পাক (দঃ) এর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে অতুলনীয় হয়ে যায়, সেখানে তার সাথে তুলনা কিভাবে সম্ভব? কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ .

(ওহে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা অন্যান্য মহিলাদের মত নয়) এতে বোঝা যায় যে হুযূরের পবিত্র স্ত্রীগণ অতুলনীয়। كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ (হে মুসলমানগণ, তোমরা হলে সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত) এতে প্রমাণিত হলো যে, উম্মতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অতুলনীয় উম্মত। মদীনা মনোয়ারা অতুলনীয় শহর, রওযা পাকের যমীন অতুলনীয়, যে অশ্রু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র চক্ষুদ্বয় থেকে বের হয়েছে, তা অতুলনীয়, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) ঘাম অতুলনীয়। মোট কথা হলো হুযূরের সাথে যেটা সম্পর্কিত হয়েছে, সেটা অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় হয়ে গেছে। তাহলে, যার বদৌলতে এত কিছু অতুলনীয় হতে পারে, তিনি স্বয়ং কেন অতুলনীয় হবেন না? ডঃ আল্লামা ইকবাল খুবই সুন্দর বলেছেন-

مریم از یك نسبت عیسی عزیز - ازسه نسبت حضرت زهرا عزیز

نورچسم رحمة للعالمین - آں امام اولین وآخرین

بانوئے آں تاجدار ہل اتی - مرتضی مشکل کشاشیرخدا .

مادر آں مرکز پر کارعشق - مادر آں قافله سالارعشق!

رشته آئین حق زنجیرپاست - پاس فرمان جناب مصطفی است

ورنه گردتربتش گردیدمے . سجدہا برخاك دے پاشیدمے

অর্থাৎ ফাতেমা যুহরা (রঃ) এ জন্যেই শ্রেষ্ঠ যে তিনি নবীর দুলালী, আলীর স্ত্রী ও শহীদদের মাতা। আলা হযরত (কুঃ সিঃ) বলেছেন-

الله کی سرتابقدم شان ہیں یه- ان سانہیں انساں وہ انسان ہیں یه

قرآن تو ایمان بتاتاہے انہیں -ایمان یه کہتاهی مری جان ہیں یه

অর্থাৎ তাঁর (দঃ) পবিত্র আপাদমস্তকে খোদার শানই প্রকাশ পায়। কোন মানুষ তাঁর মত হতে পারে না। কুরআন তাঁকে ঈমান বলে আর ঈমান বলে তাঁকে জানের জান-

নবীরা নিষ্পাপ -যে অস্বীকার করে, খোদার গজব -জেনো তার উপরে

দেওবন্দীদের কটূক্তি ও অপবাদের কারণে নবীদের শানে বেআদবী করতে জনগণকে সাহস যুগিয়েছে। হিন্দুস্থানে এমন একটি ফের্কার সৃষ্টি হয়েছে, যারা আম্বিয়া কিরামকে (মায়াজাল্লা) গুনাহগার বরং মুশরিক, কাফিরও বলে থাকে। তাদের মতে, ওনাদের অনেকে প্রথমে মুশরিক ও কাফির ছিলেন এবং অনেকে কবীরা গুনাহও করে ছিলেন। অতঃপর তওবা করে নবী হয়েছেন। আমার কাছে তাদের এ অবাঞ্ছিত বক্তব্য প্রতিহত করার জন্য কেবল কঞ্চির কলম ও কালি ব্যতীত আর কিছু নেই। তাই এ কালি কলম দিয়ে তাদের ওসব ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করার মনস্থ করেছি এবং আমার মান সম্মান এবং ভাষা ও কলমকে নবীর শান রক্ষার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পেরে ধন্য মনে করছি। সৈয়্যদুনা হযরত হাসসান খুবই সুন্দর বলেছেন-

فَاِنَّ اَبِىْ وَوَالِدَتِىْ وَعِرْضِىْ - لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ.

অর্থাৎ আমার মা- বাপ ইজ্জত সম্মান সব কিছু প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জন্য উৎসর্গীত। আমার এ প্রবন্ধটা অনেক দিন আগে আল ফকীহ নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের বার বার তাগাদার কারণে জা'আল হকের দ্বিতীয় সংস্করণে পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজন করা হলো। আল্লাহ তা'আলা একে কবুলকরে জনগণের জন্য কল্যাণকর করুন। এতে একটি ভূমিকা ও দু'টি অধ্যায় রয়েছে।

ভূমিকা

গুনাহ কয়েক রকমের আছে, যেমন শির্‌ক, কবীরা ও সগীরা। সগীরা গুনাহ দু'ধরনের হয়ে থাকে- কতেকগুলো হচ্ছে ক্ষতিকর ও জিল্লতীপূর্ণ, যেমন- চুরি, ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি, আর কতেকগুলো এ রকম নয়। আবার এ সব গুনাহের দুটি পদ্ধতি রয়েছে; কতেকগুলো ইচ্ছাকৃত করা হয় আর কতেকগুলো ভুলবশতঃ করা হয়। আম্বীয়া কিরামের জন্যও দুটি অবস্থা রয়েছে- একটি হচ্ছে নবুয়তের আগের; অপরটি হচ্ছে নবুয়তের পরবর্তী অবস্থা। খোদার মেহেরবাণীতে নবীগণ সব সময় শির্‌ক কুফরী, বদআকীদাপূর্ণ ও গর্হিত আচরণ থেকে পবিত্র। তাঁরা নবুয়তের আগে বা পরে, ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ এক মহূর্তের জন্যও বদআকীদা পোষণ করতে পারেন না। কেননা তাঁরা জন্মগতভাবেই আরিফ উল্লাহ (আল্লাহকে সনাক্তকারী) হয়ে থাকেন।

'মদারেজ ও মওয়াহেব' গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে হযরত আদম (আঃ) সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই আরশের নীচে লিখা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

এর থেকে আদম (আঃ)কে জন্মগতভাবে আরিফ উল্লাহ বলা যায়। ওস্তাদ ছাড়া লিখা পড়া জানা এবং জন্মের সাথে সাথে লিখা পড়তে পারা তা-ই প্রমাণ করে। হযরত ঈসা (আঃ) জন্ম হওয়া মাত্রই বলেছিলেন- اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا. (আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব প্রদান করেছেন এবং নবী মনোনীত করেছেন) তিনি আরও বলেছেন- وَاَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ. (আমাকে আমরণ নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমি নিজের মায়ের সাথে সৎ আচরণকারী।) এ আয়াত থেকে বোঝা গেল হযরত মসীহ (আঃ) জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে খোদার খোদায়িত্ব, নিজের নবুয়াত লাভ ও ইঞ্জিল কিতাব প্রদানের কথা জানতেন। তিনি কর্মকৌশল, স্বভাব চরিত্র ও পারিবারিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও সম্যক অবগত ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শৈশবে নিজের কাফির কউমের কাছে তাওহিদের এমন মজবুত দলীল পেশ করেছিলেন, যা অখণ্ডনীয় ছিল। তিনি চাঁদ সূর্য ও তারকারাজীর অস্ত যাওয়া ও অবস্থার পরিবর্তন হওয়া থেকে ওগুলোকে মখলুক (সৃষ্ট) বলে প্রমাণিত করেছেন। তিনি তারকারাজী দেখে বলেছিলেন هٰذَا رَبِّىْ (ওহে কাফির, এগুলো কি আমার রব হতে পারে?) এবং ডুবে যেতে দেখে বলেছিলেন لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ (ডুবন্ত জিনিসকে আমি পছন্দ করি না) তার শৈশবের এ পবিত্র কথাবার্তা বু-আলী সিনা ও ফরাবীর সমস্ত যুক্তি বিদ্যাকেও হার মানিয়েছে। তার এ কথাবার্তাকে আজকালকার যুক্তিবাদীরা সাজিয়ে গুছিয়ে এভাবে বলেন اَلْعَالَمُ مُتَغَيِّرٌ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ অর্থাৎ পৃথিবী পরিবর্তনশীল এবং প্রত্যেক পরিবর্তনীয় বিষয় ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং اَلْعَالَمُ حَادِثٌ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। অতঃপর বলেন-

اَلْعَالَمُ حَادِثٌ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْحَادِثِ بِمَعْبُوْدٍ فَالْعَالَمُ لَيْسَ بِمَعْبُوْدٍ.

(পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী এবং কোন ক্ষণস্থায়ী জিনিস খোদা হতে পারে না। অতএব পৃথিবী খোদা নয়।) এ ধরনের বিশ্লেষণকে স্বীকৃতি প্রদান পূর্বক আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ.

(এ আমার যুক্তি প্রমাণ যা ইব্রাহীম (আঃ)কে দিয়েছিলাম তাঁর কউমের

মুকাবিলায়।) হুযূর সৈয়্যদুল আম্বিয়া (দঃ) জন্ম লাভ করার সাথে সাথে সিজ্‌দাতে গিয়ে উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছেন। (মদারেজ ও মওয়াহেব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) এতে বোঝা যায়, তিনি (দঃ) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে, নিজের অবস্থান ও পদমর্যাদা এবং উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কালে ছেলেরা তাঁকে খেলাধুলার প্রতি অনুপ্রাণিত করতে চাইলে তিনি তাদেরকে যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা এরিস্টটল ও প্লেটোর সমস্ত দর্শনকেও হার মানায়। সেই উত্তরটা ছিল মানব জাতির জিন্দেগীর মূল উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন مَاخُلِقْنَا لِهٰذَا (আমাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।) আল্লাহ তা'আলা একে প্রত্যায়ন করে বলেন-

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّالِيَعْبُدُوْنَ.

(আমি জ্বীন ও মানুষকে ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।)

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন- كُنْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ. আমি ওই সময় নবী ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) মাটি পানিতে বিলীন ছিলেন।) তাফসিরাতে আহমদীয়ায় لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ. এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

اِنَّهُمْ مَعْصُوْمُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْىِ وَبَعْدَهٗ بِاِجْمَاعٍ.

অর্থাৎ নবীগণ ওহী প্রাপ্তির আগে ও পরে কুফরী থেকে পূতঃপবিত্র থাকেন।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, নবীগণ জন্মগতভাবেই আল্লাওয়ালা হয়ে থাকেন। তাদের পবিত্র সত্তা কখনও গুমরাহীর অপবাদে কলঙ্কিত হতে পারে না। জেনে শুনে তারা নবুয়তের আগে ও পরে কখনও গুনাহে কবীরায় (গুরুপাপ) লিপ্ত হননি, তবে হ্যাঁ ভুল বশতঃ গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু এতে অটল থাকতেন না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হতো। নবুয়তের আগে বা পরে সে ধরনের সগীরা গুনাহ (লঘু পাপ) তাঁদের থেকে কখনও প্রকাশ পেতে পারে না, যেগুলো গর্হিত ও জিল্লতীপূর্ণ। অবশ্য সগীরা গুনাহের মধ্যে যে গুলো এ ধরনের নয়, তা প্রকাশ পেতে পারে। উল্লেখ্য যে এ বিশ্লেষণ সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে গুলো তবলীগে দ্বীনের সাথে জড়িত নয়। কেননা, তবলীগি আহ্‌কামের ক্ষেত্রে কমবেশী বা গোপন করা থেকে নবীগণ সব সময় নিষ্পাপ। এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশতঃ কখনও কোন প্রকারের পাপ হতে পারে না। গুনাহের এ বিশ্লেষণ অন্যান্য নবীদের জন্য করা হয়েছে, কেননা তাদের থেকে মাঝে মধ্যে গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু সৈয়্যদুল

আম্বিয়া হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে কখনও কোন প্রকারের গুনাহ প্রকাশ পায়নি। এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত রয়েছে যে নবুয়তের আগে ও পরে সগীরা-কবীরা কোন প্রকারের গুনাহ ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। যেমন তফ্‌সিরাতে আহ্‌মদীয়ায় لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

لَاخِلَافَ لِاَحَدٍ فِىْ اَنَّ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً طَرْفَةَ عَيْنٍ قَبْلَ الْوَحْىِ وَبَعْدَهٗ كَمَا ذَكَرَهٗ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِى الْفِقْهِ الْاَكْبَرِ.

এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নবুয়াতের আগে বা পরে এক মুহূর্তের জন্যও সগীরা বা কবীরা কোন প্রকারের গুনাহে লিপ্ত হননি, যেমন ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ফিক্‌হে আকবরে উল্লেখ করেছেন। তফসীরে রূহুল বয়ানে مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

يَدُلُّ عَلَيْهِ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيْلَ لَهٗ هَلْ عَبَدْتَّ وَثَنًا قَطُّ قَالَ لَا قِيْلَ هَلْ شَرِبْتَ خَمْرًا قَطُّ قَالَ لَا فَمَازِلْتُ اَعْرِفُ اَنَّ الَّذِىْ هُمْ عَلَيْهِ كُفْرٌ.

অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কখনও মূর্তি পূজা করে ছিলেন? তিনি ইরশাদ ফরমান- 'না'। "আপনি কখনও শরাব পান করেছিলেন?" ফরমালেন-'না, আমিতো সবসময় জানতাম যে, আরববাসীর এ আচরণ কুফ্‌রী'।

প্রথম অধ্যায়

নবীগণ যে নিষ্পাপ এর প্রমাণ

নবীগণ যে নিষ্পাপ, তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, বিশুদ্ধ হাদীছসমূহ, উম্মতের ঐক্যমত ও আকলী দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত আছে। একমাত্র সে অস্বীকার করতে পারে, যে মন মানসিকতার দিক দিয়ে অন্ধ।

কুরআনী আয়াতসমূহ ঃ

(১) আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে বলেছেন- اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ. (ওহে ইবলীস, আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নেই।)

(২) শয়তান নিজেই স্বীকার করেছিল- وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. (হে মওলা, তোমার বিশিষ্ট বান্দাগণ ব্যতীত বাকী সবাইকে বিপথগামী করবো।) এতে বোঝা গেল যে নবীগণ পর্যন্ত শয়তান যেতে পারে না। তাই সে তাঁদেরকে না পারে বিপথগামী করতে,না পারে কুপথে পরিচালনা করতে। তাহলে তাঁদের থেকে গুনাহ কি ভাবে প্রকাশ পেতে পারে? আশ্চর্যের বিষয় নবীদেরকে মাসুম স্বীকার করে শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করার থেকে নিজের অপারগতা স্বীকার করছে। অথচ এ যুগের ধর্মদ্রোহীরা তাদেরকে গুনাহগার মনে করছে। বাস্তবিকই এরা শয়তান থেকেও নিকৃষ্ট।

(৩) হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন- مَاكَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْئٍ. আমরা নবী সম্প্রদায়ের পক্ষে খোদার সাথে শির্ক করাটা অশোভনীয়।)

(৪) হযরত শুয়াইব (আঃ) স্বীয় কউমকে বলেছিলেন- مَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ. (যেটা তোমাদের নিষেধ করি, সেটা নিজে করবো, এ ধরনের ধারণা আমি করি না।) বোঝা গেল যে নবীগণ শির্ক ও গুনাহ করার ধারণাও কখনো করেন না। এটাই হচ্ছে নিষ্কলুষতার হাকীকাত।

(৫) হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছেন-

وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِىْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَارَحِمَ رَبِّىْ.

(আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ। তবে যার প্রতি আল্লাহর দয়া রয়েছে।) এখানে এ রকম বলা হয়নি যে, আমার আত্মা মন্দকর্মপ্রবণ,বরং বলেছেন- সাধারণ আত্মা জনসাধারণকে মন্দকর্মে অনুপ্রাণিত করে।

কেবল ওসব আত্মাকে বিপথগামী করতে পারে না, যে গুলোর প্রতি খোদার বিশেষ রহমত রয়েছে। এ গুলো হচ্ছে নবীগণের আত্মা। তাঁদের আত্মা তাঁদেরকে ধোঁকা দিতে পারে না।

(৬) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

(আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতে প্রাধান্য দিয়েছেন।)এতে বোঝা গেল সমস্ত জগতের মধ্যে নবীগণ শ্রেষ্ঠ। জগতের মধ্যে নিষ্পাপ ফিরিশতাগণও রয়েছেন। আর ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে- لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ তাঁরা কখনও নাফরমানী করেন না। যদি নবীগণ গুণাহগার হন, তাহলে ফিরিশতাগণ নিশ্চয়ই নবীদের উর্ধে স্থান পেতেন।

(৭) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ আমার প্রতিশ্রুত নবুয়তের সিলসিলা জালিমদের অর্থাৎ ফাসিকদের সাথে সংমিশ্রিত হবে না। এতে বোঝা গেল অনাচার ও নবুয়াত একত্রিত হতে পারে না। কুরআন করীম নবীদের উক্তি উদ্ধৃত করে ইরশাদ করেছেন-

يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(হে আমার কউম,আমার কাছে গুমরাহী বলতে কিছু নেই, আমি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।) এ আয়াতে لٰكِنِّىْ শব্দ থেকে বোঝা গেল যে, গুমরাহী ও নবুয়াত একত্রিত করা যায় না। কেননা নবুয়াত হচ্ছে নূর আলো আর গুমরাহী হচ্ছে অন্ধকার। আলো-অন্ধকারের একত্রিকরণ অসম্ভব।

হাদীছ সমূহ ঃ

১। মিশ্কাত শরীফের الوسوسة অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একজন শয়তান অবস্থান করে, যাকে 'করীন' বলা হয়। কিন্তু আমার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) করীন মুসলমান হয়ে গেছে। সে আমাকে সুপরামর্শই দিয়ে থাকে।

২। একই অধ্যায়ে, আরও বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক শিশুকে জন্মের সময় শয়তান মারে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের সময় শয়তান ছুঁতেও পারেনি। এ হাদীছদ্বয়

থেকে জানা গেল যে উল্লেখিত নবীদ্বয় শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত।

৩। মিশ্‌কাত শরীফের কিতাবুল গোসল থেকে জানা যায় যে, নবীদের স্বপ্নদোষ হয় না। কেননা এতে শয়তানী প্রভাব রয়েছে।এমনকি তাদের স্ত্রীগণও স্বপ্নদোষ থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত।

৪। নবীগণের হাই আসে না। কেননা এতেও শয়তানী প্রভাব রয়েছে। এ জন্য তখন 'লা হওলা' বলা হয়।

৫। মিশ্‌কাত শরীফের 'আলামাতে নবুয়াত' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বক্ষ বিদীর্ণ করে এক টুক্‌রা মাংস বের করে ফেলে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, সেটা শয়তানী অংশ। অতঃপর তা যম্ যম্ কুপের পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়া হয়। এতে বোঝা গেল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর আত্মা শয়তানী প্রভাব থেকে পবিত্র।

৬। মিশ্‌কাত শরীফের مناقب عمر শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে- হযরত উমর (রাঃ) যে রাস্তা দিয়ে গমন করেন, তথা হতে শয়তান পালিয়ে যায়। এতে বোঝা গেল, যাঁর প্রতি নবীদের সুদৃষ্টি রয়েছে; তিনিও শয়তান থেকে নিরাপদ থাকেন। তাই নবীদের প্রশ্নই আসে না।

উলামায়ে উম্মতের উক্তিসমূহ ঃ

নবীগণ যে নিষ্পাপ, এ ব্যাপারে সবসময় উম্মতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালামের মধ্যে ঐক্যমত রয়েছে। শয়তানী দল ছাড়া কেউ এটা অস্বীকার করে না। যেমন শরহে আকায়েদে নসফী, শরহে ফিক্‌হ আকবর, তফ্‌সীরাতে আহমদীয়া, তফসীরে রূহুল বয়ান, মদারেজুন নাবুয়াত, মওয়াহেবে লাদুনিয়া, শিফা শরীফ, নছিমে রেয়াজ ইত্যাদি কিতাবে এর বিবরণ রয়েছে। তফ্‌সীরে রূহুল বয়ানে- مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ الاية. আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত আছে-

فَاِنَّ اَهْلَ الْوُصُوْلِ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ قَبْلَ الْوَحْىِ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمِنَ الصَّغَائِرِ الْمُوْجِبَةِ لِنَفْرَةِ النَّاسِ عَنْهُمْ قَبْلَ الْبِعْثَتِ وَبَعْدَهَا فَضْلًا عَنِ الْكُفْرِ.

অর্থাৎ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবীগণ ওহী প্রাপ্তির আগে মুমিন ছিলেন

এবং গুনাহ কবীরা, এমন কি জিল্লতীপূর্ণ সগীরা গুনাহ থেকেও পবিত্র ছিলেন। নবুয়াতের পরেও পবিত্র ছিলেন। তফ্‌সীরাতে আহমদীয়াতে বর্ণিত আছে-

اِنَّهُمْ مَعْصُوْمُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْىِ وَبَعْدَهُ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا عَنْ تَعَمُّدِ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ.

অর্থাৎ নবীগণ ওহী প্রাপ্তির আগে এবং পরে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। অধিকাংশ আলিমদের মতে গুনাহে সগীরা থেকেও পবিত্র ছিলেন। মোট কথা হলো পরলোকগত উম্মতের সর্বসম্মত অভিমতে নবীগণ নিষ্পাপ এবং এটা এত সুস্পষ্ট অভিমত যে এর জন্য অন্যান্য ইবারত উদ্ধৃত করার আদৌ প্রয়োজন নেই।

আকলী দলীল সমূহঃ

যুক্তিও বলে যে নবীগণ কুফরী ও পাপ থেকে সদা পবিত্র :

১। কুফরী, হয়তো আকায়েদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, কিংবা আত্মার অবাধ্যতা অথবা শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্রকাশ পায়। কিন্তু আমি প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করেছি যে, নবীগণ আল্লাহ ওয়ালা হয়েই জন্ম গ্রহণ করেন, অধিকন্তু তাদের আত্মাসমূহ পাক এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ। যখন এ তিনটি কারণ অনুপস্থিত, তখন তাদের থেকে কুফরী ও পাপ কিভাবে প্রকাশ পেতে পারে?

২। পাপ নফ্‌সে আম্মারা ও শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু তারা এ দু'টো থেকে নিরাপদ।

৩। ফাসিকের বিরোধিতা করা প্রয়োজন,নবীর অনুসরণ করা ফরয। যে কোন অবস্থায় নবীদেরকে মান্য করতে হবে। যদি নবীও ফাসিক হয়, তাহলে অনুসরণও প্রয়োজন আবার ফাসিক হেতু বিরোধিতাও প্রয়োজন এবং এটা দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুকে একত্রিকরণের মত।

৪। ফাসিকের কথা যাচাই না করে গ্রহণ করতে নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا ফাসিক কোন সংবাদ আনলে তা যাচাই করে দেখবে। কিন্তু নবীদের প্রত্যেক কথা বিনাবাক্যে গ্রহণ করা ফরয। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ

(আল্লাহ ও তার রসুল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে, কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অধিকার নেই।) নবী যদি ফাসিকও হয়ে থাকে, তাহলে বিনা বাক্যে তাঁদের নির্দেশ মান্য করাও প্রয়োজন, আবার মান্য না করাও প্রয়োজন। এতে দুটি বিপরীত বস্তু একত্রিকরণ বুঝায়।

৫। গুনাহগারের প্রতি শয়তান রাজি, তাই সে শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত এবং নেক্কারের প্রতি আল্লাহ রাজি, তাই সে আল্লাহর দলভুক্ত। যদি কোন নবী এক মুহূর্তের জন্যেও গুনাহগার হয়, তাহলে মায়াজাল্লা, তিনি শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যান। কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়।

৬। ফাসিক থেকে মুত্তাকী আফযল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ .

যদি নবী কোন সময় গুনাহে লিপ্ত হন আর সে সময় যদি তার কোন উম্মত নেকীর কাজ করতে থাকে, তাহলে সেই সময়ের জন্য উম্মতকে নবী থেকে আফযল বলতে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব। কেননা কোন অবস্থাতেই উম্মত নবীর বরাবর হতে পরে না।

৭। বদ আকীদা পোষণকারীর তাযীম হারাম। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে- مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَهَانَ عَلَى هَدْمِ الْاِسْلَامِ . অর্থাৎ যে ব্যক্তি বদ আকীদা পোষণকারীর সম্মান করলো, সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করলো। আর নবীর প্রতি সম্মান করা হচ্ছে ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ যদি কোন নবী এক মুহূর্তের জন্যও ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়, তখন তার তাযীমও ওয়াজিব আবার হারামও। এ রকম কি কখনও হতে পারে?

৮। গুনাহগারদের ক্ষমা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ওসীলায় হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ الاية .

এ আয়াতে সাধারণ গুনাহগারদেরকে হুযূর পাকের সমীপে হাজির হয়ে তাঁর ওসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদি তিনি গুনাহে লিপ্ত হন, তার ওসীলা কে হবে? এবং কার বদৌলতে তাকে ক্ষমা করা হবে? যিনি সমস্ত গুনাহগারের মাগফিরাতের ওসীলা হবেন, তিনি স্বয়ং গুনাহ থেকে পাক হওয়াই চাই। যদি তিনিও গুনাহগার হন, তাহলে বিনা কারণে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন আসবে।

৯। মূল্যবান জিনিস মূল্যবান পাত্রে রাখা হয়। মুক্তা যেমন মূল্যবান, তেমন বাক্সও

মূল্যবান হয়ে থাকে। স্বর্ণ অলংকারের বাক্সও মূল্যবান হয়ে থাকে। দুধের পাত্র দুর্গন্ধ ও টক থেকে হিফাজত রাখতে হয়, নতুবা দুধ নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর কুদরতী কারখানার মধ্যে নবুয়াত হচ্ছে অসাধারণ ও অনন্য নিয়ামত। তাই এর পাত্র অর্থাৎ নবীগণের আত্মা কুফ্‌রী, পাপ এবং সব রকমের নাপাকী থেকে পূতঃপবিত্র হওয়া চাই। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান الله يعلم حيث يجعل رسالته। অর্থাৎ ওসব আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবগত, যেগুলো রিসালতের উপযোগী।

১০। ফাসিক-ফাজিরের খবর সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণযোগ্য নয়। যদি নবীগণ ফাসিক হতেন, তাহলে তাদের প্রত্যেক সংবাদের জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হতো। অথচ নবীদের প্রত্যেক বাণী শত শত সাক্ষ্য থেকেও উত্তম। হযরত আবু খজিমা আনসারী (রাঃ) উট সম্পর্কে এটাইতো বলেছিলেন যে, হে আল্লাহর হাবীব, উটের ব্যবসা বেহেশত, দোযখ ও হাশর নশর থেকে বড় নয়। যখন আমরা আপনার থেকে এসব শুনে ঈমান এনেছি, তাই সে পবিত্র মুখ থেকে এটা শুনে কেন বিশ্বাস করবো না? বাস্তবিকই আপনি উট ক্রয় করেছেন। এর পুরস্কার স্বরূপ তার এক জনের সাক্ষ্য দু'জনের সাক্ষ্যের সমতুল্য করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি সমূহ এবং এ সবের জবাব

আপত্তি সমূহের বিস্তারিত জবাবের আগে ভূমিকা স্বরূপ মোটামুটি একটি জবাব দিয়ে রাখ্‌ছি, যার ফলে এমনিতেই অনেক আপত্তির নিষ্পত্তি ঘটবে। জবাবটি হচ্ছে নবীগণ নিষ্পাপ হওয়াটা নিশ্চিত ও সর্বসম্মত বিষয়। যেসব হাদীছ দ্বারা নবীগণের গুনাহ প্রমাণ করা হয়, যদি সে সব হাদীছ মুতওয়াতির ও সুস্পষ্ট না হয়, বরং হাদীছে মশহুর বা হাদীছে আহাদ হয়ে থাকে, কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিওবা তা বিশুদ্ধ হয়ে থাকে। তাফসীরে কবীরে সূরা ইউসুফের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে- যে সব হাদীছ আম্বিয়া কিরামের বিপক্ষে, সে সব গ্রহণীয় নয়। নবীকে গুনাহগার সাব্যস্ত করার চেয়ে বর্ণনাকারীকে ভ্রান্ত বলাটা অনেক সহজ। এবং সে সব কুরআনী আয়াত ও হাদীছে মুতওয়াতির, যে গুলোর দ্বারা নবীগণের মিথ্যা বলা বা অন্য কোন গুনাহ প্রমাণিত হয়, সে সব হাদীছ বা আয়াতের অবশ্যই তাবিল (ব্যাখ্যা) করতে হবে; সে সবের বাহ্যিক অর্থ কখনও হতে পারে না বা এ সব ঘটনা নবুয়াতের আগের বলে ধরে নিতে হবে।

তাফসীরাতে আহমদীয়ায় لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

وَاِذَا تَقَرَّرَ هٰذَا فَمَا نُقِلَ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ مِمَّا يُشْعِرُ بِكِذْبٍ اَوْ مَعْصِيَةٍ فَمَا كَانَ مَنْقُوْلاً بِطَرِيْقِ الْاَحَادِ فَمَرْدُوْدٌ وَمَا كَانَ مَنْقُوْلاً بِطَرِيْقِ التَّوَاتُرِ فَمَصْرُوْفٌ عَنْ ظَاهِرِهٖ اِنْ اَمْكَنَ وَاِلَّا فَمَحْمُوْلٌ عَلٰى تَرْكِ الْاَوْلٰى اَوْكَوْنِهٖ قَبْلَ الْبِعْثَتِ.

(এ ইবারতের অর্থ তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) 'মুদারেজুন নাবুয়াত' কিতাবের প্রথম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে-এ ধরনের আয়াত মুতশাবিহাত আয়াতের মত, তাই এ সব ক্ষেত্রে নীরব থাকা বাঞ্ছনীয়। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কুদ্দুস, গণী, আলীম, কাদিরে মতলক ইত্যাদি পরিপূর্ণ গুণে গুনান্বিত হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে, কিন্তু কতেক আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এর বিপরীত প্রতিভাত হয়। যেমন-আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (ওরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় এবং আল্লাহ তাদেকে) অন্যত্র ইরশাদ ফরমান। مَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ (তারা ফন্দি করেছিলএবং আল্লাহও ফন্দি করেছেন)। আর এক জায়গায় ইরশাদ ফরমান فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (তোমরা যে দিকে মুখ কর, সে দিকেই আল্লাহর মুখ আছে)। আরও ইরশাদ ফরমান يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ তোমাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত)। ইরশাদ ফরমান ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ (অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।) আল্লাহ তা'আলা হাত, মুখ, ধোঁকা, ফন্দি ইত্যাদি থেকে পাক-পবিত্র, কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যতঃ সে সব প্রমাণিত হয়। সুতরাং সে সব আয়াতের তাবিল অবশ্য কর্তব্য। এর আসল অর্থ আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া চাই। এসব আয়াত দ্বারা যদি কেউ আল্লাহকে কলঙ্কিত মনে করে, সে বেঈমান। অনুরূপ যদি কেউ কতেক আয়াতের বাহ্যিক অর্থ করে আম্বিয়া কিরামকে ফাসিক বা মুশরিক মনে করে, সে ধর্মদ্রোহী। এ একটি উত্তরই ইন্‌শাআল্লাহ সমস্ত আপত্তির গোড়া কেটে দেবে। তবুও আমি আরও কিছু বিস্তারিতভাবে আপত্তি সমূহের উত্তর দিচ্ছি।

১নং আপত্তিঃ ইবলিস হযরত আদমকে সিজ্‌দা না করে খোদার নাফরমানী করেছে। হযরত আদম (আঃ)ও গুনদুম খেয়ে একই অপরাধ করেছেন। উভয়কে একই রকম শাস্তিও দেয়া হয়েছে, ইবলিসকে ফিরিশতাদের জামাত ও বেহেশ্‌ত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং আদম (আঃ) কেও দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য

আদম (আঃ) পরে তওবা করে ক্ষমা পেয়েছেন, কিন্তু ইবলিস তওবা করেনি। তাই বোঝা গেল যে আদম (আঃ) নিষ্পাপ ছিলেন না।

উত্তরঃ শয়তান আদমকে সিজ্‌দা না করে গুনাহগারও হয়েছিল এবং শাস্তিও পেয়েছে। কিন্তু হযরত আদমের গুনদুম খাওয়ার মধ্যে কোন অপরাধ ছিল না এবং তাঁকে কোন শাস্তিও দেয়া হয়নি। কেননা শয়তান সুস্পষ্টভাবে সিজ্‌দা করতে অস্বীকার করেছে, বরং খোদার নির্দেশকে ভুল মনে করে খোদার সাথে তর্ক করার দুঃসাহস দেখিয়েছে-

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ.

(তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর ওকে সৃষ্টি করেছ মাটি দ্বারা) শাস্তিস্বরূপ আল্লাহর তরফ থেকে ইরশাদ হলো-

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

(তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত, এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার প্রতি লানত রইল।) দুনিয়াটা শয়তানের জন্য 'কালা পানি' পাঠিয়ে দেয়ার মত শাস্তি। সে কিয়ামত পর্যন্ত এখানে লাঞ্চনা, গঞ্জনা, ও 'লা হওলা' এর বেত্রাঘাত ভোগ করবে। অথচ আদম (আঃ) সম্পর্কে কুরআন করীম বার বার ঘোষণা করেছেন- 'তিনি ভুলে গিয়েছিলেন' 'গুনাহের কোন ধারণাও করেননি' ইত্যাদি। যেমন কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান- فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আমি তাঁকে অটল পাইনি।) অন্যত্র ফরমান فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ (অতঃপর শয়তান তাঁদেরকে ধোঁকা দিয়েছে) আর এক জায়গায় ইরশাদ করা হয়েছে- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ (শয়তান তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে।) মোট কথা হলো এ ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী শয়তানকে করা হয়েছে। আর তাঁদের বেলায় বলা হয়েছে ধোঁকা খেয়েছেন, ভুল করেছেন। ধোঁকাটা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বলেছিলেন-ওই বৃক্ষের কাছে যেও না। শয়তান তাঁদেরকে ধোঁকা দেয়ার মানসে বলেছিল আপনাদেরকেতো ওদিকে যেতে নিষেধ করেছে, কিন্তু ফল খেতেতো আর বারণ করেনি। ঠিক আছে, আমি এনে দিচ্ছি, আপনারা খেয়ে নিন। মিথ্যা কসম খেয়ে আরও বললো এ ফল খুবই উপকারী এবং আমি একজন আপনার একান্ত শুভাকাঙ্খী। হযরত আদম (আঃ) মনে করেছিলেন যে খোদার নামে কেউ মিথ্যা কসম খেতে পারে না বা উপরোক্ত لَا تَقْرَبَا কে হালকা নিষেধাজ্ঞা সূচক নির্দেশ মনে করেছেন। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার তফসীরে নঈমীর প্রথম পারায় উক্ত আয়াতের তফসীর

দেখুন। এ পর্যন্ত যা বললাম, তাতে উভয়ের কার্যক্রমের পার্থক্যটা প্রতিভাত হলো। এবার আলোকপাত করতে হয় দুনিয়াতে অবতরণের রহস্য নিয়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীতে খিলাফতের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً বেহেশতের মধ্যে তাঁকে কিছু দিনের জন্য রাখা হয়েছিল; এ জন্য যে তিনি যেন তথাকার ঘরবাড়ী, বাগবাগিচা ইত্যাদি দেখে অনুরূপ যাতে পৃথিবীতে আবাদ করতে পারেন। তাই বেহেশ্‌তটা তাঁর জন্য ছিল ট্রেনিং সেন্টারের মত, যেথায় কোন শিক্ষানবীশকে সব সময়ের জন্য রাখা হয় না। আর তাঁকে কাঁদায়ে পাঠানো হয়েছিল এ জন্য যে ফিরিশ্‌তাগণ এ কান্না ছাড়া বাকী সব রকমের ইবাদত করেছেন। এ ক্রন্দনের বদৌলতেই মানুষ ফিরিশ্‌তা থেকে আফযল হলো। আসলে খোদার প্রেমে বান্দাকে কাঁদানোই উদ্দেশ্য ছিল; বেহেশ্‌তটা ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র। অনেক সময় আল্লাহর প্রিয়জনদের ভুল নেক বান্দাদের জন্য কল্যাণ কর হয়ে থাকে।

درد دل کے واسطے پیداکیا انسان کو

ورنہ طاعت کےلئے کچھ کم نہ تھے کروبیاں

اے خیال یارکیاکرناتھا اورکیا کردیا

تو تو پردہ میں رہا اور مجھ کو رسوا کردیا۔

অর্থাৎ ব্যথিত হৃদয়ের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, নতুবা খোদার বন্দেগীর জন্য মখলুকের অভাব নেই। ওগো, কি করার ছিল আর তুমি কি করে দিয়েছ? তুমিতো পর্দার অন্তরালে রয়েছ; আর এদিকে আমাকে নাজেহাল করেছ।

এ ভেদ তিনিই বুঝবেন যিনি প্রেমানন্দ সম্পর্কে অবগত। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে বলেছেন اُخْرُجْ مِنْهَا (এখান থেকে বের হয়ে যাও) আর আদম (আঃ) এর বেলায় বলা হয়েছে- اِهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا (তোমরা সকলে এখান থেকে অবতরণ কর) এরপর বলা হয়েছে- তোমরা মাত্র কিছু দিনের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করছ, পুনরায় তোমাদের কোটি কোটি সন্তান সহকারে এখানে ফিরে আসবে। বুযুর্গানে কিরাম বলেন আদম (আঃ)কে বেহেশত থেকে বের করা হয়নি বরং আমরাই তাঁকে ওখান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি কেননা তাঁর পৌরুষে কাফির ফাসিক সবার রূহ ছিল। এবং সে গুলো বেহেশ্‌তের অনুপযোগী ছিল। তাই নির্দেশ দেয়া হলো ওহে আদম (আঃ), পৃথিবীতে গিয়ে ওসব দুষ্ট আত্মাকে ওখানে রেখে এসো। (মিরকাতের

الايمان بالقدر অধ্যায়ে ও রূহুল বয়ানের فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

২। পৃথিবীতে শয়তানের আগমন বিদেশ গমনের মতো কিন্তু আদম (আঃ) এর জন্য বিদেশ নয়, কেননা আদম হচ্ছে শরীর ও রূহের সমষ্টির নাম এবং পৃথিবীর মাটি দ্বারা যেহেতু তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু পৃথিবীটা তাঁর শরীরের দেশ আর রূহের জগতটা (বেহেশত) তাঁর আত্মার দেশ। সুতরাং জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আগমন আর ইন্তিকালের পর পৃথিবী থেকে জান্নাতে গমন কোনটাই তাঁর জন্য বিদেশ নয়। কিন্তু শয়তান যেহেতু অগ্নির সৃষ্টি সেহেতু পৃথিবীটা তাঁর জন্য বিদেশ সদৃশ।

৩। পৃথিবীতে আগমনটা যদি আদমের জন্য শাস্তি স্বরূপ হতো, তাহলে কখনও তাঁকে খলীফা মনোনীত করা হতো না, তাঁর মস্তকে কখনও নবুয়াতের মুকুট স্থাপন করা হতো না এবং তাঁর বংশে আম্বিয়া, আওলিয়া বিশেষ করে সৈয়্যদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হতো না। অপরাধী ক্ষমাপ্রাপ্ত হলে জেলখানা থেকে মুক্তি পায়। আবার অনেক সময় শাহী দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়ে নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু তা কখনও জেলখানায় রেখে করা হয় না। আসলে বড়দের বাহ্যিক ভুলত্রুটি অনেক সময় ছোটদের জন্য আশীর্বাদে পরিণত হয়। যেমন পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত সেই আদি ভুলের মাশুল। মজার ব্যাপার হলো আদম (আঃ) এর জন্য গুনদুম খাওয়াটা অপরাধ সাব্যস্ত হলো অথচ তাঁর সন্তানদের জন্য এটা অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে মনোনীত হলো।

২নং আপত্তিঃ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) তাঁদের এক সন্তানের নাম আবদুল হারিছ রেখেছিলেন। অথচ হারিছ হচ্ছে শয়তানের নাম। এ প্রসঙ্গে কুরআন করীম ইরশাদ ফরমান-

فَلَمَّا اٰتٰهُمَا صٰلِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ.

(যখন তিনি তাদেরকে এক নেক বান্দা দান করেন, তারা একে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে।) এতে বোঝা গেল যে আদম (আঃ) এর এ কাজ শির্‌ক ছিল। তাই প্রমাণিত হলো যে নবীগণ শির্‌কও করে থাকেন। হাকিমের বর্ণনা মতে এ আয়াতে আদম- হাওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

উত্তরঃ এ ধরনের কলঙ্ক থেকে হযরত আদম (আঃ) একেবারে পূত-পবিত্র। আপত্তিকারীরা এ আয়াত দ্বারা ধোঁকা দিতে চেয়েছে। তাফসীর কারকদের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত আয়াতে جَعَلَا ক্রিয়া পদের কর্তা কুসাই ও তার স্ত্রী বলে মত

প্রকাশ করেছেন। কেননা, خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا আয়াতের অর্থ হচ্ছে- ওহে কুরাইশ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি আত্মা অর্থাৎ কুসাই থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং সেই কুসাইর স্ত্রীকে তার স্বজাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন। ওর স্ত্রী আল্লাহর কাছে পুত্র প্রার্থনা করায় সে রাগ করে নাম আবদুল হারিছ রেখেছিল। (তফসীরে খাযায়েনুল ইরফান ইত্যাদি দেখুন) এ ধরণের অর্থে কোন আপত্তি নেই। আবার অনেকেই বলেছেন যে, جَعَلَا ক্রিয়ার মধ্যে مُضَافٌ (সম্বন্ধপদ) উহ্য রয়েছে এবং এর কর্তা হচ্ছে আদম-হাওয়ার সন্তান সন্ততি অর্থাৎ আদম ও হাওয়ার কতেক সন্তান শির্‌ক কাজ শুরু করে দিয়েছিল। (রুহুল বয়ান, মদারেক ইত্যাদি তাফসীর দেখুন)। এ কারণেই এর আগে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ যদি এ ক্রিয়া পদের কর্তা আদম ও হাওয়া হতেন, তাহলে يُشْرِكَانِ অর্থাৎ দু'বচনের শব্দ প্রয়োগ করতেন, অধিকন্তু যেখানে একটি মামুলি ভুলের অর্থাৎ গুনদুম খাওয়ায় অসন্তোষের কারণ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে শিরক করার কারণে কঠিন শাস্তি হওয়ার কথা অথচ কোন কিছু হলো না। হাকিমের এ বর্ণনাটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাঁর দলীলটা হচ্ছে একক রেওয়ায়েত। পক্ষান্তরে নবীগণ নিষ্পাপ হওয়াটা হলো সুনিশ্চিত ও চূড়ান্ত অভিমত।

৩নং আপত্তিঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান فَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (আদম (আঃ) আল্লাহর নাফরমানী করলো, ফলে ভ্রমে পতিত হলো।) এর থেকে আদম (আঃ) এর গুনাহ ও গুমরাহী উভয়টা বোঝা গেল।

উত্তরঃ এখানে অপ্রকৃত অর্থে ভুলকে পাপ বলা হয়েছে এবং غَوٰى শব্দের অর্থ গুমরাহী নয় বরং বিফল হওয়া অর্থাৎ চিরজীবন লাভের জন্য তিনি গুনদুম খেয়েছিলেন, কিন্তু তা হয়নি বরং গুনদুমের দ্বারা উপকারের পরিবর্তে অপকার হলো অর্থাৎ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন হলো না। এ আয়াত প্রসঙ্গে তফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখিত আছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের ভুলে যাওয়ার কথাটাই বার বার উল্লেখ করেছেন, তখন উক্ত আয়াতের عَصٰى শব্দ থেকে গুনাহ প্রমাণ করা মানে খোদার কালামে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা।

৪নং আপত্তিঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) চাঁদ সূর্য এমন কি তারকারাজিকে খোদা বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন هٰذَا رَبِّىْ (এটা আমার খোদা) এ রকম বলাটা সুস্পষ্ট শির্‌ক। তাই প্রতীয়মান হলো যে তিনি প্রথমে শির্‌ক করেছিলেন। পরে তওবা করেছেন।

উত্তরঃ এর উত্তর ভূমিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয়

কওমকে প্রশ্নাকারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটা কি আমার খোদা? অতঃপর নিজেই দলীল সহকারে এর জবাব দিয়েছেন لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ (অস্তগামী বস্তু সমূহকে আমি পছন্দ করি না।) কেননা এর আগে ইরশাদ করা হয়েছে-

وَكَذٰلِكَ نُرِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

(এভাবে হযরত ইব্রাহীমকে সৌরজগত ও বিশ্বজগত পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়েছি, যাতে তিনি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হন।) অতঃপর চাঁদ দেখার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং এর পর বলেছেন-

وَتِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيْنٰهَاۤ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

(আমার এ সব যুক্তি প্রমাণ হযরত ইব্রাহীমকে তাঁর কওমের মুকাবেলায় দিয়েছিলাম) এ সাজানো কথামালা থেকে জানা গেল হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ভূমণ্ডলের পরিচালন অবলোকন করে মন্তব্য করলেন। অতঃপর তারকারাজির গতিবিধি দেখে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর প্রশংসা করলেন। যদি তাঁর এ সব বক্তব্য শির্‌ক হতো, তাহলে প্রশংসা করা হলো কেন? বরং অসন্তুষ্ট হওয়ারই কথা ছিল।

৫নং আপত্তিঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তিনবার মিথ্যা বলেছেন-

১। তিনি সুস্থ ছিলেন, কিন্তু কওমকে বলেছেন- اِنِّىْ سَقِيْمٌ (আমি অসুস্থ)

২। তিনি নিজে মূর্তি সমূহ ভেঙ্গেছেন, কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন জিজ্ঞাসা করলো, তখন বলেন بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا (সেই বড় মূর্তিটা এ কাজ করেছে)।

৩। নিজের স্ত্রী হযরত সারা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন- هٰذِهٖ اُخْتِىْ (ইনি আমার বোন)। মিথ্যা বলা নিঃসন্দেহে গুনাহ। সুতরাং তিনি নিষ্পাপ নন।

উত্তরঃ এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে। এক, বেগতিক অবস্থায় যখন নিজের জানের ঝুঁকি থাকে, তখন মিথ্যা বলা গুনাহ নয় বরং এ রকম বেগতিক অবস্থায় মুখ দিয়ে কুফ্‌রী শব্দ উচ্চারণ করারও অনুমতি রয়েছে।

যে সব অবস্থায় তিনি এ রকম কথা বলেছিলেন, তখন হয়তো জীবনের ঝুঁকি ছিল অথবা মান-সম্মানের প্রশ্ন ছিল। তখনই বোন বলেছিলেন, যখন সেই জালিম বাদশাহ তাঁর কাছ থেকে হযরত সারা (রাঃ)কে জোর জবরদস্তি ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল এবং

অন্যান্য সময়ও জীবনের ঝুঁকি ছিল। যেমন বলেছিলেন بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ সুতরাং এ ধরনের বলাতে গুনাহ হতে পারে না। দুই, ওসব কথার মধ্যে কোনটাই মিথ্যা ছিল না বরং একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন, যাকে তাওরিয়া বলা হয়। প্রয়োজন বোধে তাওরিয়া জায়েয। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনৈকা বৃদ্ধা সাহাবীকে বলেছিলেন কোন বৃদ্ধা বেহেশ্‌তে যাবে না। এক ব্যক্তি তাঁর (দঃ) কাছে একটি উট চেয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন-তোমাকে উটের বাচ্চুর দেব। জনৈক সাহাবার চোখের উপর হাত রেখে তিনি (দঃ) বলেছিলেন-এ গোলামকে কে ক্রয় করবে? ইত্যাদি (মিশ্‌কাত শরীফ المزاح। অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তদ্রূপ হযরত সারা (রাঃ)কে বোন বলা অর্থ বংশগত বোন নয়, এর দ্বারা দ্বীনি বোন বোঝানো হয়েছিল। যেমন হযরত দাউদ (আঃ) এর সমীপে দু'জন ফিরিশতা বাদী-বিবাদীর আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আরয করেছিলেন- ইনি আমার ভাই, তার কাছে ৯৯টি গাভী আছে। এখানে ভাই ও গাভী শব্দদ্বয় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ রকম إِنِّى سَقِيْمٌ এর দ্বারা তাঁর ভবিষ্যত রোগাক্রান্ত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ বা سَقِيْمٌ শব্দ দ্বারা মানসিক রোগের কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমার মন তোমাদের দ্বারা সন্তুষ্ট নয়। অনুরূপ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ বাক্যে كَبِيْرُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে বোঝানো হয়েছে এবং এর দ্বারা ওই দিকে ইশারা করা হয়েছে। কেননা কাফিরগণ আল্লাহ তা'আলাকে বড় খোদা এবং মূর্তিদেরকে ছোট খোদা মনে করে। তাই তিনি বলেছেন- এ কাজ সেই করেছেন, যাকে তোমরা বড় খোদা মনে কর। নবীর কাজকে খোদার কাজ বলা যায়। অথচ ওরা মনে করেছেন তিনি তাদের বড় মূর্তির কথা বলেছেন। অথবা তিনি শব্দটা সন্দেহ বোধক ভাবে বলেছেন অর্থাৎ বড় দেবতা হয়তো ভেঙ্গেছে। সন্দেহ বোধক শব্দ থেকে সত্য মিথ্যা বলার অবকাশ নেই। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা এ সব ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, বরং এসব তাঁর মনঃপুত হওয়ার সনদ দিয়েছেন। যেমন মূর্তি ভাঙ্গার বর্ণনার আগে ইরশাদ ফরমান وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ الاية এতে বোঝা গেল তাঁর এ কাজ সঠিক এবং পথপ্রদর্শক মূলক ছিল অথচ মিথ্যা কখনও সঠিক পথ হতে পারে না। অসুখের কথা বর্ণনা করার সময় ইরশাদ করেছেন-

اِذْ جَاءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ-اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ الاية-

এর দ্বারা বোঝা গেল যে তাঁর এ ধরনের কথা সঠিক মানসিকতার পরিচায়ক কিন্তু মিথ্যা কখনও তা হতে পারে না।

৬নং আপত্তিঃ হযরত দাউদ (আঃ) পরস্ত্রী অর্থাৎ উরিয়ার স্ত্রীকে কুনযরে দেখেছিলেন, যার বর্ণনা সূরা ছোয়াদে রয়েছে। এ ধরনের আচরণ নিশ্চই অপরাধ।

উত্তরঃ ঐতিহাসিকগণ দাউদ (আঃ) এর কাহিনীর মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্ধন করেছেন। তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি হাদীছে আহাদের মধ্যে যা বর্ণিত আছে, তাও অগ্রাহ্য। এ জন্য হযরত আলী (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন-যে কেউ দাউদ (আঃ) এর কাহিনী গল্প গুজবের মত বর্ণনা করবে, আমি তাকে ১৬০ দোর্রা বেত্রাঘাত করবো। অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি হচ্ছে ৮০ দোর্রা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হবে। (তাফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা ছোয়াদে দাউদ (আঃ) এর কাহিনী দ্রষ্টব্য) আসল ঘটনা হচ্ছে উরিয়া নামক জনৈক ব্যক্তি একটি মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। হযরত দাউদ (আঃ)ও সেই প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং মহিলাটি দাউদ (আঃ) এর সাথেই বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ওই লোকটির সাথে কোন বিবাহ হয়নি। যেমন- তাফসীরাতে আহমদীয়াতে- لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

وَعَنْ دَاوُدَ بِكَوْنِهٖ اِقْدَامًا عَلَى الْفِعْلِ الْمَشْرُوْعِ وَهُوَ نِكَاحُ
الْمَخْطُوْبَةِ لِاَوْرِيَا لَاَنَّظَرَهٗ مَنْكُوْحَتَهٗ.

কিন্তু যেহেতু এ বৈধ কাজ থেকেও নবুয়াতের শান অনেক উর্ধে ও মহৎ, এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে একটি সাজানো মুকদ্দমা নিয়ে দু'জন ফিরিশ্‌তাকে তাঁর সমীপে পাঠিয়েছেন। মুকদ্দমাটি হচ্ছে তাদের মধ্যে একজনের কাছে ৯৯টি বকরী এবং অপর জনের কাছে একটি মাত্র বকরী আছে। কিন্তু ৯৯ টি বকরীর মালিক ঐ একটিও নিয়ে নিতে চায় এবং তাঁরা নিজেরাই বাদী বিবাদীর অভিনয় করে তাঁর থেকে রায় নিয়ে তাঁকে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কি শান! তার দরবারে নবীদের কত সম্মান যে কী সুন্দরভাবে ওদেরকে ঘটনাটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। (উল্লেখ্য যে এর আগে দাউদ (আঃ) এর আরও ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন) উক্ত ঘটনার দ্বারা তার শানই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ বদনসীব ধর্মদ্রোহীরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়েছে। আল্লাহ পানাহ দিন।

৭নং আপত্তিঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) আযীয মিসিরের স্ত্রী জুলেখার সাথে পাপাচারের ইচ্ছে করেছিলেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰبُرْهَانَ رَبِّهٖ-

অর্থাৎ জুলেখার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যদি না তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতেন, জানি না কি অঘটন ঘটে যেত। দেখুন, এটা কত বড় গুনাহ ছিল, যা হযরত ইউসুফ (আঃ) থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

উত্তরঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) পাপাসক্ত তো দূরের কথা, এর কল্পনা থেকেও তিনি পবিত্র ছিলেন। যে বলে যে তিনি এ রকম উদ্দেশ্য করেছিলেন, সে কাফির। তাফসীরে রূহুল বয়ানে সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

فَمَنْ نَسَبَ اِلَى الْاَنْبِيَاءِ الْفَوَاحِشَ كَالْعَزْمِ عَلَى الزِّنَاءِ وَنَحْوِهِ الَّذِى يَقُوْلُهُ الْحَشْوِيَّةُ كَفَرَ لِاَنَّهُ شَتْمٌ لَهُمْ كَذَا فِى الْقُنْيَةِ.

আপত্তিতে উল্লেখিত আয়াতের দু'ধরনের তাফসীর করা হয়েছে-এক, وَلَقَدْ পর্যন্ত পড়ে বিরতি দিন এবং هَمَّ থেকে পৃথক আয়াত শুরু করুন। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে জুলেখা ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং তিনিও আসক্ত হতেন, যদি খোদার নিদর্শন না দেখতেন। এখন আর কোন আপত্তি রইলো না। আকলী বলুন বা নকলী বলুন, সবদিক থেকে সঠিক অর্থ হয়েছে। তাফসীরে খাযেনের মতে এর আসল ইবারত হচ্ছে- وَلَوْلَاَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ لَهَمَّ بِهَا তাফসীরে মদারেক শরীফে বর্ণিত আছে-

وَمِنْ حَقِّ الْقَارِى اِذَا قَدَّرَ خُرُوْجَهُ مِنْ حُكْمِ الْقَسَمِ وَجَعَلَهُ كَلَامًا بِرَاسِهٖ اَنْ يَّقِفَ عَلَى بِهٖ وَيَبْتَدِىْ بِقَوْلِهٖ وَهَمَّ بِهَا.

অর্থাৎ ক্বারীদের উচিৎ بِهٖ এর পর বিরতি দেয়া এবং هَمَّ بِهَا থেকে আয়াত শুরু করা। কিয়াসও তাই বলে, কেননা কুরআন করীম এ জায়গায় জুলেখার সব রকমের প্রস্তুতির বর্ণনা করেছেন- وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ সে তাঁকে সব রকমভাবে মোহিত করার চেষ্টা করেছে। তাঁকে কাছে ডেকেছে এবং দরজাও বন্ধ করেছিল। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) এর অনিচ্ছা, ঘৃণা ও নিষ্পাপের কথাও সাথে সাথে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ.

(আল্লাহর দোহাই, সে আমার মুরব্বি, আমার প্রতি তার অনেক ইহসান রয়েছে। এ ধরনের আচরণ অন্যায় এবং অন্যায়কারী কখনও কামিয়াব হয় না।) এর পর আরও

বর্ণিত আছে كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ এ আয়াতে فَحْشَاءَ এর দ্বারা যেনা এবং سُوْءَ এর দ্বারা যেনার উদ্দেশ্য করা বোঝানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেনার ধারণা থেকেও পবিত্র রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত জুলেখাও স্বীকার করেছে-

اَلْاٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

আমিই তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। তিনি সত্যবাদী। এমনটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর দ্বারাও তাঁর নির্দোষিতা ও জুলেখার পঙ্কিলতার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে-

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا আযীয মিসিরও তাই বলেছেন-

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِىْ لِذَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ.

ওহে জুলেখা, তুমি পাপী, তুমি স্বীয় গুনাহ থেকে তওবা কর। দেখুন, দুগ্ধ পোষ্য শিশু, আযীয মিসির, স্বয়ং জুলেখা, এমনকি আল্লাহ তা'আলাও তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যদি জুলেখার মত তিনিও পাপাসক্ত হতেন, তাহলে তিনিও দোষী সাব্যস্ত হতেন এবং এসব সাক্ষ্য মিথ্যা পরিণত হতো। আর যদি এতটুকুই হতো যে জুলেখাই পাপের সূচনা করেছিল। পরে তিনিও জড়িত হয়ে পড়েছেন। যদি ইউসুফ (আঃ) অবৈধ কাজ করার খেয়াল করতেন, তাহলে তাঁর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা নিশ্চয় বর্ণিত হতো। যেমন- তাফসীরে মদারেকে আছে-

وَلِاَنَّهٗ لَوْ وُجِدَ مِنْهُ ذٰلِكَ لَذُكِرَتْ تَوْبَتُهٗ وَاسْتِغْفَارُهٗ.

আসলে উপরোক্ত আয়াতের যথার্থ অর্থ হচ্ছে যে তিনিও (যেনার) মনস্থ করতেন, যদি খোদার নিদর্শন না দেখতেন। তাফসীরে কবীরে উল্লেখিত আছে যে لَوْلَا এর জবাব এর আগে উল্লেখিত বলেও ধরে নেয়া যায়। যেমন- উক্ত আয়াতের আগে বর্ণিত আছে-

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا.

(তাফসীরে কবীরে لَقَدْ هَمَّتْ এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) উক্ত আয়াতের অপর ব্যাখ্যা হলো بِهٖ তে ওয়াক্‌ফ না করে بِهَا পর্যন্ত একই বাক্য মনে করতে হবে এবং আয়াতের অর্থ দাড়াবে- নিশ্চয় জুলেখা ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি আসক্ত এবং ইউসুফ

(আঃ) জুলেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। আয়াতে উল্লেখিত هَمَّ শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে নিশ্চয় পার্থক্য রয়েছে هَمَّتْ بِهٖ দ্বারা যেনার খেয়াল বোঝানো হয়েছে এবং هَمَّ بِهَا দ্বারা হৃদয়ের অনিয়ন্ত্রিত আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে কোন ইচ্ছে শক্তি প্রকাশ পায় না। অর্থাৎ জুলেখা ইউসুফ (আঃ)কে কামনা করেছিল এবং ইউসুফ (আঃ) এর মনে অনিয়ন্ত্রিত সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, যা কোন অপরাধ বা গুনাহ নয়। যেমন- রোযায় ঠাণ্ডা পানি দেখলে মনে তৃষ্ণা জাগে, কিন্তু পান করার ইচ্ছেতো দুরের কথা, কল্পনাও করা হয় না, কেবল শীতল পানি ভাল লাগে। যদি উভয় শব্দ একই অর্থবোধক হতো, তাহলে একই শব্দ দু'বার বলা হতো না। বরং وَلَقَدْ هَمَّا (অর্থাৎ উভয়ে মনস্থ করেছিলেন) বললেই যথেষ্ট হতো। দেখুন مَكَرُوْا وَمَكَرَ اللهُ। আয়াতে প্রথম مكر শব্দের অর্থ এক রকম এবং দ্বিতীয় مكر শব্দের ভাবার্থ অন্যরকম। তাফসীরে খাযেনে বর্ণিত আছে-

قَالَ الْاِمَامُ فَخْرُالدِّيْنُ اَنَّ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بَرِيْئًا مِنَ الْعَمَلِ الْبَاطِلِ وَالْهَمِّ الْمُحَرَّمِ.

(ইমাম ফখরউদ্দিন (রহঃ) বলেছেন যে নিশ্চয় হযরত ইউসুফ (আঃ) খারাপ ধারণা ও অসৎ কাজ থেকে পবিত্র ছিলেন।) লক্ষ্যণীয় যে জুলেখা দরজার পাশে আযীয মিসিরকে দেখে ইউসুফ (আঃ) এর নামে যেনার অভিযোগ করেননি, বরং বলেছেন যে ইউসুফ (আঃ) যেনার উদ্দেশ্য করেছিলেন, যেমন- কুরআনে উল্লেখিত আছে-

قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءً اِلَّا اَنْ يُّسْجَنَ.

(যে তোমার স্ত্রীর সাথে অবৈধ কাজ করার উদ্দেশ্য করে, তার জেল ব্যতীত অন্য কি শাস্তি হতে পারে?) এর প্রতিবাদে হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন- هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَّفْسِىْ (অসৎ কাজের উদ্দেশ্য সেই করেছিল।) দুগ্ধপোষ্য শিশুও ওর সাফাই গাওয়াকে ফাঁস করে দিয়েছিল। আযীয মিসির নিজেই হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জামা ছেড়া দেখে বলেছিলেন اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ মিসরের মহিলারাও জুলেখার অভিযোগকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত জুলেখা নিজেও তার দোষ স্বীকার করেছিল। তাই, যদি هَمَّ بِهَا এর অর্থ ইউসুফ (আঃ) যেনার উদ্দেশ্য করেছিলেন- এ রকম করা হয়, তাহলে বলতেই হয় যে আল্লাহ তা'আলা জুলেখার কথাকেই সত্যায়ন করেছেন এবং অন্যান্যদের বক্তব্যকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এ ধরনের ভাবার্থ আসল বক্তব্যের বিপরীত। এ বর্ণনাটা যেন স্মরণ থাকে। ইন্‌শা আল্লাহ অনেক কাজে আসবে।

৮নং আপত্তিঃ হযরত মুসা (আঃ) একজন কিব্‌তিকে জ্যান্ত মেরে ফেলেছিলেন। এবং বলেছেন هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ (এটা শয়তানী কাজ) বোঝা গেল যে, তিনি জুলুমপূর্বক হত্যা করেছেন, যা বড় অপরাধ।

উত্তরঃ হত্যা করার উদ্দেশ্য মুসা (আঃ) এর ছিল না বরং জালিম কিব্‌তি থেকে মজলুম ইস্রাঈলীকে রক্ষা করাটাই উদ্দেশ্য ছিল। যখন কিব্‌তি লোকটাকে ছেড়ে দিচ্ছিল না, তখন তিনি (আঃ) ওকে হটিয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে একটি থাপ্পড় মেরে ছিলেন। কিন্তু নবুয়াতের বলে বলীয়ান উক্ত থাপ্পড় সে বরদাস্ত করতে পারেনি, যার ফলে মারা যায়। তাই এ হত্যাটা ছিল অনিচ্ছাকৃত বা ভুল বশতঃ এবং নবীদের ভুল হতে পারে। অধিকন্তু, এ ঘটনাটা নবুয়াত প্রাপ্তির আগে ঘটেছিল। যেমন রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে كَانَ هٰذَا قَبْلَ النُّبُوَّةِ আর সেই কিবতিটা সংগ্রামী কাফির ছিল যাকে হত্যা করা অপরাধ ছিল না। তিনিতো মাত্র একজন কিব্‌তিকে হত্যা করেছেন; কিছুদিন পর সমস্ত কিব্‌তিকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। তবে তিনি (আঃ) যে এ কাজকে শয়তানী কাজ বলেছেন, এটা হচ্ছে তাঁর আজেযী ও একান্ত অনুতপ্ত ভাবের প্রকাশ মাত্র। কেননা আগাম কাজকেও তিনি অপরাধ মনে করেছেন। অর্থাৎ এ কাজটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে হয়ে গেল। কিব্‌তিদের ধ্বংসের সময় সেও ধ্বংস হয়ে যেত। ظَلَمْتُ نَفْسِىْ এবং فَغَفَرَلَهٗ শব্দদ্বয় দ্বারা ধোঁকায় পতিত হয়ো না। এ শব্দগুলো ভুল ত্রুটির বেলায়ও প্রযোজ্য হয়। অথবা উক্ত আয়াত দ্বারা কিব্‌তির জুলুমকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ এ জুলুম শয়তানী কাজ।

৯নং আপত্তিঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন- وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى (আপনি পথভ্রষ্ট ছিলেন, পরে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন) বোঝা গেল যে তিনি প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলেন, পরে হিদায়েত প্রাপ্ত হয়েছেন।

উত্তরঃ যে এ আয়াতে উল্লেখিত ضَالٌّ এর অর্থ গুমরাহ বলে, সে নিজেই গুমরাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوٰى অর্থাৎ তোমাদের মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম না কখনও গুমরাহ হয়েছে, না বিপথগামী। উক্ত আয়াতে ضَالٌّ এর অর্থ খোদার প্রেমে বিভোর এবং هُدٰى অর্থ সলুকের পদমর্যাদা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর প্রেমে বিভোর পেয়েছেন, তাই আপনাকে সলুকের মর্যাদা দান করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর কাছে আরয করেছিল-

انك لفي ضلال مبين يا انك لفي ضلالك القديم.

এখানে ضَـال এর অর্থ হচ্ছে প্রেমে বিভোর। হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী স্বীয় 'মুদারেজুন নাবুয়াত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন- আরবীতে ওই ধরনের উচ্চ বৃক্ষকে ضَـال বলে, যার দ্বারা পথহারা লোক পথের সন্ধান পায়। অর্থাৎ ওহে মাহবুব, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সুউচ্চ বৃক্ষের মত পথের দিশারী হিসেবে পেয়েছেন, যাকে আরশ ফরশ সব জায়গা থেকে দেখা যায়। সুতরাং আপনার ওসীলায় সবাইকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে। (এখানে هَدٰى ক্রিয়ার কর্ম সাধারণ লোক, নবী (আঃ) নয়) এ রকম আরও অনেক অর্থ করা হয়েছে।

১০ নং আপত্তিঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ.

(যাতে আল্লাহ তা'আলা আপনার আগে পরের গুনাহ মাফ করে) এতে বোঝা গেল তিনি পাপী ছিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও প্রায় সময় তাঁর নিজের জন্য মাগফিরাতের দুআ করতেন। যদি তিনি গুনাহ্‌গার না হতেন, তাহলে এ মাগফিরাত কি জন্য কামনা করতেন?

উত্তরঃ এ আয়াতের কয়েকটি উত্তর রয়েছে-এক, এখানে মাগফিরাত বলতে নিষ্পাপ এবং হিফাজত বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেন আপনাকে সবসময় গুনাহ থেকে পবিত্র রাখে। যেমন- রূহুল বয়ানে উল্লেখিত আছে-

اَلْمُرَادُ بِالْمَغْفِرَةِ الْحِفْظُ وَالْعِصْمَةُ اَزَلًا وَاَبَدًا فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰى يَسْتَحْفِظُكَ وَيَعْصِمُكَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَاَخِّرِ.

দুই, ذَنْبِكَ শব্দের মধ্যে একটি مُضَـاف উহ্য আছে অর্থাৎ আপনার উম্মতের গুনাহ, যা لَكَ বলার দ্বারা বোঝা গেল। অর্থাৎ আপনার ওসীলায় যেন উম্মতের গুনাহ মাফ করে। যদি তাঁর (দঃ) নিজের গুনাহ বোঝানো হতো, তাহলে لَكَ বলার কি প্রয়োজন ছিল (রূহুল বয়ান ও খাযেন দ্রষ্টব্য) তিন। এ আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে করা হয়েছে, যেমন (الاية) وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا কোন সময় অপরাধের কথা অপরাধীকে লক্ষ্য করে বলা হয়, আবার কোন সময় অপরাধীর জিম্মাদারকে লক্ষ্য করে বলা হয়, যেমন মামলায় কোন সময় অপরাধী, আবার কোন সময় উকীলকে লক্ষ্য করে অপরাধের কথা বলা হয়। উকীল বলে থাকে এটা আমার মামলা, আমি এর জিম্মাদার।

www.AmarIslam.com

এখানেও সেই দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- আপনার উম্মতের গুনাহ, যার শাফায়াতের জিম্মাদার হলেন আপনি।

১১ নং আপত্তিঃ আল্লাহ তা'আলা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে লক্ষ্য করে ইরশাদ ফরমান-

وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا

(যদি আমি আপনাকে অটল না রাখতাম, তাহলে কাফিরদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।) এর দ্বারা বোঝা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কাফিরদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রতিরোধ করেছেন। আর কাফিরদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াও গুনাহ।

উত্তরঃ এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে। এক, এ আয়াতটা শর্ত ও জযা নিয়ে গঠিত শর্তযুক্ত পদ, যেথায় উল্লেখিত ঘটনাদ্বয় হওয়াতো দূরের কথা, সম্ভাবনা মনে করারও কোন প্রয়োজন নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র এরশাদ করেছেন-

قُلْ لَوْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ.

(যদি আল্লাহর কোন ছেলে হতো, আমি এর প্রথম পূজারী হতাম।) কিন্তু না খোদার ছেলে হওয়া সম্ভব, এবং না নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক এর পূজা করা সম্ভব। উপরোক্ত আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হুযূর আলাইহিস সালামের হিফাজত না করা যেমন অকল্পনীয়, তেমন হুযূর আলাইহিস সালাম কর্তৃক ওদের প্রতি ঝুঁকে পড়াটাও অকল্পনীয়। দুই, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমি আপনাকে প্রথম থেকে নিষ্পাপ ও অটল না রাখতাম তাহলে আপনি ওদের প্রতি প্রায় ঝুঁকে পড়তেন, কেননা ওদের ধোঁকা ও চালাকী খুবই মারাত্মক ছিল। অর্থাৎ যেহেতু আপনি নিষ্পাপ, সেহেতু কাফিরদের প্রতি ঝুঁকে পড়েননি, এমনকি ঝুঁকার উপক্রমও হননি। এর দ্বারা তাঁর (দঃ) নিষ্পাপ হওয়া প্রমাণিত হলো। (খাযেন, মাদারেক, রূহুল বয়ানে দেখুন)। তিন, একেতঃ হুযূর আলাইহিস সালামের স্বভাব চরিত্র নির্মল, দ্বিতীয়তঃ তিনি নাবুয়াতপ্রাপ্ত ও খোদার পক্ষ থেকে নিষ্পাপ বলে ঘোষিত। উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে নাবুয়াত ও নিষ্পাপতার প্রতি লক্ষ্য না করলেও তাঁর নির্মল স্বভাব চরিত্র দোষ ও গুনাহ থেকে এমন মুক্ত যেথায় ওসব নিষ্ক্রিয়। কেননা তাঁর রূহানী শক্তি মানবীয় শক্তির উপর জয়ী। অর্থাৎ আমি আপনাকে নিষ্পাপ না করলেও আপনি কাফিরদের সাথে মিশতেন না, তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন না। অবশ্য কিছুটা প্রভাবিত হতেন। কিন্তু যখন আপনার পূত স্বভাবের প্রতি খোদার এ রহমত হলো অর্থাৎ আপনাকে নিষ্পাপও করা হলো এবং আপনার পবিত্র শিরে নবুয়াতের মুকুটও পরিধান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করানো হলো, তখন আর কোন রকমের দোষ ত্রুটির অবকাশ রইলো না। তাফসীরে রূহুল বয়ানে তাই বর্ণিত আছে-

إِنَّمَا سَمَّاهُ قَلِيلًا لِأَنَّ رُوحَانِيَّةَ النَّبِيِّ كَانَتْ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ غَالِبًا عَلَى الْبَشَرِيَّةِ إِذْ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ لِرُوحِهِ شَيْئٌ يَحْجُبُهُ عَنِ اللهِ تَعَالَى فَالْمَعْنَى لَوْلَا التَّثْبِيتُ وَقُوَّةُ النُّبُوَّةِ وَنُورُ الْهِدَايَةِ وَأَثَرُ نَظَرِ الْعِنَايَةِ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ.

১২ নং আপত্তিঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান- مَاكُنْتَ تَدْرِى مَاالْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ. 'হে নবী (দঃ) আপনি জানতেন না কিতাব কি জিনিস এবং ঈমান কি'। এতে প্রমাণিত হয় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জন্মগত আরিফ বিল্লাহ ছিলেন না। কেননা তাঁর কাছে ঈমানের খবরও ছিল না।

উত্তরঃ এর কয়েকটি উত্তর রয়েছে। এক, এখানে তাঁর জ্ঞানকে অস্বীকার করা হয়নি, বরং মনগড়া ও অনুমান থেকে জানাকে অস্বীকার করা হয়েছে। পূর্ণ আয়াতটি হচ্ছে-

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتٰبُ.

অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি স্বীয় মেহরবানীতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আপনি নিজে জানতেন না। অর্থাৎ আপনার এ জ্ঞানের উৎস হচ্ছে খোদার ওহী, নিছক মনগড়া ও অনুমান ভিত্তিক জ্ঞান নয়। দুই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা তাঁর জন্মগত অবস্থার কথা নয়, বরং নুরে মুহাম্মদীর জন্মের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আলমে আরওয়াহে (রূহের জগতে) আপনাকে সাদাসিধে ভাবে সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর আপনাকে যাবতীয় জ্ঞানে ভূষিত করে এবং নাবুয়তের তাজ পরিধান করায়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি। আপনি রূহের জগতেও নবী ছিলেন। তিনি (দঃ) নিজেই বলেন كُنْتُ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ. (আমি ওই সময় নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) মাটি-পানিতে মিশ্রিত ছিলেন।) তিন, এর দ্বারা ঈমান ও কুরআনের বিশ্লেষণ পূর্ণ আহকামকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ওহী প্রাপ্তির আগে তিনি (দঃ) ইসলামী আহকাম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত ছিলেন না। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে রূহুল বয়ানে বর্ণিত আছে-

اَىِ الْاِيْمَانُ بِتَفَاصِيْلِ مَا فِىْ تَضَاعِيْفِ الْكِتٰبِ আরও উল্লেখিত আছে-

لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَفْضَلُ مِنْ يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَقَدْ اُوْتِىَ كُلٌّ الْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ صَبِيًّا.

অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইয়াহিয়া (আঃ) ও ঈসা (আঃ) থেকে আফযল এবং তাঁদেরকেতো শৈশবাবস্থায় ইলম ও হিকমত দান করা হয়েছিল। তাহলে এটা কিভাবে বলা যায় যে তিনি (দঃ) শৈশবাবস্থায় জ্ঞান শূন্য ছিলেন?

১৩নং আপত্তিঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান- فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ (শয়তান হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)কে প্রতারিত করেছে।) এতে বোঝা গেল শয়তানের চালবাজি নবীদের সাথেও চলে। তাহলে এটা কিভাবে বলা সম্ভব যে শয়তান তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারে না?

উত্তরঃ আমি বলেছি যে শয়তান তাঁদেরকে গুমরাহ করতে পারে না এবং তাঁদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কবীরা গুনাহ করাতে পারে না। শয়তান নিজেই বলেছিল-

لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ.

(আমি ওদের সবাইকে বিপথগামী করব, তবে ওদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাদেরকে নয়।) এ আয়াতে উল্লেখিত আছে فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ সুতরাং গুমরাহী এক জিনিস আর প্রতারণা করা অন্য জিনিস।

১৪নং আপত্তিঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদেরকে অনেকে নবী মনে করেন। অথচ তাঁরা বড় গুনাহ করেছেন। যেমন নিরাপরাধ ভাইকে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করা এবং আপন পিতার কাছে মিথ্যা বলে তাঁকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কাঁদানো জঘন্য অপরাধ নয় কি? তবু তাঁরা নবী হয়েছেন। তাই বোঝা গেল যে নবীগণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক নয়।

উত্তরঃ জমহুর উলামায়ে কিরাম তাঁদেরকে নবী মনে করেন না। অবশ্য আলিমদের একটি গ্রুপ কিছু দুর্বল প্রমাণাদি দ্বারা তাঁদের নবুয়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে ধারণা করে থাকেন। এ জন্য আমি সূচনায় উল্লেখ করেছি যে, নবুয়াতের আগে আম্বিয়া কিরাম বদআকীদা থেকে পবিত্র হওয়া সম্পর্কে সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে এবং কবীরা গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়াটাও জমহুর উলামাদের অভিমত। নবুয়াতের পরেও কবীরা গুনাহ থেকে পাক হওয়া সম্পর্কে সর্বসম্মত অভিমত রয়েছে। তাঁদের নবুয়াত সম্পর্কে

কোন সুস্পষ্ট আয়াত বা সাহাবায়ে কিরামের উক্তি পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ এ আয়াতে নিয়ামত দ্বারা নবুয়াত বোঝানো হয়নি এবং আলে ইয়াকুব দ্বারা তাঁর ঔরশজাত সকল সন্তানকেও বোঝানো হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي কেউ কেউ বলেছেন যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমায়েছেন-

وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ

ইয়াকুব (আঃ) এর বার জন ছেলে ছিলেন। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, সবাই ওহী প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু এটাও দুর্বল অভিমত। কেননা أُنْزِلَ ক্রিয়া দ্বারা বিনা মাধ্যম ওহী প্রাপ্তির কথা বোঝায় না আর أَسْبَاط শব্দ ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তানদের উপাধি বলে কোন প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ.

এর ভাবার্থ এ নয় যে আমাদের সবার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে এবং আমরা সবাই নবী আর أَسْبَاط হচ্ছে বনী ঈস্রাইলের চারটি গোত্রের গোত্রীয় নাম এবং বাস্তবিকই তাঁদের মধ্যে নবীর আবির্ভাবও ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

فَالَّذِي عَلَيْهِ الْاَكْثَرُونَ سَلَفًا وَخَلَفًا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ أَصْلًا فَلَمْ يُنْقَلْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ بِنُبُوَّتِهِمْ

অনুরূপ তাফসীরে রুহুল বয়ান ও অন্যান্য তাফসীরে তাঁদের নবুয়াত প্রাপ্তিকে অপ্রমাণ করা হয়েছে। অবশ্য তওবার পর তাঁরা আল্লাহর ওলী বরং নবীর সাহাবার পদমর্যাদা লাভ করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে তাঁদেরকে তারকারাজির মত দেখেছেন। কেননা তাঁরা নবীর সাহাবী ছিলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান- أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ (আমার সাহাবীগণ তারকারাজির মত) অধিকন্তু তাঁদের ওসব পাপ কেবল ইয়াকুব (আঃ) এর স্নেহ লাভের জন্যই করা হয়েছিল। পরে তাঁরা ইয়াকুব (আঃ) ও ইউসুফ (আঃ) থেকে মাফ চেয়ে নিয়েছিলেন। আর তাঁরা উভয়ে ওদের ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দুআ করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা সবাই

ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাঁদের শানে বেআদবী করা বড় পাপ। কাবিল জনৈক মহিলার সাথে প্রেম নিবেদন করে অপরাধ করেছিল। পরে এর জন্য আদম (আঃ) থেকে ক্ষমা লাভ করেনি, যার ফলে সে বেঈমানই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ঈমানদার ছিলেন।

১৫ নং আপত্তিঃ কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত আছে যে জুলেখা যেনার মনস্থ করেছিলেন, যা বড় অপরাধ। অথচ আপনি বলেছেন যে নবীর স্ত্রী ব্যভিচারিনী হয় না। তাহলে জুলেখা কিভাবে ইউসুফ (আঃ) এর স্ত্রী হতে পারে? কেননা সে ব্যভিচারিনী ছিল। সুতরাং মানতেই হবে যে হয়তো তাঁর বিবাহ হয়নি বা এ নীতি ভুল।

বিঃ দ্রঃ গুজরাটের কতেক মূর্খ দেওবন্দী জুলেখাকে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করে তাঁর শানে যা- তা মন্তব্য করেছে।

উত্তরঃ হযরত জুলেখা ইউসুফ (আঃ) এর সম্মানিতা স্ত্রী। তাঁর স্ত্রী হওয়া সম্পর্কে মুসলিম ও বুখারী শরীফের হাদীছ এবং প্রায় তাফসীর থেকে প্রমাণিত আছে। তাঁর থেকে ইউসুফ (আঃ) এর সন্তানাদিও জন্ম হয়েছে। তাফসীরে খাযেন, তাফসীরে কবীর মাদারেক, মায়ালেমুত্তানযীল ইত্যাদিতে এর বিশ্লেষণ রয়েছে। জুলেখা কখনও ব্যভিচারিনী ছিল না। এবং যেনার মত কোন গুনাহও তাঁর থেকে প্রকাশ পায়নি। হযরত ইউসুফের প্রেমে বিভোর অবস্থায় জুলেখার মনে সহবাসের ধারণা জেগে ছিল। হযরত ইউসুফের সৌন্দর্য তাঁকে পাগল করেছিল এবং সেই অবস্থায় এ রকম ধারণা করেছিলেন। যদি মিসরের মহিলারা ক্ষণিকের জন্য তাঁর অপূর্ব সুন্দর আকৃতি দেখে বিভোর হয়ে নিজেদের হাত কেটে ফেলতে পারে, তাহলে তাঁর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে জুলেখার ধৈর্যচ্যুতি ঘটার মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে? অবশ্য পরে সে সব গুনাহ থেকে তওবাও করেছেন। এটাও লক্ষণীয় যে জুলেখা কেবল ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অন্য কারো প্রতি নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সার্বিকভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন। আমি নবীগণের স্ত্রীদেরকে যেনা ও অন্যান্য অশ্লীলতা থেকে মুক্ত বলেছি কিন্তু নিষ্পাপ বলিনি। জুলেখা এ পাপের জন্য তওবা করেছিলেন। এবং আরয করেছিলেন- اَلْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ জুলেখা নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করলো এবং অপরাধ স্বীকার মানে তওবা করা। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর জন্য অসন্তোষ কিংবা শাস্তির কথা কিছু উল্লেখ করেননি। যাতে বোঝা যায় যে তাঁর গুনাহ মাফ করা হয়েছে। এখন তাঁর গুনাহকে অশোভনীয়ভাবে উল্লেখ করাটা জঘন্য পাপ। তাঁর থেকে যেনা বা অশ্লীলতা কখনও প্রকাশ পায়নি। জানিনা দেওবন্দীরা কোন্ শয়তানের ধোঁকায় পড়েছে যে তারা প্রায় সময় আম্বিয়া কিরামের মান সম্মানের প্রতি আঘাত হানে। জুলেখা হচ্ছেন

ইউসুফ (আঃ) এর ঘরণী। তাঁর অপবাদ মানে নবীরই অপবাদ। আল্লাহ তাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করুক।

উপসংহারঃ স্মরণ রাখা দরকার যে খোদা তা'আলা নবীদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁরা হচ্ছেন তাঁর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তা'আলা যে ভাবে ইচ্ছে তাঁদের দোষ গুনাহ বর্ণনা করুক এবং তাঁরাও যেভাবে পছন্দ সে-ভাবে স্বীয় প্রার্থনা বা বন্দেগী প্রকাশ করুক, কিন্তু তাতে আমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই। তাঁদের দোষ তালাশ করে বা তাঁদের শানে বেআদবী করে নিজের আমলকে মলিন করতে যাব কেন? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেতো তাঁদের ইয্যত সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। দেখুন, ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাজারে বাহ্যতঃ বিক্রি হয়েছিলেন, যার জন্য মিসরবাসী তাকে আযীয মিসিরের কেনা গোলাম মনে করতেন। আল্লাহ তা'আলা এ কালিমাকে দূরীভূত করার জন্য সাত বছর মেয়াদী দুর্ভিক্ষ দিয়ে ছিলেন। প্রথম বছর সবাই তাঁর কাছে টাকা পয়সা দিয়ে খাদ্য শস্য ক্রয় করেছিল, দ্বিতীয় বছর সোনা চাঁদি দিয়ে, তৃতীয় বছর গরু-ছাগল দিয়ে, চতুর্থ বছর নিজেদের দাসদাসী দিয়ে, পঞ্চম বছর নিজেদের ঘর-বাড়ী ও জায়গা জমি দিয়ে, ষষ্ঠ বছর নিজেদের ছেলে-মেয়ে দিয়ে তাঁর থেকে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করেছিলেন। সপ্তম বছর মিসরবাসী নিজেরাই ইউছুফ (আঃ) এর কাছে বিক্রি হয়েছে এবং আরয করেছে- আমরা আপনার দাসদাসীতে পরিণত হলাম, আপনি আমাদেরকে খাদ্য শস্য প্রদান করুন। তখন তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেন। (মাদারেক, রূহুল বয়ান ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) এ রকম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি কেবল এ জন্যই করা হলো যে, যখন সমগ্র মিসরবাসী ইউসুফ (আঃ) এর দাসে পরিণত হলো, তখন তাঁকে কে বলবে 'কেনা গোলাম'? এতে বোঝা গেল যে একজন নবীর মান সম্মান অটল রাখার জন্য সমগ্র জগত বাসীকে মছিবতে ফেলতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে জনৈক ইমাম সব সময় নামাযে সূরা আবাসা পাঠ করতো। (সুরাটিতে বাহ্যতঃ হুযূর (দঃ)কে ভর্ৎসনা করা হয়েছে মনে হয়।) যখন তিনি জানতে পারলেন, তখন ওকে হত্যা করালেন। (তাফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা আবাসার তাফসীর দেখুন।) আমার রচিত 'শানে হাবিবুর রহমান' কিতাবে এ সূরার সুন্দর তাফসীর করা হয়েছে, যেথায় প্রমাণ করা হয়েছে যে ওটা আসলে হুযুরের প্রশংসাগীতি। আল্লাহ তা'আলা দেওবন্দীদের হিদায়েত করুক। ওরা নবীদের শানে বেআদবী করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا
وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

তারাবীহের নামায প্রসঙ্গে আলোকপাত

প্রথম অধ্যায়

তারাবীহের নামায বিশ রাকাত হওয়ার প্রমাণ

তারাবীহর নামায বিশ রাকাত পড়া সুন্নাত; আট রাকাত পড়া সুন্নাতের বরখেলাপ। আমি কুরআন শরীফের বিন্যাস, বিশুদ্ধ হাদীছ, উলামায়ে কিরামের উক্তি ও আকলী দলীল সমূহ দ্বারা এর প্রমাণ দিচ্ছি।

১) কুরআন শরীফে সূরাও আছে, আয়াতও আছে এবং রূকুও আছে। কুরআন শরীফের যে সব বিষয় বস্তুর নাম রয়েছে, সে গুলোকে সূরা বলা হয় আর যে সব বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম নেই, ওগুলোকে আয়াত বলা হয়। কিন্তু রূকুকে রূকু কেন বলা হয়, তা ভেবে দেখা দরকার। কেননা সূরার অর্থ হচ্ছে কোন কিছুকে পরিবেষ্টন করা আর আয়াত অর্থ চিহ্ন, যেহেতু সূরা একটি বিষয় বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন- সূরা বলদ আর আয়াত খোদায়ী কুদরতের চিহ্ন হিসেবে বিবেচ্য, সেহেতু এ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। কিন্তু কুরআনী রূকুকে রূকু কেন বলা হয়, তা একবার তলিয়ে দেখা দরকার। রূকু মানে নত হওয়া। তাজবীদের কিতাবসমূহ থেকে জানা যায় যে হযরত উমর ও উছমান (রাঃ) তারাবীহর নামাযে যেই পরিমাণ কুরআন পাঠ করে রূকু করতেন, সেই অংশের নাম রূকু রাখা হয়েছে। তারবীহের নামায বিশ রাকাত এবং রমযানের সাতাশ তারিখে কুরআন খতম-এ হিসাবে ধরলে, কুরআনে পাকে মোট ৫৪০ রূকু হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু খতমের দিন কোন কোন রাকাতে ছোট ছোট দু'তিন সূরা একসাথে পড়ে ফেলা হতো, সেহেতু কুরআন শরীফ ৫৫৭ রূকু সম্বলিত হয়েছে। যদি তারাবীহের নামায আট রাকাতই হতো, তাহলে রূকুর সংখ্যা ১১২ হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ছিল। অতএব কুরআনের রূকুর সংখ্যাই প্রমাণ করছে যে তারবীহের নামায বিশ রাকাত। কোন ওহাবী আট রাকাত তারাবীহের সমর্থনে কুরআনী রূকুর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে কি?

২) তারাবীহ تراويح শব্দটি ترويح এর বহুবচন, যার অর্থ হলো শরীরকে আরাম দেয়া। তারবীহের নামাযে চার রাকাতের পর কিছুক্ষণের জন্য বসে আরাম করা হয়। সেই বসাটার নাম তরবীহা। এ জন্য এই নামাযকে তারাবীহ অর্থাৎ আরামের সমষ্টি বলা হয়। আরবীতে কমপক্ষে তিনটাকে বহুবচন বলা হয়। যদি আট রাকাত তারাবীহ হয়, তাহলেতো এর মধ্যে মাত্র একবার তরবীহা পাওয়া যাচ্ছে এবং এর নাম

তারাবীহ (বহুবচন) হতো না। তিন তরবীহার (বিশ্রাম) জন্য কম পক্ষে ষোল রাকাত তারাবীহ হওয়া বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ প্রতি চার রাকাত পর এক তরবীহা। বিতরের আগে কোন তরবীহা বা বিশ্রাম নেওয়া হয় না। তাই তারাবীহের নামই আট রাকাত তারাবীহের দাবীকে অপ্রমাণ করে।

৩) প্রতি দিন বিশ রাকাত নামায অত্যাবশ্যক-সতের রাকাত ফরয ও তিন রাকাত বিতর, যথা- ফজরে দু'রাকাত, যুহরে চার রাকাত, আসরে চার রাকাত, মাগরিবে তিন রাকাত এবং ইশায় চার রাকাত ফরয ও তিন রাকাত বিতর। পবিত্র রমযান মাসে আল্লাহ তা'আলা এ বিশ রাকাতের পরিপূর্ণতার জন্য আরও বিশ রাকাত তারাবীহের নামায নির্ধারণ করেছেন। লা মযহাবীরা সম্ভবতঃ পাঁচ ওয়াক্তিয়া নামাযেও আট রাকাত পড়ে থাকেন নতুবা আট রাকাতের সাথে ঐ বিশ রাকাতের কি সামঞ্জস্য থাকতে পারে?

৪) হাদীছ সমূহঃ স্মর্তব্য যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিয়মিতভাবে তারাবীহের নামায জামাত সহকারে আদায় করেননি; কেবল দু'এক দিন আদায় করেছেন। অবশ্য তিনি বলে দিয়েছেন যে যদি এটা নিয়মিতভাবে আদায় করা হয়, তাহলে ফরয হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে। তাই তোমরা ঘরের মধ্যেই নামায পড়ে নিও। কেউ কেউ বলেন এ নামায আসলে তাহাজ্জুদের নামাযই ছিল, যা রমযান মাসে গুরুত্ব সহকারে আদায় করানো হয়েছে। এ জন্য সাহাবায়ে কিরাম সাহরীর শেষ সময়ে এ নামায থেকে ফারেগ হতেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর যুগেও এটা সুষ্ঠু ভাবে আদায়ের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। লোকেরা আলাদা আলাদাভাবে পড়ে নিতেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এ ব্যাপারে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বিশ রাকাত তারাবীহের নামায নির্ধারণ করেন এবং বিশ রাকাত নিয়মিত ভাবে জামাত সহকারে আদায়ের ব্যবস্থাও করেন। তাই সঠিক বক্তব্য হচ্ছে তারাবীহের নামায মূলত সুন্নাতে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কিন্তু একে নিয়মিতভাবে জামাত সহকারে বিশ রাকাত আদায় করাটা হচ্ছে সুন্নাতে ফারুক (রাঃ)। নবী করীম (দঃ) আট রাকাত তারাবীহের নির্দেশও দেননি এবং এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতাও করেননি। এমনকি আট রাকাত তারাবীহ পড়া সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। তাই বিশ রাকাতের উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত হওয়াটা সুন্নাতের বিপরীত নয়। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

(তোমাদের জন্য আমার সুন্নাতও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত পালনীয়) যা হোক আমরা বিশ রাকাতের সমর্থনে সাহাবায়ে কিরামের আমল পেশ করলাম। দেখি, লা

মযহাবীরা তাদের আট রাকাত তারাবীহের সমর্থনে এমন কোন সহীহ মরফু হাদীছ পেশ করতে পারে কিনা, যদ্দ্বারা আট রাকাত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ইনশা আল্লাহ কখনও পারবে না। আমাদের দাবীর সমর্থনে উত্থাপিত হাদীছ সমূহ নিম্নে পেশ করা হলো-

১। হযরত উমর (রাঃ) স্বীয় খিলাফতের যুগে বিশ রাকাত তারাবীহ জামাত সহকারে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম একমত ছিলেন। 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' কিতাবে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً رواه البيهقى فى الفرقة باسناد صحيح.

২। হযরত ইবনে মনি হযরত আবি ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন- فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

৩। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ اَبِى الْحَسْنَاتِ اَنَّ عَلِىَّ ابْنَ اَبِى طَالِبٍ اَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

৪। ইবনে আবি শিবা, তিবরানী, কবীর, বায়হাকী, আবিদ ইবনে হামিদ ও বগবী বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ

এ হাদীছ থেকে বোঝা যায় যে স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বিশ রাকাত তারাবীহের নামায পড়তেন।

৫। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে-

وَعَنْ شُبَيْرِمَةَ اِبْنِ شَكْلٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ عَلِىٍّ اِنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ فِىْ رَمَضَانَ فَيُصَلِّىْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَاتٍ.

৬। একই বায়হাকীতে আরও বর্ণিত আছে-

وَعَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ اَنَّ عَلِيًّا دَعَى الْقُرَّاءَ فِىْ رَمَضَانَ فَامَرَ رَجُلًا يُّصَلِّىْ بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلِىٌّ

يُوتِرُ بِهِمْ.

৭। সেই বায়হাকীতে সহীহ সনদ সহকারে আরও বর্ণিত আছে-

عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(সহীহুল বিহারীর كَمْ يَقْرَانِى التَّرْوِيْحِ শীর্ষক অধ্যায়ে এর বিশ্লেষণ দেখুন) উপরোক্ত রেওয়ায়েত থেকে প্রতিভাত হলো যে স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তারাবীহর নামায বিশ রাকাত পড়তেন এবং হযরত উমর ফারুকের খিলাফতের সময় এ বিশ রাকাতের উপর যথাযথ আমল করার সূচনা হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস, আলি, আবি ইবনে কাব, উমর, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম এর উপর আমল করেছিলেন।

উলামায়ে উম্মতের অভিমতঃ

১। তিরমীযী শরীফে সওমের আলোচনায়- ما جاء فى قيام شهر رمضان শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَارُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ وَّعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىْ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ هٰكَذَا اَدْرَكْتُ بِبَلَدِ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

অর্থাৎ আহলে ইলমের আমল ওটার উপর, যা হযরত আলী, উমর ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে অর্থাৎ বিশ রাকাত। এটাই হযরত সুফিয়ান ছুরী, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফেঈর অভিমত। ইমাম শাফেঈ স্বীয় শহর পবিত্র মক্কায় এরই অনুশীলন দেখতে পান অর্থাৎ মুসলমানেরা বিশ রাকাত তারাবীহ পড়তেন।

২। ফতহুল মুলহিম শরহে মুসলিমের দ্বিতীয় খণ্ড ২৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

رَوٰى مُحَمَّدُ ابْنُ نَصْرٍ مِنْ طَرِيْقِ عَطَاءٍ قَالَ اَدْرَكْتُهُمْ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَّثَلٰثَ رَكْعَاتِ الْوِتْرِ وَفِى الْبَابِ اٰثَارٌ كَثِيْرَةٌ اَخْرَجَهَا ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ وَهٰذَا كَالْاِجْمَاعِ.

এতে বোঝা গেল বিশ রাকাতের উপর মুসলমানদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩। উমদাতুল কারী শরহে বুখারী পঞ্চম খণ্ডের ৩০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَرَوَى الْحَارِثُ ابْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ الْقِيَامُ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بِثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً قَالَ ابْنُ عَبْدِاللّٰهِ هٰذَا مَحْمُوْلٌ عَلٰى اَنَّ الثَّلٰثَ لِلْوِتْرِ

এর থেকে জানা গেল যে সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিশ রাকাত তারাবীহ ও তিন রাকাত বিতর পড়া হতো।

৪। উমাদাতুল কারীর একই জায়গায় আরও বর্ণিত আছে-

كَانَ عَبْدُاللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُصَلِّىْ لَنَا فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ الْاَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّىْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

৫। সেই উমদাতুল কারীর পঞ্চম খণ্ডের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

قَالَ ابْنُ عَبْدِالْبِرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهٖ قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَالشَّافِعِىُّ وَاَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَنْ اَبِىْ ابْنِ كَعْبٍ. مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

অর্থাৎ হযরত ইবনে আবদুল বির বলেছেন যে বিশ রাকাত তারাবীহের নামায হচ্ছে সাধারণ উলামায়ে কিরামের অভিমত। কুফাবাসী, ইমাম শাফেঈ ও অধিকাংশ ফকীহগণ এর সমর্থক এবং হযরত আবি ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত আছে যে এ ব্যাপারে কোন সাহাবীর দ্বিমত নেই।

৬। মোল্লা আলী কারী (রহঃ) শরহে নেকায়ায় বর্ণনা করেছেন-

فَصَارَ اِجْمَاعًا لِمَارُوَى الْبَيْهَقِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِىٍّ.

সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমর, উছমান ও আলী (রাঃ) এর শাসনামলে বিশ রাকাত

তারাবীহর নামায পড়তেন। সুতরাং এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৭। মওলবী আবদুল হাই ছাহেব স্বীয় ফতওয়ার কিতাবের প্রথম খণ্ডের ১৮২ পৃষ্ঠায় আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী হাইতমীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً.

অর্থাৎ বিশ রাকাত তারাবীহের উপর সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত রয়েছে।

৮। উমদাতুলকারী শরহে বুখারী পঞ্চম খণ্ডের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

وَاَمَّا الْقَائِلُوْنَ بِهٖ مِنَ التَّابِعِيْنَ فَشُبْرُمَةُ اِبْنُ شَكْلٍ وَابْنُ اَبِىْ مَلَيْكَةَ وَالْحَارِثُ الْهَمْدَانِىْ وَعَطَاءُ اِبْنُ اَبِىْ رِبَاحٍ وَاَبُو الْبَخْتَرِىْ وَسَعِيْدُ ابْنُ اَبِى الْحَسَنِ الْبَصْرِىْ اَخُوالْحَسَنِ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ اِبْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَعِمْرَانُ الْعَبْدِىُّ.

এ ইবারত থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে বিশ রাকাত তারাবীহ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, ফকীহ ও মুহাদ্দিছীনে কিরাম একমত। তাঁদের মধ্যে কেউ আট রাকাত তারাবীহ পড়েননি এবং পড়ার নির্দেশও দেননি।

একটি মর্মকথাঃ লা-মযহাবীরা আসলে আপন প্রবৃত্তির অনুসারী। এ জন্য তাদেরকে আহলে হাওয়া অর্থাৎ সুবিধাবাদী বলা হয়। যেটায় আত্মার আরাম মিলে, সেটাই তাদের মযহাব। আমি তাদের আরাম-দায়ক মযহাবের কয়েকটি মাসায়েল নিম্নে উল্লেখ করলাম, যাতে মুসলমানেরা প্রত্যক্ষ করেন এবং ইবরত হাসিল করেন।

১। দু'মটকা পানি কখনও নাপাক হয় না। সুতরাং কুঁয়ার পানি যতই অপরিষ্কার হোক না কেন, পান করতে পারেন।

২। ভ্রমণে কয়েক ওয়াক্তের নামায এক সঙ্গে পড়ে নিন। রাফেজিদের মত কে বার বার নামবে আর নামাজ পড়বে। তদুপরি রেলে ভীষণ ভীড় হয়।

৩। মেয়েদের অলংকারের কোন যাকাত নেই। কেনইবা থাকবে। এরজন্য যথেষ্ট পয়সা ব্যয় হয়েছে তো।

৪। কেবল আট রাকাত তারাবীহ পড়ে আরাম করুন। কারণ নামাযটা হচ্ছে বোঝা বিশেষ।

৫। কেবল এক রাকাত বিতর পড়ে শুয়ে থাকুন। কারণ নামায থেকে যত

তাড়াতাড়ি ফারেগ হতে পারেন,ততই মঙ্গল ।

৬। এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দিলেও কেবল এক তালাকই প্রযোজ্য হবে। পুনরায় ঘর-সংসার করা যাবে। মোট কথা হলো , যেখানে আরাম, সেখানেই বন্ধুদের দ্বীন ও ঈমান।

আর একটি সুক্ষ্ম বিষয়ঃ মুসলিম শরীফের কিতাবুত তালাকে বর্ণিত আছে যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর যুগে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাকই ধরা হতো। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বললেন- লোকেরা এতে বেশ তৎপর হলেন। তাই এর দ্বারা তিন তালাক প্রযোজ্য হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আরাম প্রিয় লা-মযহাবীরা এক সঙ্গে তিন তালাক দিলেও এক তালাক প্রযোজ্য হওয়ার কথা বলে বেড়াচ্ছে। এ সব আল্লাহর বান্দারা এটা চিন্তা করলো না যে উমর (রাঃ) কি সুন্নাতের বিপরীত নির্দেশ দিতে পারেন? আরও লক্ষণীয় যে, তিনি এ নতুন বিধান জারী করলেন কিন্তু কোন সাহাবী বিরোধিতা করলেন না। আসল কথা হলো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যুগের কতেক লোক এরকম বলতেন তোমাকে তালাক দিলাম, তালাক তালাক। শেষের তালাক শব্দদ্বয় প্রথম তালাকের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হতো। যেমন আমরা বলে থাকি আমি কালকে যাব, কালকে, কালকেই; আমি রুটি খাব, রুটি রুটিই। এখনও যদি কেউ সেই নিয়তে এ রকম বলে, তাহলে এক তালাকই প্রযোজ্য হবে। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর যুগে লোকেরা যেহেতু তিন তালাকই দেওয়া আরম্ভ করেছিল, সেহেতু আমল পরিবর্তনের সাথে সাথে হুক্মও বদলে গেল। তাই তিনি এ নির্দেশ জারী করলেন। এ মাসাআলার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমার রচিত তফসীরে নঈমীর দ্বিতীয় খণ্ডে الطلاق مرتان। আয়াতের তফসীরে দেখুন, যেথায় অনেক হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকরী হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ রাকাত তারাবীহ প্রসঙ্গে আপত্তির জবাব

১নং আপত্তিঃ মিশকাত শরীফের قيام شهر رمضان অধ্যায়ে ও মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে যে হযরত উমর (রাঃ) আবি কা'ব ও দারমী (রাঃ) কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন লোকদেরকে এগার রাকাত নামায পড়ায়। এতে প্রমাণিত হয় যে তারাবীহ আট রাকাত; বাকী তিন রাকাত হচ্ছে বিতর।

উত্তরঃ এর জবাব কয়েক রকম করে দেয়া যায়। প্রথমতঃ এ হাদীছটি ময্তরব (একই রাবী থেকে একই বিষয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত এবং ময্তরব হাদীছ দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা যায় না। এ হাদীছের রাবী হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ। মুয়াত্তাতে তাঁর থেকে এগার রাকাত বর্ণিত আছে, মুহাম্মদ ইবনে নসর মরুজী তাঁর বরাত দিয়ে তের রাকাত বর্ণনা করেছেন এবং মুহাদ্দিছ আবদুর রায্যাক তাঁর বরাত দিয়ে অন্য সনদে একুশ রাকাত বর্ণনা করেছেন। (বুখারী শরীফের শরাহ ফতুহুল বারীর চুতর্থ খণ্ড ১৮০ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেখুন। সুতরাং এ সমস্ত রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি তাদের কথা মত এ হাদীছটি সহীহ বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে তারাবীহ আট রাকাত প্রমাণিত হলো। এবং তিন রাকাত বিতরও প্রমাণিত হলো। কিন্তু তারা বিতর এক রাকাত পড়ে কেন? তাদের কথা মতো নয় রাকাতই হওয়া উচিত ছিল। তাহলে কি হাদীছের অর্ধেকাংশ গৃহীত এবং অর্ধেকাংশ বর্জিত? তৃতীয়তঃ হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে প্রথমে আট রাকাত তারাবীহের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পরে বার রাকাত এবং শেষে বিশ রাকাত ধার্য হয়। কারণ, মিশকাত শরীফের قيام شهر رمضان শীর্ষক অধ্যায়ে সেই হাদীছের পরে বর্ণিত আছে-

وَكَانَ الْقَارِى يَقْرَء سُوْرَةَ الْبَقَرَةَ فِى ثَمَانِ رَكْعَات وَاِذَاقَامَ بِهَا فِى اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً رَاىَ النَّاسُ اَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ

অর্থাৎ ক্বারী আট রাকাতে সূরা বাকারা পড়তেন এবং পরে যখন বার রাকাতে এ সূরা পড়তেন, তখন লোকদের কাছে হালকা মনে হতো। এ হাদীছের প্রেক্ষাপটে মিরকাতে বর্ণিত আছে-

نَعَمْ ثَبَتَ الْعِشْرُوْنَ فِى زَمَنِ عُمَرَو فِى الْمُوَطَا، رِوَايَةٌ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا اَنَّهُ وَقَعَ اَوَّلاً ثُمَّ اِسْتَقَرَّ الْاَمْرُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَانَهُ الْمُتَوَارِثُ.

অর্থাৎ ওই সমস্ত রেওয়ায়েতকে এ জন্য একত্রিত করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে প্রথমে আট রাকাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, পরে বিশ রাকাতই স্থিরকৃত হয়। চতুর্থতঃ তারাবীহের নামায মূলত সুন্নাতে রাসুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং একে সব সময় পড়া, জামাত সহকারে পড়া ও বিশ রাকাত পড়া। এ তিনটি সুন্নাতে উমর ফারুক (রাঃ)। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সব সময় বিশ রাকাত পড়েন নি এবং সাহাবায়ে কিরামকে জামাত সহকারে পাড়ার নির্দেশও দেননি। তাই যদি আট রাকাতই পড়া হয়, তাহলে সুন্নাতে ফারুকী বাদ পড়ে যায়। তবে যদি বিশ রাকাত পড়া হয়, তাহলে সবার উপর আমল হয়ে যায়। কেননা বিশের মধ্যে আটও আছে কিন্তু আটের মধ্যে বিশ নেই। হাদীছ শরীফে আছে- আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের উপর আমল করুন। ওরাও (আপত্তি কারীরা) সব সময় ও নিয়মিতভাবে জামাত সহকারে তারাবীহর নামায পড়ে থাকে। অথচ এ দুটি বিষয় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই; এ গুলো হচ্ছে সুন্নাতে ফারুকী, তাই একটি বাদ দিবেন কেন, বিশ রাকাতই পড়ুন।

২নং আপত্তিঃ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে হযরত আবু সালমা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রমযানের রাতে কত রাকাত পড়তেন'? তিনি উত্তরে বলেছিলেন-

مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَافِىْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَرَكْعَاتٍ.

(হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রমযান ও গর রমযানে আট রাকাতের অতিরিক্ত পড়তেন না।) প্রমাণিত হলো যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তারাবীহ আট রাকাত থেকে বেশী পড়তেন না। তাই বিশ রাকাত পড়াটা বিদ্আতে সাইয়া।

উত্তরঃ এ আপত্তিটারও কয়েকটি উত্তর রয়েছে। এক, উপরোক্ত হাদীছে তারাবীহের নামায নয়, তাহাজ্জুদের নামাযের কথা বলা হয়েছে। কেননা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রমযানে ও গর-রমযানে আট রাকাতের অতিরিক্ত পড়তেন না। এতে বোঝা গেল যে এটা সেই নামায, যা সব সময় পড়া হয়। তাই এটা তারাবীহ হতে পারে না, কারণ তারাবীহ কেবল রমযানেই পড়া হয়। অধিকন্তু তিরমিযী শরীফে এ হাদীছের জন্য- باب ماجاء فى وصف صلوة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل. নামে একটি অধ্যায় খাড়া করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে এটা সালাতুল লাইল অর্থাৎ

তাহাজ্জুদের নামাযই, তারাবীহের নামায নয়। আরও উল্লেখ্য যে সেই হাদীছের শেষে হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, আমি আরয করেছিলাম-ইয়া রসুলাল্লাহ, আপনি বিতরের আগে কেন শুয়ে পড়েন? হুযূর ইরশাদ ফরমান, ওহে আয়েশা, আমার চোখ ঘুমায়, কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। এ বক্তব্য থেকে বোঝা গেল এ রাকাতগুলো ঘুম থেকে উঠে আদায় করতেন এবং এর সাথেই বিতর পড়তেন। তখনইতো হযরত আয়েশা অবাক হয়ে আরয করেছিলেন, আপনি আমাদেরকে বিতর পড়ে শুতে নির্দেশ দিয়েছেন অথচ আপনি শোয়া থেকে উঠে তাহাজ্জুদের সাথেই বিতর নামায পড়েন। উত্তরে বললেন, আমার জাগা সম্পর্কে পূর্ণ ভরসা আছে। কিন্তু যার ভরসা না থাকে, **তার** বিতর পড়ে শোয়া উচিত। উল্লেখ্য যে, তারাবীহ শোবার আগে পড়া হয়, তাহাজ্জুদ শোয়া থেকে উঠে পড়া হয়। মুদারেজুন নাবুয়াতের প্রথম খণ্ড ৪০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে-

تحقیق انست کہ صلوۃ انحضرت در رمضان ھماں نماز معتاد بود یازدہ رکعت کہ دایم در تہجدمے گزارد۔

দুই, বিশ রাকাত তারাবীহ যদি বিদ্‌আতে সাইয়া হয়, তাহলে হযরত উমর ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম কেন পছন্দ করলেন এবং স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ওবা কেন বিরোধিতা করলেন না? তাঁদের বেলায় কি ফত্ওয়া দিবেন? অধিকন্তু আজ কাল সকল লা-মাযহাবীরা পুরা রমযান মাসে জামাত সহকারে তারাবীহ পড়ে থাকে। বলুন, ওদের এ অগ্রগামিতা বিদ্‌আতে সাইয়া কি না? যদিওবা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আট রাকাত তারাবীহ পড়ে থাকেন, তাহলে দু-তিন দিনই পড়েছেন। কিন্তু আপনারা প্রতিদিন পড়াটা কোথা থেকে আবিষ্কার করলেন? যদি সম্পূর্ণ হাদীছের অনুসারী হয়ে থাকেন, তাহলে হাদীছ মুতাবিক পুরা রমযানে দু-তিন দিনই তারাবীহ পড়ুন। তিরমিযী শরীফের রিওয়ায়েত থেকে আরও প্রমাণিত আছে যে মক্কাবাসীরা বিশ রাকাত ও মদীনাবাসীরা একচল্লিশ রাকাত তারাবীহের উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আট রাকাতের সমর্থক ছিলেন না। বলুন এ সব লোকেরা বিদ্‌আতী ও ফাসিক হলো কিনা? যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা সঠিক হবে কিনা? কারণ, ফাসিকের রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। আর কোন দেশে মুসলমানেরা আট রাকাত পড়ে বলে এ রকম কোন প্রমাণ আছে কি? তিন, উত্থাপিত হাদীছ দ্বারা আট রাকাত তারাবীহ যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি তিন রাকাত বিতরও প্রমাণিত হয়, কিন্তু আপনারা বিতর এক রাকাত পড়েন কেন? আসল কথা হলো আট রাকাত তারাবীহের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ কোথাও নেই। আসলে ওই হাদীছ দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায বোঝানো হয়েছে। দেখি, এমন কোন রিওয়ায়েত পেশ করুন, যেথায় আট রাকাত তারাবীহের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইন্‌শাআল্লাহ, কখনও পারবেন না।

www.AmarIslam.com

এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা

যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে যদিওবা সে অন্যায় করেছে, কিন্তু এ অবস্থায় এক তালাক নয়, তিন তালাকই কার্যকরী হবে, এবং এ মহিলা সেই পুরুষের জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা না হয়। বর্তমান যুগের লা-মযহাবী ও ওহাবীরা এ হুকুমকে অস্বীকার করে এবং নিজেদের মনের কামনা অনুসারে বলে যে এ অবস্থায় এক তালাকই কার্যকরী হবে এবং সেই মহিলার সাথে পুনরায় ঘর-সংসার করা যাবে। এ জন্য এ আলোচনাকে একটি ভূমিকা ও দু'টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচ্য মাসআলার দলীলসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে লা-মযহাবীদের উত্থাপিত আপত্তি সমূহের উত্তর দেয়া হয়েছে।

ভূমিকা

স্ত্রীকে যদি তালাক দিতে হয়, তাহলে পবিত্র কালে কেবল এক তালাক দেওয়াটাই শ্রেয়। যদি তিন তালাক দিতে হয়, তাহলে তিন তোহরে (তিন পবিত্র কালে) তিন তালাক দেওয়া উচিত। কিন্তু যদি কেউ ঋতু কালে তালাক দিয়ে দেয় বা এক সাথে তিন তালাকই দিয়ে দেয়, তাহলে যদিওবা সে অন্যায় করেছে, তালাক কার্যকরী হবে। এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়ার তিনটি পর্যায় আছে-

(১) যদি স্বামী নিজের স্ত্রীকে যার সাথে কেবল বিবাহ হয়েছে কিন্তু কোন দৈহিক সম্পর্ক হয়নি, এক সাথে তিন তালাক এ ভাবে দেয়-তোমাকে তালাক দিলাম, তালাক, তালাক, এই অবস্থায় কেবল এক তালাকই কার্যকরী হবে এবং শেষের দু'তালাক, গণ্য হবে না। কেননা প্রথম তালাক উচ্চারণ করার সাথে সাথে সেই মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং তার উপর ইদ্দতও ওয়াজিব নয়। তালাকের জন্য বিবাহ বা ইদ্দতের প্রয়োজন। তবে সেই মহিলাকে যদি এ রকম বলে-তোমাকে তিন তালাক দিলাম, তখন তিন তালাকই কার্যকরী হবে। কেননা তখন তিন তালাক বিবাহ বলবৎ থাকা কালীন কার্যকরী হয়েছে। (প্রায় ফিক্‌হের কিতাবে তা বর্ণিত আছে।)

২। যদি স্বামী স্ত্রীকে, যার সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে, এভাবে তালাক দেয়-তোমাকে তালাক দিলাম, তালাক, তালাক। যদি শেষের তালাক শব্দদ্বয় দ্বারা পহেলী তালাকের প্রতি জোর দেয়ার নিয়ত করে থাকে এবং স্বতন্ত্র তালাকের নিয়ত না করে,

www.AmarIslam.com

তাহলে এক তালাক কার্যকরী হবে (কিন্তু কাজির দরবারে তা অগ্রাহ্য হবে) কেননা সে এক তালাককে দু'বার জোর দিয়েছে। যেমন কেউ বললো, পানি পান করে নিন, পানি, পানি; খাবার খেয়ে নিন, খাবার, খাবার, আমি কালকে গিয়েছিলাম, কালকে, কালকে। এসব অবস্থায় শেষের শব্দদ্বয়ের প্রথম শব্দের প্রতি জোর দেয়া বুঝায়।

৩। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে, যার সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে, এক সংগে তিন তালাক দেয়- হয়তো বলেছে তোমাকে তিন তালাক দিলাম বা এ রকম বললো- তোমাকে তালাক দিলাম, তালাক দিলাম, তালাক দিলাম, যে কোন অবস্থায় তিন তালাকই কার্যকরী হবে। এ মহিলা দ্বিতীয় স্বামী পরিত্যক্তা না হওয়া পর্যন্ত এ পুরুষের জন্য হালাল হবে না। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, মালেক, আহমদ ও আগের পরের সমস্ত উলামা একমত। তবে কতেক যাহির পন্থী আলিম শেষ পর্যায়ের তালাকের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন তাফসীরে সাবীতে দ্বিতীয় পারার فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ (الاية) আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে-

وَالْمَعْنٰى فَاِنْ ثَبَتَ طَلَاقَهَا ثَلَاثًا فِىْ مَرَّةٍ اَوْمَرَّاتٍ فَلَا تَحِلُّ (الاية) كَمَا اِذْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثَلْثًا اَوِ الْبَتَّهُ وَهٰذَا هُوَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ উলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে তিন তালাক পৃথক পৃথক দেওয়া হোক বা এক সঙ্গে দেওয়া হোক যে কোন অবস্থায় মহিলা হারাম হয়ে যাবে। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নববীতে الطلاق الثلث শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِىْ مَنْ قَالَ لِاِمْرَاتِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلْثًا فَقَالَ الشَّافِعِىُّ وَمٰلِكٌ وَاَبُوْحَنِيْفَةَ وَاَحْمَدُ وَجَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ يَقَعُ الثَّلْثُ وَقَالَ طَاؤُسُ وَبَعْضُ اَهْلِ الظَّاهِرِ لَايَقَعُ بِذَالِكَ اِلَّا وَاحِدَةً.

অর্থাৎ যে কেউ নিজের স্ত্রীকে যদি বলে-তোমাকে তিন তালাক দিলাম, তাহলে তিন তালাকই কার্যকরী হবে বলে চারি ইমাম ও আগে পরের প্রায় উলামায়ে কিরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে কতেক যাহির পন্থী আলিম বলেন যে এক তালাকই কার্যকরী হবে। এমন কি হুজ্জাজ ইবনে আরতাত, ইবনে মকাতেল ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন যে ওই রকম বলার দ্বারা এক তালাকও কার্যকরী হবে না। যেহেতু

বর্তমান যুগের লা-মযহাবীরা সব জায়গায় আত্মার আরাম তালাশ করে, সেহেতু যেই জিনিসে নফসে আম্মারার তৃপ্তি মিলে, সেটা অগ্রাহ্য থেকে অগ্রাহ্যতর ও একান্ত জয়িফ রেওয়ায়েত হোক না কেন, সেটাই ওদের দ্বীন ও ঈমান। এ জন্য তারা ইবনে তাইমিয়ার অনুসরণ করে এ আকীদা পোষণ করে যে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাকই কার্যকরী হবে। তাফসীরে সাবীতে দ্বিতীয় পারা فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

وَاَمَّاالْقَوْلُ بِاَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلْثَ فِىْ مَرَّةٍ وَّاحِدَةٍ لَا يَقَعُ اِلَّا طَلْقَةً لَايُعْرَفُ اِلَّا لِابْنِ تَيْمِيَّةَ وَرَدَّ عَلَيْهِ اَئِمَّةُ مَذْهَبِهٖ حَتّٰى قَالَ الْعُلَمَاءُ اَنَّهُ الضَّالُّ الْمُضِلُّ وَنِسْبَتُهَا اِلَى الْاِمَامِ اَشْهَبَ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمَلِكِيَّةِ بَاطِلَةٌ.

অর্থাৎ এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে যে এক তালাকই কার্যকরী হয়- এ রকম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী ছাড়া আর কেউ বলেনি। ইবনে তাইমিয়া নিজের মযহাবের ইমামদেরকেও অগ্রাহ্য করেছে। উলামায়ে কিরাম বলেন যে, ইবনে তাইমিয়া নিজেও গুমরাহ এবং অন্যদেরকেও গুমরাহকারী। এ মাসআলার ইঙ্গিত ইমাম শাহাব মালিকীর প্রতি করাটা ভুল। যা হোক প্রতীয়মান হলো যে বর্তমান যুগের লা- মযহাবীরা কেবল আত্মার আরামের জন্য বাতিল আকীদা আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আমি আমার রচিত তাফসীরে নঈমীর দ্বিতীয় খণ্ড فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ মাসআলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু আজকাল এ বিষয় নিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমার কাছে এ প্রসঙ্গে প্রশ্নাদির স্তুপ হয়েছে। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে এ মাসআলার ফয়সালা করতে কলম ধরলাম। বর্ণনার ধরন অন্যান্য আলোচনার মতই হবে অর্থাৎ দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হবে। প্রথম অধ্যায়ে দলীলাদি প্রদান করা হবে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধিতাকারীদের উত্থাপিত আপত্তি সমূহের জবাব দেয়া হবে।

প্রথম অধ্যায়

তিন তালাক কার্যকরী হওয়ার প্রমাণাদি

বেশী তালাক দেয়ার চেয়ে এক তালাক দেয়াটা শ্রেয়ঃ। কিন্তু যদি তিন তালাকই দিতে হয়, তাহলে প্রতি তোহরে (পবিত্র কালে) এক তালাক করে তিন তোহরে তিন তালাক দেওয়া উচিৎ। এক সঙ্গে কয়েক তালাক দেয়া জঘন্য পাপ, তবে যদি কেউ এক সঙ্গে কয়েক তালাক দিয়ে দেয়, তা হলে যদিও বা পাপ করেছে, কিন্তু তিন তালাক কার্যকরী হবে। যেমন ঋতুকালে তালাক দেয়া যদিও বা পাপ কিন্তু তালাক কার্যকরী হয়। প্রমাণাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

পুনরায় ফরমান-(الاية) فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ

এ আয়াতদ্বয় থেকে বোঝা গেল দু-তালাক পর্যন্ত প্রত্যাহার করার অধিকার আছে, কিন্তু তিন তালাক দেয়ার পর পুনরায় গ্রহণ رجعت করার কোন অধিকার থাকে না এবং مرتان এর প্রয়োগ দ্বারা বোঝা গেল যে পৃথক পৃথক ভাবে তালাক দেয়ার এমন কোন শর্ত নেই যে তা না হলে তালাক কার্যকরী হবে না। এক সঙ্গে দেয়া হোক বা পৃথক পৃথক দেয়া হোক, হুকুম তা-ই হবে। যেমন তাফসীরে সাবীতে এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে-

فَاِنْ طَلَّقَهَا اِلٰى طَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ سَوَاءٌ وَقَعَ الْاِثْنَتَانِ فِىْ مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ وَالْمَعْنٰى فَاِنْ ثَبَتَ طَلَاقُهَا ثَلْثًا فِىْ مَرَّةٍ اَوْمَرَّاةٍ فَلَا تَحِلُّ.

অর্থাৎ আয়াতের অভিপ্রায় হলো যদি তিন তালাক দেয়া হয়, তাহলে তিন তালাকই কার্যকরী হবে, তা এক সাথে দেয়া হোক বা পৃথক দেয়া হোক, যে কোন অবস্থায় স্ত্রী হালাল থাকবে না। এর আগে উল্লেখিত আছে -

كَمَا اِذَا قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثَلْثًا اَوْ اَلْبَتَّةَ وَهٰذَا هُوَ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ.

অর্থাৎ যদি কেউ এ রকম বলে'তোমাকে তিন তালাক' তাহলে তিন তালাকই কার্যকরী হবে। এ ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদী একমত। অনুরূপ অন্যান্য তাফসীর সমূহেও বর্ণিত আছে।

২। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ. لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا.

অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করলো, অর্থাৎ এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দিল, সে নিজের প্রতি জুলুম করলো। কেননা কোন কোন সময় মানুষ তালাক নিয়ে লজ্জিত হয় এবং প্রত্যাহার করতে চায়। কিন্তু তিন তালাক এক সঙ্গে দিয়ে দিলে, আর প্রত্যাহার করা যায় না। এ আয়াতে এটা বলা হয়নি যে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তালাক কার্যকরী হবে না। বরং বলা হয়েছে যে এ রকম লোক জালিম। যদি এর দ্বারা এক তালাকই কার্যকরী হয়, তাহলে জালিম কিভাবে হয়? মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নববীর الطلاق الثلث শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

وَاحْتَجَّ الْجَمْهُوْرُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَاللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ الخ قَالُوْا مَعْنَاهُ اَنَّ الْمُطَلِّقَ قَدْ يَحْدُثُ لَهٗ نَدَمٌ فَلَا يُمْكِنُهٗ تَدَارُكُهٗ لِوُقُوْعِ الْبَيْنُوْنَةِ. فَلَوْكَانَتِ الثَّلٰثُ لَمْ تَقَعْ طَلَاقُهٗ هٰذَا اِلَّا رَجْعِيًّا فَلَا يَنْدَمُ.

(উপরে আমি যা আরয করেছি, তাই এর তরজুমা)

৩। বায়হাকী ও তবরাণী শরীফে সবিদ ইবনে গুফলাতা থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রাঃ) স্বীয় বিবি আয়েশা খশামিয়াকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দেন। পরে জানতে পারলেন যে সে (স্ত্রী) ইমাম হাসানের বিচ্ছেদে অনেক কান্নাকাটি করছে। এ খবর শুনে তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং বললেন, যদি আমি আমার আব্বাজান সৈয়্যদুনা হযরত আলী (রাঃ)কে এ রকম বলতে না শুনতাম- "যে কেউ নিজের স্ত্রীকে পৃথক পৃথক বা এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে, সেই মহিলা দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা না হওয়া পর্যন্ত ওর জন্য জায়েয হবে না।" তাহলে নিশ্চয় আমি ওকে পুনরায় গ্রহণ করে নিতাম। হাদীছের শেষের বাক্যটি হচ্ছে-

لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي وَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلْثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ ثَلْثًا مُبْهَمَةً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(৪) সেই সুনানে কুবরা বায়হাকী শরীফে হযরত হাবীব ইবনে আবি ছাবেতের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে-

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي أَلْفًا قَالَ ثَلْثٌ تُحَرِّمُهَا وَاقْسِمْ سَائِرَ هُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ-

অর্থাৎ এক ব্যক্তি সৈয়্যদুনা আলী (রাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন- আমি আমার স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়েছি। হযরত আলী (রাঃ) ফরমালেন তিন তালাকের দ্বারাই সে তোমার জন্য হারাম হয়ে গেল, বাকী তালাক সমূহ তোমার অন্যান্য স্ত্রীসমূহের মধ্যে বন্টন করে দাও। অর্থাৎ ওগুলো অর্থহীন। এটা সুস্পষ্ট যে ওই লোকটি হাজার তালাক হাজার মাসে দেয়নি। তাহলে তো ছিয়াশি বছর দুমাস তালাকের জন্য অতিবাহিত হয়ে যেত। নিশ্চয়ই এক সঙ্গে দিয়েছে এবং সৈয়দুনা মওলা আলী (রাঃ) তিন তালাক কার্যকরী হওয়ার কথা বলেছেন।

(৫) বায়হাকী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

অর্থাৎ ইমাম জাফর সাদিক স্বীয় পিতামহ হযরত আলী (রাঃ) এর বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন-তিনি বলেছেন-যে কেউ নিজের স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দিলে, দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়া ব্যতীত সেই স্ত্রী ওর জন্য হালাল হবে না। এর প্রতি জোরালো সমর্থন বায়হাকী শরীফে আবি ইয়ালা বর্ণিত এ হাদীছে রয়েছে-

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْمَنْ طَلَّقَ مَرأَتَهُ ثَلْثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

৬। ইমাম বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে আয়ায ইবনে কবীরের বরাত দিয়ে রিওয়ায়েত করেছেন যে এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে দৈহিক সম্পর্কের আগে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দেয়। পুনরায় ওকে গ্রহণ করার ইচ্ছা হলো। তখন সে হযরত আবু হুরাইরা

www.AmarIslam.com

(রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়। তাঁরা উভয়ে অভিমত ব্যক্ত করলেন যে আমরা এ বিবাহের বৈধতার কোন উপায় দেখছি না, যতক্ষণ না সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। সে আরয করলো, জনাব আমিতো কেবল এক শব্দের দ্বারাই তিন তালাক দিয়েছি। এর উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বললেন তোমার হাতে যা কিছু ছিল, সব দিয়ে দিয়েছ। হাদীছের শেষের ইবারতটি নিম্নরূপ-

فسئل اباهريرة وعبدالله ابن عباس فقال لاترى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال انما كان طلاقى اياها واحدة فقال ابن عباس انك ارسلت من يدك ماكان لك من فضل. (সুনানে কুবরার সপ্তম খণ্ডে ৩৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৭। সেই বায়হাকী শরীফে হযরত আতা (রাঃ) এর বরাত দিয়ে আবদুল হামিদ ইবনে রাফে থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন একজন হযরত সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সমীপে বলেন-আমি আমার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন তিনটি নিয়ে নাও বাকী সাতানব্বইটি বাদ দাও। হাদীছের ভাষ্যটা এ রকম-

ان رجلا قال لابن عباس طلقت امرأتي مائة قال تأخذ ثلثا وتدع سبعا وتسعين-

(৮) বায়হাকী শরীফে সাঈদ ইবনে হবির থেকে বর্ণিত আছে-এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সমীপে আরয করলেন-আমি আমার স্ত্রীকে এক হাজার তালাক দিয়েছি। তিনি বললেন, তিনটি গ্রহণ করুন এবং নয়শত সাতানব্বইটি বাদ দিন। হাদীছের ইবারতটা হচ্ছে-

ان رجلا جاء الى ابن عباس وقال طلّقت امرأتي الفا فقال تأخذ ثلثا وتدع تسع مائة وسبعة وتسعين.

৯। বায়হাকী শরীফে হযরত সাঈদ ইবনে হবিরের রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত আছে-সৈয়্যদুনা আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, যে তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছিল, "তোমার উপর তোমার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে।" হাদীছের ইবারতটা হচ্ছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلْثًا حُرِّمَتْ

www.AmarIslam.com

عليك.

১০। বায়হাকী শরীফে হযরত উমর ইবনে দিইনারের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে- জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে জানতে চাইলেন যে, যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তারকারাজির সমতুল্য তালাক দিলে এর কি হুকুম হতে পারে? তিনি বলেছেন ওকে বলে দাও যে ওর জন্য বুরজে জওযার মস্তকই যথেষ্ট। উল্লেখ্য যে, বুরজে জওযার মাথায় তিনটি তারা থাকে। হাদীছের ইবারত এ রকম-

عَنْ عُمرِ ابنِ دينار انَّ عبـاس سُئل عن رجُلِ طلَّق امْرأتَه عدد النجوم فقال إنما يكفيك رأس الجوزاء.

(১১) ইবনে মাজা শরীফে তালাকের আলোচনার প্রারম্ভে من طلق ثلثا فى مجلس واحد শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, হযরত ফাতিমা বিনতে কাইস বলেন- আমাকে আমার স্বামী ইয়ামন যাবার প্রাক্কালে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দেয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওই তিন তালাককে কার্যকর বলেছেন। হাদীছের আরবী ইবারতটা হচ্ছে-

قَالَت طلقنى زوجى ثَلْثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذالك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

(১২) হাকিম, ইবনে মাজা ও আবু দাউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আলী, ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে রুকানা থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন, আমার দাদা রুকানা তাঁর বিবিকে তালাকে বত্তা (দ্বৈত অর্থবোধক তালাক) দেন। অতঃপর বারগাহে নববীতে হাজির হন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে এ ব্যাপারে ফয়সালার জন্য আরয করলেন 'আমি এক তালাকের নিয়ত করেছিলাম'। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন- খোদার কসম করে বলতে পারবে যে তুমি এক তালাকের নিয়ত করেছিলে? আরয করলেন- খোদার কসম করে বলছি যে এক তালাকের নিয়ত করেছিলাম। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে ফেরত দিয়ে দেন। যেমন- ইবনে মাজা ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِاللّٰه اِبْنِ عَلى ابْنِ يزيد ابْنِ رَكَانَه عَنْ اَبِيْه عَنْ جَدِّه اَنَّه طَلَّقَ اِمْرَأتَهُ الْبَتَّة فَاتَى رَسُوْلَ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسْئَلَه فقال مَااَرَدْتَ بِهَا قَالَ وَاحِدَةً قَالَ وَاللّٰه مَااَرَدْتَ

بِهَا وَاحِدَةً قال فردها اليه.

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে যদি এক তালাকই কার্যকরী হতো, তাহলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত রুকানাকে তাঁর নিয়তের কসম কেন করালেন? তিনি বলেছিলেন- اَنْتِ طالق طالق طالق শেষের তালাক শব্দদ্বয় প্রথম তালাকের প্রতি জোর দেয়ার জন্যই বলেছিলেন। এ জন্য এক তালাকই ধরা হয়েছে। এ রিওয়ায়েতটি একান্ত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য। যেমন -ইবনে মাজা বলেন- مَااشرف هذا الحديث (এ হাদীছটি সনদের দিক দিয়ে খুবই উচ্চস্তরের) আবু দাউদ বলেছেন- هذا اصح من حديث ابن جريج (এ রিওয়ায়েতটি ইবনে জরিহের রিওয়ায়েতের তুলনায় অনেক বিশুদ্ধ।)

১৩। মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও শাফেঈ, আবু দাউদ ও বায়হাকী শরীফে হযরত মায়াবিয়া ইবনে আবি আয়াশের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু হুরাইরা ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-যে কেউ নিজের স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে এর কি হুকুম? হযরত আবু হুরাইয়া বলেছেন- 'এক তালাকের দ্বারা ওকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে এবং তিন তালাকের দ্বারা হারাম হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা না হওয়া পর্যন্ত ওকে পুনরায় বিবাহ করা জায়েয হবে না, হযরত ইবনে আব্বাস এর সমর্থন করেছেন। হাদীছের ইবারত হচ্ছে-

عَنْ معاوية ابْنِ عياش ان ابن عباس واباهريرة وعبد الله اِبْنِ عَمرو ابْنِ العاص سئلوا عن البكر وطلقها زوجها ثلثا قَالَ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وروى مالك عن يحى اِبْنِ سعيد عن بكير ابن اشج عن معاوية ابن ابى عياش اَنَّه شهد هذه القصة.

১৪। বায়হাকী শরীফের বুসাম ছরিকী থেকে বর্ণিত আছে যে হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেন, যে কেউ নিজের স্ত্রীকে অজ্ঞাতে বা জেনে শুনে তিন তালাক দিয়ে দিলে, সেই মহিলা ওর জন্য হারাম হয়ে যাবে।

১৫। একই বায়হাকী শরীফে মুসাল্লামা ইবনে জাফর আহমদ থেকে বর্ণিত আছে আমি ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম- আপনি কি এ রকম

বলেছেন যে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক কার্যকরী হবে? তিনি বলেছেন- মায়াজাল্লা, আমি এ রকম কখনও বলিনি; তিন তালাকই কার্যকরী হবে। (তফসীরে রূহুল মায়ানী, দ্বিতীয় পারা দ্রষ্টব্য)

১৬। মুসলিম শরীফে কিতাবুত তালাকের الطلاق الثلث শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে এ রকম আইন পাশ করা হয়েছিল যে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকরী হবে। হাদীছের মূল ইবারত হচ্ছে-

فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلو فى امر كانت لهم فيه عناة فلو قضيناه عليهم فامضاه عليهم.

১৭। এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নববীতে বর্ণিত আছে যে সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমত হচ্ছে তিন তালাকের দ্বারা তিন তালাকই কার্যকরী হবে। এবং সাহাবায়ে কিরাম কখনো ভ্রান্ত বিষয়ে ঐক্যমত হতে পারে না।

১৮। যখন স্বামীর তিন তালাক দেয়ার অধিকার রয়েছে, তখন তিন তালাক দিলে এক তালাক কার্যকরী হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? মালিকের হস্তক্ষেপ অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

১৯। হারাম কাজের দ্বারা কানুন পরিবর্তন হয় না। এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়া অবশ্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু স্বামী যখন মুখ দিয়ে তিন তালাক বলছে, তাহলে তিন তালাক কার্যকরী হবে না কেন? দেখুন, চুরিকৃত, চাকু দ্বারা পশু যবেহ করা হারাম। কিন্তু যদি কেউ যবেহ করে, তাহলে যবেহকৃত পশু হালাল। ঋতু কালে তালাক দেয়া হারাম, কিন্তু কেউ দিয়ে দিলে, তালাক পতিত হবে।

২০। ইসকাতে কারণের সাথে আদি-কারণে (مسبب) সামঞ্জস্য থাকে। কারণ পাওয়া গেলে আদিকারণ (مسبب) থাকাটা একান্ত জরুরী। হিদায়া কিতাবুল ওকালতে বর্ণিত আছে-

لان الحكم فيها لايقبل الفصل عن السبب لانه اسقاط فيتلاشى.

অর্থাৎ ইসকাতে হুকুমকে স্বীয় সবব (কারণ) থেকে পৃথক করা যায় না। তালাক বলাটা হচ্ছে সব্ব (কারণ) এবং তালাক কার্যকরী হওয়াটা হচ্ছে এর হুকুম। তালাক

দ্বারাই স্বামীর অধিকার বাস্তবায়িত হয়। সবব (কারণ) পাওয়া গেল, হুকুম পাওয়া গেল না অর্থাৎ দিল তিন তালাক, কার্যকরী হলো এক, তা হতে পারে না।

২১। অধিকাংশ উলমায়ে কিরাম বিশেষ করে চারি ইমাম-আবু হানিফা, শাফিঈ, মালিক ও আহমদ (রাঃ) এর অভিমত হচ্ছে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকরী হবে। এর বিরোধিতা করা মানে মুসলিম মিল্লাতের বিরোধিতা করা, যা পথভ্রষ্টতার নামান্তর। মোট কথা, কুরআন, হাদীছ, ইজমায়ে সাহাবা, উলামা, মুহাদ্দেছীন ও তাফসীর কারকদের বিভিন্ন উক্তি ও যুক্তিগত দলীলাদি দ্বারা এ মাসআলাটি প্রমাণিত হয়েছে। এর বিরোধিতা করা মানে কুরআন হাদীছের বিরোধিতা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোচ্য মাসআলা প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তির জবাব

আলোচ্য মাসআলা প্রসঙ্গে লা-মযহাবীরা নিম্ন বর্ণিত আপত্তিগুলো করে থাকে। ইন্‌শাআল্লাহ, তাদের পক্ষে এর থেকে আর কিছু বেশী বলার নেই। এমন কি সাধারণ লা-মাযহাবীরা এতটুকুও জানে না, যা আমি তাদের হয়ে উত্থাপন করেছি।

১নং আপত্তিঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

একটু পরে আরও ইরশাদ করেন- فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ

مرتان শব্দ দ্বারা এবং فان এর ف দ্বারা বোঝা গেল যে তালাকসমূহ পৃথক পৃথক হওয়া চাই। কিন্তু এক সঙ্গে তিন তালাক বলার সময় আলাদা আলাদা কোথায় হলো।

উত্তরঃ এ আপত্তির কয়েক ধরনের জবাব দেয়া যায়। এক, উল্লেখিত আয়াত দ্বারা এ রকম ভাবার্থ কখনও প্রকাশ পায় না যে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাকই কার্যকরী হবে। বরং আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে রজয়ী তালাক দুটি الطلاق শব্দে الف لام হলো আহাদী। এ আয়াতের পর বলেছেন যে কেউ দু থেকে বেশী অর্থাৎ তিন তালাক দিলে, দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ওর জন্য সেই মহিলা হালাল হবে না। যেমন- তাফসিরাতে আহমদীয়া, সাবী ও জালালাইনে উল্লেখিত আছে- اَلطَّلَاقُ اى التطليق الذى يراجع بعده مرتان দুই, যদি মেনেও

নেয়া হয় যে, مَـرَّتَان শব্দ দ্বারা পৃথক পৃথক তিন তালাক বোঝানো হয়, তাহলে 'তোমাকে তালাক' বলার দ্বারা শব্দগত পার্থক্য বোঝা যায় আর 'তোমাকে তিন তালাক' বলার দ্বারা সংখ্যাগত পার্থক্য প্রকাশ পায়। আয়াতে তালাক সমূহের মাঝখানে এক ঋতুর দুরত্ব থাকা শর্ত- এ আয়াতের ভাবার্থ তারা কোত্থেকে বের করলো? আল্লাহ তা'আলা ফরমান- فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (আসমানের দিকে বার বার দেখুন) এ আয়াতের ভাবার্থ এ নয় যে আসমানের দিকে মাসে এক বার তাকাও; তিন, আপনাদের তাফসীর দ্বারাও আয়াতের ভাবার্থ এটাই প্রকাশ পায় যে তালাকসমূহ পৃথক পৃথক প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। আমরাও তাই বলি যে এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়া একান্ত নিষেধ; পৃথক পৃথক দেয়াটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি কেউ বোকামী করে রাগের মাথায় এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তিন তালাক কার্যকরী হবে কিনা? এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নীরব।

২নং আপত্তিঃ মুসলিম শরীফের কিতাবুত তালাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও সিদ্দীক আকবরের যুগে, এমনকি হযরত উমর ফারুকের যুগের প্রারম্ভেও এটাই বিধান ছিল যে এক সংগে তিন তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হবে। হাদীছের ইবারতটা হচ্ছে নিম্নরূপ-

عَنْ ابنِ عبـاس قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليـه وسلم وابى بَكْرٍ وَثِنْتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ واحدةً.

মুসলিম শরীফের একই জায়গায় আরও বর্ণিত আছে হযরত আবু সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- আপনি কি জানেন নবীজী ও সিদ্দীকে আকবরের যুগে তিন তালাককে এক তালাকই মনে করা হতো? তিনি বললেন হ্যাঁ। হাদীছের আরবী ইবারতটা হচ্ছে-

إِنَّ ابا الصـحـبـاء قـال لابن عـبـاسٍ اَتَعْلَمُ اَنَّمَا كَانَتِ الثَّلٰثُ تُجْعَلُ واحدة على عهد النَّبِيِّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابِى بَكْرٍ وثلثا من امارة عمر فقال اِبْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

উপরোক্ত হাদীছসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে এক সংগে তিন তালাক দিলে এক তালাকই কার্যকরী হয়। এটাই হচ্ছে লা-মযহাবীদের সবচেয়ে জোরালো আপত্তি।

উত্তরঃ এ আপত্তির কয়েকটি উত্তর দেয়া যায়। এক, এ হাদীছটি মনসুখ (রহিত) কেননা সৈয়্যদুনা ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণিত আছে এবং এটা তাঁরই প্রদত্ত ফত্ওয়া যে এক সংগে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই কার্যকরী হয় যার বর্ণনা প্রথম অধ্যায়ে করা হয়েছে এবং যখন রিওয়ায়েত কারীর আমল স্বীয় রিওয়ায়েতকৃত হাদীছের বিপরীত হয়, তখন ধরে নিতে হবে যে রিওয়ায়েতকারীর দৃষ্টিতে হাদীছটি মনসুখ। অধিকন্তু সাহাবায়ে কিরামের বর্তমানে হযরত উমর ফারুক কর্তৃক এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হওয়ার হুকুম জারী করা এবং সবাই সে অনুযায়ী আমল করা এবং কোন সাহাবী এমন কি স্বয়ং সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এ প্রসংগে কোন আপত্তি না করার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত হাদীছটি হয়তো মনসুখ বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা সাহাবায়ে কিরাম কখনও হাদীছের বিপরীত ঐক্যমত হতে পারে না।' দুই, এ হাদিছে ওই ধরনের মহিলাকে তালাক দেয়া বুঝানো হয়েছে, যার সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়নি এবং বাস্তবিকই যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক এভাবে এক সংগে তিন তালাক দেয়, তাহলে এক তালাকই কার্যকরী হবে; শেষের দু'তালাক ধর্তব্য নয়। যেমন আবু দাউদ শরীফে কিতাবুত তালাকের-

نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلث শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে হযরত আবু সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- আপনি কি জানেন যে হুযুর ও সিদ্দীক আকবরের যুগে ও উমর ফারুকের খিলাফতের প্রারম্ভে যে কেউ নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে নাকি এক তালাকই ধরা হতো? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন - হ্যাঁ। দৈহিক সম্পর্কহীন স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে এক তালাকই কার্যকরী হতো। হাদীছের ইবারতটা হচ্ছে-

قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ بَلٰى كَانَ الرَّجُلُ اذا طلق امراته ثلثا قبل ان يَدْخُلَ بها جَعَلُوْاهَا واحدة (الخ)

এ হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, **মুসলিম** শরীফের বর্ণিত হাদীছের ভাবার্থ তা-ই হবে। এবং এ হুকুমটা এখনও বলবৎ আছে, যেমন আমি ভূমিকায় আলোকপাত করেছি। তিন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও সিদ্দীক আকবরের যামানার লোকেরা তিন তালাক এভাবে দিতেন, তোমাকে তালাক, তালাক, তালাক। সম্ভবতঃ শেষের দু'তালাক প্রথম তালাকের প্রতি জোর দেয়ার জন্য বলা হতো। কিন্তু উমর ফারুকের যুগে লোকের এ রীতি পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তারা এক সংগে তিন তালাকই দিতে শুরু করলেন। সুতরাং মাসআলার আকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার কারণে

হুকুমেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। নববী শরীফে বর্ণিত আছে-

فالاصح ان معناه انه كان فى الامر الاول اذا قال لها انت طالق انت طالق ولم ينو تاكيدا ولا استينا فا يحكم بوقوع طلقة لقلة ارادتهم الاستيناف بذالك فحمل على الغالب الذى هو ارادة التاكيد فلما كان فى زمان عمر رضى الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم ارادة الاسنيناف بها حملت عنه الاطلاق على الثلث عملا بالغائب السابق الى الفهم منها فى ذالك لعصر.

অর্থাৎ যেহেতু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যুগে সাধারণতঃ লোকেরা তিন তালাকের মধ্যে প্রথম তালাক দ্বারা তালাকের নিয়ত করতেন এবং পরবর্তী তালাক দ্বারা (প্রথম তালাকের প্রতি) জোর দিতেন। এ জন্য যে কেউ বিনা নিয়তে এক সংগে তিন তালাক দিলে, এক তালাকই ধরা হতো। ওই সময় অধিকাংশ (তালাকঘটিত) ব্যাপার এ রকমই ছিল। কিন্তু হযরত উমর ফারুকের যুগে লোকেরা সাধারণতঃ তিন তালাক দ্বারা তিনেরই নিয়ত করতেন। এজন্য তিন তালাক কার্যকরী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো। মাসআলার আকৃতি পরিবর্তনের সাথে সাথে হুকুমেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে। দেখুন কুরআন শরীফে যাকাতের হকদার আট বর্ণিত আছে। অর্থাৎ মোয়াল্লেফাতুল কুলুব ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট কাফিরগণকে)কেও যাকাত দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হযরত উমর ফারুকের যুগে সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে যাকাতের হকদার সাত ঘোষণা করলেন এবং মোয়াল্লেফাতুল কুলুবকে বাদ দিলেন। কেননা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মুসলমানের জামাত ছোট ও দুর্বল ছিল বিধায় কাফিরদেরকে যাকাত দিয়ে আকৃষ্ট করা হতো। কিন্তু হযরত উমর ফারুকের যুগে মুসলমানেরা কম ছিল না এবং দুর্বলও ছিল না। তাই ওদেরকে যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কারণ পরিবর্তনের ফলে হুকুমও পরিবর্তন হয়েছে; রহিত করা হয়নি,যতক্ষণ পর্যন্ত যায়েদ গরীব ছিল, ওকে যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যখন ধনী হয়ে গেল, তখন যাকাত প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে; কাপড় যখন নাপাক ছিল, তখন নামায নাজায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু যখন পাক হয়ে গেছে তখন জায়েয হয়ে গেছে। আজকাল ভারত বর্ষের লোকেরা তালাকের প্রতি জোর দেয়া বলতে কিছু বুঝে না। এক সঙ্গে তিন তালাকের নিয়তেই তালাক দিয়ে থাকে।

আশ্চর্যের বিষয় মাসআলার আকৃতি এক রকম আর হুকুম অন্য রকম! আল্লাহ , লা-মযহাবীদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন যাতে হাদীছের সঠিক ভাবার্থ বুঝতে পারে।

৩নং আপত্তিঃ আবু দাউদ শরীফের প্রথম খণ্ড ও দুর্রে মনসুরের প্রথম খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠায় এবং হযরত আবদুর রায়যাক ও বায়হাকী (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আববাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে আবদু ইয়াযিদ আবু রুকানা স্বীয় স্ত্রী উম্মে রুকানাকে তালাক দিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন তালাক প্রত্যাহার করে নাও। তিনি আরয করলেন হুযূর আমিতো তিন তালাকই দিয়ে দিয়েছি। হুযূর ফরমালেন আমি তো জানি; তবুও প্রত্যাহার কর; অতপর- এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدتهن.

আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থের ইবারতটা হচ্ছে-

طلق عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ارجع امراتك فقال انى طلقتها ثلثا قال قد علمت ر جعها وتلا يايها النبى (الاية)

এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে যদি তিন তালাকই কার্যকরী হত, তাহলে প্রত্যাহার করা সম্ভব হত না, তখন দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন পড়তো। তাই বোঝা গেল যে এক তালাকই বলবৎ রাখা হয়েছে ও বাকী দু'তালাক বাতিল করে দেয়া হয়েছে। আরও লক্ষ্যণীয় যে রুকানা স্বয়ং বলছেন 'আমি তিন তালাকই দিয়েছি'। এতে এক তালাকের প্রতি জোর দেয়া বুঝবার কোন অবকাশ নেই। তথাপি এক তালাকই গণ্য করা হয়েছে।

উত্তরঃ আফসোস, আপত্তিকারীরা, আবু দাউদ ও বায়হাকীর আংশিক রিওয়ায়েতই উদ্ধৃত করেছে। অথচ যে অংশটি তারা উল্লেখ করেনি, সেখানেই এ আপত্তির যথার্থ উত্তর রয়েছে । একই জায়গায় বায়হাকী ও আবু দাউদে বর্ণিত আছে নাফে ইবনে আজির এবং আবদুল্লাহ ইবনে আলি ইবনে ইয়াযিদ ইবনে রুকানা স্বীয় দাদা রুকানা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে তালাকে বত্তা (দ্বৈত অর্থবোধক তালাক) দিয়েছিলেন। সুতরাং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রীকে তাঁকে ফেরত দিয়ে দেন। এ হাদীছ অন্যান্য হাদীছ থেকে সহীহ কেননা তাঁর ছেলে এবং তাঁর ঘরের অন্যান্যরা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে বাইরের লোক অপেক্ষা অনেক বেশী জানার কথা। রুকানার নাতি বলছে আমার দাদা আমার দাদীকে তালাকে বত্তা দিয়েছেন এবং অন্যান্যরা বলছেন- তিন তালাক দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে, নাতির রিওয়ায়েতই বেশী

সহীহ বলে গণ্য হবে। উক্ত হাদীছের আরবী ইবারত হচ্ছে-

وحديث نافع ابن عجير وعبدالله ابن على ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده ان ركانة طلق امرأته البتة فردها النبى صلى الله عليه وسلم اصح لانهم ولد الرجل واهله اعلم به ان ركانة انما طلق مرأته البتة وجعلها النبى صلى الله عليه وسلم واحدة.

সার কথা হলো তিন তালাক সম্বলিত সমস্ত রিওয়ায়েত জঈফ। ইমাম বায়হাকী(রাঃ) বলেন যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আটটি রিওয়ায়েত এর বিপরীত বর্ণিত আছে এবং রুকানার নাতি থেকেও তালাকে বত্তার একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। বলুন, তিন তালাক সম্বলিত এক রিওয়ায়েত, না তালাকে বত্তা সম্বলিত নয় রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য হবে? বায়হাকীর ইবারতটা হচ্ছে-

وهذا الاسناد لاتقوم به الحجة مع ثمانية ورد عن عباس فتيا بخلف ذالك ومع رواية اولادر كانة ان طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق.

(সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৭ম খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি যে আবু রুকানা বারগাহে নববীতে আরয করেছিলেন ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি এক তালাকের নিয়তই করেছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ ব্যাপারে কসমও করায়েছিলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। ইমাম নববী বলেছেন আবু রুকানার তিন তালাক সম্বলিত রিওয়ায়েতটি জঈফ(দুর্বল) এবং অপ্রসিদ্ধ লোক থেকে বর্ণিত হয়েছে। ওর তালাকের ব্যাপারে কেবল ওই রিওয়ায়েতটি সহীহ, যেটা আমি বর্ণনা করেছি অর্থাৎ উনি তালাকে বত্তাই দিয়েছিলেন। বত্তা শব্দের মধ্যে এক ও তিন উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। সম্ভবতঃ তিন তালাক সম্বলিত হাদীছের বর্ণনাকারী বত্তা বলতে তিন তালাকই মনে করেছেন। এ জন্য বত্তার পরিবর্তে তিন তালাকই বলে দিয়েছেন যার জন্য এ মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম নব্বীর মূল ভাষ্যটা হচ্ছে-

واماالروايت اللتى رواها المخالفون ان ركانة طلق ثلثا فجعلها واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين وانما

الصحيح منها ماقدمناه انه طلقها البتة ولفظ البتة محتمل للواحدة وللثلث ولعل صاحب هذا الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعنى الذى فهمه وغلط فى ذالك.

৪নং আপত্তিঃ সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) স্বীয় বিবি সাহেবানীকে ঋতুকালীন সময়ে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ গুলোকে এক তালাকই সাব্যস্ত করেছেন এবং ওকে পুনঃগ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। যদি এ তিন তালাক তিনই ধরা হতো, তাহলে পুনঃগ্রহণ সম্ভব হতো না।

উত্তরঃ এটা ভুল ধারণা। আসলে সৈয়্যদুনা ইবনে উমর নিজ বিবিকে ঋতুকালে এক তালাকই দিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রজায়াত অর্থাৎ পুনঃ গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। কেননা তালাক পবিত্র থাকাকালীন সময়ে দেয়া উচিৎ। যেমন মুসলিম শরীফের প্রথম খণ্ড تحريم الطلاق الحائض শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

عن نافع عن عبدالله انه طلّق امراة له وهى حائض تطليقة واحدة فامره رسول الله عليه وسلم ان يراجع ثم يمسكها حتى تطهر.

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নববী শরীফের الطلاق শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-

واما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة اللتى ذكرها مسلم وغيره طلّقها واحدة.

সুতরাং তাঁর ব্যাপারে তিন তালাক সম্পর্কিত রিওয়ায়েতসমূহ একেবারে জঈফ (দুর্বল)।

৫নং আপত্তিঃ তফসীরে কবীরের দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠায় الطّلاق مرّتان এর তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখিত আছে-

مَعْنَه اَنْ تَطْلِيْقَ الشَّرْعِيَّة يَجِبُ اَنْ يَكُوْنَ تَطْلِيْقَة عَلى

التفريق دون الجمع والارسال وهذا التفسير هو قول من قال الجمع بين الثلاث حرام.

অর্থাৎ শরয়ী তালাক এক সঙ্গে না দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে দেয়া ওয়াজিব। এটি তাঁদেরই তফসীর, যাঁরা এক সংগে তিন তালাক দেয়াকে হারাম বলেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে এক সংগে তিন তালাক দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

উত্তরঃ এটা অস্বীকার করছে কারা? আমরাওতো বলি- তালাক পৃথক পৃথক ভাবে দেয়া উচিৎ। কিন্তু কথা হচ্ছে- এক সংগে তিন তালাক দিলে, তিন তালাক কার্যকরী হবে কিনা? তাফসীরে কবীরে উপরোক্ত ইবারতে তিন তালাক পতিত হবে না বলে কোথায় আছে? সেখানেতো কেবল উল্লেখিত আছে যে এ রকম কাজ নাজায়েয। কোন জিনিস হারাম হওয়া এক কথা আর এর উপর শরয়ী হুকুম বর্তানো আর এক কথা। রমযান শরীফে দিনের বেলায় খানাপিনা হারাম। কিন্তু কেউ খেয়ে ফেল্‌লে রোযা ভেংগে যাবে। যেনা হারাম তবে যদি কেউ করে, তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। হারামের প্রভাব কার্যকরণের উপর পতিত হয় না।

৬নং আপত্তিঃ তফসীর কবীর (মিসরী) দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

وهو اختيار كثير من علماء الدين انه لو طلقها اثنتين او ثلثا لا يقع الا الواحدة.

অর্থাৎ অনেক উলামায়ে দ্বীন এটাই গ্রহণ করেছেন যে যদি কেউ এক সংগে দুই বা তিন তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে এক তালাকই পতিত হবে। অতএব বোঝা গেল যে সাধারণ উলামায়ে ইসলামের মতে এক সংগে তিন তালাক দিলে এক তালাকই পতিত হয়।

উত্তরঃ আপত্তিকারী বলেনি যে, ওসব উলামা কারা এবং তাদের মযহাব কি? আমি মনে করি এরা হলেন ইবনে তায়মিয়া ও ওহাবী অনুসারী আলিমগণ। তাঁদের মযহাব সম্পর্কে আমি আলোচ্য বিষয়ের প্রথম অধ্যায়ে তাফসীরে সাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি যে ইবনে তায়মিয়া ও তাঁর অনুসারীগণকে হক্কানী উলামায়ে কিরাম গুমরাহ ও গুমরাহকারী বলেছেন। আর আপত্তিকারী তাফসীরে কবীরের পূর্ণ ইবারত উদ্ধৃত করেননি। উল্লেখিত ইবারতের আগে বর্ণিত আছে-

والقول الثانى وهو قول ابى حنيفة رضى الله عنه انه وان

كان محرما الا انه يقع.

অর্থাৎ দ্বিতীয় উক্তিটা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার- এক সংগে তিন তালাক দেয়া যদিওবা নিষেধ, তথাপি তালাক পতিত হবে। একটু পরে তাফসীরে কবীরে আরও উল্লেখিত আছে যে ইমামগণের অভিমত হচ্ছে যাকে তিন তালাক দেয়া হবে, সে স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (তফসীরে কবীর (মিসরী) দ্বিতীয় খণ্ডের ২৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন)

৭নং আপত্তিঃ যুক্তিও বলে যে এক সংগে তিন তালাক দিলে এক তালাকই ধরা উচিৎ; কেননা যে কাজসমূহের পৃথক পৃথকভাবে করার নির্দেশ আছে, সেগুলোকে একবারে করে ফেল্‌লে একের হুকুমই বর্তাবে। যেমন লায়ানে পৃথক পৃথক চারটি শপথ করা ওয়াজিব এবং হজ্বে শয়তানকে পৃথক পৃথকভাবে সাত কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। যদি কেউ সাত কংকর এক সংগে নিক্ষেপ করে, তাহলে এক বারই ধরা হবে। এবং আরও ছয় কংকর পৃথক পৃথকভাবে নিক্ষেপ করতে হবে। আর চারটি শপথ যদি কেউ একটি শব্দ দ্বারা করে, তাহলে একটি শপথই ধরা হবে। অনুরূপ যদি কেউ শপথ করলো আমি এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবো, কিন্তু সে যদি এভাবে একবার পাঠ করে اللهم صل على سيدنا محمد الف مرة তাহলে দরূদকে এক হাজার বার মনে করা হবে না বরং একবার ধরা হবে। তাই যদি কেউ এক সংগে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তিন নয়, এক তালাক কার্যকরী হওয়া যুক্তিসংগত।

উত্তরঃ আলহামদু লিল্লাহ, আপনারা কিয়াসের সমর্থক হলেন এবং কিয়াসের জন্য বেশ কষ্টও স্বীকার করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনারা যেমন, আপনাদের কিয়াসও তেমন। জনাব, লায়ান ও রমিতে কাজই উদ্দেশ্য, এর কার্যফল নয় কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে কেবল কার্য নয়, কার্যফলই উদ্দেশ্য। সুতরাং এ কিয়াসটা সঠিক হলো না। লায়ানে একটি শপথ একটি সাক্ষ্যের সমতুল্য। যেহেতু যেনায় চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন, সেহেতু লায়ানে, যা এর বিকল্প হিসেবে বিবেচ্য, শপথ কার্যটাও চার বার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক শব্দে চারটি শপথ করলে, একটি কার্য বোঝা গেল। আর শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে সাত কংকর নিক্ষেপ হয়েছে সত্য, তবে নিক্ষেপ কাজ হয়েছে মাত্র একবার। যেহেতু আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিক্ষেপ কাজটি সাতবার করেছেন, সেহেতু এর অনুসরণ করা কর্তব্য। দরূদ শরীফ পাঠে পরিশ্রম অনুযায়ী ছওয়াব পাওয়া যায়। এক হাজার দরূদ শরীফের অঙ্গীকার

মানে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠের অঙ্গীকার। তাই যদি একবারে 'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সায়্যিদেনা মুহাম্মদ এক হাজার বার' এ রকম বললে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠের সেই কষ্টটা পাওয়া গেল না। কিন্তু তালাকটা কোন্ ছওয়াবের কাজ হলো যে বেশী কষ্ট করলে বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে? মোট কথা হলো তাদের সমস্ত আপত্তি মাকড়সার জালের মত দুর্বল। তাদের আরাম প্রিয়তা ও নফসের অনুসরণই হচ্ছে এ সব বক্তব্যের মূল ভিত্তি। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কুরআন হাদীছ বোঝার তাওফীক দিন।

যদি তিন তালাকের দ্বারা এক তালাক পতিত হয়, এবং স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি তিন তালাক পতিত হয় এবং ২য় স্বামী গ্রহণ ব্যতিরেকে পুনরায় ঘরসংসার করে, তাহলে সারা জীবন হারামকারী হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং সতর্কতামূলক এক সংগে তিন তালাক বললে তিন তালাকই ধরা উচিৎ। এ জন্য উসূল ফিক্‌হে পারদর্শী উলামায়ে কিরাম বলেন যে, যখন মুবাহ ও হারামের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তখন হারামকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।

وَصَلَّى اللّٰه تعالى على خَيرِخَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدنا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ واٰله واصحابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِهٖ وهو ارحم الرَّاحِمِيْنَ.

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত